পশ্চিমবঙ্গ

নদিয়া জেলা সংখ্যা

১৪০৪

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ৩১ ✿ সংখ্যা ১৭-২১

২৬ সেপ্টেম্বর, ৩, ২৪, ৩১ অক্টোবর এবং ৭ নভেম্বর ১৯৯৭

প্রধান সম্পাদক : তরুণ ভট্টাচার্য *সম্পাদক :* দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক : মুকুলেশ বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল ● উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ : গোকুলচাঁদের মন্দির // শান্তিপুর // ছবি : দিলীপকুমার পাল

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় // ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

তৃতীয় প্রচ্ছদ : বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় // মোহনপুর // ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

চতুর্থ প্রচ্ছদ : জলঙ্গী সেতু // কৃষ্ণনগর // ছবি : দিলীপকুমার পাল

কৃতজ্ঞতা : এই সংখ্যায় ব্যবহৃত তথ্যাবলী, আলোকচিত্র, মানচিত্র এবং প্রবন্ধাবলী জেলার সভাধিপতি হরিপ্রসাদ তালুকদার, মোহিত রায়, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, সত্যেন মণ্ডল, অরবিন্দ মণ্ডল, সার্ভে অব ইন্ডিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রমুখের সৌজন্যে।

অঙ্গসজ্জা

প্রতাপ সিংহ ● তুলসীদাস বসাক ● রামচন্দ্র পণ্ডিত ● শ্যাম রুদ্র ● নিতাই গোড়ে ● জয়দেব পাল

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : কুড়ি টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

সুভাষ সরকার, তথ্য আধিকারিক

বিতরণ শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ // পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ● কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২১-৪২৯৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

নদিয়া জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হল। এর আগে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার হুগলি ও বর্ধমান জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের আরও কয়েকটি জেলার তথ্য ও প্রবন্ধ সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বেই সেগুলি মুদ্রিত হবে।

আমাদের পত্রিকার জেলা সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্য হল : জেলার প্রাচীন ইতিহাস, পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লৌকিক পরম্পরা ও সংগ্রামী মানসিকতা তুলে ধরার পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কৃষি-স্বাস্থ্য-জলসম্পদ-শিল্প-পঞ্চায়েত-সংস্কৃতি-সেচ-বিদ্যুৎ-বনসম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে যেসব উন্নয়ন ঘটেছে ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার অনুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশন করা। এর ফলে জেলার আবহমানকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক পরম্পরার ইতিহাস অনুধাবন করা যাবে।

সব জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবু নদিয়া জেলা বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে স্পর্ধিত ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগে বাংলার প্রথম প্রতিবাদী যে মহান মানুষ শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম নিলেন নদিয়ায়, তার সুস্থ অভিঘাতে বাংলা নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হল। তাঁকে ঘিরেই প্রথম জীবনী-কাব্য রচিত হল, তাঁকে ঘিরেই কোমল-কান্ত বৈষ্ণব গীতি-কবিতার উৎসার ঘটল যা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে নবজীবনের পথে পরিচালিত করেছে। নদিয়ায় আজ যে বাউল-ফকিরদের সমন্বয়ী ধর্মচেতনা ও গৌণ ধর্মগুলির উদার মানবতার ঐতিহ্যলালিত সন্ধান মেলে তারও উৎসভূমি চৈতন্য-দর্শন। গাঙ্গেয় সমতটের এই জেলা বাঙালি সংস্কৃতি-চেতনায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই সংখ্যা প্রকাশে নদিয়া জেলা পরিষদ এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর অকুণ্ঠ আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাদের অভিনন্দন জানাই। জেলাগুলির সমৃদ্ধ পরিচয় লাভ করে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও প্রতিবেশীর প্রতি সুস্থ আগ্রহ ব্যাপক ও গভীরতর হবে বলে কামনা করি।

নদিয়া জেলার পুরাকীর্তি

বিষ্ণুমূর্তি : সাহিত্য পরিষদ ॥ শান্তিপুর ছবি : কে সি কুণ্ডু
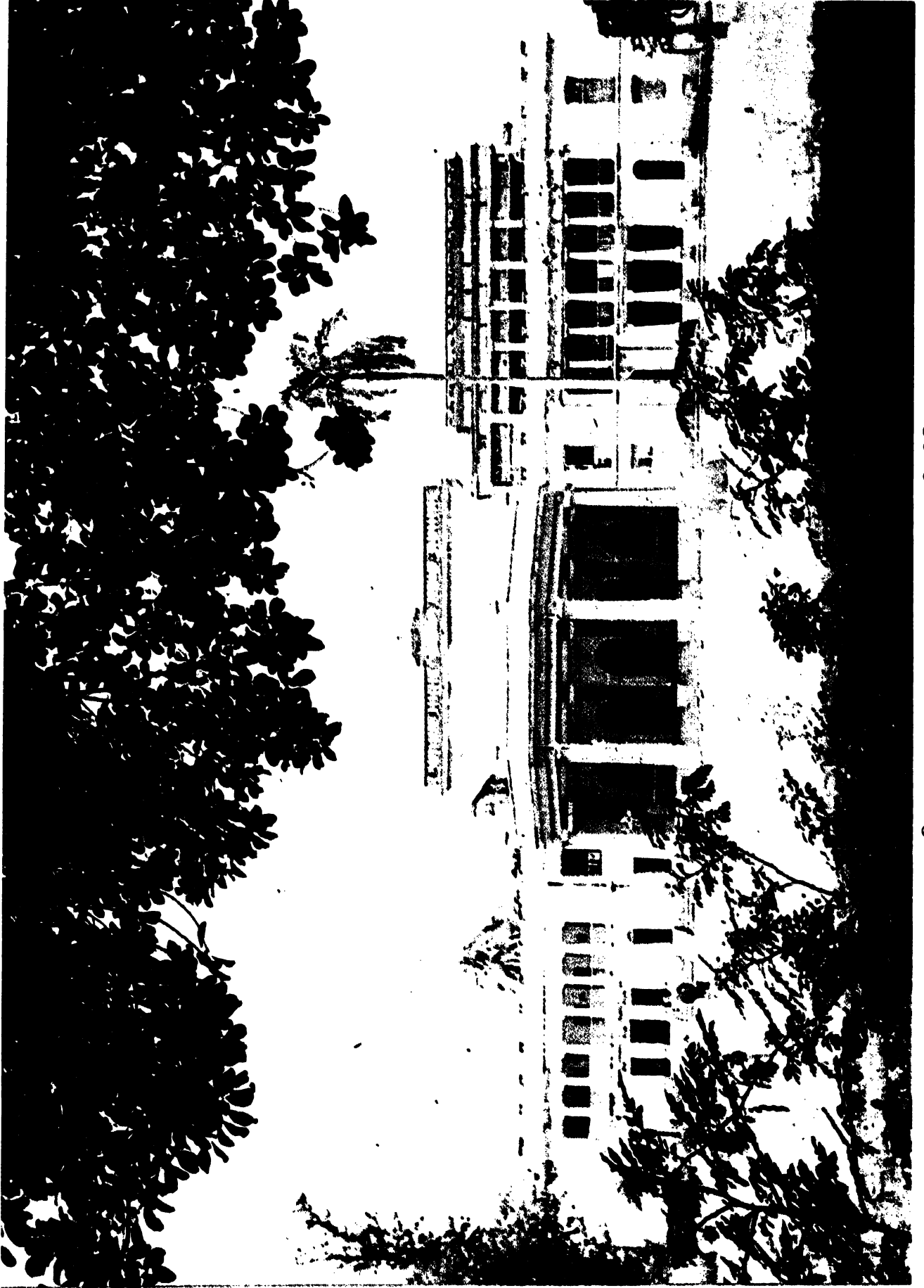
কৃষ্ণনগর রাজবাটি

ছবি : দিলীপকুমার পাল
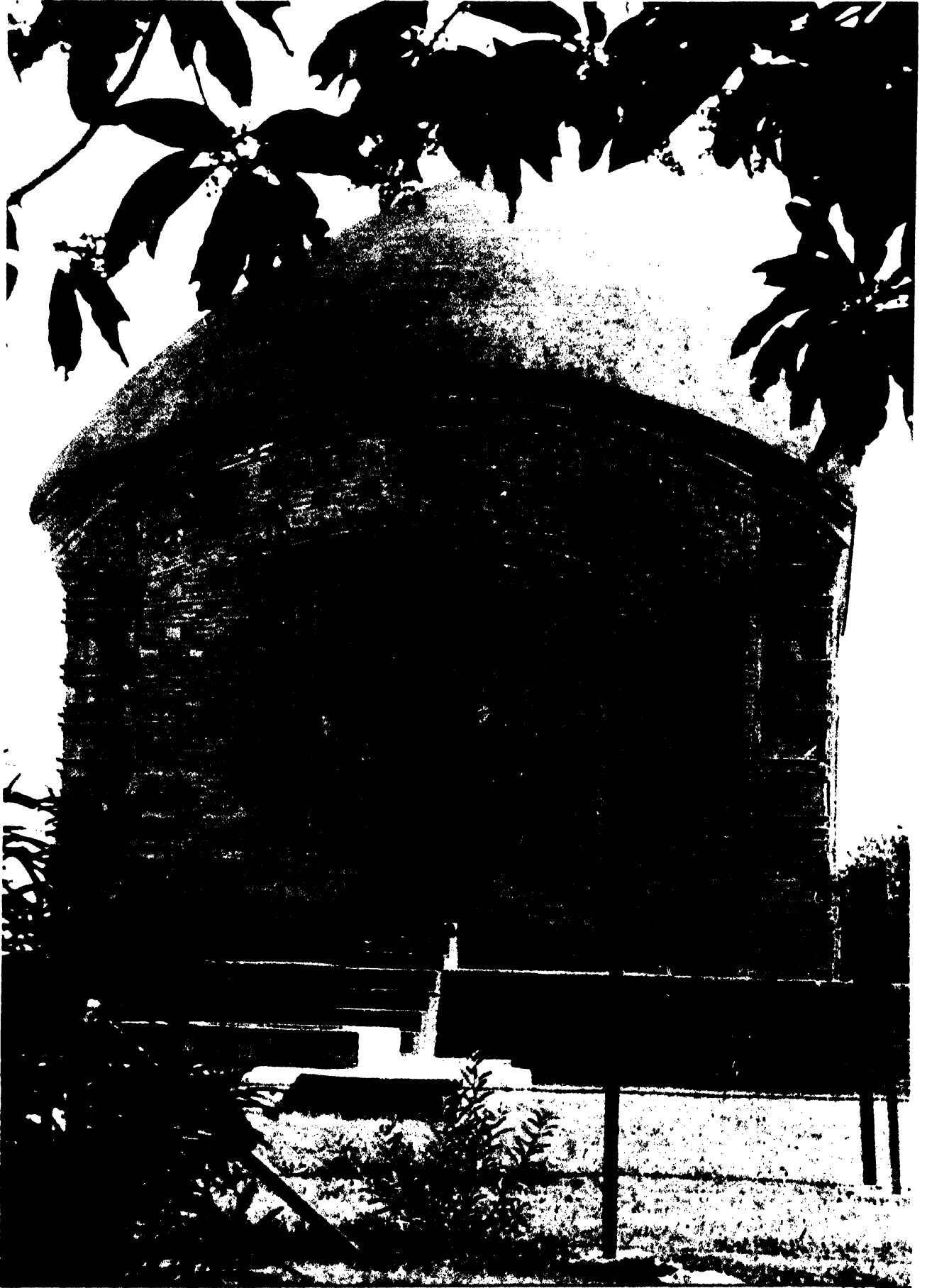
পালপাড়ার মন্দির ছবি : অপূর্ব সরকার
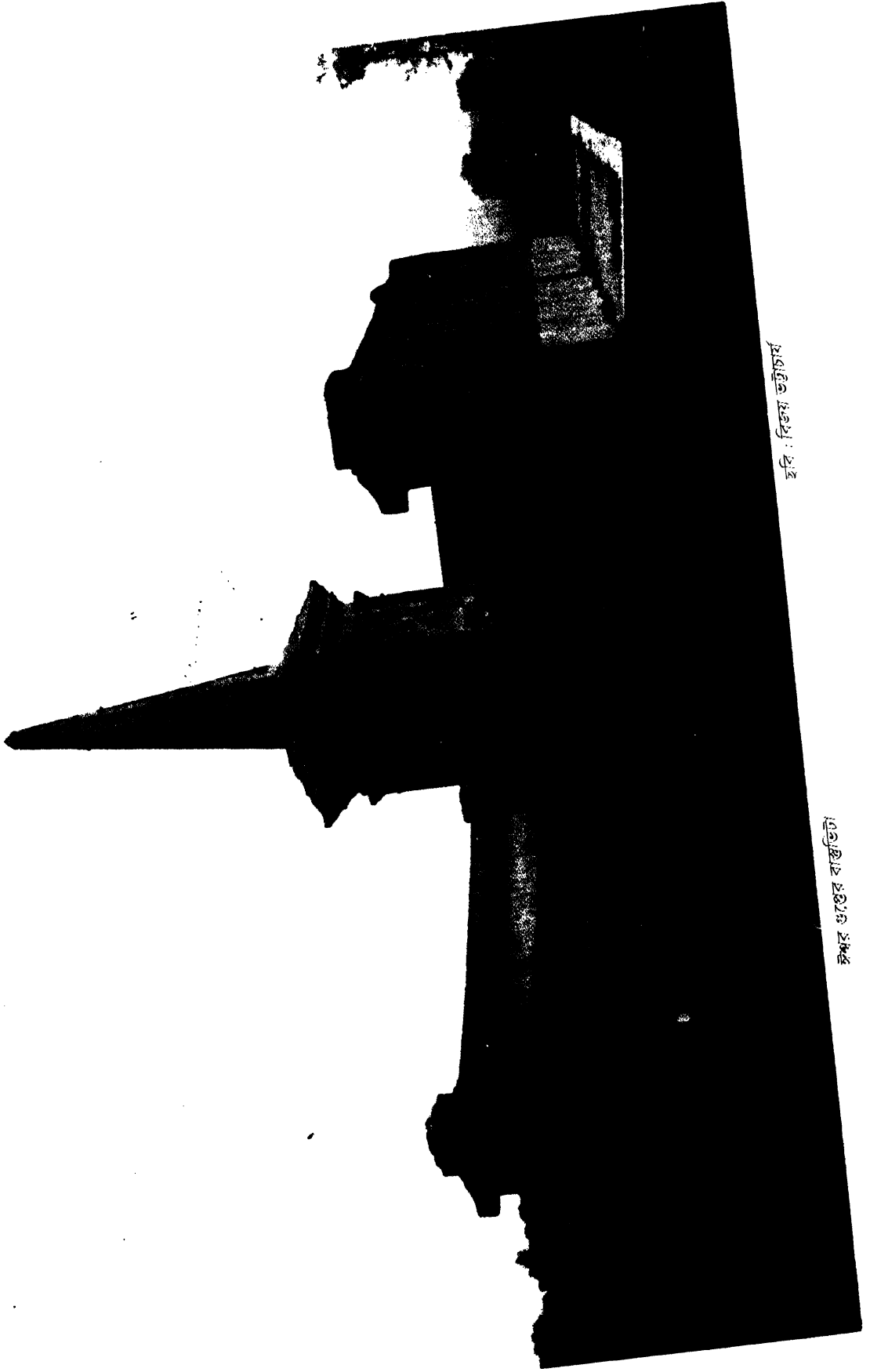
ঈশ্বর গুপ্তের বাস্তুভিটা
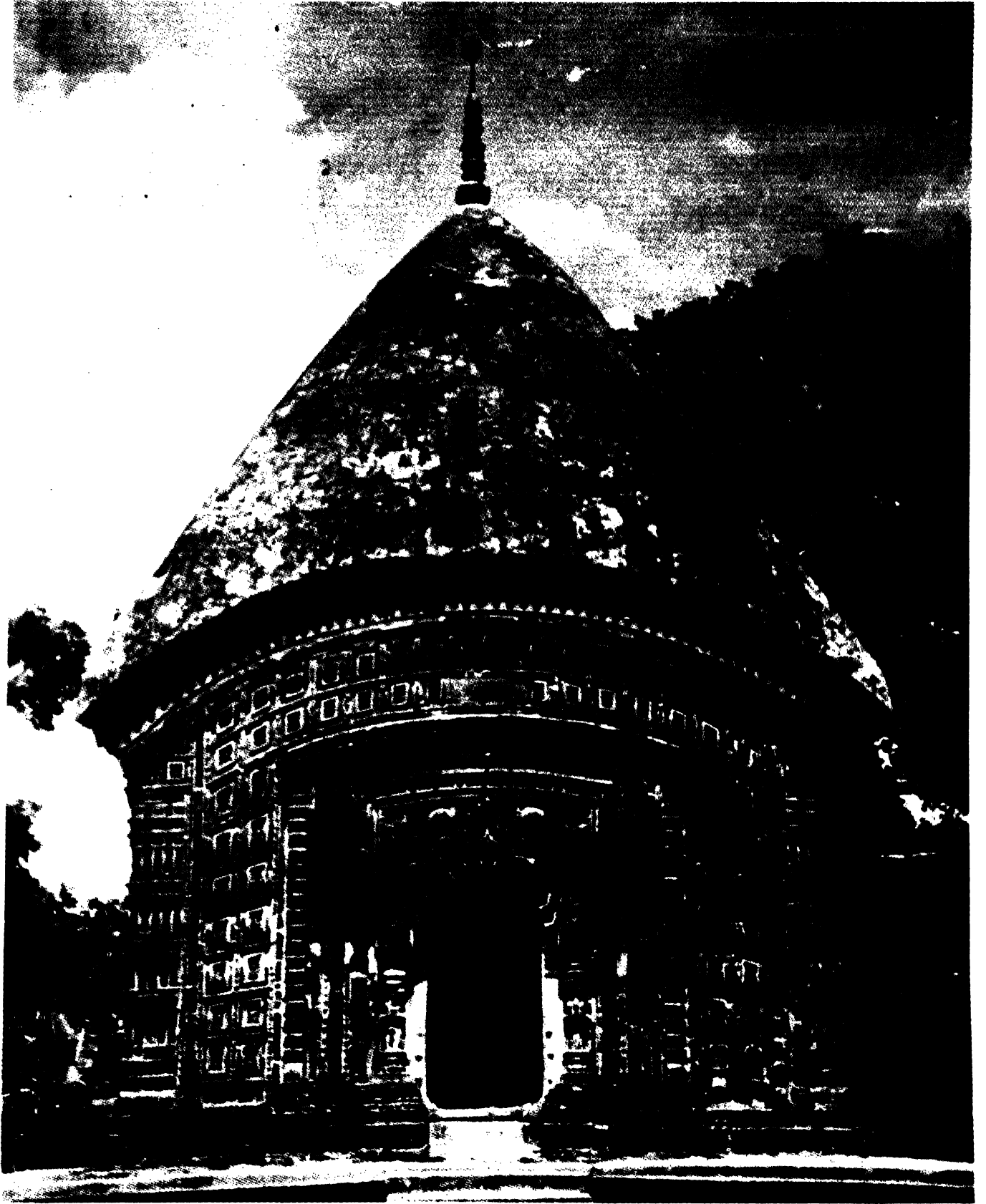
ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

রাঘবেশ্বর মন্দির ।। দিগনগর ছবি : সত্যেন মণ্ডল
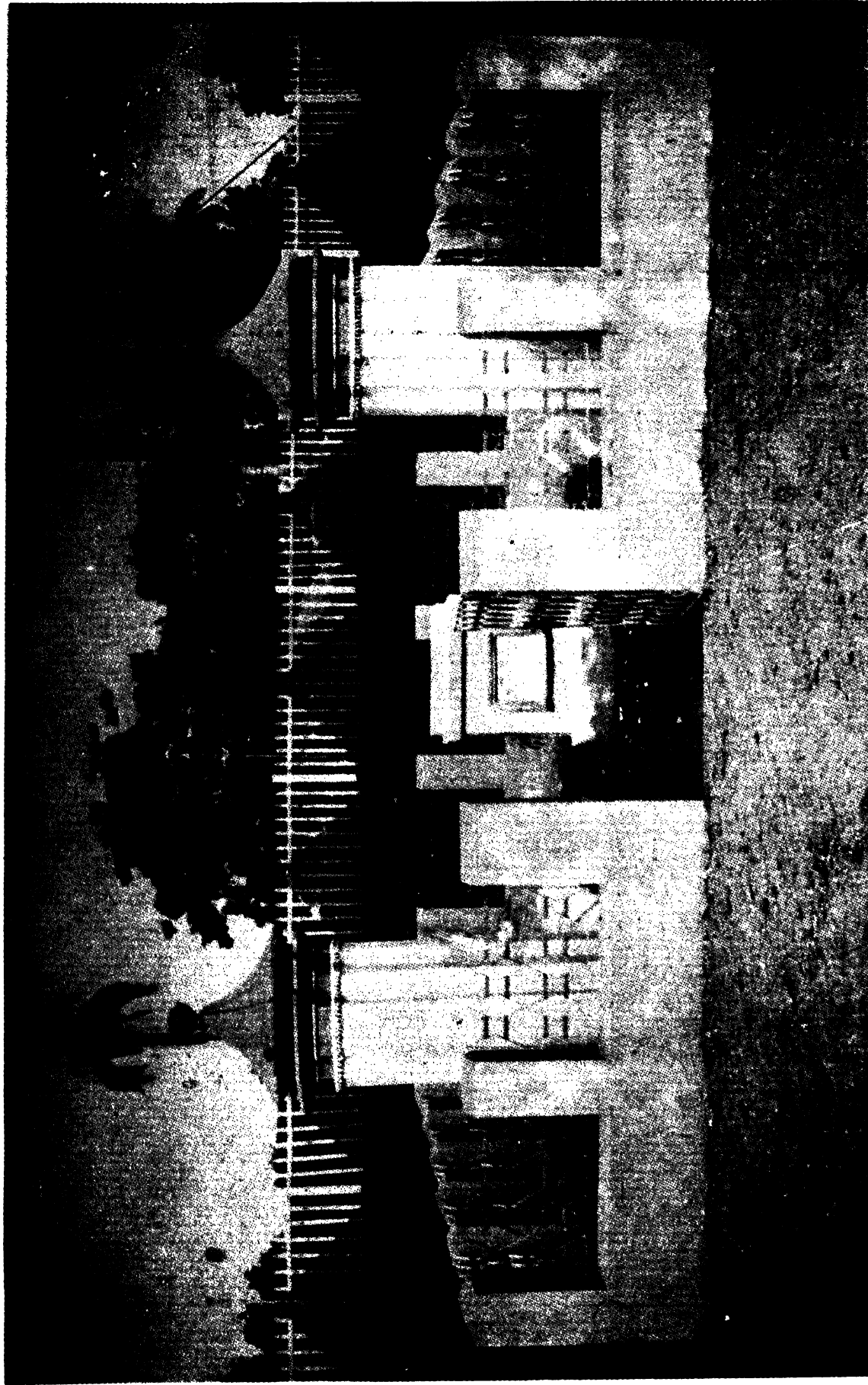
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভিটা ।। কৃষ্ণনগর   ছবি : সত্যেন মণ্ডল
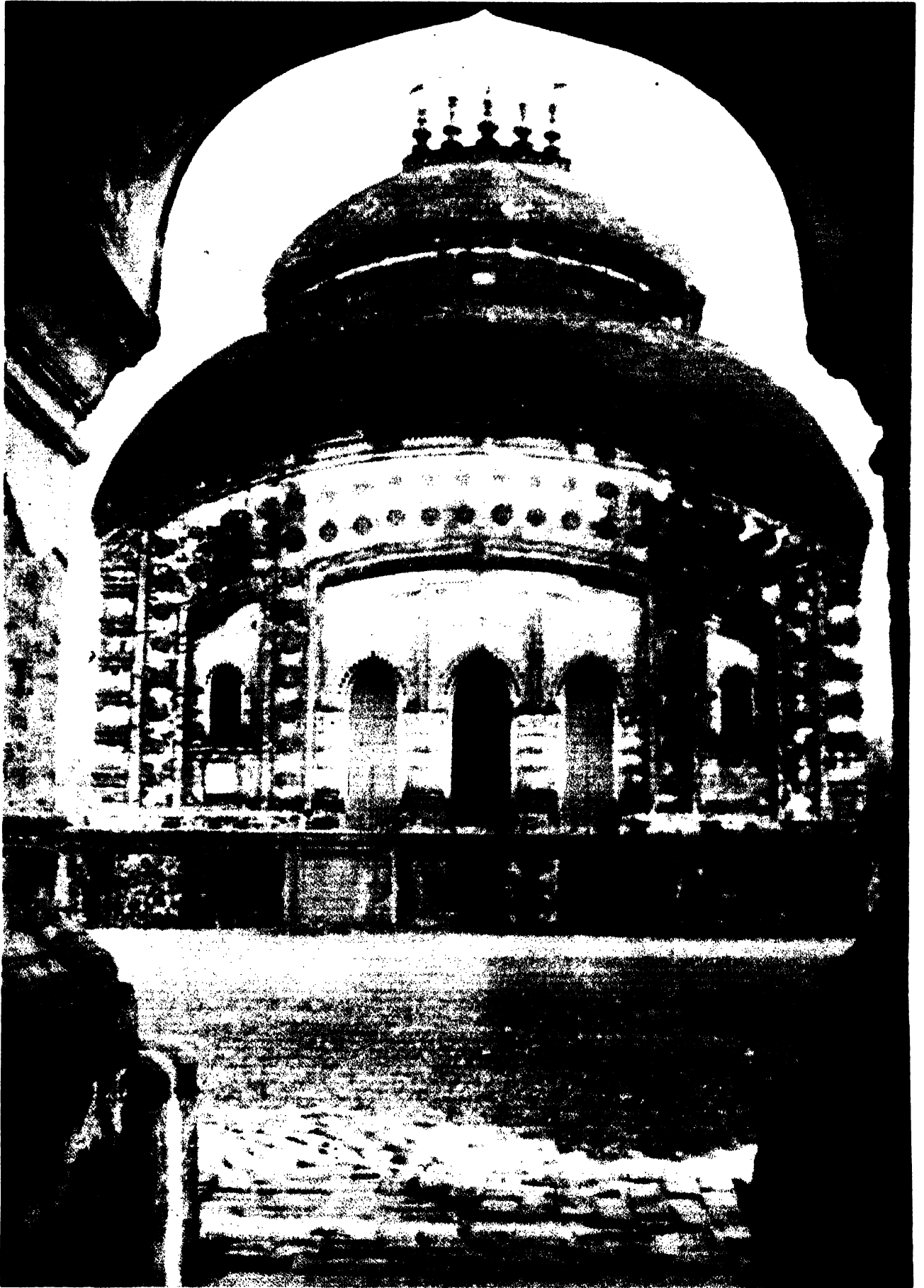
রথতলা কৃষ্ণরায় মন্দির ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য
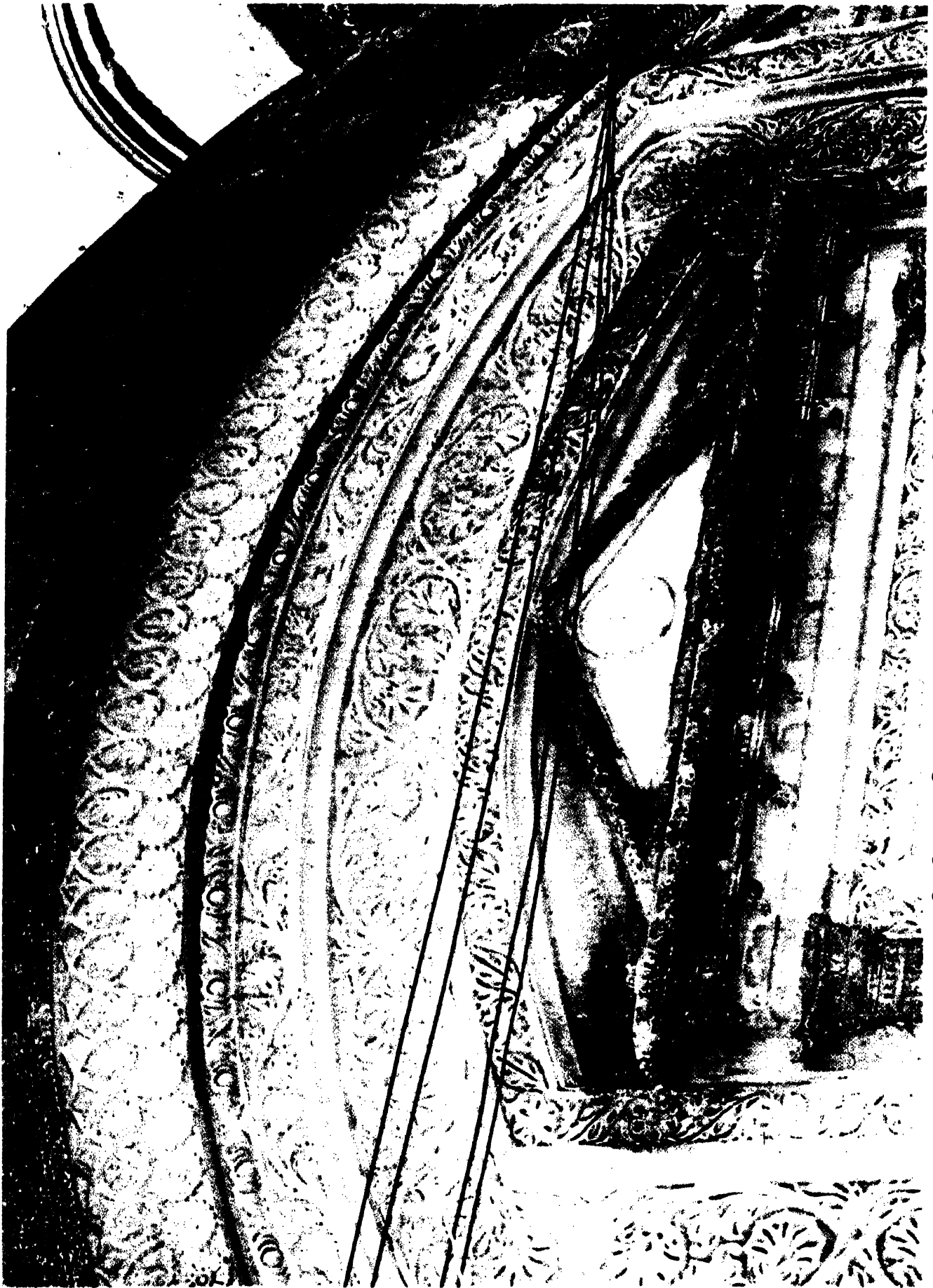
দ্বাদশ শিবমন্দির ॥ নবদ্বীপ   ছবি : শান্তিরঞ্জন দেব

দোলমঞ্চ // চাকদহ   ছবি : অপূর্ব সরকার
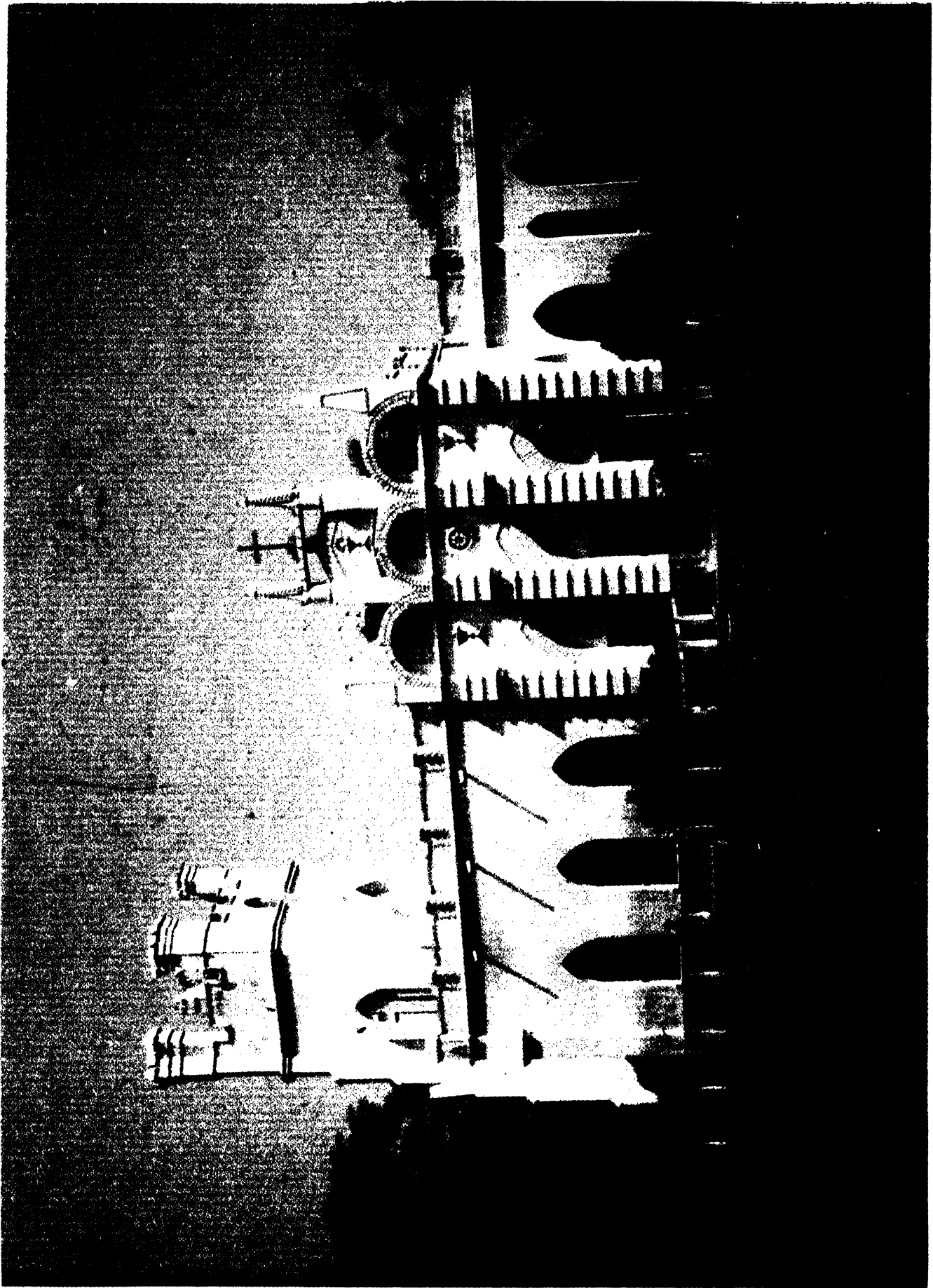
গির্জা ॥ চাপড়া ছবি : অরবিন্দকুমার মণ্ডল

গন্নাথ মন্দির ॥ যশড়া　　　　ছবি : অপূর্ব সরকার
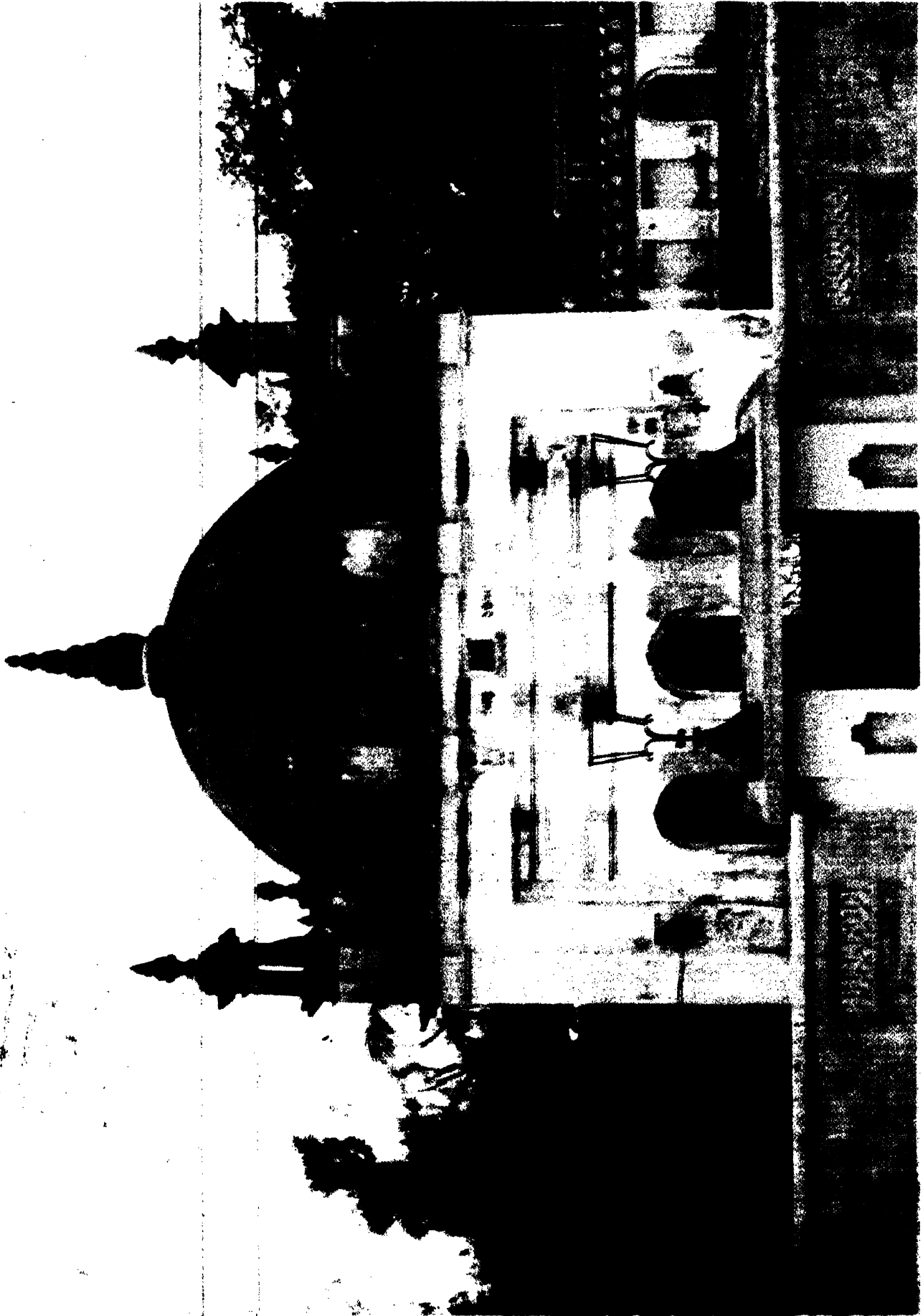
তোপখানা মসজিদ // শান্তিপুর ছবি : কে সি কুণ্ডু

বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ।। বামুনপুকুর ছবি : দিলীপকুমার পাল

জলেশ্বর মন্দির ।। শান্তিপুর　　　　ছবি : কে সি কুণ্ডু
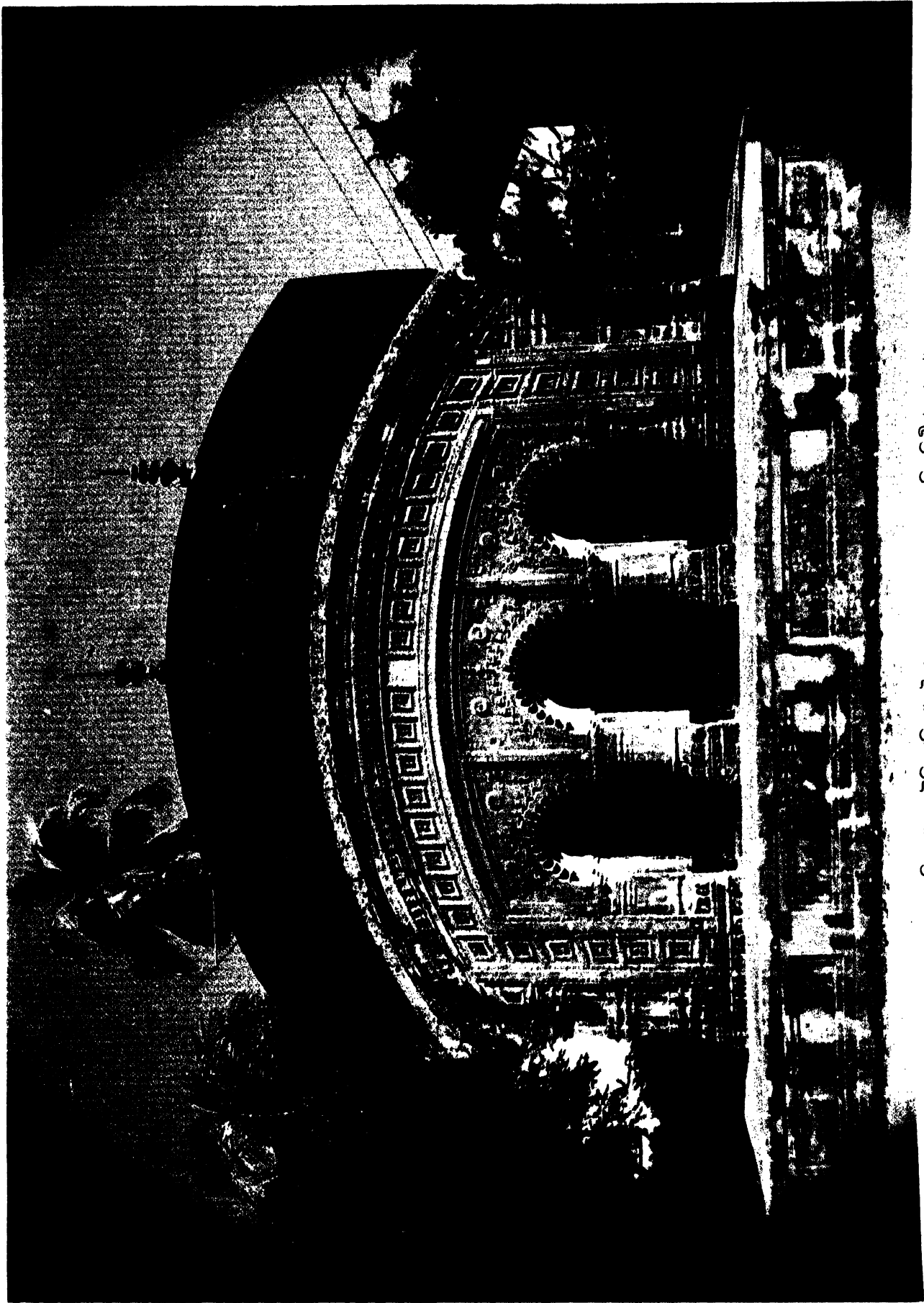
রাধাকৃষ্ণ মন্দির ।। মুস্তৌফি বাড়ি ।। উলা　　　　ছবি : দিলীপকুমার পাল
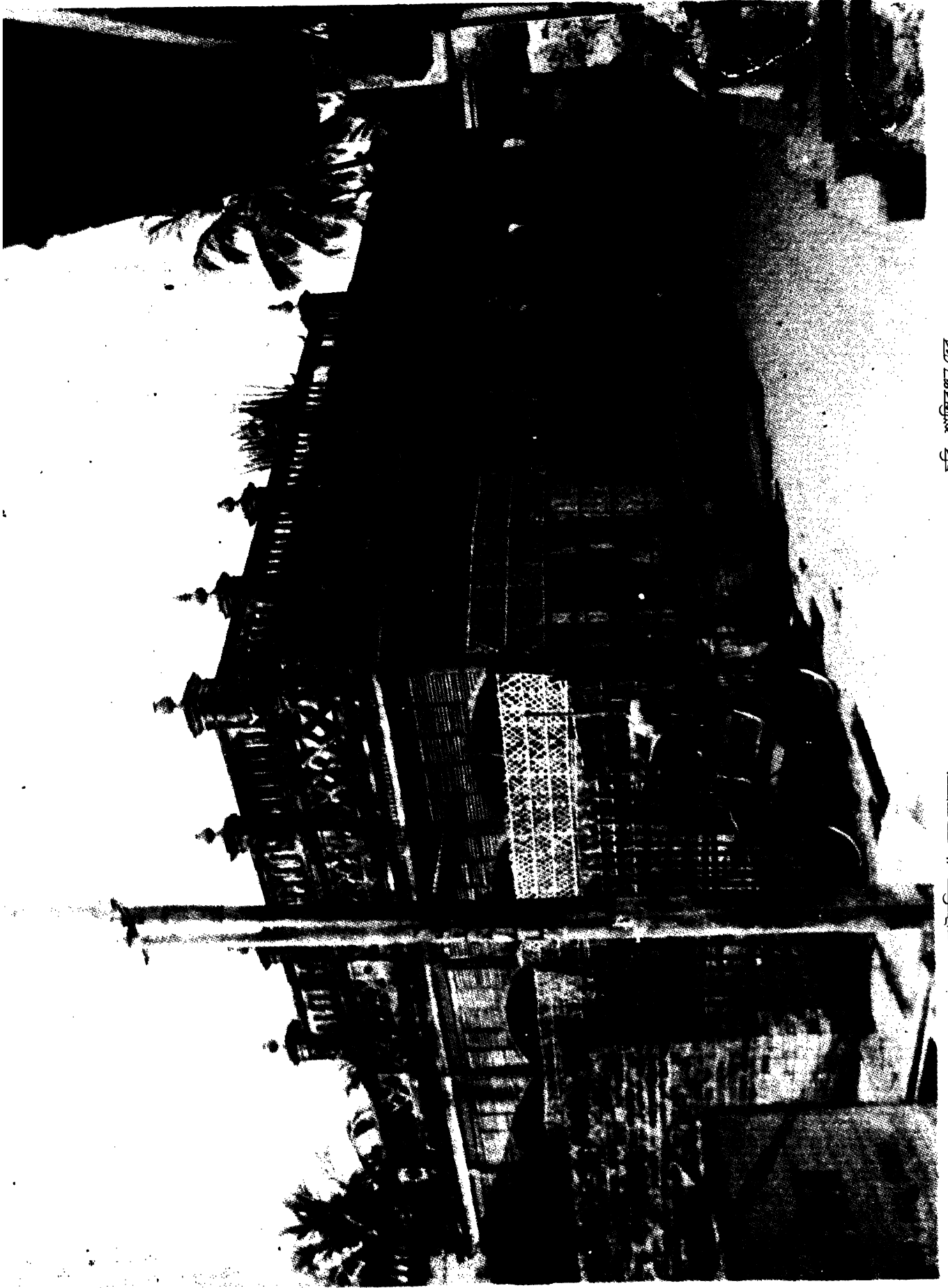
নাটমন্দির // বড় আমড়া   ছবি : শান্তিরঞ্জন দেব

বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ ।। নবদ্বীপ   ছবি : ব্রহ্মচারী ধনঞ্জয়
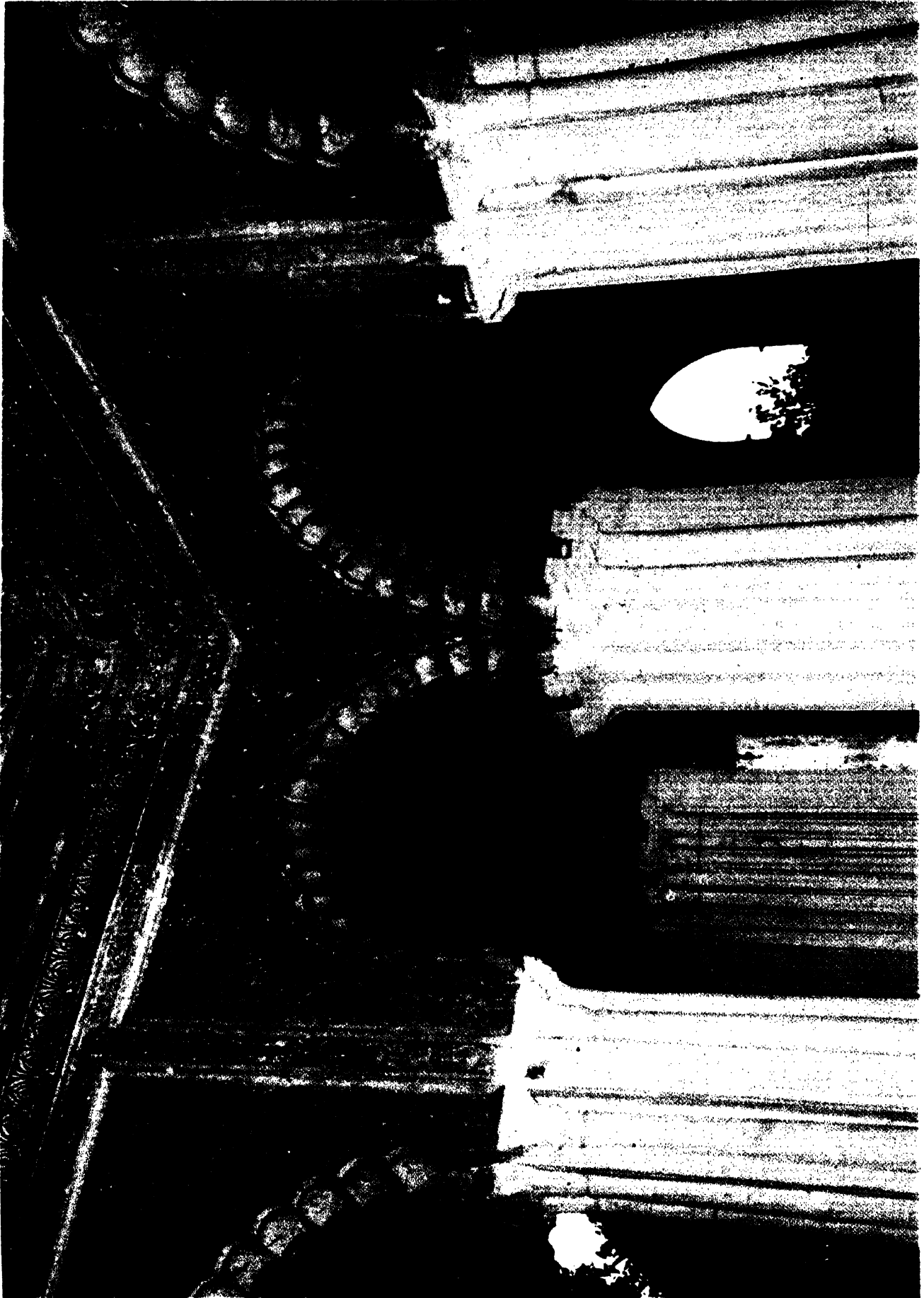
রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপে পঙ্খের কাজ ॥ কৃষ্ণনগর　　　　ছবি : সত্যেন মণ্ডল

গোকুলচাঁদ মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ ॥ শান্তিপুর   ছবি · দিলীপকুমার পাল
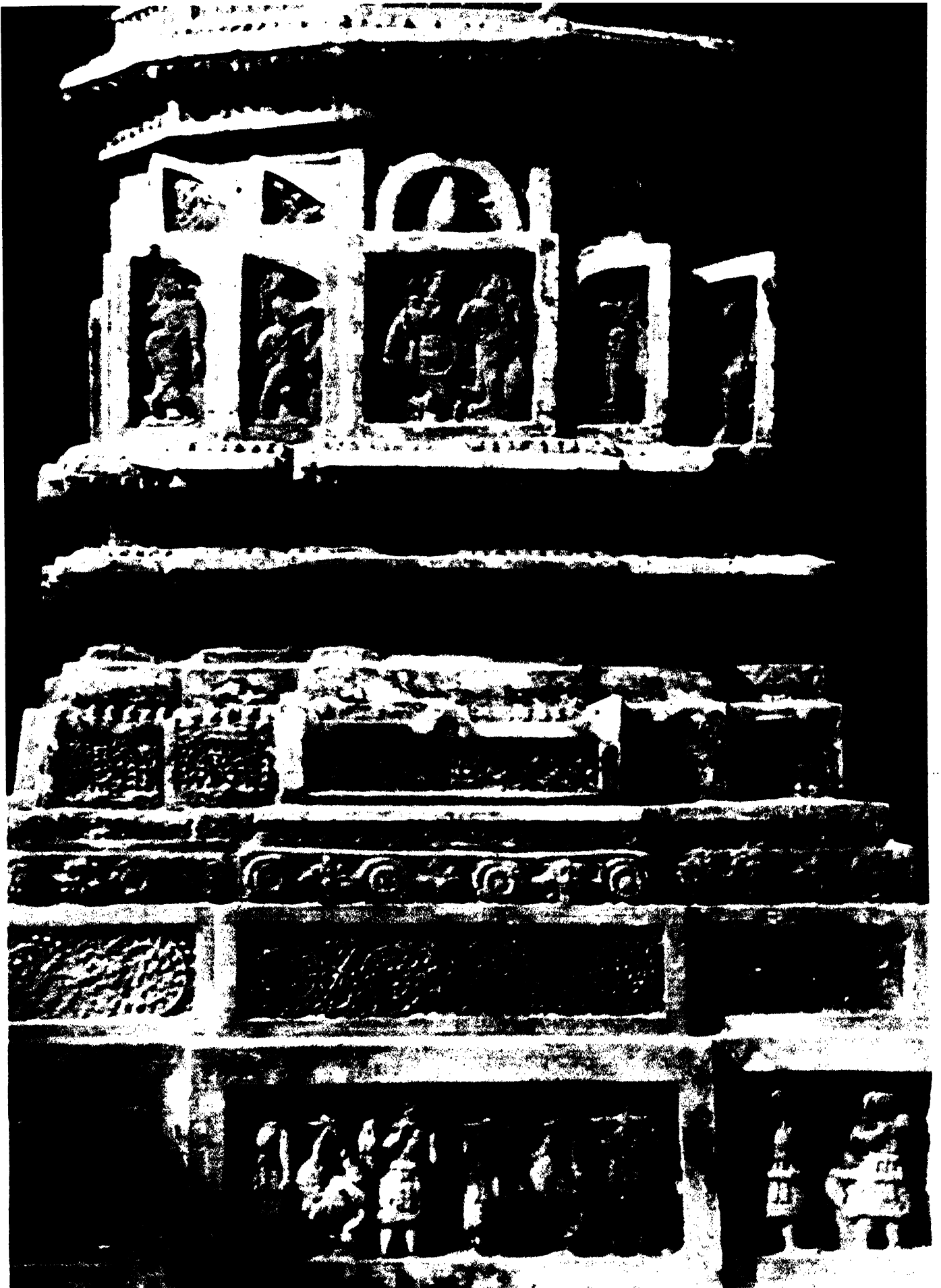
বাবলা অদ্বৈত পাট ॥ শান্তিপুর *ছবি : কে সি কুণ্ডু*
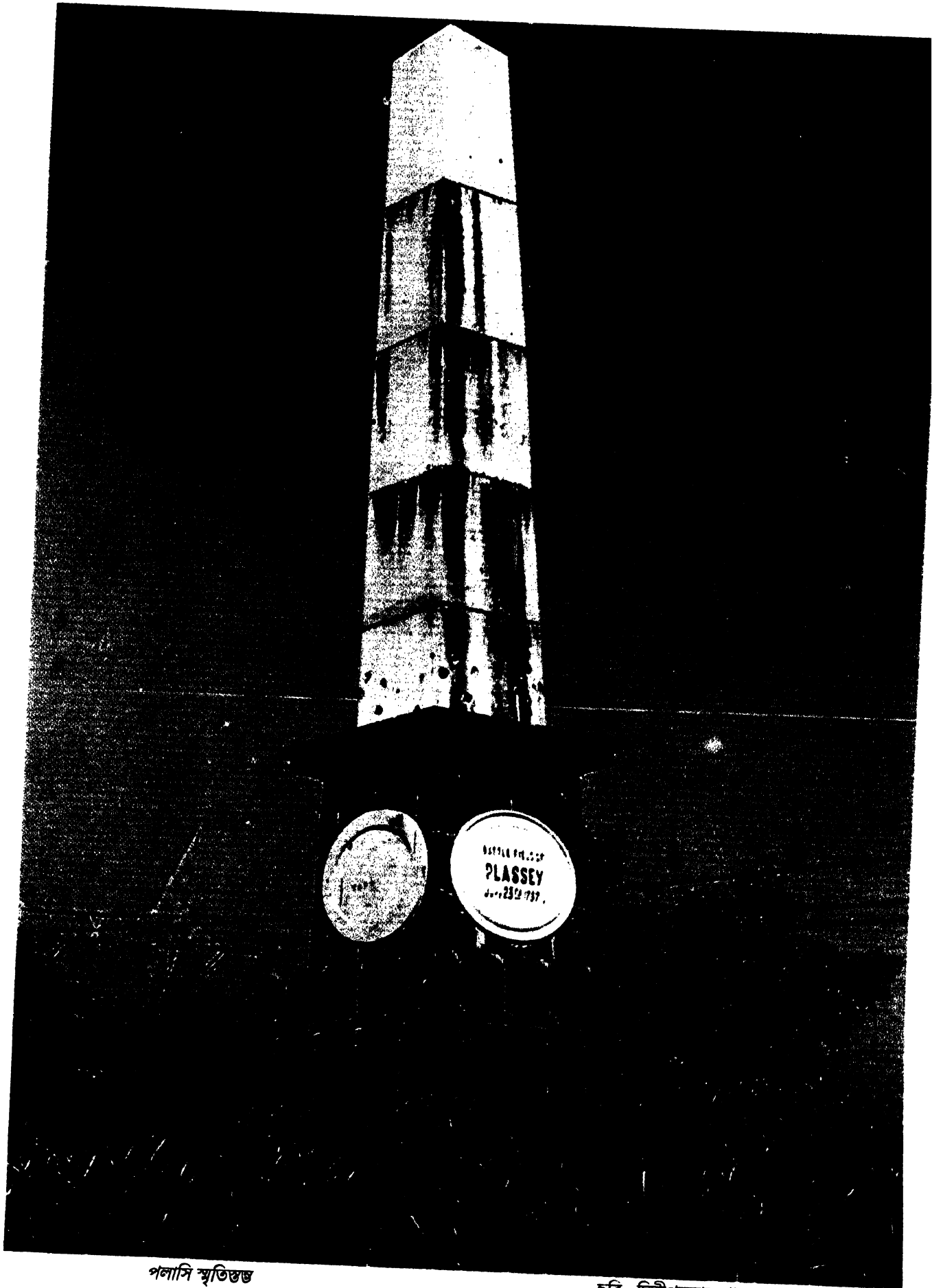
পলাসি স্মৃতিস্তম্ভ
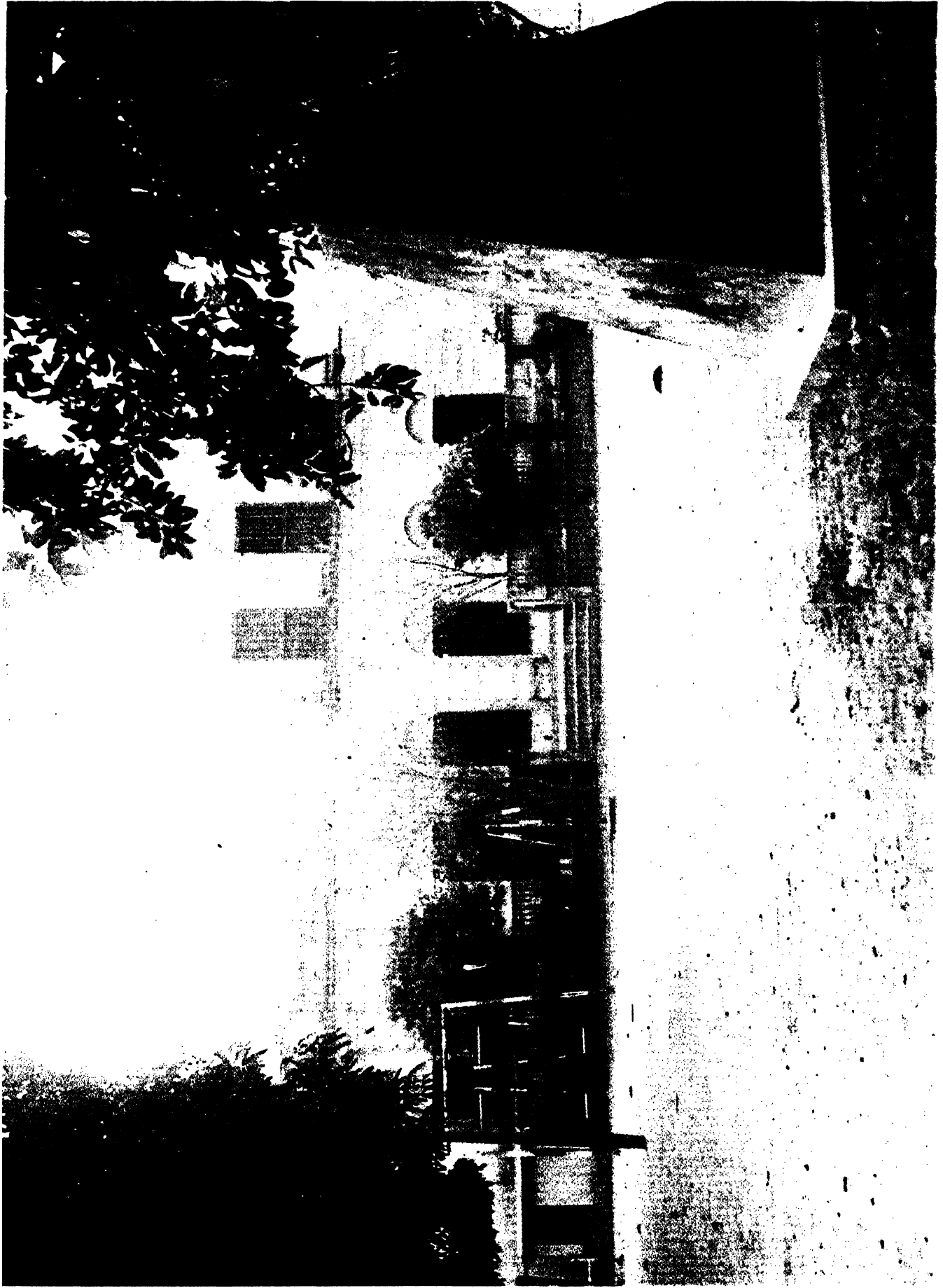
ছবি : দিলীপকুমার পাল

রামতনু লাহিড়ীর বসতবাড়ি // কৃষ্ণনগর — ছবি : দিলীপকুমার পাল
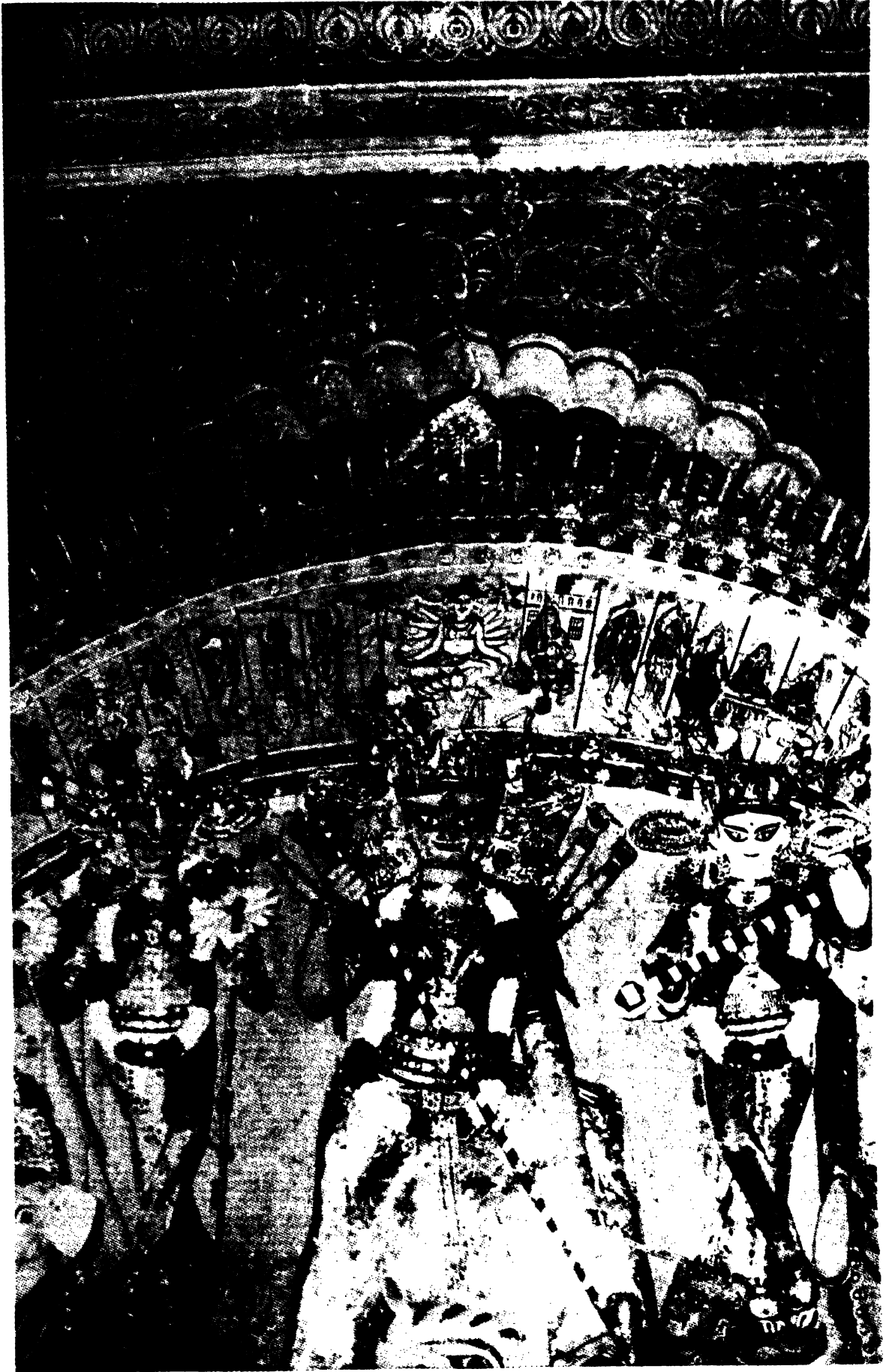
রাজরাজেশ্বরী ।। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি   ছবি : সত্যেন মণ্ডল
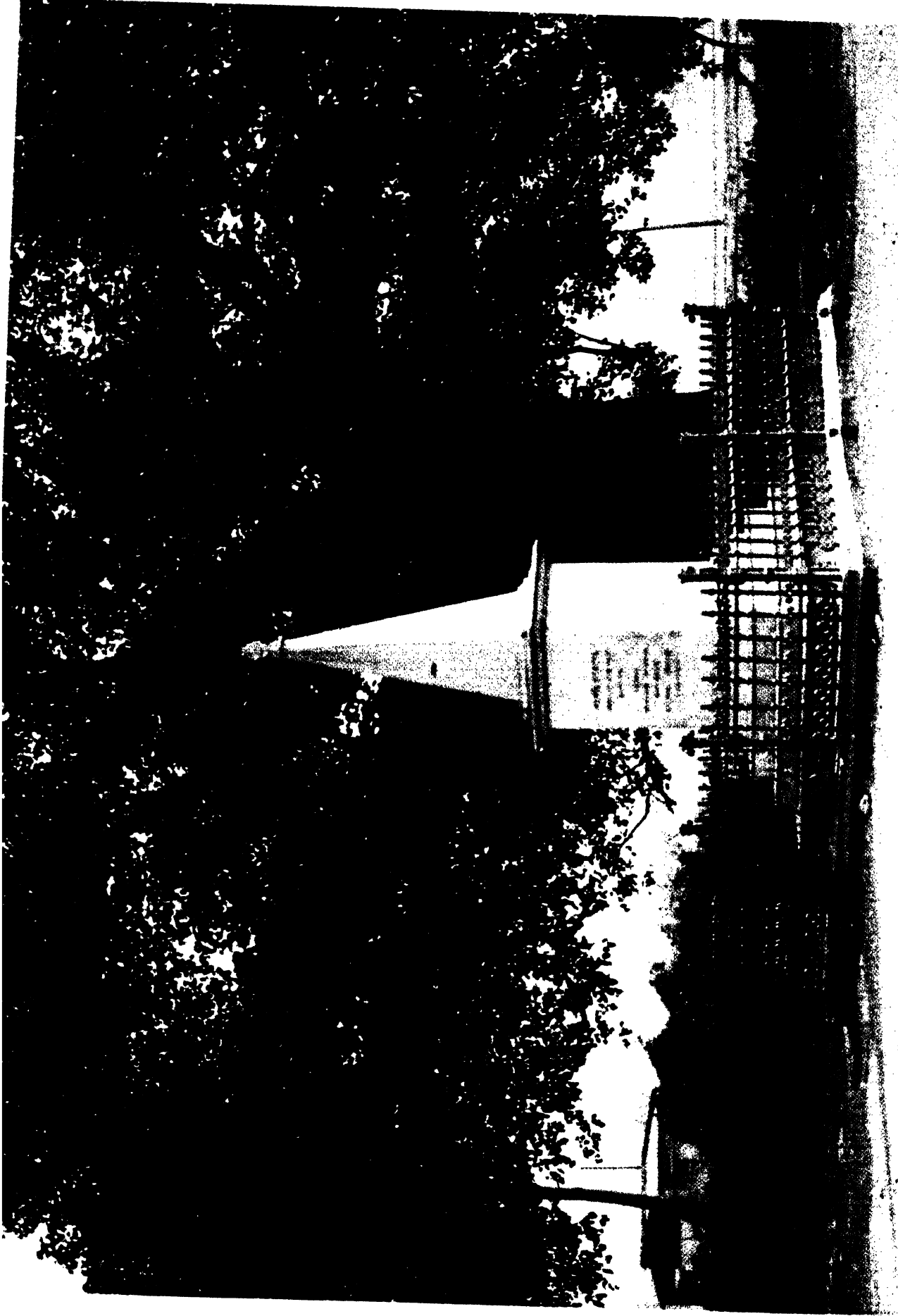
কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান :: ফুলিয়া

ছবি : দিলীপকুমার পাল

নদিয়া জেলা একনজরে

হরিপ্রসাদ তালুকদার
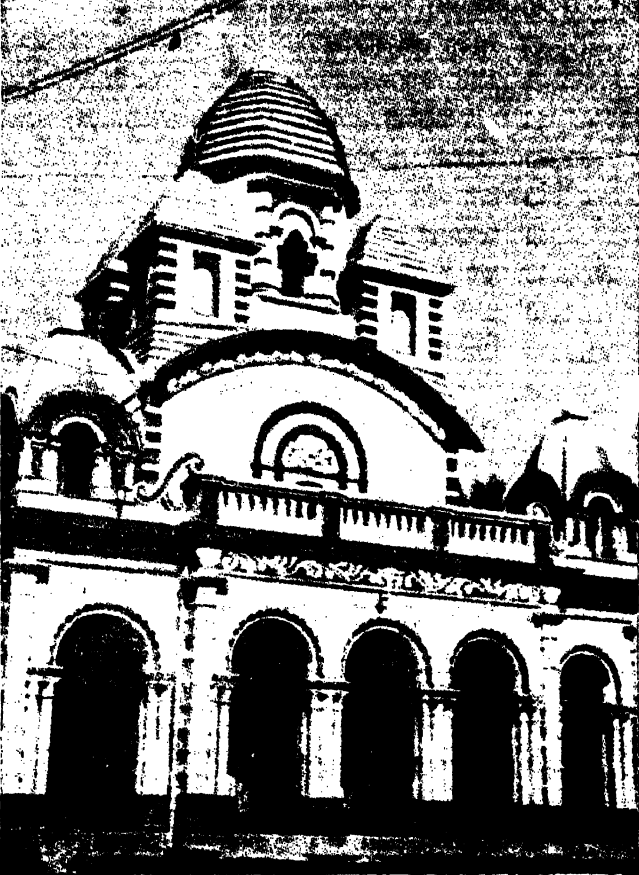
বুড়ো শিব মন্দির ॥ নবদ্বীপ ছবি : সত্যেন মণ্ডল

অবস্থান ও আয়তন

অন্যান্য জেলা সম্পর্কে জানি না, তবে নদিয়া জেলার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জেলার আয়তন ও সীমানা নানা কারণে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে নদিয়ার নামকরণ সম্পর্কেও নানা মত প্রচলিত আছে, অবশ্য সবই কিংবদন্তী নির্ভর, তাই কোনটি সঠিক তা বলা অসম্ভব।

নদিয়া জেলা ২২°৫৩´ ও ২৪°১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৯´ ও ৮৮°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এই জেলাকে প্রায় দু'ভাগে বিভক্ত করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জেলার উচ্চতা ৪৬ ফুট।

বর্তমানে নদিয়া জেলার আয়তন—৩,৯২৭ কি. মি.।

সীমানা

উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে—মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমে—বর্ধমান ও হুগলি জেলা, পূর্বে বাংলাদেশ।

এই দীর্ঘ ২৬৫ কি.মি. দৈর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা নদিয়া জেলার ১৭টি ব্লকের মধ্যে ৭টি ব্লকে

বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা, ব্লকগুলি হল—করিমপুর-১, করিমপুর-২, তেহট্ট-১ রানাঘাট-২, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি, নদিয়া জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ এই ৭টি ব্লকে।

প্রশাসনিক বিভাগ

নদিয়া জেলার ৪টি মহকুমা। (১) কৃষ্ণনগর সদর, (২) তেহট্ট, (৩) রানাঘাট, (৪) কল্যাণী।

- ❑ থানা — ১৬টি
- ❑ ব্লক — ১৭টি
- ❑ পঞ্চায়েত সমিতি — ১৭টি
- ❑ গ্রাম পঞ্চায়েত — ১৮৭টি
- ❑ পৌরসভা — ৯টি
- ❑ উপনগরী — ১টি
- ❑ শহরতলী বা বড় গঞ্জ — ১৬টি
- ❑ মোট মৌজা — ১৩৫২টি
- ❑ জেলা সদর — কৃষ্ণনগর

জনসংখ্যা

❑ ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে নদিয়া জেলার জনসংখ্যা ৩৮,৫২,০৯৭ জন।

(ক) পুরুষ—১৯,৮৯,৮৪১—৫১.৬৬%

(খ) মহিলা—১৮,৬২,২৫৬—৪৮.৩৪%

- ❑ তফসিলি জাতির জনসংখ্যা—১১,১৭,৫০৬—২৯.০১%
- ❑ তফঃ উপজাতির জনসংখ্যা— ৯০,৫২৫— ২.৩৫%
- ❑ মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা —৩২,০৩,৪৫৭—৮৩.১৬%
- ❑ মোট শহরের জনসংখ্যা — ৬,৪৮.৬৪০—১৬.৮৪%
- ❑ জনসংখ্যার ঘনত্ব —প্রতি বর্গকিমিতে—৯৮১

বিঃ দ্রঃ—এই জেলায় দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থাকার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অবিভক্ত নদিয়া জেলার জনসংখ্যা ছিল ৮,৪০,৩০৩ (১৯৪১ সালে) (১৯৫১)-তে ১১,৪৪,১০৪, (১৯৬১)-তে ১৭,১৩,৩২৪, (১৯৭১)-তে ২২,৩০,২৭০, (১৯৮১)-তে ২৯,৬৪,২৫৩, (১৯৯১)-তে ৩৮,৫২,০৯৭।

❑ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার বিন্যাস

- ❑ হিন্দু — ৭৫.২০%
- ❑ মুসলিম — ২৪.০৮%
- ❑ খ্রিস্টান — ০.৬৯%
- ❑ অন্যান্য — ০.০৩%

❑ কর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস

- ❑ কৃষিতে নিযুক্ত — ৮.৪৫%
- ❑ কৃষি শ্রমিক — ৭.৯২%
- ❑ নির্মাণ, প্রসেসিং সার্ভিসিং ও মেরামতি শ্রমিক — ২.১২%
- ❑ অন্যান্য শ্রমিক — ১০.৩২%
- ❑ প্রান্তিক শ্রমিক — ০.৫৩%
- ❑ অশ্রমিক জনসংখ্যা — ৭০.৬৬%

শিক্ষা

(ক)	প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	২৪৫৩
	গ্রামে	—	২১১৭
	শহরে	—	৩৩৬
(খ)	নিম্ন মাধ্যমিক	—	১৫৩
(গ)	উচ্চ মাধ্যমিক	—	২৩৫
(ঘ)	উচ্চতর মাধ্যমিক	—	৭০
(ঙ)	সিনিয়র মাদ্রাসা	—	৪
(চ)	মহাবিদ্যালয়	—	১৫
(ছ)	বিশ্ববিদ্যালয়	—	২
(জ)	কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা	—	৫
(ঝ)	শিক্ষক ও শিক্ষণ কেন্দ্র	—	৫
(ঞ)	গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত)	—	১১১

সাক্ষরের সংখ্যা	৪,৮৪,৭১৯	৬৭.৬৮%
মহিলা	২.৪০৭১৩	৪৯.৬৬%
পুরুষ	২,৪৪,০৬৬	৫০.৩৫%

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা

- ❑ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র — ১৩
- ❑ গ্রামীণ হাসপাতাল — ২
- ❑ সরকারি সাধারণ হাসপাতাল — ৩
- ❑ মহকুমা হাসপাতাল — ১
- ❑ জেলা হাসপাতাল — ১
- ❑ টিবি হাসপাতাল — ২
- ❑ হার্ট ইউনিট হাসপাতাল — ১
- ❑ বিশেষ হাসপাতাল — ১
- ❑ এস এইচ সি এস — ৫০
- ❑ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র — ৪৯৬
- ❑ কুষ্ঠ নিরোধক ইউনিট — ৭
- ❑ চেস্ট সেন্টার — ৭১
- ❑ ক্লিনিক — ৪৪
- ❑ ডিসপেনসারি (হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক সহ) — ৩৩
- ❑ ব্লাড ব্যাঙ্ক — ৫
- ❑ দন্ত চিকিৎসালয় — ১০
- ❑ বেসরকারি হাসপাতাল — ১০
- ❑ বেসরকারি চেস্ট ক্লিনিক — ৩
- ❑ জেলা পরিষদের ডিসপেনসারি — ৯
- ❑ অন্যান্য — ৫
- ❑ এক্সরে প্লান্ট — ১৩
- ❑ ই সি জি সেন্টার — ৩
- ❑ ফিজিওথেরাপি সেন্টার — ২
- ❑ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট — ২
- ❑ মাইক্রোসার্জারি আই ইউনিট — ১
- ❑ প্লাস্টিক সার্জারি সেন্টার — ১
- ❑ ই এস আই হাসপাতাল — ১
- ❑ পুলিশ জেল হাসপাতাল — ২
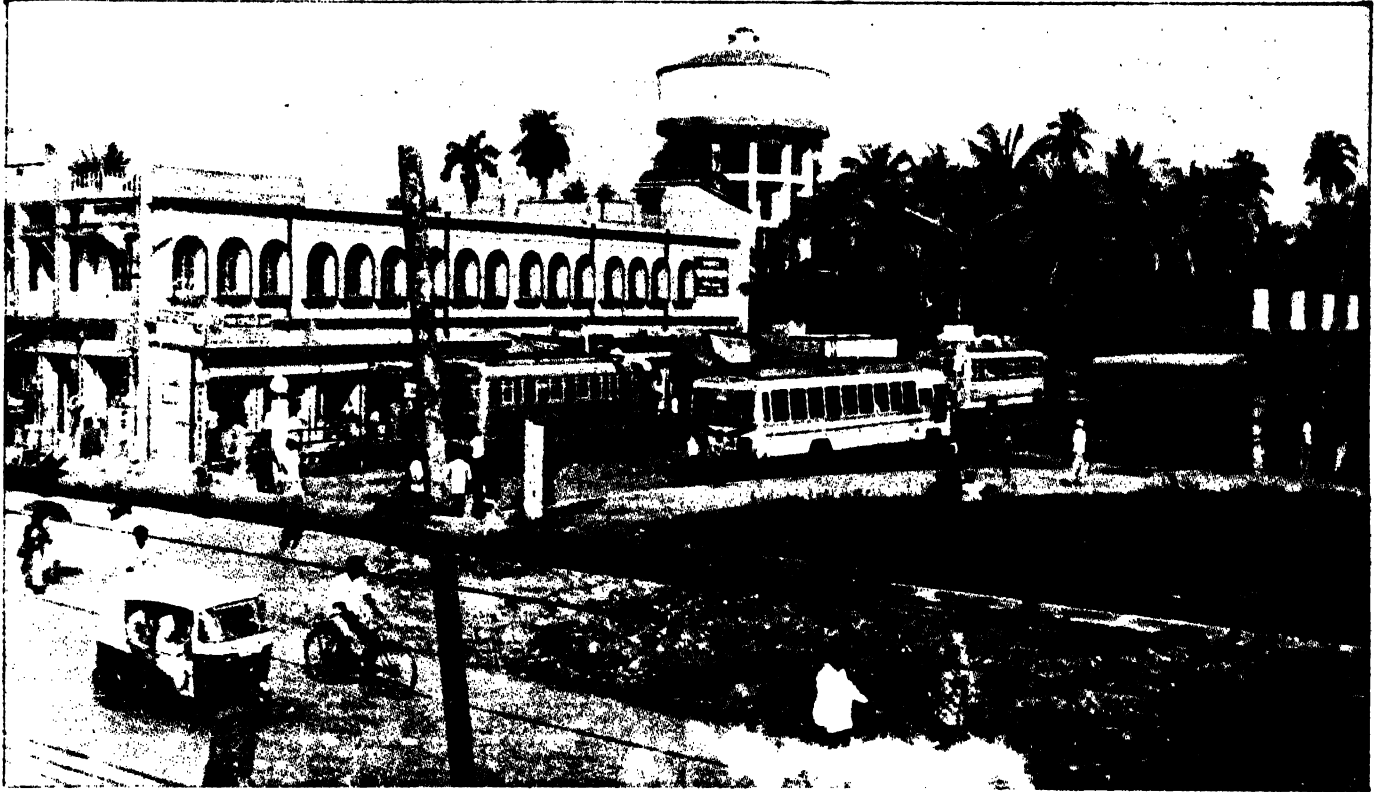
পৌরবাজার ॥ চাকদহ

ছবি : অপূর্ব সরকার

সড়কপথ পরিবহন ব্যবস্থা

- বাসরুট মোট — ১০৪
- বাসের সংখ্যা — ৪৯৩
- অটো রিকশা ও ট্রেকার — ৩০৬
- মালবাহী গাড়ি — ৩৫৮২
- ট্যাক্সি, অ্যাম্বাসেডর, জিপ, ভ্যান — ৪৮৪
- ট্রাক্টর, ট্রেকার — ১০২০
- টু-হুইলার — ১৩,৫৯৩

সড়ক পথ

১। জাতীয় সড়ক — ১১৭ কি.মি.
২। রাজ্য সড়ক — ১৫৯ ”
৩। জেলা সড়ক — ২৫১ ”
৪। গ্রামীণ সড়ক — ৪৯১ ”
৫। জেলা পরিষদের রাস্তা — ১১১১.৫৯ ”
৬। পৌরসভার রাস্তা — ৭১৭ ”
৭। নোটিফায়েড রাস্তা — ৩৭৬ ”

নদিয়া জেলায় রেলপথ

- কল্যাণী-মদনপুর — ৫ কি.মি.
- মদনপুর-শিমুরালী — ৫ ”
- শিমুরালী-পালপাড়া — ২ ”
- পালপাড়া-চাকদহ — ২ ”
- চাকদহ-পায়রাডাঙ্গা — ৬ কি.মি.
- পায়রাডাঙ্গা-রানাঘাট জংশন — ৬ ”
- রানাঘাট জংশন-আড়ংঘাটা — ৮ ”
- আড়ংঘাটা-বগুলা — ১১ ”
- বগুলা-তারকনগর হল্ট — ৭ ”
- তারকনগর হল্ট-মাজদিয়া — ৫ ”
- রানাঘাট জং-কালীনারায়ণপুর জং — ৪ ”
- কালীনারায়ণপুর জং-বীরনগর — ৪ ”
- বীরনগর-তাহেরপুর — ৩ ”
- তাহেরপুর-বাদকুল্লা — ৫ ”
- বাদকুল্লা-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন — ১০ ”
- কৃষ্ণনগর সিটি জং-বাহাদুরপুর — ৭ ”
- বাহাদুরপুর-ধুবুলিয়া — ৫ ”
- ধুবুলিয়া-মুড়াগাছা — ৬ ”
- মুড়াগাছা-বেথুয়াডহরী — ১০ ”
- বেথুয়াডহরী-সোমডাঙ্গা — ৪ ”
- সোমডাঙ্গা-দেবগ্রাম — ৮ ”
- দেবগ্রাম-পাগলাচণ্ডী — ৪ ”
- পাগলাচণ্ডী-পলাশী — ৬ ”
- কালীনারায়ণপুর জং-হবিবপুর — ৩ ”
- হবিবপুর-ফুলিয়া — ৫ ”
- ফুলিয়া-শান্তিপুর — ৬ ”
- শান্তিপুর-দিগনগর — ৭ ”

- দিগনগর-কৃষ্ণনগর সিটি জং. — ৩ কি.মি.
- কৃষ্ণনগর সিটি-কৃষ্ণনগর রোড — ১ "
- কৃষ্ণনগর রোড-আমঘাটা — ৫ "
- আমঘাটা-মহেশগঞ্জ — ২ "
- মহেশগঞ্জ-নবদ্বীপঘাট — ২ "
- গাংনাপুর-মাঝের গ্রাম — ৪ "
- পূর্বস্থলী (বর্ধমান জেলা)-নবদ্বীপ ধাম — ৮ "

নদিয়া জেলায় প্রধান কৃষি ফসল

১। ধান
২। গম
৩। পাট
৪। আখ
৫। আলু
৬। ডাল (মসুর, ছোলা, মুগ, কলাই, অড়হর)
৭। তৈলবীজ (সরিষা, তিসি, তিল, বাদাম)
৮। মশলা (গোলমরিচ, হলুদ, আদা, লঙ্কা, ধনিয়া, মেথি, কালোজিরে, দারুচিনি।)
৯। উদ্যান ফসল (আম, লিচু পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, বাতাবি, নারিকেল।)

ক্ষুদ্র সেচ

১। গভীর নলকূপ — ৭১২
২। নদী সেচ প্রকল্প — ৩২৩
৩। অগভীর নলকূপ — ২৯৪
৪। মাঝারি নলকূপ — ৩৩
৫। সরকারি গুচ্ছ স্যালো — ১২২৪
৬। ব্যক্তিগত স্যালো — ৮০,০০০
মোট চাষযোগ্য জমি — ২,৭২,১৩৫ হেক্টর
মোট সেচ এলাকাভুক্ত জমি — ২,০৮,৪৪০ হেক্টর
শতকরা প্রায় সত্তর শতাংশ জমি সেচ এলাকাভুক্ত।

নদিয়া জেলার নদ-নদী

নদী ৬টি, মোট দৈর্ঘ ৫৬৫ কি.মি।

(১) ভাগীরথী
রামনগর — কল্যাণী — ১৮৭ কিমি
(২) জলঙ্গী
স্বরূপগঞ্জ — গোপালপুর — ২০৬ কিমি
(৩) ভৈরব
যামসেরপুর — ভেটিয়া — ৩২ কিমি
(৪) চূর্ণী
মাজদিয়া — পায়রাডাঙ্গা — ৫৩ কিমি

সুরভি নিবাস ॥ হরিণঘাটা

(৫) মাথাভাঙ্গা

গোবিন্দপুর — মাজদিয়া — ১৯ কিমি

(৬) ইছামতি

কারমবেড়িয়া — পূর্বনগর — ৬৮ কিমি

নদিয়া জেলায় ইট ভাটার সংখ্যা

	মোট	২৭৪
(ক)	কৃষ্ণনগর সদর ও তেহট্ট মহকুমা	১৪৯
(খ)	রানাঘাট মহকুমা	৫৯
(গ)	কল্যাণী মহকুমা	৬৬
		২৭৪

সিনেমা হল ও ভিডিও হলের সংখ্যা

	স্থায়ী হল	অস্থায়ী	ভিডিও
১. সদর মহকুমা	১১	৩	২৪
২. তেহট্ট "	২	৩	৪
৩. রানাঘাট "	৮	৫	৫৭
৪. কল্যাণী "	৪	৩	২৬
	২৫	১৪	১১৫

নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা

- সাপ্তাহিক ১০টি
- পাক্ষিক ৩৩টি
- মাসিক ৫টি
- ত্রৈমাসিক ২টি

পোস্ট অফিসের সংখ্যা — ৪৪৯

ক্যাটাগরি	কৃষ্ণনগর	নবদ্বীপ	রানাঘাট	মোট
হেড পোস্ট অফিস	১	১	১	৩
এল এস জি সাব অফিস	৩	৩	৫	১১
টি এস সাব অফিস	২৩	২৫	৫২	১০০
এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল সাব অফিস	১৩	৬	১৭	৩৬
এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল ব্রাঞ্চ অফিস	৮৫	৯২	১২২	২৯৯
মোট	১২৫	১২৭	১৯৭	৪৪৯

নদিয়া জেলার সাংসদ ও বিধায়কগণ

সাংসদ

(১) অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
(২) অসীম বালা

বিধায়ক

(১) চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস
(২) কমলেন্দু সান্যাল
(৩) আব্দুস সালাম মুন্সী
(৪) খবিরুদ্দিন আহ্‌মদ
(৫) সুনীল ঘোষ
(৬) মীরকাশেম মণ্ডল
(৭) সুনীল বিশ্বাস
(৮) শশাঙ্ক বিশ্বাস

(৯) বিশ্বনাথ মিত্র
(১০) অজয় দে
(১১) শিবদাস মুখার্জী
(১২) বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস
(১৩) শংকর সিং
(১৪) সত্যসাধন চক্রবর্তী
(১৫) মিলি হীরা

জেলার মন্ত্রীদ্বয়

(১)	সত্যসাধন চক্রবর্তী	উচ্চশিক্ষা	পূর্ণমন্ত্রী
(২)	কমলেন্দু সান্যাল	ভূমি ও ভূমিরাজস্ব	রাষ্ট্রমন্ত্রী

বিভিন্ন সমবায়ের মোট সংখ্যা — ১৭৯৪

১।	সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	—	১
২।	এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক	—	১
৩।	ফিসারমেন্স ফেডারেশন	—	১
৪।	কিষান কোঃ-অঃ মিল্ক প্রডিউসার কোঃ অঃ লিঃ	—	১
৫।	ডিস্ট্রিক্ট কোঃ-অঃ ইউনিয়ন	—	১
৬।	আরবান কোঃ-অঃ ব্যাঙ্ক	—	৪
৭।	হোলসেল কোঃ-অঃ ক্রেডিট সোসাইটি	—	২
৮।	এমপ্লয়মেন্ট কোঃ-অঃ ক্রেডিট সোসাইটি	—	১৭৪
৯।	ফারমিং কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৯
১০।	মালটিপারপাস কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১২
১১।	কনজিউমার্স কোঃ-অঃ স্টোরস	—	১১৫
১২।	হাউসিং কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১১৪
১৩।	ফিসারমেন্স কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৭৮
১৪।	পাওয়ারলুম কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৯
১৫।	উইভার্স কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৪২৯
১৬।	ট্রান্সপোর্ট কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	২০
১৭।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৮৩
১৮।	ইঞ্জিনিয়ারস কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৮৯
১৯।	প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি	—	৩৬৪
২০।	হকার্স কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৪
২১।	লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	৬৪
২২।	মিল্ক কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১৩৯
২৩।	পোলট্রি কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	২২
২৪।	গ্রেইন ব্যাঙ্ক কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১৩
২৫।	মার্কেটিং কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১৫
২৬।	কোল্ড স্টোরেজ কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	২
২৭।	ইরিগেশন কোঃ-অঃ সোসাইটি	—	১১
২৮।	অন্যান্য	—	১৭

নদিয়া জেলা পরিষদের পরিচালকমণ্ডলী

১। হরিপ্রসাদ তালুকদার—সভাধিপতি ও কর্মাধ্যক্ষ অর্থ-সংস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি
২। রাধানাথ বিশ্বাস—সহকারী সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি
৩। বিমল চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ, বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি
৪। অশোক ব্যানার্জি, কর্মাধ্যক্ষ, কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি
৫। শান্তিরঞ্জন দাস, কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি
৬। চিন্তাহরণ বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ, খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি
৭। শিবচন্দ্র বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ স্থায়ী সমিতি
৮। গোপালচন্দ্র বিশ্বাস। কর্মাধ্যক্ষ, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি
৯। যমুনা ব্রহ্মচারী, কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি
১০। ভারতী বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ, ক্ষুদ্রশিল্প ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি

নদিয়া জেলা পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য—৩৪
তার মধ্যে মহিলা সদস্য—১২

নদিয়া জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিবৃন্দ

১।	অখিল মণ্ডল	সভাপতি	করিমপুর-১
২।	দেবাশিস চৌধুরি	”	করিমপুর-২
৩।	সতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	”	তেহট্ট-১
৪।	নিমাই বিশ্বাস	”	তেহট্ট-২
৫।	ভবেশ মিত্র	”	কালিগঞ্জ
৬।	নুরুলহুদা মল্লিক	”	নাকাশীপাড়া
৭।	কিরণপ্রকাশ বিশ্বাস	”	চাপড়া
৮।	দীপ্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরি	”	কৃষ্ণগঞ্জ
৯।	পরেশচন্দ্র পাল	”	কৃষ্ণনগর-১
১০।	শিশির কুমার	”	কৃষ্ণনগর-২
১১।	মেঘলাল সেখ	”	নবদ্বীপ
১২।	নিমাই বিশ্বাস	”	শান্তিপুর
১৩।	যোগেশচন্দ্র সরকার	”	রানাঘাট-১
১৪।	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	”	রানাঘাট-২
১৫।	শংকরনারায়ণ চক্রবর্তী	”	হাঁসখালি
১৬।	শচীন বিশ্বাস	”	চাকদহ
১৭।	সনৎকুমার সিংহ	”	হরিণঘাটা

প্রশাসনিক ভবন

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা শাসক	৫২২৯৪	৫২৩৮১
ভবন কার্যালয়		৫৩০৭০
		৫২৫৫৭
		৫২৩০২
অতিরিক্ত জেলাশাসক	৫২২৫৯	৫২২৯৩
(সাধারণ)	৫২৪৮৪	
অতিরিক্ত জেলাশাসক	৫২৩০৯	৫২৪২১
(ভূমি ও রাজস্ব)		৫২০৬০
অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন)	৫২৭৭০	৫২২৯৫
অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ)	৫৩০৬৮	৫২২৩৩
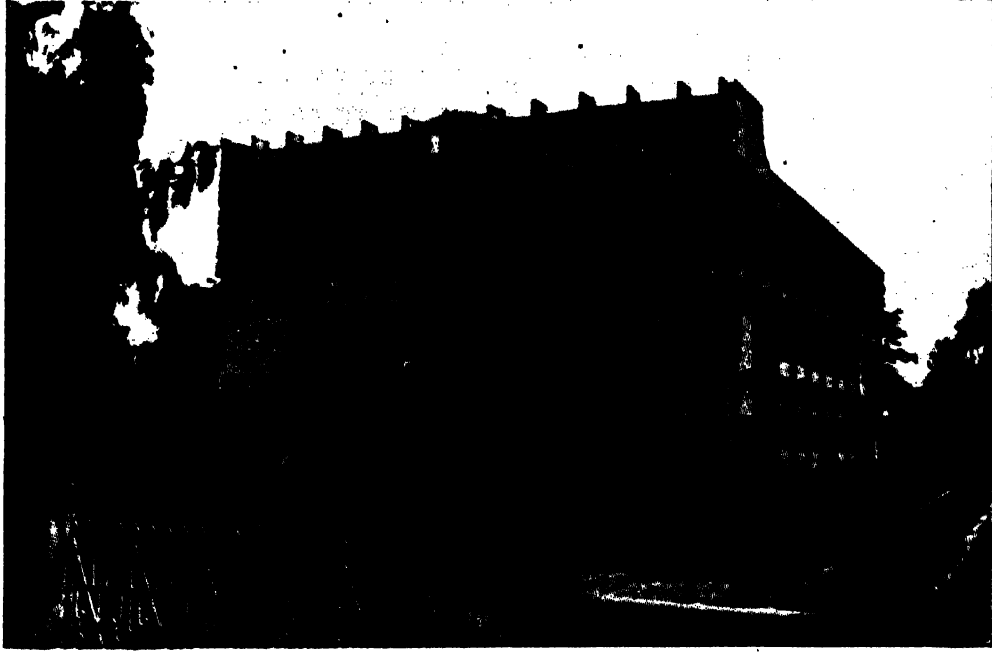
ঋত্বিক সদন ॥ কল্যাণী

ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

	বাড়ি	কার্যালয়
উপ-সমাহর্তা (উচ্চ)		৫২৯৫৬
কার্যালয় তত্ত্বাবধায়ক (সমাহর্তা)		৫২৮৫২
জেলা সমাহর্তা/নাজির	৫২৮৯৩	৫২৯৬৬
জেলা নির্বাচন		৫২৮১১
জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক		৫২৮৪২
আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক	৫২০১৪	৫২৮৫৩
জেলা উন্নয়ন আধিকারিক	৫৪১৮০	৫২৮৯১
কোষাধ্যক্ষ আধিকারিক-১		৫৪৪৭৬
কোষাধ্যক্ষ আধিকারিক-২		৫২৯০৫
জেলা ত্রাণ আধিকারিক		৫২৩৭৬
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (খাদ্য ও ত্রাণ)		৫২১০৬
বিশেষ ভূমি রাজস্ব আধিকারিক		৫২৯৬৯
জনকল্যাণ আধিকারিক		৫২৫৩১
অন্তঃশুল্ক তত্ত্বাবধায়ক		৫২৪৭৫
অসামরিক প্রতিরোধ		৫২৮৮৯
ভারপ্রাপ্ত নগর উন্নয়ন		৫২৩১১
জেলা যুব আধিকারিক		৫২৫৬৫
সচিব, আইন সাহায্য		৫২০০৯
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (পুল)	৫২০১৪	৫২৮৭১
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (বায়স্কোপ) (চলচ্চিত্র)		৫২৩১১
বেষ্টিত বাড়ি		৫২৯০১
উপ-জেলা ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব আধিকারিক	৫২১০৫	৫২০৬০

মহকুমা বিভাগ

	বাড়ি	কার্যালয়
মহকুমা আধিকারিক (কৃষ্ণনগর)	৫২৬২৬	৫৩০৮০
মহকুমা আধিকারিক (তেহট্ট)	এস টি ডি ০৩৪৭৪	৫০২৯২
মহকুমা আধিকারিক (রানাঘাট)	০৩৪৭৩	৫৫০৯৫ ৫৫০২০
মহকুমা আধিকারিক (কল্যাণী)	০৩৩	৪২৪২০৩ ৪২৪৫২৩

আয়কর

	বাড়ি	কার্যালয়
আয়কর আধিকারিক 'এ'		৫২৪৯০
আয়কর আধিকারিক 'বি'		৫২৮২৫
আয়কর আধিকারিক 'সি'		৫২৫৮৫

খাদ্য দপ্তর

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)		৫২২৯৯
মহকুমা নিয়ামক (কৃষ্ণনগর)		৫২৩৩৪
মহকুমা নিয়ামক (রানাঘাট)		
মহকুমা নিয়ামক (কল্যাণী)		
জেলাশাসক	৫২৩০০	৫২২১৭
ভারতীয় খাদ্য নিগম		

শিক্ষা/প্রতিষ্ঠান

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চতর)		৫২২৯৮
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)		৫২১৪১
সম্পাদক, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ		৫২৭৬৪
জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ (প্রাথমিক)		৫২৯৩৭
জেলা বিদ্যালয় (শরীর, শিক্ষা ও যুব কল্যাণ)		৫২২৪৬
কৃষ্ণনগর উইমেন মহাবিদ্যালয়		৫২৩৫৫
জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক		৫২৮৩২
অধ্যক্ষ সরকারি মহাবিদ্যালয়	৫২৮১০	৫২৮৬৩
বিপ্রদাস পাল চৌধুরি প্রতিষ্ঠান		৫২৫৮৮
অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাবিদ্যালয়	৫২৩৬৭	৫২২৪০
অধ্যক্ষ, নিম্ন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান		৫২৭৬১
কবি বিজয়লাল মহাবিদ্যালয়		৫২৭২৯
মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		৫২৪৯১
বি পি সি শিল্প কারিগরি বিদ্যালয়	৫২৪১৩	৫২৪১৩
জেলা বিদ্যালয়		৫২২০৪
সরকারি বালিকা বিদ্যালয়		৫২৩৭৯
অ্যাংলো ভাণ্ডারখোলা বিদ্যালয়		৫২২০৩
অন্ধ বিদ্যালয় (হেলেন কেলার)		৫২৬৭২
সি এস এস বিদ্যালয়		৫২২০৫
দেবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়		৫২২১৮
ডন বস্কো প্রাথমিক বিদ্যালয়		৫২৫৮১
ডন বস্কো কারিগরি বিদ্যালয়		৫২৭৫০
ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয়		৫২৪৬৫
হোলি ফ্যামেলি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৫২৫২৮
হোলি ফ্যামেলি উচ্চ বিদ্যালয়		৫২৫২৭
লেডি কারমাইকেল বালিকা বিদ্যালয়		৫২৭৬০
ঘূর্ণি উচ্চ বিদ্যালয়		৫২৮০৬

আরক্ষা দপ্তর

	বাড়ি	কার্যালয়
তত্ত্বাবধায়ক, নদিয়া	৫২৩০৩ ৫২৮৯৯	৫২২২৯
অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক, নদিয়া	৫২৩৬১	৫২২৩০
আরক্ষা রেখা		৫২২৩২
উপ তত্ত্বাবধায়ক (বড়বাড়ি) (ডি অ্যান্ড টি)	৫২৮৮৩	৫২৮৮৭
উপ-তত্ত্বাবধায়ক (ডি অ্যান্ড টি)	৫২৮৭৪	৫২৮৮৭
উপ-তত্ত্বাবধায়ক (ডি আই বি)	৫২২৮০	৫২৯৬০
উপ-তত্ত্বাবধায়ক (ডি ই বি)	৫২৮৮২	৫২৪৮৮
ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক (কোতয়ালী)		৫২৯১৪
কোতয়ালী (বি এস)		৫২৮৩৫
আর টি নিয়ন্ত্রণ ঘর		৫২৮৭৮
আর আই আরক্ষা রেখা	৫২৮০৫ (এস টি ডি)	৫২৮৪৫
নবদ্বীপ পি এস	৪০১৫৯	৪০১৫৯
চাপড়া পি এস		৪০৪০৪
চাপড়া পি এস	চাপড়া	২২৩
কৃষ্ণগঞ্জ পি এস	০৩৪৭৩	৭৬২১৭
নাকাশীপাড়া পি এস	বেথুয়া	৫৫৩৫১
তেহট্ট পি এস	তেহট্ট	৫২২২১
করিমপুর পি এস	০৩৪৭১	৫৫১৩৭ ৫৫১৩৬
রানাঘাট পি এস	০৩৪৭৩	৫৫০২২ ৫৫০০৫
চাকদহ পি এস	০৩৪৭৩	৪৪০২২
শান্তিপুর পি এস		৭৭০৬২ ৭৭০৩০
ধুবুলিয়া পি এস	ধুবুলিয়া	২১১
হাঁসখালি পি এস	০৩৪৭৩	৭৬০১২
কালিগঞ্জ পি এস	০৩৪৭৪	৫৫২৩৮
হরিণঘাটা পি এস	০৩৪৭৩	৩৩৩৩১
কল্যাণী পি এস	০৩৩	৪২৪১০০
ধানতলা পি এস		

সীমা সুরক্ষা ফৌজ

	বাড়ি	কার্যালয়
ডি আই জি সীমা সুরক্ষা		৫২৯৩৬
সহকারী পরিচালক		৫২০৯৯
সহকারী সেনানায়ক	৫২০৬৭	৫২০১০
সেনানায়ক ৯ নং	৫২৪৯৪	৫২৫৭৯
ডি আই জি		৫২০৮৫
এন সি সি কার্যালয়		৫২৪৭৮
এন সি সি মহিলা		৫২২৬৯

ন্যায়পরতা

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা বিচারপতি, নদিয়া	৫২৪৭৩	৫২৩৩৬ ৫২১০১
মুখ্য বিচারিক শাসক		৫২৭০৭
মহকুমা বিচারিক শাসক		৫২৫৮৬
জেলা নিবন্ধক, নদিয়া		৫২৫৮৯

ডাকহরকরা বিভাগ

	বাড়ি	কার্যালয়
তত্ত্বাবধায়ক ডাকঘর	[illegible]	৫২৮৪৯
সহকারী তত্ত্বাবধায়ক	[illegible]	৫২৮২৭
ডাক কর্তা, মুখ্য ডাকঘর	[illegible]	৫২৮১২
হিসাব রক্ষক		৫২৯৩৫

বিদ্যুৎ পর্ষদ

	বাড়ি	কার্যালয়
আঞ্চলিক পরিচালক		৫২৭৩৩
(রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ)		
বিভাগীয় বাস্তুকার		৫২৮৮১
(শহর সরবরাহ) বেহিখালী		৫২৫৬০
সহকারী বাস্তুকার		৫২৯৩০

বীমা

	বাড়ি	কার্যালয়
শাখা পরিচালক (এল আই সি)	৫২৮৩৮	৫২৮৯৬
এল আই সি কার্যালয়		৫২৯৬১
জাতীয় বীমা	৫২৪০৪	৫২৩৮৮

	বাড়ি	কার্যালয়
যৌথ বীমা সংস্থা	৫২৭০২	৫২০৭৬
(আগুন ও সাধারণ)		
ভারতীয় জীবন বীমা		৫৩০৩৭
পিয়ারলেস বীমা	৫৩০৯৫	৫২৫৭৮

মৎস্য

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা মৎস্য আধিকারিক		৫২৪৪০
এফ এফ ডি এ		৫২২১২
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক		৫২০৪৯
(এফ এফ ডি এ)		
নদিয়া জেলা মৎস্য নিগম		৫২৬০৯

কৃষি এবং কারিগরি

	বাড়ি	কার্যালয়
অধ্যক্ষ কৃষি আধিকারিক	৫২২৬০	৫২২৬০
তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যক্ষ কৃষি আধিকারিক	৫২৪২৯	৫২৪২৯
যৌথ পরিচালক, কৃষি		৫২৪১২

	বাড়ি	কার্যালয়
আঞ্চলিক বিভাগ		৫২৭১২
(কৃষি জলসেচ) আধিকারিক		
নির্বাহী বাস্তুকার		৫২৩৩৫
(কৃষি জলসেচ)		
কৃষি আয়কর শুল্ক আধিকারিক		৫২৭২৪
উদ্যান পালন বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি		৫২৪৪২
নির্বাহী বাস্তুকার (সেচ বিভাগ)		৫৩০৮১

শিল্প

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা শিল্প আধিকারিক		৫২৪৯৬
সাধারণ পরিচালক		৫২৯৪৩
(জেলা শিল্প বিনিয়োগ কেন্দ্র)		
জেলা আধিকারিক		৫২০৫১
(খাদি গ্রামোন্নয়ন শিল্প)		

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক

	বাড়ি এস টি ডি	কার্যালয়
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কৃষ্ণনগর-১		৫২৪৫০
		৫২৮০৩
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কৃষ্ণনগর-২	ধুবুলিয়া	২১৬
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নাকাশীপাড়া	বেথুয়া	৫৫২৫২
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক চাপড়া	চাপড়া	২২১
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কৃষ্ণগঞ্জ	০৩৪৭৩	৭৬২১৪
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কালিগঞ্জ	০৩৪৭৪	৬৬২১৪
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক করিমপুর-১	০৩৪৭১	৫৫০২১
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক করিমপুর-২	০৩৪৭১	৫৫১৩৫
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তেহট্ট-১	তেহট্ট	৫০২২৪
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তেহট্ট-২	০৩৪৭৪	৫২২২২
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হাঁসখালি	০৩৪৭৩	৭২২১১
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শান্তিপুর		৭৭০২৭
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রানাঘাট-১	০৩৪৭৩	৫৫১৬১
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রানাঘাট-২	০৩৪৭৩	৫৫০৯৮
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক চাকদহ	০৩৪৭৩	৪৪৬৫৫
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হরিণঘাটা	০৩৪৭৩	৩৩৩১৩

নিজস্ব স্বশাসিত সরকার

	বাড়ি	কার্যালয়
সচিব, নদিয়া জেলা পরিষদ	৫২৫৯৩	৫২৩৪২
অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক	৫৩০৬৮	৫২২৩৩
সভাধিপতি, নদিয়া জেলা পরিষদ	৪৮২১৭	৫২৪৯৯
সহকারী সভাধিপতি নদিয়া	৭৪	৫২৮০৪

	বাড়ি	কার্যালয়
জেলা পরিষদ		
পৌরপিতা, কৃষ্ণনগর পৌরসভা	৫২৪৫৫	৫২৯২৬
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, কৃষ্ণনগর		৫২২৬১
সমস্ত বিষয় খরিদ্দার সমিতি		
বাস মালিক সমিতি		৫২৯৫৫

স্বাস্থ্য

	বাড়ি	কার্যালয়
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক	৫২৩৪৬	৫২৩০৬
সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২	৫২৭১০	৫২৭১১
জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক		৫২৮৫০
জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শক্তিনগর		৫২৮৭৩
সদর স্বাস্থ্য কেন্দ্র		৫২৮৫০
মাতৃসদন		৫২৮৪৬
ম্যারি ইমাকুলেট স্বাস্থ্যকেন্দ্র		৫২২৮২
ঔষধ নিয়ামক পর্ষদ		৫২১৯৪
তত্ত্বাবধায়ক, পশুপালন		৫২৩৭৪
তত্ত্বাবধায়ক, পশুপালন স্বাস্থ্যকেন্দ্র		৫২২৭৮
তত্ত্বাবধায়ক ধুবুলিয়া টি বি স্বাস্থ্য কেন্দ্র		২২৪
সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-৩		

সাংবাদিক

	বাড়ি	কার্যালয়
সন্তোষ বিশ্বাস (স্টেটসম্যান)		৫২৬০৩
কালি বোস (পি টি আই)		৫২২৮১
এস এন সিংহরায়		৫২৪০৩
বর্তমান		৫২৯২৪

জেলা পর্যায় আধিকারিক

	বাড়ি	কার্যালয়
বিভাগীয় বনাধিকারিক ন-মু		৫২৩৬২
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো আধিকারিক		৫২৫৬৮
নেহেরু যুব কেন্দ্র		৫২৯৬৫
উপ-কীটপোষ অধিকর্তা		৫২৭০৯
উপ-অধিকর্তা কেন্দ্রীভূত		৫২৯৬৭
কীটপোষ উন্নয়ন প্রকল্প		৫২১২৪
দুগ্ধ মহাধ্যক্ষ		
দোহশালা দোহশালা উন্নয়ন প্রকল্প		৫২৪১৫
সহকারী পাট উন্নয়ন আধিকারিক		৫২৬২০
পরিচালক, তফসিলি জাতি/উপজাতি		৫২৫৬৭
পৌরনিগম		
প্রকল্প আধিকারিক, জেলা	৫২৭৮৬	৫২৪৬২
গ্রামোন্নয়ন সংস্থা		

নদিয়া জেলা পরিষদ ।। কৃষ্ণনগর

ছবি : সত্যেন মণ্ডল

	বাড়ি	কার্যালয়
প্রকল্প আধিকারিক, কেন্দ্রীভূত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প	৫২৯৮৪	৫৩০৭৯
উপ-পশু কৃষি অধিকর্তা		৫২৭২৫
রাজ্য কুক্কুটাদি পালন প্রতিষ্ঠান		৫২৫৮২
অধিকর্তা, রাজ্য বীজ নিগম	৫২১১৫	৫২২৫৪
প্রতিষ্ঠান অধিকর্তা,পাট এবং বীজ		৫২৫১৫
সহকারী শ্রম মহাধ্যক্ষ		৫২৪৬৬
উপ-শ্রম অধিকর্তা		৫২১৪৪
জেলা শ্রম আধিকারিক		৫২৫৫১
শখের পর্যটক কুটীর, কৃষ্ণনগর		৫২০৮০
জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক		৫২৪৬০
উপ-অধিকর্তা, তন্তুবায়		৫২২৭৬
এ আর সি এস		৫২৩৮৩
জেলা পরিসংখ্যান আধিকারিক		৫২৫৪৭
পরিচালক, ক্ষুদ্র সঞ্চয়		৫২৪৮০
সমাজ কল্যাণ আধিকারিক		৫২৫৮৭
বাণিজ্যিক শুল্ক আধিকারিক		৫২৮৬৮
স্টেশন কর্তা, কৃষ্ণনগর রেল		৫২৮৭২
জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক		৫২৯১৯
ইসকন, মায়াপুর		৪৫২৫০
সম্পাদক, সারা বাংলা শিক্ষক সমিতি		৫৩১৮৪
সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি		৫৩১০৫
সহকারী সংগ্রহীতা, বহিশুল্ক		৫২৪২০
বিদ্যুৎ সরবরাহ, বেহিখালী		৫২৮০৭

	বাড়ি	কার্যালয়
সম্পাদক, জেলা বণিক সভা		৫২২২৬
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ		৫২৪৭২
শাখা পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ সংস্থা		৫২৪৬৮
জেলা সৈনিক পর্ষদ		৫২২৮৭
স্থাপন অভিযোগ আধিকারিক		৫২৪৫৩
শিল্প উন্নয়ন সংস্থা		৫২৬৯৪

পূর্ত দপ্তর

	বাড়ি	কার্যালয়
নির্বাহী বাস্তুকার পূর্তকার্য ও বাড়ি		৫২৪৫৬
নির্বাহী বাস্তুকার-৬		৫২৬৮২
নির্বাহী বাস্তুকার-পর্ষদ কোর্ট রাস্তা		৫২৩৬৯
নির্বাহী বাস্তুকার, জাতীয় সড়ক বিভাগ-৬	৫২৩৮৪	৫২৬০৮
নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্তকার্য নদিয়া মুর্শিদাবাদ		৫২৩৯৯
মহকুমা নিয়ামক পূর্তকার্য		৫২৪৯৮
সহকারী বাস্তুকার পূর্তকার্য (বিদ্যুৎ)		৫৩০৪৪
সহকারী বাস্তুকার, পূর্তকার্য কারিগরী দপ্তর		৫৩০৪০
নির্বাহী বাস্তুকার সড়ক	৫২৩৬৯	৫২৪৭৭

নদিয়া জেলায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প

ক্রমিক নং	শিল্প সংস্থার নাম	উৎপাদিত দ্রব্য
১.	মেসার্স রেমন্ড পেপার মিল রানাঘাট :	পেপার বোর্ড ও স্ট্ বোর্ড
২.	সুপ্রিম পেপার মিল চাকদহ :	পেপার
৩.	বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিল লিঃ কাটাগঞ্জ :	স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং
৪.	জয়লক্ষ্মী টেক্সটাইল মিল রানাঘাট :	স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং
৫.	দি কল্যাণী স্পিনিং মিল লিঃ কল্যাণী :	স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং
৬.	দি রিহ্যাবিলিটেশন্ ইন্ডাস্ট্রিস করপোরেশন লিঃ কল্যাণী :	হ্যান্ডলুম আইটেম
৭.	কল্যাণী ব্রুয়ারীজ লিঃ কল্যাণী :	বিয়ার
৮.	ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারি অ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপ্মেন্ট করপোরেশন লিঃ কল্যাণী :	ডেয়ারি প্রোডাক্টস্
৯.	গ্নেরিয়া কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস্ লিঃ গয়েশপুর :	কেমিক্যাল্স আইটেম
১০.	খৈতান এগ্রো-কমপ্লেক্স্ লিঃ পলাশী :	সুগার
১১.	ফর্মেনটেশন ইন্ডাস্ট্রিস্ প্রাঃ লিঃ গয়েশপুর :	কেমিক্যালস্
১২.	হরিণঘাটা গভর্নমেন্ট ডেয়ারি ফ্যাক্টরি হরিণঘাটা :	মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রডাক্টস
১৩.	এল পি জি বটলিং প্ল্যান্ট ইন্ডিয়া অয়েল করপোরেশন লিঃ কল্যাণী :	বটলিং অব্ এল পি জি
১৪.	অ্যান্ডরুল অ্যান্ড কোঃ লিঃ (বটলিং ডিভিশন) গয়েশপুর	মেড্সিন্
১৫.	ওয়েস্ট বেঙ্গল ফারমাসিউটিক্যাল অ্যান্ড পিটো কেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিঃ কল্যাণী :	মেড্সিন
১৬.	ফাইসার লিঃ, কল্যাণী	কেমিক্যাল ফব্ ফারমা-সিউটিক্যাল অ্যান্ড বাল্ক ড্রাগস্
১৭.	ড্রাইটন ইন্ডিয়া লিঃ কল্যাণী :	অ্যামিন-রিসন, ফিনিলিক রিসন অ্যান্ড পলিথিনস্
১৮.	অ্যালায়েড অ্যারোমেটিক লিঃ কল্যাণী :	রাশিও অরগ্যানিক কেমিক্যালস্
১৯.	মেসার্স অ্যালেনবুরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস্ লিঃ কল্যাণী :	ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস
২০.	সেন পণ্ডিত (প্রাঃ) লিঃ কল্যাণী :	বাই সাইকেল অ্যান্ড রিক্স পার্টস্
২১.	সাইকেল করপোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া (প্রাঃ) লিঃ কল্যাণী :	বাই-সাইকেল অ্যান্ড রিক্স পার্টস্
২২.	নীলাচল অর্গানাইজেশন (প্রাঃ) লিঃ কল্যাণী :	ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট
২৩.	ওয়েবল ইলেকট্রো-কেমিক্যাল লিঃ কল্যাণী :	সফ্ট ফেরিটেস্
২৪.	ডব্লু বি ফিলামেন্ট অ্যান্ড ল্যাম্প লিঃ কল্যাণী :	ইলেকট্রিক্যাল ল্যাম্প পার্টস্
২৫.	ফেলিলিক্স এক্সাইজ লিঃ কল্যাণী :	ইন্ডাসট্রিয়াল ওয়ার অ্যান্ড কেবিলস্
২৬.	দি স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোঃ অফ্ ইন্ডিয়া লিঃ কৃষ্ণনগর :	স্পেশাল পাম্প, ইলেকট্রিক্যাল এম/সি অ্যান্ড ইকুইবমেন্টস্
২৭.	অ্যান্ডরিউল কোঃ লিঃ কল্যাণী :	টি, কফি, টোবাকো মেসিন পার্টস্
২৮.	সিংহ অ্যালয় অ্যান্ড স্টিল লিঃ কল্যাণী :	এম এস বিলেটস্ অ্যালয় স্টিল কারবন, স্টিল, ই টি সি
২৯.	কানোরিয়া উইকনসিম সেন্ট্রিগুলা লিঃ গয়েশপুর :	অ্যালয় স্টিল কাস্টিং
৩০.	রাম স্বরূপ ইন্ডাস্ট্রিস্ করপোরেশন কল্যাণী :	জি আই ওয়ার, ই টি সি

নদিয়া জেলার সার্কিট হাউস সহ বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালিত ডাক বাংলো ও গেস্ট হাউসের তালিকা

নং	দপ্তরের নাম	আবাসনের নাম	অবস্থানের ঠিকানা	সংরক্ষণের ঠিকানা	মোট শয্যা	প্রতিদিনের ভাড়া	যাতায়াতের ব্যবস্থা	বুকিং ফোন নং
১.	জেলা শাসক, নদিয়া কৃষ্ণনগর, নদিয়া	১। সার্কিট হাউস	জেলাশাসক আবাসনের বিপরীতে, এবং এস পি অফিসের পার্শ্বে	কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট নেজারত বিভাগ নদিয়া	৭টি 2AC	D— S— AC—	কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাস অথবা রিক্‌শা	এস টি ডি ০৩৪৭২ ফোন : ৫২৯৬৬ ৫২৯০১
২.	নদিয়া জেলা পরিষদ কৃষ্ণনগর, নদিয়া	ডাক বাংলো ১। কৃষ্ণনগর ২। রানাঘাট ৩। করিমপুর	১। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনের সামনে, ২। রানাঘাট, মহকুমা শাসকের আবাসনের কাছে, ৩। করিমপুর-নাটনা	সচিব, নদিয়া জেলা পরিষদ, কৃষ্ণনগর, নদিয়া	১। ২২টি ২। ৪টি ৩। ৩টি	D—১০০/৬০ S—৬০/৪০ AC—৩০০.০০ ২০০.০০	কৃষ্ণনগরের ক্ষেত্রে ওই রানাঘাট এন এইচ থেকে রিক্‌শা করিমপুর বাসে নাটনা মোড়	এস টি ডি ০৩৪৭২ ফোন : ৫২৩৪২ ৫২৪১০ ৫৩০৮৫
৩.	বন বিভাগ নদিয়া মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনগর, নদিয়া	১। বেথুয়াডহরী বন বাংলো	বেথুয়াডহরী NH_{34} এর পার্শ্বে	বিভাগীয় বনাধিকারিক কৃষ্ণনগর, নদিয়া	৪টি	D—১২৫/-	রেলওয়ে স্টেশন থেকে ও বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্‌শা	এস টি ডি ০৩৪৭২ ফোন : ৫২৩৬২
৪.	সেচ ও জলপথ কৃষ্ণনগর, নদিয়া	পরিদর্শন বাংলো	স্বরূপগঞ্জ	নির্বাহী বাস্তুকার সেচ ও জলপথ	৪টি	D—৫০/-	স্বরূপগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্‌শা	০৩৪৭২ ফোন : ৫২৪৫১
৫.	সি ই ও এফ এফ ডি এ	রেস্ট হাউস	কৃষ্ণনগর, নদিয়া মীন ভবন	সি ই ও এফ এফ ডি এ	১। ৪টি	D—৪০/- A.C.—৬০/-	বাসস্ট্যান্ড ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে রিক্‌শা	০৩৪৭২ ফোন : ৫২২১২
৬.	পি ডব্লু ডি	রেস্ট হাউস ১। কৃষ্ণনগর ২। মীরা পলাশী	১। কৃষ্ণনগর পি ডব্লু ডি মোড় ২। পলাশী সুগার মিল	নির্বাহী বাস্তুকার পি ডব্লু ডি	১। ৪টি ২। ৪টি		পি ডব্লু ডি মোড় রিক্‌শা অথবা হাঁটাপথ	০৩৪৭২ ফোন : ৫২৪৫৬
৭.	কৃষ্ণনগর পৌরসভা	রেস্ট হাউস কৃষ্ণনগর, নদিয়া	কৃষ্ণনগর সঙ্গীতা সিনেমা হলের সামনে	পৌর পিতা কৃষ্ণনগর পৌরসভা	১৫টি	D—৬০/- S—৪০/- DOR—১২৫/- 5 bed	কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডের কাছে সঙ্গীতা সিনেমা হলের সামনে। রিক্‌শা অথবা হাঁটা	০৩৪৭২ ফোন : ৫২০৮০

নং	দপ্তরের নাম	আবাসনের নাম	অবস্থানের ঠিকানা	সংরক্ষণের ঠিকানা	মোট শয্যা	প্রতিদিনের ভাড়া	যাতায়াতের ব্যবস্থা	বুকিং ফোন নং
৮.	নবদ্বীপ পৌরসভা	নবদ্বীপ পৌর অতিথি নিবাস	নবদ্বীপ বাসস্ট্যান্ড	পৌর পিতা নবদ্বীপ পৌরসভা অথবা বাসস্ট্যান্ড অতিথি নিবাস	৩৪টি	D—৮০/- D—৫০/-	নবদ্বীপ ধাম স্টেশন থেকে রিক্‌শা অথবা বাসে নবদ্বীপ বাসস্ট্যান্ড	০৩৪৭২ ফোন : ৪০৪১৩
৯.	শান্তিপুর পৌর সভা	শান্তিপুর পৌরসভা অতিথি নিবাস	ডাঃ বি সি রায় রোড শান্তিপুর, নদিয়া	পৌর পিতা শান্তিপুর অথবা অতিথি নিবাস	১৩টি	D—৭৫/- S—৫০/- 3B—১০০/- DOR—২০/-	মতিগঞ্জ মোড় থেকে হাঁটা অথবা রিক্‌শা	০৩৪৭২ ফোন : ৭৮০১৮
১০.	রানাঘাট মহকুমা শাসক	রানাঘাট মহকুমা শাসক বাংলো	রানাঘাট মহকুমা শাসকের আবাসন	রানাঘাট মহকুমা শাসক	৪টি 2D 2AC	S—কেবলমাত্র সরকারি আধি-কারিকদের জন্য	জেলা পরিষদ বাংলো সংলগ্ন	০৩৪৭৩ ফোন : ৫৫০২০ ৫৫০৯৫
১১.	নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি	নীলচল লজ	হুলোর ঘাট মায়াপুর	সভাপতি নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি	১৪টি	D—৫০/- DS—২০/-	হুলোর ঘাট, মায়াপুর	০৩৪৭২ ৪৮২৭৬
১২.	কৃষ্ণনগর রেলওয়ে	রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম	কৃষ্ণনগর সিটি রেলওয়ে স্টেশন	অন ডিউটি টিকিট কালেক্টর	৫টি	DOR—১৬/-	রেলওয়ে স্টেশন	০৩৪৭২ ফোন : ৫২৮৭২
১৩.	কৃষি সেচ ডিভিশন—১	রেস্ট হাউস	পান্থতীর্থ জাতীয় সড়ক NH34	নির্বাহী বাস্তুকার কৃষিসেচ ডিভিশন—১	৬টি	D—২৪/-	পান্থতীর্থ কৃষ্ণনগর থেকে রিক্‌শা অথবা হাঁটাপথ	০৩৪৭২ ফোন : ৫২৩৩৫

ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি

মোহিত রায়
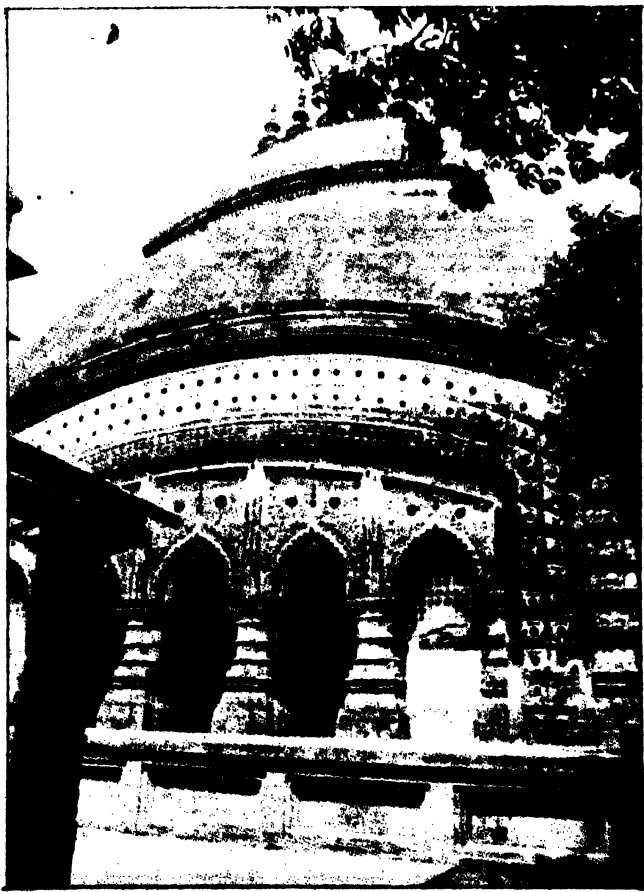
শ্যামচাঁদ মন্দির ।। শান্তিপুর *ছবি : কে সি কুণ্ডু*

নদিয়া গাঙ্গেয় সমতট। প্রাচীনকালের নদিয়ার অবস্থানগত অঞ্চলের ভৌগোলিক নাম ও চতুঃসীমা বর্তমানকালে এত দূর পরিবর্তন হয়েছে যে, বর্তমান নদিয়ার সঙ্গে পূর্বেকার ইতিহাসের নদিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কোনও সামঞ্জস্য নেই এবং সেই অবস্থান নিরূপণ করাও প্রায় দুঃসাধ্য। এ কথা সুবিদিত যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ধারা যে ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল—সেই অঞ্চলের আধুনিককালে নাম বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের মূল প্রবাহের সঙ্গে প্রাচীনকালের নদিয়ার সংযোগ অনির্ণেয়। প্রাচীনকালের লেখকরা এই অঞ্চলে গৌড় ও বঙ্গ নামে দু'টি রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বেকার পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নবদ্বীপ (নদিয়া জেলা), শান্তিপুর (নদিয়া জেলা), মৌলপত্তন (হুগলি জেলা) ও কণ্টকপত্তন (কাটোয়া-বর্ধমান জেলা) অঞ্চলবৃত্তে গৌড় রাজ্যে গঠিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা সহ নদিয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার অংশবিশেষ নিয়েই ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসৃত গৌড় রাজ্য। পরবর্তীকালের রচনায় বর্ণিত হয়েছে যে, গৌড় রাজ্যের অবস্থান ছিল বঙ্গ ও ভুবনেশ রাজ্যের মধ্যবর্তী। সেই রচনাতেই বঙ্গ রাজ্যকে সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাকবি কালিদাস বঙ্গকে গঙ্গার প্রবাহের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে তাঁর 'রঘুবংশ' কাব্যে বর্ণনা করেছেন। আবার, পাল-সেন আমলের নথি-লেখ-তথ্য অনুযায়ী বঙ্গকে 'রঘুবংশ'-এ বর্ণিত অঞ্চল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অঞ্চল বলে উল্লেখ আছে বলে মনে হয়। এমন কি যশোহর বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বদ্বীপের কিছু অংশও উপবঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বাংশই প্রকৃত বঙ্গ হিসাবে বর্তমানে চিহ্নিত। পরবর্তীকালে সেন আমলের লেখমালায় বঙ্গ বিক্রমপুরভাগ ও নাব্য নামে বিভক্ত ছিল। নদনদী ও খাড়িতে পরিপূর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ছিল নাব্য, যার অর্থ নৌকা-জাহাজাদি নৌযান চলাচলের উপযোগী। এখানে আর একটি উল্লেখ্য অভিমত ছিল যে, বঙ্গ কোন সময়েই নির্দিষ্ট ভূভাগ বলে প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত ছিল না। সম্পূর্ণ ত্রিকোণাকৃতি অংশ যা ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনার খাড়ি অঞ্চল নিশ্চিতভাবেই বঙ্গ নামে সমধিক পরিচিত। ষষ্ঠ শতকে রচিত 'বৃহৎ সংহিতা'র বর্ণনায় উপবঙ্গ নামে লিখিত অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপের কিছু কিছু অংশ বলে জানা যায়। এই আকরসূত্র অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বর্তমান নদিয়া অঞ্চল প্রাচীনকালে কিছু সময়ে বঙ্গ এবং গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই অঞ্চল সব সময়েই বঙ্গভুক্ত ছিল বা গৌড়ভুক্ত ছিল, এমন নয়। ১২০২-০৩ সালে (শকাব্দ ১১২৪, তারিখটি 'শেকসুভোদয়া' ও 'পগ্-সম্-জোন্ জঙ্গ' থেকে গৃহীত) ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খল্জীর নওদীয়া বা নোদীয়া (নবদ্বীপ) অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত এই অনির্দিষ্টতার অনুমান।

ঘটনা যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গাঙ্গেয় বদ্বীপে একটি রাজ্য ছিল এবং এই রাজ্য এত পরাক্রান্ত ছিল যে, গ্রিক সূত্রানুযায়ী মাসিডোনিয়ার বিজেতা বীর আলেকজান্ডারের অদম্য হৃদয়েও ভীতির সঞ্চার করেছিল। এই গঙ্গারিডি (গঙ্গাহৃদিই?) রাজ্য ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক ২০০ চতুরশ্ববাহিত যুদ্ধরথ ও ৩০০০ হস্তিবাহিনীর সেনাসমাবেশে সক্ষম ছিল। এই রাজ্যের অস্তিত্ব খ্রিস্টাব্দ এক শতক পর্যন্ত যে ছিল তার প্রমাণ 'Periplus of the Erythrean sea' ও Klandios Ptolemaios কৃত 'Geographika Indika' সূত্র। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পূর্বে পর্যন্ত বঙ্গ এই রাজ্যটির কোন ইতিহাস ভারতীয় সূত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু, গ্রিক ও রোমান সূত্রে খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত গঙ্গারিডিকে শক্তিশালী রাজ্য বলে বর্ণিত আছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়। এই সময়েই প্রথম বঙ্গ এই কথাটিই 'একাধিরাজ' উপাধিভূষিত রাজা চন্দ্রের মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপিতে উৎকীর্ণ আছে। রাজা চন্দ্র বঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সে সময় বঙ্গরাজ্যে তাঁর প্রতিপক্ষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। অভিলেখ সূত্রে (epigraphic records) এই প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় যে, বহিরাগতেরা বঙ্গবিজয় করেছিল। বঙ্গ রাজ্যে গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারিদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। বর্তমান নদিয়ার অদূরবর্তী বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত চারটি তাম্রশাসনে এবং আর একটি বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তিনজন স্বাধীন একচ্ছত্র অধীশ্বর গোপালচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের উল্লেখ আছে। সমাচারদেবের একটি সিলমোহর নালন্দায় পাওয়া গেছে। বৈশ্যগুপ্ত ও গোপালচন্দ্র প্রমুখ রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু, বেশ কিছু রাজকর্মচারীর নাম উভয়েরই সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে, এই গোষ্ঠী এই অঞ্চলে বৈশ্যগুপ্তের পরবর্তীকালের মনে হয়। খ্রিস্টাব্দ ৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর এই চারজনের রাজ্য শাসনকাল বলে মনে করা হয়। পালদের রাজ্য শাসনে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ১৫০ বছরের বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মগধের গুপ্তরাজদের অবসিতকালে শশাঙ্ক গৌড়ের পরাক্রান্ত শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। এই গৌড় ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের একটি অংশ এবং কখনও কখনও উত্তরবঙ্গেরও অংশ বলে পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রথমে মৌখরিদের এবং পরে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধরত হয়েছিলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিজেতা হলেন হর্ষবর্ধন। শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ রাঙামাটি বলে চিহ্নিত) কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের অধিকৃত হয়। কর্ণসুবর্ণ রাজ্য নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিছু কিছু অংশে গঠিত ছিল। বাক্‌পতিরাজ লিখিত প্রাকৃত 'কাব্য গৌড়বাহ' সূত্রে জানা যায় যে, কনৌজ-কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণ মগধের রাজাকে হত্যা করে বঙ্গ রাজ্যকে আক্রমণ করেছিলেন। বঙ্গের রাজা, যার নাম সঠিক নির্ণয় করা যায় না, তুমুল যুদ্ধের পর পরাজয় স্বীকার করেন। ৭৩৪–৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় এই ঘটনা ঘটেছিল।

সমাচারদেবের মৃত্যুর পরেই অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালরাজাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ ইতিহাসের অন্ধকার যুগের আবরণ উন্মোচিত হয়।

পালরাজা ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী ('Epigraphia Indica, Vol-IV, pp. 243–54) দেশের বিশিষ্টজনেরা দেশের অরাজকতা মাৎস্যন্যায় অবস্থার অবসানের জন্য গোপালকে রাজপদে আসীন করেন। গোপালের পিতা ছিলেন যুদ্ধব্যবসায়ী বপ্যট এবং পিতামহ সর্ববিদ্যাবিশারদ দয়িতবিষ্ণু। পালরাজেরা প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। পালরাজাদের বেশ কিছু সংখ্যক লেখমালা আবিষ্কারের পরও তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কারণ, এইসব লেখমালায় কোনও পরিষ্কার উল্লেখ নেই। তদুপরি, কোন্ স্থানে গোপাল (প্রথম) রাজপদে আসীন হন, তাও জানা যায় না। নদিয়ার পালরাজাদের কোন লেখমালাও আবিষ্কৃত হয়নি। ইতিহাসের আকর উপাদান লেখমালা ও সাহিত্যের কুয়াশাচ্ছন্ন তথ্যে অনুমতি হয় যে, গোপাল (প্রথম) ও ধর্মপালের শাসনাধিকারে নদিয়া ছিল বা নদিয়ায় তাঁদের আধিপত্য ছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল (প্রথম) রাজা নির্বাচিত হন, তাঁর রাজত্বকাল ৭৫০–৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ধর্মপাল (রাজত্বকাল ৭৭৫–৮১০ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসন লাভ করেন।

ধর্মপাল বত্রিশাধিক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষার্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল। ধর্মপাল নানা ধর্মবিশ্বাসের

রোমান ক্যাথলিক গির্জা ॥ কৃষ্ণনগর   *ছবি : দিলীপকুমার পাল*

প্রতি সহনশীল ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মহান পৃষ্ঠপোষক। তিনি মগধে বিক্রমশীল বিহার স্থাপন করেন, ওদন্তপুরীতে মঠ স্থাপন করেন। পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারও ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় লেখক লামা তারনাথের বিবরণ অনুযায়ী ধর্মপাল ৫০ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে অবস্থিত সুবর্ণবিহার ঢিপি (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত মোহিত রায় লিখিত 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থ এবং এই সংকলনে প্রকাশিত 'নদীয়ার পুরাসম্পদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ধর্মপালকে প্রকৃতই বাংলার জ্যোতিষ্কদের অন্যতম বলা হয়। তিনি বঙ্গ রাজ্যের অধিপতি হন পিতৃসূত্রে উত্তরাধিকারিরূপে। তিনি অস্ত্রবলে ও কূটকৌশলের চাতুর্যে উত্তর ভারতের অধীশ্বররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল ৮১০ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর শাসন করেন। বঙ্গোপসাগর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত, হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপার্বত্য এলাকা পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে কামরূপ পর্যন্ত দেবপালের আধিপত্য বিস্তারলাভ করেছিল। তিনি জাভা, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপসমূহের শাসনকর্তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নদিয়ার দুই প্রত্নস্থল কালীগঞ্জের দেবগ্রাম ও রানাঘাটের দেবগ্রাম দেবপালের স্মৃতিবিজড়িত বলে কিংবদন্তী।

দেবপালের পরে তাঁর পিতৃব্য জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল—প্রথম (শূরপাল—প্রথম নামেও পরিচিত) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মুঙ্গের দানলেখমালায় জানা যায় যে দেবপালের রাজ্যপাল নামে পুত্র ছিল। অনেকে এই বাংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের পরিবর্তনকে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লব বলে মনে করেন, এই কারণেই পালরাজ্যের পতন ঘটতে থাকে, অস্তমিত হয় পালরাজ্যের গৌরবসূর্য। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখিত 'পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত' গ্রন্থ অনুযায়ী দেবপালের পরে তাঁর পুত্র শূরপাল—প্রথমই ৮৪৭–৬০ খ্রিস্টাব্দ রাজত্ব করেন, তাঁর পরে সিংহাসনে আসীন হন বিগ্রহপাল—প্রথম, তাঁর রাজত্বকাল ৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ। দেবপালের মৃত্যুর প্রায় ১৪০ বছরের মধ্যে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারিরা ধারাবাহিকভাবে শাসনক্ষমতায় থাকলেও ক্রমে গুর্জর-প্রতিহারদের কাছে পালরাজ্যের ভূমির আধিপত্য হারিয়ে ফেলছিলেন, গুর্জর-প্রতিহারেরা ইতোমধ্যেই মগধ ও উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু অংশ দখল করে নেন। বিগ্রহপাল—দ্বিতীয় (রাজত্বকাল ৯৭২–৭৭ খ্রিস্টাব্দ)—এর পরে তাঁর পুত্র মহীপাল—প্রথম পাল সিংহাসনে আরোহণ করে ৯৭৭–১০২৭ খ্রিস্টাব্দ রাজত্ব করেন। ১০২১–২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল পালরাজ্য আক্রমণ করেন, তিনি ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজা। তাঁর কাছে পরাজিত হন দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল (দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন বলে চিহ্নিত), দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালদেশের গোবিন্দচন্দ্র ও

উত্তররাঢ় অঞ্চলের মহীপাল রাজগণ। মহীপাল-প্রথম ও রাজেন্দ্রচৌলের মধ্যে যুদ্ধ উত্তররাঢ়ের কোনও এক স্থানে হয়েছিল, এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের জয় পরাজয়ে অনিশ্চয়তা ছিল অথবা রাজেন্দ্রচৌল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রচৌল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তিনি বঙ্গ বা রাঢ়ে রাজ্য অধিকারের—সংস্থাপনের চেষ্টা করেননি। এই আক্রমণের পর নদিয়া সহ বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা পরিষ্কার নয়। মহীপাল-প্রথম-এর পর তাঁর পুত্র নয়পাল (১০২৭–৪৩ খ্রিস্টাব্দ) ও পরে তাঁর পুত্র বিগ্রহপাল-তৃতীয় (১০৪৩–৭০ খ্রিস্টাব্দ) পাল সিংহাসনে আসীন হন। বিগ্রহপাল-তৃতীয়-এর পরে তাঁর পুত্র মহীপাল-দ্বিতীয় ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত্য বিদ্রোহের নায়ক দিব্য বা দিব্বোক-এর অভ্যুত্থানে মহীপাল-দ্বিতীয় নিহত হন, দিব্য পরে উত্তরবঙ্গের বা বারেন্দ্রভূমির শাসনক্ষমতায় আসেন, রাজা হন। তারপরে, প্রকৃত পালরাজ ছিলেন রামপাল। তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করে পূর্ববর্তী পালরাজদের পাল অনুগতদের সঙ্গীরূপে সংগ্রহ করেন, ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। রামপাল তাঁর মাতুল মাখনদেবের সাহায্যে বারেন্দ্রভূমির কোনও অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। রামপাল বঙ্গ বা নদিয়া ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন কি না জানা যায় না। রামপাল বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হন বলে মনে হয়। দ্বাদশ শতকে রচিত সন্ধ্যাকরনন্দী লিখিত 'রামচরিত' সূত্রে বারেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে রামপালের সহযোগী অনুগত রাজা ও মিত্রদের নাম জানা যায়। তাঁদের বেশির ভাগই রাঢ় বা মগধের অধিবাসী ছিলেন। নাম ছাড়া আর কোনও তথ্যপ্রমাণ না থাকায় আমরা শুধুমাত্র নদিয়ার দেবগ্রামের বিক্রমরাজকে চিহ্নিত করতে পারি। এ ছাড়া, বঙ্গীয় বদ্বীপের আর কোনও মিত্রের উল্লেখ নেই। বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গ-বদ্বীপের কিছু কিছু অংশ পালরাজদের অধিকারভুক্ত ছিল। বৈদ্যদেব তাঁর প্রভু কুমারপালের পক্ষে নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কুমারপাল হলেন রামপালের পুত্র। কুমারপাল ১১২০ মতান্তরে ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজপদে আসীন হন এবং দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ করেছিলেন। কুমারপালের পর রাজা হন গোপাল-তৃতীয়। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোপাল-তৃতীয়-এর পর তাঁর পিতৃব্য মদনপাল সিংহাসনে আসীন হন। তাঁর রাজত্বকাল ১১৪৩–৬১ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ওড়িশার চোড়গঙ্গ ও পশ্চিমের গাহড়বাল কর্তৃক আক্রান্ত হন। বঙ্গে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন কর্তৃকও উত্তরবঙ্গে মদনপাল আক্রান্ত হয়েছিলেন। মদনপালের পক্ষে বঙ্গে আধিপত্য স্থাপন সম্ভব হয়নি, সেই সময়ে বঙ্গ বর্মণদের অধিকারভুক্ত ছিল। শেষ পালরাজ গোবিন্দপাল শুধুমাত্র মগধের অংশবিশেষ শাসন করতেন এবং ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পালরাজ্য হারান। বর্মণ রাজবংশের শেষরাজা ভোজবর্মণ। খুব সম্ভবত বর্মণরাজদের পরাহত ও বিতাড়িত করেন বিজয়সেন। সেনরাজেরা নিজেদের কর্নাটকের মূল ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন এবং সেনরাজ বংশের প্রথম প্রকৃত রাজা হলেন বিজয়সেন। এই পরিবার রাঢ়ে দেশান্তরিত এবং দুই প্রজন্মে রাঢ়ের কোনও অঞ্চলে বসবাস করতেন। কথিত আছে যে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন গঙ্গাতীরে নিভৃত বাসস্থান নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখ অনুযায়ী সামন্তসেন কর্নাটদেশ আক্রমণকারী শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন হলেন বিজয়সেনের পিতা। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী হেমন্তসেন নিজেকে মহারাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু তিনি কোথায় রাজত্ব করেছিলেন—জানা যায় না। যদি হেমন্তসেন রাজত্ব করেই থাকেন, তা হলে তিনি রাঢ়ের কোনও ক্ষুদ্রায়তন অঞ্চলে রাজত্ব করে থাকবেন। অনুমানের বিষয়, কেমন করে দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকীরা রাঢ়ে রাজ্য সংস্থাপন করলেন, কিন্তু এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজয়সেনের রাজত্বকালের দু'টি, তৎপুত্র বল্লালসেনের রাজত্বকালের দু'টি ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের আটটি শিলালেখ-তাম্রশাসনে কিছু তথ্য আলোকিত হয়। কিন্তু এই ইতিহাস-উপাদানগুলির কোনওটিতে রাঢ়ে তাঁদের অধিকার কিভাবে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়—এ ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। উপাদানে উল্লেখের অনুপস্থিতির জন্য সেনেরা কিভাবে, কি উপায়ে বাংলায় আসেন জানা না গেলেও এ কথা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের সেন রাজবংশ পূর্বে কর্নাটদেশের অর্থাৎ আধুনিক কন্নড়ভাষাভাষী কর্নাটক রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। কর্নাটকের উত্তরকালীন চালুক্যবংশ এবং তামিলনাড়ুর চোল ও চোল-চালুক্য বংশের মধ্যে বিবাদ চলছিল এবং সেনরাজ সামন্তসেন চালুক্যবংশের সামন্ত ছিলেন। কলচুরিবংশের লেখাবলীতে গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণকে (১০৪১–৭২ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গ ও গৌড়রাজদের বিজেতা বলা হয়েছে। সেনবংশের আনুমানিক কালক্রম : সামন্তসেন (১০৬০–৮০ খ্রিঃ), হেমন্তসেন (১০৮০–৯৬ খ্রিঃ)। অরিরাজবৃষভশঙ্কর বিজয়সেন (১০৯৬–১১৫৯ খ্রিঃ), অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর বল্লালসেন (১১৫৯–৭০ খ্রিঃ) ও অরিরাজমদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন (১১৭৯–১২০৬ খ্রিঃ)। পালরাজ রামপালের মৃত্যুর পর দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সেনরাজ বিজয়সেনের উত্থান ঘটে। 'বল্লালচরিত' (১৫২০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দভট্ট রচিত) অনুযায়ী অনন্তবর্মণ চোরগঙ্গার আক্রমণে সহযোগী ছিলেন বিজয়সেন এবং এই আক্রমণে বর্মণবংশের পতন ঘটলে বিজয়সেন আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন।

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র সুবিখ্যাত বল্লালসেন ক্ষমতাসীন হন এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল শান্তিপূর্ণ। তিনি 'দানসাগর' নামে স্মৃতিগ্রন্থ ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতারূপে খ্যাত। বাংলায় প্রচলিত বিশ্বাস ও কিংবদন্তী যে, বাংলায় কুলজী-কুলশাস্ত্র অনুযায়ী বল্লালসেন কুলীন প্রথার প্রবর্তক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বল্লালসেনের দু'টি ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের আটটি শিলালেখ-তাম্রশাসনে এই বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই, দানপত্রেও ব্রাহ্মণদের কুলীন বলে উল্লেখ করা হয়নি। কুলজী-কুলশাস্ত্র ইতিহাস-আশ্রিত নয়।

বল্লালসেনের মৃত্যুর পর তাঁর চালুক্যবংশীয়া মহিষী রামদেবীর গর্ভজাত পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে সেনরাজ হন।

তৎকালীন ভারতের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি অসাধারণ দানবীর রাজা ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লক্ষ্মণসেন সম্পর্কে লিখেছেন : 'সম্রাটের উপাধির সঙ্গে গৌড়েশ্বর সংযুক্ত করেছিলেন। এর কারণ হয়তো এই যে, বিহারের অনেকাংশে লক্ষ্মণসেনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখানকার পালবংশীয় গৌড়েশ্বর তাঁর সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন। ....তাঁর সময়েই সেনেরা কাশীরাজ অর্থাৎ গাহড়ালবংশীয় নরপতিকে পরাজিত করার এবং গাহড়রাল রাজ্যের অন্তর্গত বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ উত্থিত করার দাবি করেছে। ....পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষ্মণসেন শিবের উপাসক ছিলেন....তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের ভক্ত ছিলেন। ....'গীতগোবিন্দ'-প্রণেতা রাধাকৃষ্ণভক্ত কবি জয়দেব তাঁর সভায় সমাদৃত ছিলেন। ...আরও কবি ও পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হলায়ুধ, শ্রীধরদাস, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর এবং গোবর্ধন উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মণসেনের আমলে উল্লেখ্য ঘটনা হল ১২০২ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদিয়া অভিযান। এই অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায় মিনহাজউদ্দিন লিখিত ফারসি গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-তে। দিল্লির সুলতানের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মিনহাজ ৫৫৮ হিজরিতে অর্থাৎ ১২৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে এই বিবরণ রচনা করেন। মিনহাজ লিখিত বখতিয়ারের নদিয়া অভিযানের কাহিনী : বখতিয়ার কর্তৃক বিহারবিজয় শেষ হবার পর তাঁর বিষয়ে সেনরাজ লক্ষ্মণসেন ও তাঁর প্রজাদের কর্ণগোচর হয়। জ্যোতিষীরা, জ্ঞানীগুণিজনেরা এবং মন্ত্রিবর্গ লক্ষ্মণসেনকে দেশত্যাগ করবার পরামর্শ দিলেন। কারণ, শাস্ত্র অনুসারে দেশ তুর্কীদের অধিকৃত হবে। শাস্ত্রে তুর্কী বিজেতার দেহের যে বর্ণনা আছে, বখতিয়ারের দেহের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণ ও ধনী বণিকেরা দেশত্যাগ করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন বখতিয়ার একদল সেনার সঙ্গে বিহার থেকে এগিয়ে এলেন। মাত্র অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার নোদিয়া শহরের দ্বারে উপস্থিত হলেন। নগরদ্বারে এসে বখতিয়ার কাউকে আঘাত না করে ধীরগতিতে অগ্রসর হলেন। নগরের সকলেই ভেবেছিলেন যে একদল বণিক বেচাকেনার জন্য অশ্ব নিয়ে এসেছে। রায় লখমনিয়া অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন তখন আহারে বসেছেন। বখতিয়ার দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলেন। শঙ্কিত লক্ষ্মণসেন দ্রুত নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করলেন। লুণ্ঠন-পীড়ন-অত্যাচার-হত্যায় নগরের পথঘাট রক্তরঞ্জিত হল। নগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বখতিয়ারের অধিকৃত হল। বখতিয়ার নগরটি ধ্বংস-নাশ করে লখনৌতী (লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়)-র দিকে চলে গেলেন।

এই বিবরণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মিনহাজ বর্ণিত 'নোদীয়হ্' নদিয়া বা নবদ্বীপ শহরের সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে 'নোদীয়হ্' নদিয়া বা নবদ্বীপ—তার প্রমাণ নেই, তদুপরি নবদ্বীপে সেন রাজধানী ছিল—তারও প্রমাণ নেই। ডঃ আবদুল করিম লিখিত 'বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল' গ্রন্থে নবদ্বীপেই বখতিয়ারের অভিযানের সারবত্তা স্বীকৃত হয়েছে। বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানের পরেই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানের কালে নবদ্বীপ মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনকর্তাদের অন্যতম বিশিষ্ট ইখতিয়ারউদ্দিন ইউজবক তুগরাল খান (বা মুগীসুদ্দিন ইউজবক শাহ) বখতিয়ারের নদিয়া অভিযানের ৫০ বছর পরে নদিয়া বিজয়ের স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন ('নদিয়ার পুরাসম্পদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুলতানি আমলে নদিয়া বাংলার সুলতানদের রাজ্যশাসনভুক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের রাজা অরিরাজদনুজমাধব দশরথ দেব (যাঁর একাধিক তাম্রশাসন পাওয়া গেছে)-এর আমলে নদিয়ার দক্ষিণাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। মনে হয়, তৎকালীন সমগ্র নদিয়া অঞ্চল মুসলিম বিজেতাদের দখলে ছিল না। নদিয়ায় মুসলিম লেখমালাও মাত্র দু'টি। একটি শান্তিপুরে, অপরটি চাকদহে এই মুসলিম লেখমালা পাওয়া গেছে, কিন্তু কোনওটিই ষোড়শ শতকের পূর্বে নয়। স্বল্প আয়তনের ভূস্বামীরা নদিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে জমিদারিত্ব করতেন বলে মনে হয়।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সুলতানের আমলে সমগ্র বাংলা তাঁর অধিকৃত ছিল এবং সমগ্র নদিয়াও এই সময়কাল থেকে ইলিয়াস শাহ সুলতানি শাসনাধীন ছিল। সাতগাঁও-তে প্রাপ্ত একটি লেখমালা সূত্রে জানা যায় যে, নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহের সুলতানিকালে নদিয়া তাঁর রাজ্যশাসনভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতকের উল্লেখ্য সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, তিনি তাঁর পিতা নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহের সঙ্গে যৌথভাবে ১৪৫৫-৬০ খ্রিস্টাব্দ, এককভাবে নিজে ১৪৬০-৭৩ খ্রিস্টাব্দ এবং পুত্র সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের সঙ্গে যৌথভাবে ১৪৭৪-৭৬ খ্রিস্টাব্দ শাসন করেন। এই সময়কালে নদিয়ার শান্তিপুরের অদূরে গঙ্গাতীরবর্তী তৎকালীন প্রাচীন জনপদ 'গ্রামরত্ন' ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস জনহিতের জন্য বাংলার প্রথম রামায়ণ কাব্য রচনা করেন এবং সমাদর লাভ করেন। তাই তিনি বাংলার আদিকবি।

কালনায় প্রাপ্ত দু'টি লেখমালা সূত্রে নদিয়া সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ সুলতানের আমলে তাঁর শাসনাধীন ছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষে নদিয়ার নবদ্বীপে আবির্ভূত হন ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, তাঁর কালক্রম ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিঃ। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের তথা নববৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বাংলার মনন ও চর্যার ক্ষেত্রে নবধারার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। আবার, শ্রীচৈতন্যজীবনীমূলক পুঁথিসমূহ সূত্রে মধ্যযুগের নবদ্বীপের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় জানতে পারা যায়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্য সূত্রে জানা যায় সুলতানি আমলের এইকালে নবদ্বীপে শাসকশ্রেণীর দমন-পীড়নের কথা। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, তিনি সর্ব ধর্মমতের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রতিও উদার ছিলেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ সুলতান হন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর মোগল শাসনের সূচনা করেন। বাবর-পুত্র হুমায়ুনকে পরাজিত করে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ ভারতের সম্রাট হন। এই পট পরিবর্তনের প্রভাব নদিয়ায় পড়েনি। শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ আদিলের দুর্বল শাসনকালে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মুহম্মদ শাহ আদিলকে পরাজিত করে মোগলসম্রাট আকবর শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় একটি আফগান পরিবার কাররানি নদিয়া সহ বাংলার কিছু অংশ দখল করে নেন। এমন ধারণা প্রচলিত যে, বাংলার ভূস্বামী প্রতাপাদিত্যের দখলে ছিল নদিয়ার পশ্চিমাংশ। বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মানসিংহ বাংলায় আসেন। তবে, পরবর্তীকালে বাংলার মোগল-অনুগত নিয়োজিত শাসনকর্তা ইসলাম খাঁর কাছে প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটে। মানসিংহকে বাংলায় অনেকে সহযোগিতা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরাই হন মোগল অনুগ্রহভাজন ভূস্বামী।

দিল্লির মোগলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) নদিয়ার আন্দুলিয়া (আনুলিয়া ?)-রাজ কাশীনাথ রায় ধৃত ও নিহত হলে তাঁর বিধবা গর্ভবতী স্ত্রী নদিয়ার বাগোয়ান (বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত)-এর জমিদার নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রিতা হন, সেখানেই তাঁর পুত্রসন্তান জন্মালে হরেকৃষ্ণ তাঁর নাম রাখেন রামচন্দ্র সমাদ্দার এবং তাঁকেই পরে হরেকৃষ্ণ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারি করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের প্রথম পুত্র মানসিংহের সহযোগী ভবানন্দ নদিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রামচন্দ্রের অন্যান্য পুত্র জগদীশ, হরিবল্লভ এবং সুবুদ্ধিও বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কুলজী ও সংস্কৃত পুঁথি 'ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতং' অনুযায়ী ভবানন্দ শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের ২০তম অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুনী গাঁঞিভুক্ত সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর প্রদত্ত ১৪ পরগনার সনদ (ফরমান) সূত্রে নদিয়ারাজ হন এবং নদিয়া রাজবংশের সূচনা করেন। ভবানন্দের পূর্বনাম ছিল দুর্গাদাস সমাদ্দার, কিন্তু নদিয়ারাজ পদে আসীনকালে তাঁর নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার। অবশ্য পরবর্তী নদিয়ারাজেরা রায় উপাধি গ্রহণ করেন। ভবানন্দের নদিয়ারাজ—রাজত্বকাল ১৬০৬–২৮ খ্রিঃ। তৎপুত্র নদিয়ারাজ গোপালের রাজত্বকাল ১৬২৮–৩২ খ্রিঃ। গোপালপুত্র রাঘব রায়ের রাজত্বকাল ১৬৩২–৮৩ খ্রিঃ। রাঘবপুত্র রুদ্র রায়ের নদিয়ারাজ কাল ১৬৮৩–৯৪ খ্রিঃ। ভবানন্দ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারিতে নদিয়ারাজ রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। নদিয়ারাজ রুদ্র রায় তাঁর তৎকালীন নদিয়া রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে ও নবদ্বীপ-শান্তিপুর জনপদের নিকটবর্তী স্থানে রেউই গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং রেউইয়ের নামকরণ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে কৃষ্ণনগর। রুদ্র রায়ের প্রথমা রানীর পুত্র রামচন্দ্র ও রামজীবন, দ্বিতীয়া রানীর পুত্র রামকৃষ্ণ। রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য নদিয়ারাজ হন। রামজীবনের রাজত্বকাল ১৬৯৪–১৭১৫ খ্রিঃ। রামকৃষ্ণ ও রামজীবন কৃষ্ণনগরে রাজধানীনগর সুসমৃদ্ধ করেন। রামজীবনের প্রথমা রানীর পুত্র রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়া রানীর পুত্র

এলানে কালী // দেয়ারাপাড়া

ছবি : ব্রহ্মচারী [illegible]
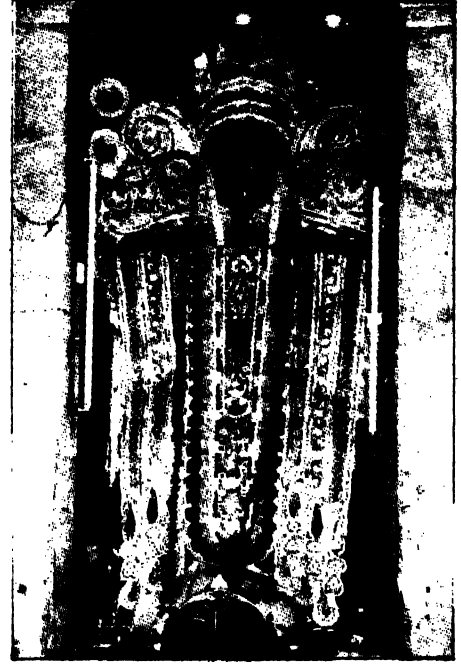
রঘুরাম এবং তৃতীয়া রানীর পুত্র রামগোপাল। রঘুরামের রাজত্বকাল ১৭১৫–২৮ খ্রিঃ। রঘুরামের পুত্র হলেন সুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁর জন্ম ১৭১০ খ্রিঃ, মৃত্যু ১৭৮২ খ্রিঃ। তাঁর নদিয়ারাজ কাল ১৭২৮–৮২ খ্রিঃ। কৃষ্ণচন্দ্রের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল নানা ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এই সময় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২৩ জুন ১৭৫৭—নদিয়ার পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়, সূচিত হয় মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগ। কৃষ্ণচন্দ্রকে বলা হয় 'বাংলার বিক্রমাদিত্য'। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিপোষক এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারক-বাহক তথা হিন্দুসমাজপতি। তিনি নবদ্বীপ-অগ্রদ্বীপ-চক্রদ্বীপ-কুশদ্বীপের সমাজের অধিপতিও ছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সহ জ্ঞানীগুণীদের ভূমি-অর্থ ও বৃত্তিদান করেছেন। তাঁর কালে অষ্টাদশ শতকে বঙ্গ সংস্কৃতির অভিকেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর তথা নদিয়া। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, সাধককবি রামপ্রসাদ সেন সহ জ্ঞানীগুণীরা তাঁর রাজসভায় সভাসদরূপে অলঙ্কৃত করতেন। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে ষড়যন্ত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল এবং নদিয়ারাজ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মতে কৃষ্ণচন্দ্রকে লোকে 'নেমকহারাম' বলে অভিহিতও করত এ কারণে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞকালে সারা ভারতের পণ্ডিতেরা যোগদান করেন, যজ্ঞান্তে কৃষ্ণচন্দ্র ভূষিত হন 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমান্ মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়' নামে। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে তিনি কৃষ্ণনগর থেকে শিবনিবাসে রাজধানী স্থাপন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া রানীর পুত্র শম্ভুচন্দ্র, শিবচন্দ্র সহ অন্য সকল পুত্রই প্রথমা রানীর। শিবচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭৮২–৮৮ খ্রিঃ। তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নদিয়ারাজ কাল ১৭৮৮–১৮০২ খ্রিঃ এবং

তৎপুত্র গিরীশচন্দ্রের নদিয়ারাজ কাল ১৮০২–৪২ খ্রিঃ। তিনি অপুত্রকহেতু শ্রীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৮৪১–৫৬ খ্রিঃ। তৎপুত্র সতীশচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৮৫৬–৭০ খ্রিঃ। তিনি অপুত্রকহেতু তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন তাঁর দ্বিতীয়া রানী ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৭০–৯০ খ্রিঃ নদিয়ারাজ এসটেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ক্ষিতীশচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৮৯০–১৯১১ খ্রিঃ। তৎপুত্র ক্ষৌণীশচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৯১১–২৮ খ্রিঃ। ১৯২৮–৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নদিয়ার মহারাজকুমার ছিলেন সৌরীশচন্দ্র রায়। নদিয়া রাজবংশলতা :
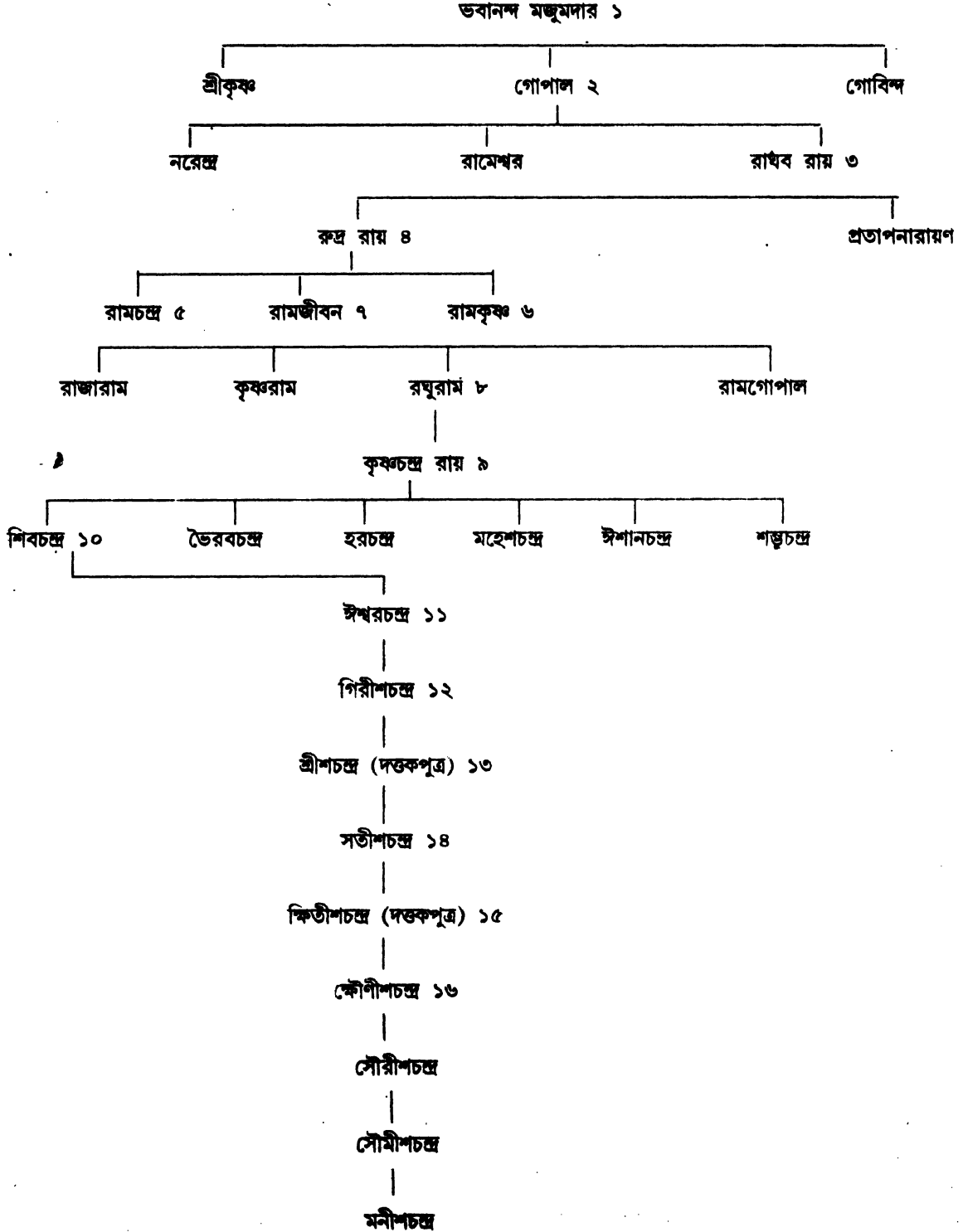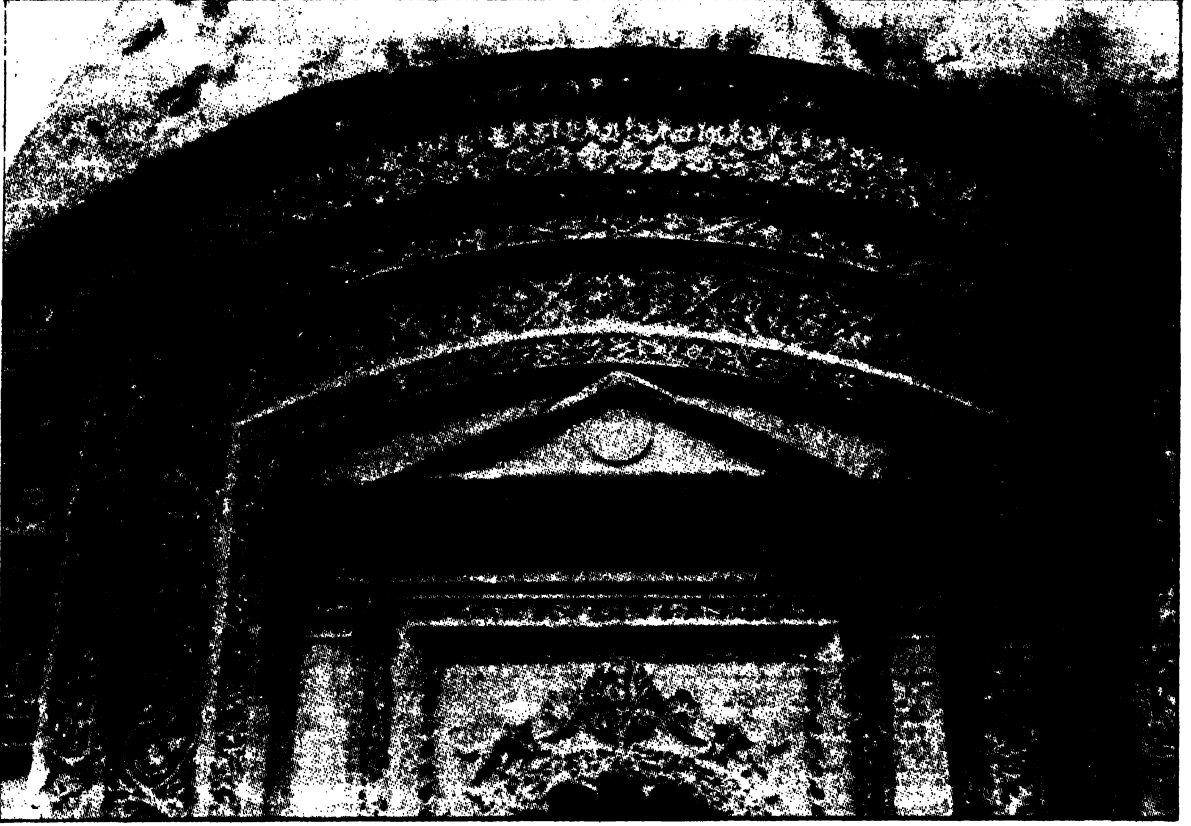
দ্বাদশ শিবমন্দির ।। নবদ্বীপ   ছবি : শান্তিরঞ্জন দেব

মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব-পরবর্তী দুর্বল হীনবল মোগল শাসনকালে বাংলার শাসনকর্তা জাফর খাঁ মুর্শিদকুলি খান নামে বাংলার স্বাধীন নবাব হন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তখন, নদিয়ারাজেরা বাংলার নবাবকেই বার্ষিক কর দিতেন। আবার, পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভের ফলে নদিয়ারাজদের বার্ষিক কর দিতে হত কোম্পানিকে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেস্টিংস, তিনি জেলা প্রশাসন ও করাদি আদায়ের জন্য জেলায় জেলায় সমাহর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার সর্বপ্রথম ইংরেজ জেলা সমাহর্তা নিযুক্ত হন রেডফারন্, তাঁর সহকারি ছিলেন চেরী। এই শতকের শেষে নদিয়ায় নীলচাষ প্রবর্তিত হয়। বেঙ্গল ইনডিগো কনসারন্ ইংরেজ কারবার সহ নানা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা নীলচাষে নদিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং নীলচাষীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে। পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি নদিয়ায় ও অন্যত্র নীলচাষীরা জোটবদ্ধ হয়, বিদ্রোহ করে। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনার নাম নীলবিদ্রোহ, নীলের কারণে নদিয়ার মাটি হয়েছিল চাষীর রক্তে লাল।

স্বাধীনতা আন্দোলনেও নদিয়ার ভূমিকা উল্লেখ্য উজ্জ্বল। শহিদ বসন্ত বিশ্বাস, শহিদ বাঘাযতীন ও শহিদ অনন্তহরি মিত্র নদিয়ার সন্তান। পরাধীনতার বন্ধন শৃঙ্খল মোচনের জন্য নদিয়ায় বর্তমান শতকের সূচনা থেকেই নানা বৈপ্লবিক কার্যক্রম ও আন্দোলনও হয়েছে। ১৯২০ সাল ও পরবর্তীকালের অসহযোগ আন্দোলনেও নদিয়া আন্দোলিত হয়। করবন্ধ আন্দোলনে ১৩ এপ্রিল, ১৯৩২ নদিয়ার তেহট্টের অদূরে চাঁদেরঘাট গ্রামে শহিদবরণ করেন সতীশ সর্দার। ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনও হয় নদিয়ায়, রানাঘাটে রেলপথের উপর বিমান থেকে গুলিবর্ষিত হয়। নদিয়ার অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা পর্বে যোগদান করে ভোগ করেছেন কারা নির্যাতন আর নির্বাসন দণ্ড।

১৯৪৭-এ দেশের স্বাধীনতার কালে নদিয়া বিভক্ত হয়। নদিয়ার উত্তরাংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয় এবং দক্ষিণাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয়।

ইতিহাসের তিনটি উল্লেখ্য পটপরিবর্তনে নদিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানে বাংলায় মুসলিম অধিকার সহ মধ্যযুগের সূচনা হয়, এই যুগের অবসান হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার পলাশীর প্রান্তরে, অস্ত যায় বাংলার স্বাধীনতাসূর্য। আবার এপ্রিল ১৯৭১-এ অবিভক্ত নদিয়ার বর্তমান নদিয়ার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে মুজিবনগরে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ইতিহাসের এই তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাই ঘটেছে নদিয়ার মাটিতে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Bengal District Gazetteers : NADIA, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত West Bengal District Gazetteers : NADIA গ্রন্থদ্বয়ের ইতিহাস-অধ্যায় অবলম্বনে ও নানা আকর গ্রন্থাদি সূত্রে লিখিত।

নদিয়ার পুরাসম্পদ

পুরাসম্পদ মানুষের কীর্তির স্বাক্ষর। প্রত্নসম্পদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুগভীর। নানা গঠনবৈচিত্র্যপূর্ণ প্রত্নসম্পদ মানুষের নির্মাণশৈলীর, নিপুণতার, দক্ষতার, রুচির ও দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচায়ক। পুরাকীর্তি মানুষের কালের নীরব সাক্ষ্য। পুরাকীর্তির তথ্যের আলোকে আলোকিত হয় মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস, উন্মোচিত হয় মানুষের জীবনের কথা, উদ্‌ঘাটিত হয় মানুষের জীবনের সত্য ঘটনা। তাই প্রত্নসম্পদ মানুষের ইতিহাসের অমূল্য আকর উপাদান। প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রত্নসম্পদসমৃদ্ধ এলাকা নদিয়া জেলা। নদিয়া শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর পবিত্র আবির্ভাবভূমি। গঙ্গার উত্তরবাহিনীস্থল নবদ্বীপ মধ্যযুগে ছিল সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পত্তিশালী ইতিহাসখ্যাত নগর-জনপদ, কালে নবদ্বীপ পরিণত হয় সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চার বাগীশ্বরী অভিকেন্দ্রে। নদিয়ার প্রাচীনতম ধর্মীয় স্থাপত্যনিদর্শন বল্লালঢিপি উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে। নদিয়ার বাংলা চালারীতির পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত ভাস্কর্যমণ্ডিত বহু মন্দির এবং শিবনিবাসের বৃহদায়তন ও বিরল রীতির দেবালয়সমূহ নদিয়ার উল্লেখ্য উজ্জ্বল পুরাসম্পদ। নদিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নৈশ্বর্যময় জেলা।

নদিয়া গাঙ্গেয় সমতট। পলিমাটি সমতল নদিয়ার আজ পর্যন্ত কোন সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। তবে, নদিয়ার কালীগঞ্জ থানার ৯২ সংখ্যক মৌজাভুক্ত কামদেবপুর গ্রামে নবপলীয় যুগের একটি প্রস্তরকুঠার ও প্রস্তরনির্মিত সুপারি আকৃতির পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ষষ্ঠীতলায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে একজন কৃষক এই প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান। এখন আছে কাটোয়ার আঞ্চলিক সংগ্রহশালায়। প্রস্তরকুঠার প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। নীচের চেয়ে উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত সরু, ছুঁচালো। নীচের দিকে ক্রমপর্যায়ে চওড়া। মুখটি চওড়ায় প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি। কুঠারটি সুমসৃণ ও সুন্দর। একদিক সমান, উঁচুনিচু নেই। অপরপিঠ কচ্ছপের পিঠের মতো। মুখটির দুদিক ঘষে ধার করা হয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে মসৃণ হয়েছে। এই মসৃণতা প্রস্তুতকারক তথা ব্যবহারকারীদের সুরুচি ও পরিশীলিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এটি হল সস্কন্দ কুঠার। অন্য পুরাবস্তুটি বাঁটুলে নিক্ষেপের জন্য তৈরি হতে পারে। বাংলায় ইতিহাসপূর্ব যুগের মানুষের সাংস্কৃতিক-সামাজিক ধারার কালবিন্যাস-পুরোপলীয় যুগ, নবপলীয় যুগ ও তাম্রপলীয় যুগ। প্রাপ্ত প্রস্তর কুঠারটি দেখে অনুমিত হয় যে, নবপলীয় ও তাম্রপলীয় যুগের মধ্যবর্তীকালের মানুষের তৈরি ও ব্যবহার্য পুরাবস্তু। প্রাচীন জনবসতির দিক থেকে কামদেবপুর ও সন্নিহিত এলাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কামদেবপুরের অনতিদূরে কাটোয়ার শাঁখাই-এর কাছে অজয় নদ গঙ্গায় এসে মিশেছে। কাছেই কুনুর-কোপাই নদী। ছোটনাগপুরের পর্বতশ্রেণীর গুহাজীবন থেকে আদিম মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা নদীপথে এসে এই সব অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল—তার প্রমাণ বর্ধমান জেলায় নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গার পশ্চিমদিকের মতো পূর্বতীরে নদিয়া জেলার কামদেবপুরে এই প্রত্নকুঠার প্রাপ্তি ইতিহাসের সূত্র মেলে ধরেছে যে, গঙ্গার পূর্বতীরেও আদিমজনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল এবং শিকারে বা গাছ কাটতে যাতায়াত করত।

এবারে তুলে ধরছি, আনন্দবাজার পত্রিকায় ৭ অক্টোবর ১৯৯১ তারিখে প্রকাশিত (পৃষ্ঠা ৫, স্তম্ভ ৩) একটি সংবাদ :

> প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন তেহট্টে
>
> কৃষ্ণনগর, ৬ অক্টোবর—নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত তেহট্টের নিকটবর্তী একটি গ্রামে সম্প্রতি খ্রিস্টীয় দশম শতকের সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। ভারতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (জি এস আই) নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে জলঙ্গি ও ভৈরব নদীর মধ্যবর্তী নতুন জিৎপুর ও তেহট্ট গ্রাম থেকে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পেয়েছে। সংলগ্ন গ্রাম কাঁঠালি থেকেও নানারকম পাত্রের অংশ পাওয়া গিয়েছে। এলাকাটি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব অধিকারের অফিসাররা পরীক্ষা করে এগুলিকে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বের নিদর্শন বলে স্থির করেছেন।—ইউ এন আই

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-৮১) লিখিত 'বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' গ্রন্থ থেকে জানা যে ভৈরব এখন মরণোন্মুখ হলেও মধ্যযুগের অন্যতম নদী। তেহট্ট অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনসূত্রে জনবসতির অনুসন্ধান চলছে।

নদিয়ার বিভিন্নস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গিয়েছে পাল-সেন যুগের কিছু ভগ্ন বা অখণ্ড প্রস্তর ও ধাতবমূর্তি ও সেনযুগের তাম্রশাসন। প্রস্তরমূর্তিগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণু (বাসুদেব মূর্তি)। এ ছাড়া, অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যমূর্তিও উল্লেখযোগ্য। অল্পকিছু বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধপ্রভাবিত অন্যান্য দেবী মূর্তিও পাওয়া গেছে। নদিয়ায় বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে বিশেষত পাল আমলে এই সব মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। নদিয়ায় প্রাপ্ত পাল-সেনযুগের শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত প্রস্তর ও ধাতুমূর্তিগুলি প্রথাগত শিল্পসুষমামণ্ডিত। প্রাচীনযুগে নির্মিত মূর্তি প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তিনির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী লোকই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠা করতেন। শিল্পীগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাচারের

নির্দেশমত মূর্তি প্রস্তুত করতেন। এতে তাঁদের শিল্প রচনার শক্তি ও স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব হত। বিশেষত, এই শিল্পীগণ যাঁদের অনুগ্রহে জীবিকানির্বাহ করতেন, শিল্পের সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা ধর্মনিষ্ঠাই ছিল তাঁদের মনে অধিকতর প্রবল, সুতরাং বাংলার এই শিল্পীগণের পরিস্থিতি প্রকৃত শিল্পের উৎকর্ষের অনুকূল ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। ধনী ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট এই সমুদয় শিল্পীর রচনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনের অনুকূল হত।'

নদিয়ায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল তেহট্ট থানার বরেয়া গ্রামের কষ্টিপাথরের পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শমুদ্রার অসামান্য অখণ্ড বুদ্ধমূর্তি। আকার ৬৯ x ৩৫ সেন্টিমিটারস। দশম শতকের মূর্তি। বর্তমানে কলকাতার বেহালায় অবস্থিত রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে রক্ষিত (প্রদর্শ সংখ্যা ০৫.১১৯)। বরেয়া সন্নিহিত এলাকায় ভগ্নাংশ বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী (১৮৪৬-১৯১৪) তাঁর 'নবদ্বীপমহিমা' গ্রন্থে 'নবদ্বীপে বৌদ্ধ প্রভাব' অধ্যায় লিখেছেন : 'নবদ্বীপে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পাড়ডাঙার শিব, যুগনাথ, মালোদের শিবের নিকটস্থ ষষ্ঠীঠাকুরানী, জয়দুর্গা ও দণ্ডপাণি বৌদ্ধভাবাপন্ন।' উল্লিখিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৪ সন) পদ্মপাণি বুদ্ধ ও উগ্রতারা চামুণ্ডার ধাতব মূর্তির (নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রাপ্ত) আলোকচিত্র আছে।

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রামে বেশ কিছু বৌদ্ধ দেবদেবীর ভগ্নাংশ মূর্তি পাওয়া গেছে। সবগুলিই প্রস্তরনির্মিত। নাকাশিপাড়া থানার নাংলা গ্রামে বেলেপাথরের একটি মূর্তির অবয়বে বুদ্ধমূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। চাকদহ পুরসভার প্রতিষ্ঠাতা পুরপতি জোসেফ ডেভিড মেলেক বেগলার ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। চাকদহে তাঁর বাড়িতে রক্ষিত পাথরের একটি বড় বুদ্ধমূর্তি পরে কলকাতায় আশুতোষ সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি বুদ্ধগয়ায় খননকার্য চালিয়েছিলেন। মূর্তিটি সেখান থেকে আহৃত না চাকদহের কোথাও আবিষ্কৃত তা সঠিক জানা যায় না। এ ছাড়া, নদিয়া জেলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে।

নবদ্বীপ থানার পানশিলা গ্রামে এক টিপির উপরে এক প্রস্তর খণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল, পাথরের বুকে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত লিপি : 'খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী সিব/খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ/খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী যোগেশ।' এখানে সিব অর্থে মহাদেব, মঞ্জু ঘোষ অর্থে বোধিসত্ত্ব এবং যোগেশ অর্থে বুদ্ধ বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ, যথাক্রমে, শিব, মঞ্জু ঘোষ ও যোগেশে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। পালরাজাদের আমলে এই সব অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। পরে বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস পেলে বুদ্ধ শিব ও ধর্মঠাকুরে পরিণত হয়। পানশিলা নামটি অর্থবহ কেন না তার সঙ্গে বৌদ্ধকেন্দ্র তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতির নামের মিল আছে। এখানে কয়েকটি উঁচু টিপিও দেখা যায়। গ্রামটি ভালুকার বিল নামক এক বিরাট জলাশয়ের তীরে অবস্থিত। অদূরেই ভালুকা গ্রাম। 'ধর্মমঙ্গল' ও 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'বল্লুকা'র নামান্তর হতে পারে। বল্লুকা নদীতীরে ধর্মপূজা প্রথম প্রবর্তিত হয়। সেদিনের বল্লুকা নদী মজে গিয়ে আজ হয়ত ভালুকার বিলে পরিণত হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার বড় চাঁদঘর গ্রামে আছে বৃক্ষতলে কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজা মূর্তি। বৌদ্ধদেবীমূর্তি বলে অনুমিত হয়। কিন্তু দুর্গাধ্যানে নিত্যপূজিতা এই মূর্তির লোকায়ত নাম যশোদায়িনী, আবার অনেকে বনদুর্গা বা মঙ্গলচণ্ডীও বলে থাকে।

নদিয়ার নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে সেন আমলে তৈরি পাথরের নানা আকারের বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য : কৃষ্ণনগরে খাকিবাবার মঠের, দিগনগরে রাঘবেশ্বর মন্দিরের, আনুলিয়ার বৃক্ষতলের, শিবনিবাসের রামসীতা মন্দিরের, করিমপুর দোগাছির দালানমন্দিরের, বনমালিপাড়ার; বিষ্ণুপুরের (চাকদহ থানা), মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দিরের, শান্তিপুর সাহিত্য পরিসরে ও হরিণঘাটা থানার শিমহাটে নৈয়ায়িক গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ (১৬০০-৮২)-এর পরিষৎ বিষ্ণুমূর্তি অখণ্ড অবস্থায় আছে। অজস্র ভগ্ন মূর্তি (বিষ্ণু) নানা স্থানে আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য. পাথরের মূর্তির মধ্যে করিমপুর দোগাছির মহিষমর্দিনী, নবদ্বীপের বুড়োশিবমন্দিরের মহিষমর্দিনী উল্লেখ্য। পাথরের ও ধাতুর প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নানা মন্দিরে আছে। পাগলাচণ্ডী গ্রামের চণ্ডীমূর্তি ও শিবনিবাসের শীতলামূর্তি অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন। দেপাড়ার নৃসিংহ প্রস্তরমূর্তিও উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত সদাশিবের কষ্টিপাথরের এক অপরূপ মূর্তি (১.১ মি. x ৫৪ সে মি) কৃষ্ণনগরের রায় প্রসন্নকুমার বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কলকাতায় সংগ্রহশালায় দান করেন। ত্রিমুখ-দশভুজ মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ডান দিকের পাঁচ হাতে অঙ্কুশ, ত্রিশূল, দণ্ড, বরাভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা। বামদিকের হাতে সর্প, ডমরু, পদ্ম, অক্ষমালা ও পাত্র। পঞ্চরথ বিন্যাসের পাদপীঠের উপর স্থাপিত মহাম্বুজের ঊর্ধ্বে মূর্তিটি অবস্থিত। বরদমুদ্রায় শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত। ডাম ও বামদিকের হাতের অলঙ্কারগুলি পরস্পর পৃথক। মস্তকের ভঙ্গি প্রলংকর। পাদপীঠে শিববাহন ষণ্ড। নীচে এক ভক্তের ক্ষুদ্র মূর্তি উৎকীর্ণ। পিছনে পর্ণাকৃতি জ্যোতির্বলয় ও চালিতে উড়ন্ত গন্ধর্বমূর্তি।

কৃষ্ণনগরের বাস্তুবিদ চিত্তসুখ সান্যাল নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদ্দণ্ডপুরের জনৈক বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিতলের এক পার্বতী মূর্তি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় দান করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০) প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ)-এ মূর্তিটির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ : 'ওঁ দেয় (ধর্মে)য়ং শ্রীনারায়ণপাল দেবরাজ্যে সম্বৎ ৫৪, শ্রীউদণ্ডপু(র) বাস্তব্য রাণক উছপুর বারুকস্য।' সান্যাল পরিবারে আছে একটি প্রাচীন নৃসিংহমূর্তি, পদ্মাসীন, চতুর্ভুজ, দু'হাতে শঙ্খ-চক্র, অপর দু'হাতে বরাভয়মুদ্রা। মুখাকৃতি নৃসিংহের, নীচে সর্প। একপাশে জোড়হাতে ভক্ত প্রহ্লাদ। পিছনে চালি। লিপি নেই। ধাতব মূর্তি।

কৃষ্ণনগরের কাছে জলঙ্গি নদীতীরবর্তী পুরনো শম্ভুনগর গ্রামে পাওয়া গেছে মনসাসদৃশ প্রস্তর দেবীমূর্তি, এই অসামান্য অখণ্ড মূর্তিটি এখন কৃষ্ণনগরে এক পরিবারে গৃহদেবীরূপে পূজিতা।

একমাত্র বল্লালঢিপি ছাড়া নদিয়ায় পাল-সেনযুগে নির্মিত কোনও মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাহলে, সে যুগে কি নদিয়ায় কোনও স্থাপত্য নিদর্শন ছিল না বা নির্মিত হয়নি? হয়ত হয়েছিল। বিধ্বংসী জলবায়ু, প্লাবন, নদীর তটক্ষয় বা গতি পরিবর্তন এবং বখতিয়ার যুজবক প্রমুখের ব্যাপক ধ্বংসলীলায় ইট বা পাথরের তৈরি সেসব স্থাপত্য নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে মনে হয়। নদিয়ার মাটি পলিপ্রধান এবং বেলে-দোআঁশ জাতীয়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নয়। কর্কটক্রান্তিরেখা নদিয়ার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ার ফলে এখানকার জলবায়ুতে চরমভাব অনুভূত হয়, স্থাপত্য নিদর্শনেরও দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি হয়। শ্রীচৈতন্যজীবনীমূলক ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে নদিয়ায় কোনও মন্দির দেবালয়ের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীনতর মন্দিরগুলি তার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বল্লালঢিপি উৎখনন

কৃষ্ণনগর থেকে তেরো কিলোমিটার পশ্চিমে বামনপুকুর বাজার সংলগ্ন বল্লালঢিপিতে ভারতে সরকারের পোষকতায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চল চক্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গত ১৯৮১ সাল থেকে আধুনিক প্রত্নবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎখননের কাজ চলেছে। বল্লালঢিপি উৎখননের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ভারতের লোকসভায় বারংবার তুলে ধরেন লোকসভার তৎকালীন সাংসদ অধ্যাপক রেণুপদ দাস এবং তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রাদিতে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রায় তেরো হাজার বর্গমিটার আয়তাকার এই ঢিপির উচ্চতা ছিল প্রায় নয় মিটার। পশ্চিমে খাড়াই, উত্তর-পূর্বে ঢাল। পশ্চিমে অদূরে ভাগীরথী নদী। খোঁড়াখুড়ির ফলে এখন অবশ্য এই ঢিপির হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য। এই ঢিপি সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল। অনেকে ভাবতেন যে এই ঢিপিতে সমাহিত আছে বাংলার পাল আমলে (অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে) নির্মিত কোনও বৌদ্ধস্তূপ বা বিহার। আবার, অনেকে মনে করতেন যে সেনযুগে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত কোনও রাজপ্রাসাদই এই ঢিপি। সেনরাজ বল্লালের নামাঙ্কিত ঢিপি, তাই অনুমিত হত যে ঢিপির মধ্যে সমাহিত আছে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রস্তরফলক ও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী অনেকে মনে করতেন সেনরাজধানী বিজয়পুর ঘুমিয়ে আছে ঢিপির মধ্যে। ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢাকা এই বিশাল ঢিপিটিকে প্রথমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে সম্পূর্ণ ঢিপিকে সুশৃঙ্খলভাবে দাবার ছক অনুযায়ী ভাগ করে (প্রতিটি ঘর দশ বর্গমিটার) খাদবিন্যাস করে কালানুক্রমিক পর্যায়ভিত্তিক প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত নকশা অনুযায়ী উৎখনন করা হয়। কারণ, আগেই বোঝা গিয়েছিল যে এখানে সমাহিত আছে এক সুবিশাল গঠনস্থাপত্য। এই গঠনস্থাপত্যের কী চরিত্র—তা অবশ্য প্রথমে জানা যায় নি। উৎখননের মূল লক্ষ-উদ্দেশ্য ছিল—ধ্বংসকবলিত ইমারতের সার্বিক উন্মোচন ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রত্নবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। দেখা গেল, ঢিপির মূল গঠনস্থাপত্য পোড়ামাটির টালি ইটের সুনিপুণ গাঁথনির বিশাল প্রাচীরে আবৃত। প্রাচীরের বেধ প্রায় পাঁচ মিটার, উচ্চতা চার মিটার। দক্ষিণে প্রায় ৯০ মিটার ও পূর্বে প্রায় ৬০ মিটার এই প্রাচীর। ভারতে এই ধরনের বিশালাকার গঠনশৈলী বিরল। অন্তত তিনবার সংস্কার করা হয়েছে। মূল প্রাচীরের সঙ্গে প্রায় দুই মিটার বেধের আরও একটি প্রাচীর সংযুক্ত। এই স্থাপত্য বারবার বন্যাকবলিত হয়েছে। প্রমাণ পাওয়া গেল—ভিতরে রয়েছে গাঙ্গেয় পলিমাটি আর বালি। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পোড়ামাটির নানা আকারের সুন্দর টালি ইটের মূল গঠনস্থাপত্য। ইটের আকার নানা প্রকার। উন্মোচিত গঠনস্থাপত্য নিঃসন্দেহে বিহারের বিক্রমশীলা ও বাংলাদেশের রাজশাহীর সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহারের মতো গঠনশৈলীর। + যোগচিহ্নের আকারে নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত, খাড়াই ও বিন্যস্ত। শীর্ষভাগ ক্রমসংকীর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র। অন্তত তিনবার পুনর্নির্মিত হলেও এবং প্রতিবারই আয়তন বৃদ্ধি করা হলেও অনুসৃত হয়েছে একই গঠনরীতি। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এই কেন্দ্র ধ্বংস বা পরিত্যক্ত হবার কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নয়, মানবিকও। অধিকাংশ প্রস্তরভাস্কর্য মূর্তি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্তিই প্রমাণ করে যে মানবিক আঘাতেই এমন হয়েছে। দক্ষিণে পাওয়া গেছে হোমকুণ্ড বা যজ্ঞস্থলী। তার ব্যাসার্ধ ৭০ সেন্টিমিটার, গভীরতা ৫০ সেন্টিমিটার, ভিতরে ভস্ম। উত্তরে পবিত্র বারিকুণ্ড। গোলাকার, অনতিগভীর বাঁধানো কূপ। পবিত্রবারি নির্গমনের জন্য তার মাথার ঠিক উপরেই পাথরের তৈরি মকরমুখ একটি সংকীর্ণ প্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত। এখানেই একটি প্রকোষ্ঠে পাওয়া গেছে প্রস্তরনির্মিত অনুপম ভাস্কর্য শৈবগণমূর্তি। কক্ষতল চুনসুরকি পেটানো আর ইট বিছানো। প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল চুনবালির তৈরি উন্নত শিল্পধারার স্টাকো মডেলিং দেবদেবীর ও দৈত্যের অসামান্য মূর্তিমুখ ও কুলকারি অলঙ্করণ। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধমহাবিহার-খ্যাত কর্ণসুবর্ণ উৎখননেও অনুরূপ মূর্তিমুখ পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া পাওয়া গেছে নানা যুগের অজস্র ভগ্ন মৃৎপাত্র, মালার পুঁতি, ভগ্নপ্রস্তরমূর্তি ও নানা ধাতব দ্রব্যাদি। পাওয়া গেছে অখণ্ড নরকঙ্কাল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই নরকঙ্কালের দেহীরা সকলেই অকস্মাৎ বন্যাকবলিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। উন্মোচিত গঠনস্থাপত্য নিঃসন্দেহে ধর্মীয় স্থাপত্য। মূল গঠনস্থাপত্যের শৈলী ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ধস্তূপের মতো। পরবর্তীকালে পঞ্চরথ পঞ্চরত্ন ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ে পরিণত করা হয়েছে। কোনও লেখ বা উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়নি। উৎখননের কাজ এখন আর হচ্ছে না। সংরক্ষণও নামমাত্র। এই প্রসঙ্গে সাংসদ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় লোকসভায় মে ১৯৯২ প্রশ্ন তোলেন : "The excavation at Ballal dhipi in the District of Nadia in West Bengal has been started by the Calcutta Circle of Archaeological Survey of India with the object to

expose the full view complete picture of the structural complex, since this is the largest and one of the ancient religious complex/temples in Bengal. But it has been observed that the work is stopped or not carried out with the same spirit. The reason behind it, should be flarified inview of the unknown settlement hitherto is unexposed so far'. ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তরে জুলাই ১৯৯২ জানান : 'Archaeological Survey of India has undertaken scientific clearance of the ancient mound at Ballal Dhipi, District Nadia, West Bengal during 1982-83 upto 1987-88 which has revealed a dilapidated and eroded brick-structure in the form of a Siva Temple datable to the 10th-11th century A.D. along with other miniature shrines all around, though partly damaged. Antiquities found include copper objects, stucco and terracotta figures, besides pottery. As clearance of the mound has already exposed the plan of the brick-structure with other earlier remains, no further work of the site is felt necessary.'

শুধুমাত্র 'পরিচিতি' প্রত্নতাত্ত্বিক খননের শেষ কথা হতে পারে না। উন্মোচিত প্রত্ননিদর্শনের সার্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন জনইতিহাসের স্বার্থে প্রয়োজন, স্থাপত্যনিদর্শনের নির্মাতা এবং সেখানকার আবাসিকদের পূর্ণ পরিচয়, পরিবেশ পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন পরবর্তী পর্যায়ে উৎখনন, সংরক্ষণ ও প্রত্নস্থল-প্রদর্শশালা।

রানাঘাট শহরের অদূরে চূর্ণি নদী তীরবর্তী আনুলিয়া গ্রাম। প্রাচীন জনপদ। বৌদ্ধযুগে এই গ্রাম বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধপ্রভাবিত নাম 'অনলগ্রাম' থেকে নাকি আনুলিয়া নামকরণ হয়েছে। জনশ্রুতি, বৌদ্ধশ্রমণ শান্তাচার্য এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখানকার লোকায়ত গ্রামদেবতা নাথপন্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে শোনা যায়। পাঠান আমলে এখানে নাকি এক ধনাগার ছিল। চূর্ণিতীরে একটি বিলীয়মান ঢিপি এখনও স্থানীয় লোকের কাছে ধনাগার নামে পরিচিত। এই ঢিপি থেকে এক সময় নাকি কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। এখানে ১৮৯৮ সালে সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) সেটি ক্রয় করেন ('ঐতিহাসিক চিত্র' / ১ম পর্যায় / ১ম ভাগ / পৃষ্ঠা-২৮৭-৯০)। কুমুদনাথ মল্লিক (১৮৮০-১৯৩৮) কৃত 'নদীয়া কাহিনী'তে (২য় সং, পৃ-১৭৭) তাম্রশাসনটির প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৭ সাল / ৩৭ ভাগ / ৪র্থ সংখ্যা / পৃ-২১৬), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (৩য় সং, পৃ-৩৩৮, ৩৪৭), 'Inscriptions of Bengal, Vol-III, of Varendra Research Society, Rajsahi' এবং ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০)-কৃত 'চিন্ময় বঙ্গ' গ্রন্থেও তাম্রশাসনটির বিবরণ পাওয়া যায়। সেটির পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায়, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্র মাসের নবম দিবসে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় যজুর্বেদীয় কাম্বশাখাধ্যায়ী বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র রঘুদেব শর্মাকে প্রদান করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম সূত্রে জানা যায়, এই বহুমূল্য তাম্রশাসনটি বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে। আনুলিয়ায় প্রত্নবিজ্ঞান-নির্ভর উৎখনন হলে ইতিহাসের অনালোকিত অধ্যায় আলোকিত হতে পারে।

মুরারী গুপ্ত লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্' সূত্রে (৪র্থ প্রক্রম, ১০৮) জানা যায় যে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীচৈতন্যের নিমকাঠের বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূজার্চনা করতেন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত মল্লরাজ বীর হাম্বির (রাজত্বকাল ১৫৯১-১৬১৬ সাল) বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত রামচন্দ্রপুর (বর্তমানে প্রাচীন মায়াপুর নামে পরিচিত) এলাকায় ভক্তিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পর কালোপাথরের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত। প্রসঙ্গত স্মরণ্য, ধর্মপ্রাণ এই মল্লরাজ শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ শ্রীনিবাস আচার্য (১৫১৯- ?)-এর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর নির্দেশেই বীর হাম্বির নবদ্বীপে মহাপ্রভু মন্দির নির্মাণ করেন। কালক্রমে, প্রাকৃতিক কারণে (গঙ্গার বিধ্বংসী বন্যাপ্লাবনে, গতি পরিবর্তনে বা ভাঙনে) হাম্বির নির্মিত এই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯-৯৩) ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ও মুর্শিদাবাদের কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণবভক্তপ্রাণ। তিনি নবদ্বীপে হাম্বির নির্মিত বলে কথিত মন্দিরস্থলে কয়েকটি কালোপাথরের সন্ধান পান এবং সেখানেই লালপাথরের (Red sand stone) ৬০ ফুট উঁচু একটি নবরত্ন মন্দির ১৭৯১ সালে নির্মাণ করেন— 'মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা'র জন্য। বঙ্গীয় সরকার প্রকাশিত Territorial Aristocracy of Bengal (Chapter-VI, page-67) গ্রন্থে উল্লেখ আছে : 'Gangagobinda Singh built temples at Ramchandrapore......on the first Agrahayana, 1199 B.S.' কালের করালগ্রাসে প্রাকৃতিক কারণেই এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 'Calcutta Review' পত্রিকাতে (১৮৪৬ সাল, পৃষ্ঠা ৪২৩) প্রকাশিত সংবাদে আছে : Gangagovinda Singh Erected a temple over 60 ft. high which was washed away 25 years ago by the river. It was at Ramchandrapore....' শ্রীরামপুর খ্রিস্টীয় মিশনের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ সাল) সংবাদ : 'মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে।' 'History of Kandi and Paikpara Raj' গ্রন্থেও (পৃষ্ঠা ১৯-২০) আছে : 'Gangagovinda Singh built four splendid temples at Ramchandrapore.' অনুমিত হয় যে ১৮২০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের এই মন্দিররাজি অবলুপ্ত হয়—প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই। ১৮৭১ সালে গঙ্গার আবার গতি পরিবর্তন হয়। নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

(১৮৩৯-১৯২০) প্রমুখেরা ৮ শ্রাবণ ১৩২৪ সনে (১৯১৬ সালে) স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তাঁরাও 'গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন বৃহৎ শৃঙ্খলযুক্ত মন্দির' দেখেছেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ (পূর্বাশ্রমে যিনি ছিলেন একজন কৃতী ইনজিনিয়ার) নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর অঞ্চলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯১৭-৩০ সালে খোঁড়াখুঁড়ি করে লালপাথরের ভগ্নাংশসহ অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থ 'নবদ্বীপ দর্পণ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)-এ এই সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ করেছেন। ১৩২৮ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কাশিমবাজাররাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে সভাপতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী-সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সম্পাদক করে এ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতির পক্ষ থেকে পুস্তিকাদিও প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) ও প্রাজ্ঞ প্রত্নবিদ্ অধ্যাপক ড. সুধীররঞ্জন দাস প্রমুখও বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চল সরজমিন পরিদর্শন করে এই প্রত্নস্থলের প্রত্নসম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৭-৮৮ সালে নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর (প্রাচীন মায়াপুর) এলাকায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ পূর্বাঞ্চল চক্র (Archaeological Survey of India-Eastern Circle) প্রত্নসমীক্ষা অনুসন্ধানে ও পরীক্ষামূলক প্রাথমিক উৎখননে মসৃণ কালোপাথরের (Basalt Stone) তৈরি স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। পাথরের আকার (dimensions) নানারূপ— ৬২ x ৪৫ x ৪৫ x ৪ সেন্টিমিটার থেকে ২৮ x ২৪ x ৪ সেন্টিমিটার। গড় আকার ৬০ x ৫০ x ৪ সেন্টিমিটার। ওই এলাকার এক আবাসিকের বাড়িতে নলকূপ বসাতে গিয়ে এই পাথরের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে আয়তাকার কষ্টিপাথর (অখণ্ড আকারের, ভগ্ন, ভগ্নাংশ) উদ্ধার হয়েছে। অভিজ্ঞ প্রত্ন সমীক্ষকদের প্রাথমিক ধারণায় স্থাপত্য নিদর্শন ধর্মীয় বলে অনুমিত। এলাকাটি গাঙ্গেয় চর, অধুনা জনবসতি হয়েছে। সমতল ভূমি এলাকা— সুউচ্চ বা অনুচ্চ ভূমি বা ঢিপি নয়। প্রত্নস্থলের উপর গৃহস্থের বসতবাড়ি ও শাক-সবজি, ফল-ফলারির বাগান। গাঙ্গেয় উর্বর পলিমাটির ফসল-ফলনসম্ভব ভূমিতে এখন দেখা দিয়েছে উজ্জ্বল প্রত্ন-সম্ভাবনা। এই স্থাপত্য নিদর্শন নিঃসন্দেহে মানুষের তৈরি (Human made)। কষ্টিপাথর বিরাটাকার ঢালি-ইটের মতো আয়তাকারে কাটা হয়েছে, করা হয়েছে মসৃণ উজ্জ্বল। এই স্থাপত্য নিদর্শন নির্মাণে মানুষেরই ভূমিকা ছিল। এখন পর্যন্ত কোনও লেখ (Inscription) পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি অন্যান্য প্রত্নস্থলের মতো প্রত্নসামগ্রী—মানুষের তৈরি মানুষের ব্যবহৃত হাঁড়িকুড়ি মৃৎতৈজসপত্রাদি বা তার ভগ্নাংশ। অন্য কোনও পাথুরে প্রমাণও মেলেনি—যা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই স্থাপত্য বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুমন্দির। মল্লরাজদের বৈশিষ্ট্য হল যে মন্দির স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁরা অবশ্যই প্রস্তরের প্রতিষ্ঠাফলক সংস্থাপন করেছেন। এই মন্দির বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুমন্দির হলে আশা করা যায় যে প্রস্তর প্রতিষ্ঠাফলকের সন্ধান পাওয়া যাবে যদি সেটি বিনষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে। আবার, স্থাপত্য নিদর্শনের যৎসামান্যই উন্মোচিত হয়েছে—তা থেকে নির্দ্বিধভাবে বলা যায় না যে এটি মন্দির বা ধর্মীয় কেন্দ্র (Religious complex) আবাসিক স্থাপত্য (Residential Complex) বা রাজ স্থাপত্য (Capital Complex) বা রাজপ্রাসাদ স্থাপত্য (Palace Complex) হতে পারে না—এমন কথা নয়। তবে, এই স্থাপত্য-নিদর্শনের ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি স্বল্পস্থানে পরিধিতে, তাই রাজকেন্দ্র বা রাজপ্রাসাদ কেন্দ্র না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। বাংলায় কষ্টিপাথর চিরকালই দুর্লভ ও দুর্মূল্য। স্বল্প পরিসরে নির্মিত হলেও কষ্টিপাথরে নির্মিত এই স্থাপত্য নির্মাণে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল বলে সহজেই অনুমিত হয়। স্বল্প পরিসরে নির্মিত বলে এই স্থাপত্য নিদর্শন ধর্মীয় কেন্দ্র বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

অবিলম্বে এই প্রত্নস্থলের আধুনিক প্রত্ন ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে উৎখনন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট এলাকাটির সরকারি বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণার। তদুপরি, কষ্টিপাথরের এই প্রস্তরনিদর্শনগুলির প্রত্নমূল্য ছাড়াও প্রস্তরমূল্য আছে—উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ না হলে এগুলি বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও বর্তমান। এই প্রত্নস্থলের একমাত্র উৎখননের মাধ্যমেই ভূগর্ভে প্রোথিত স্থাপত্যের অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন হতে পারে। প্রত্নবিদ্‌রাও এই প্রত্নস্থল সমীক্ষার পর প্রত্নসম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। তাঁদের মতে এই স্থাপত্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই, তবে মানুষের ও ভক্তজনের বহুধাবিভক্ত নানা মত ও মনোভাবের ফলে ভাবাবেগ বর্তমান। কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞান কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার নয়, প্রত্নবিজ্ঞান উন্মোচন করে সত্যের, আলোকিত করে ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়। প্রত্নবিজ্ঞান কোনও অবস্থাতেই অনুমান-নির্ভর নয়। নবদ্বীপে রামচন্দ্রপুরের এই প্রত্নস্থলে উৎখনন সুসম্পন্ন হলে এই স্থাপত্য নিদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর বিচার-বিশ্লেষণে কালনিরূপিত হবে এবং এই স্থাপত্য বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু মন্দির কিনা— প্রমাণিত হবে, হয়ত বা অবসান হবে জনইতিহাসগত একটি বিতর্কিত সমস্যার। সমস্যা চিরকালই বহুজনের কাছে সমস্যা। আবার সমস্যা কারও কারও কাছে অনুকূল ও সুবিধাজনক। সমস্যা থাকলে যেমন বহুজনের নানা অসুবিধা হয়, আবার সুবিধাও হয় কারও কারও। তাই, কেউ কেউ সমস্যার সমাধান চান না স্ব-স্ব স্বার্থেই। ইতিহাস সমস্যাও তেমনই এক সমস্যা, এ সমস্যার সমাধান হয়ত সকলের কাম্য নয়—গ্রহণীয় নয়। তার জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের সমস্যা সমাধানেও গণচেতনা। জাগ্রত সংহত মানুষের ইতিহাস সমস্যা সমাধানে নবদ্বীপের প্রত্নস্থলটির উৎখননের দাবিও কোনও সরকার উপেক্ষা করতে পারবে না বলে আমাদের বিশ্বাস ও আশা। বীর হাম্বিরের মন্দির নির্মাণের প্রায় চার শতক এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির নির্মাণের দুই শতক আজ অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে প্রবহমান গঙ্গার গতিধারারও পরিবর্তন হয়েছে। মন্দির দুটির অবলুপ্তির জন্য দায়ী একমাত্র গঙ্গা, তেমনই গঙ্গাই মন্দির দুটির নির্মাণ থেকে অবলুপ্তিকালের একমাত্র নীরব সাক্ষী—আবার গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চরভূমিতে জেগে উঠেছে স্থাপত্যনিদর্শন—এই স্থাপত্যকীর্তি কি বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু

মন্দির ?—এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামীদিনের এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে।

কৃষ্ণনগরের অদূরে সুবর্ণবিহার প্রত্নস্থল। অনেকের মতে, এখানে পালরাজাদের আমলে বা তার পূর্বে কোনও বৌদ্ধবিহার ছিল, যেহেতু বিহার অর্থে বৌদ্ধমঠ বোঝায়। সম্রাট অশোকের কালে সুবর্ণদ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর সেখানকার অধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ এবং সুবর্ণবিহার একই স্থানে বলে অনুমিত। শতাধিক বৎসর পূর্বে ১২৯৮ সনে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ মহিমা'য় আছে : 'ইহা একটি ধ্বংসীভূত স্তূপ। এই স্তূপ প্রায় ২ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং উচ্চতায় প্রায় ১০ হাত হইবে। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তরময়। ইহার উত্তরদিকের ভূমি বহুদূর পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্তূপের মধ্যস্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। তাহার পরিমাণ প্রায় ৩ কাঠা হইবে ও গভীরতাও ৮/৯ হাত হইবে। এই গহ্বরের চারিদিকে উচ্চ জঙ্গলাবৃত ভূমি ইহাকে বাঁধের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। অতি বর্ষাতেও ইহার মধ্যে বৃষ্টিজল জমিয়া থাকে না—অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রোথিত আছে। তাহার অল্পাংশই মাটির উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার শিরোদেশ শিলকুটানোর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট।.... ইহাও প্রস্তর নির্মিত বিশাল পুরী....এখানকার স্তূপের উপর ইষ্টকময় ভিত্তি ও ভিত্তির উপর খিলানের পরিবর্তে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত ছিল।.....স্তূপের উত্তরাংশে লাফালাফি করিলে পূর্বে গুমগুম শব্দ পাওয়া যাইত—যেন তাহার তলদেশ ফাঁপা। কৃষকেরা ওই স্থান খনন করে ও উহার অভ্যন্তরে এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ দেখিতে পায়। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাহিরে আসে। কয়েকপাত্র চাউলও তাহার সঙ্গে ছিল। চাউলগুলির অবস্থা প্রস্তরভূত।' এই টিপির অবস্থা আজও পূর্ববৎ। এখানকার স্তূপের ইট ও পাথরে গঙ্গাবাস রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কাছাকাছি নানা স্থানে প্রস্তরখণ্ড আছে। মহেশগঞ্জ কুঠিবাড়ির ফুলবাগানে সুবর্ণবিহারে প্রাপ্ত পাথরের সুবিশাল আমলকাংশসহ নানা আকারের কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড আছে। এই টিপি সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত। সুবর্ণবিহার প্রত্নস্থলের উৎখনন প্রয়োজন।

রানাঘাট থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম। এখানে একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জনশ্রুতি, দেবপাল রাজার গড়। এই গড়কে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। এখানে নানা সময়ে প্রস্তর ধাতব নানা মূর্তি, শামাদান, কারুকার্যময় পাথর ও এনামেল করা ইট প্রভৃতি প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে। ১৮৯৬ সালে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে : 'Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly pre-Muhammadan ruins seen or heard of in the district'. কিন্তু বর্তমানে কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। গড়ের চারদিকে চারটি উঁচু টিপি এখনও আছে। শোনা যায়, শত্রু বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ লক্ষ করবার জন্যই নাকি এই নিরীক্ষণ কেন্দ্রগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই গড় বা দুর্গপ্রাকারের কাছাকাছি এলাকায় মোগল আমলের কাঁচের পাত্রাদিসহ ভগ্ন শিশিবোতলও পাওয়া গেছে। এই প্রত্নস্থলে উৎখনন প্রয়োজন।

থানায় অবস্থিত শালিগ্রাম। কিংবদন্তী, এখানে নাকি একদা শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল। এখানে কয়েকটি প্রাচীন উঁচু টিপি এবং দিঘি আছে। কয়েকটি টিপিতে লাল-কালো রঙের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছড়ানো আছে। গ্রামের একটি দিঘি ও এক নদীখাত থেকে পালযুগের কিছু বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। অদূরেই বড়গাছি গ্রাম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-৬০) লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'বড়গাছি' ও সেখানকার রাজা ভক্তবৈষ্ণব 'হরিহোড়'-এর উল্লেখ আছে। এখানেও টিপি আছে। শালিগ্রাম ও বড়গাছি দুটি গ্রামই প্রত্নসম্ভাবনাপূর্ণ প্রত্নস্থল, এখানেও উৎখনন প্রয়োজন।

মন্দির

নদিয়ায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে জাতির জীবনে সূচিত হয়েছিল নবজাগরণ। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিকশিত হয়েছিল নব উদ্দীপনায়। নবদ্বীপ তথা নদিয়াকে কেন্দ্র করে নববৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী অভ্যুদয়ের স্পর্শে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে দেখা দিল যুগোপযোগী পরিবর্তন। সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মন্দিরশিল্প এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য। নদিয়ার মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যশৈলীতে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তীকালে নির্মিত হলেও শুধুমাত্র দেবস্থান নয়, নদিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপাদান।

প্রত্নবিশেষজ্ঞেরা বাংলার নিজস্ব মন্দিরস্থাপত্যরীতিকে 'বাংলারীতি' নামে অভিহিত করেন, তাঁরা উত্তর ভারত বিশেষত ওড়িশা থেকে আহৃত, 'নাগর'-শৈলীর বিবর্তিত রূপ-অনুসারী 'দেউল'-রীতি ছাড়াও বাংলার নিজস্ব রীতিকে 'চালা', 'রত্ন' ও 'দালান' নামের প্রধান তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। চালা-মন্দির : এ শ্রেণীতে দোচালা (বা এক বাংলা), জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা সবই পড়ে। রত্নমন্দির : এ পর্যায়ের দেবালয়শীর্ষে এক বা একাধিক চূড়া নির্মিত হয়। দালানমন্দির : অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলির সামনের অংশে সাধারণত তিন বা ততোধিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথসহ অলিন্দ থাকে। নদিয়ায় এই তিন শ্রেণীর মন্দিরই দেখা যায়। দেউলরীতি নেই, আগেও ছিল কিনা জানা যায় না। নদিয়ায় চারচালা মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক। পাথরের তৈরি একটি মন্দিরও নেই, সবই চুন-সুরকির দেশজ গাঁথনি-মশলায় ইটের তৈরি। বাঙালির চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সবচেয়ে সরল রূপ দোচালার আদলেই বাংলার প্রথম পাকা মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। তার আগে বাঁশ-খড়-কাঠের তৈরি অনুরূপ দেবালয় হয়ত প্রচলিত ছিল। এ শৈলীর প্রধান লক্ষণ—চালার বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস, যা যাবতীয় চালা-স্থাপত্যের ইমারতেই অল্পাধিক লক্ষ করা যায়। সেকালে মানুষের আবাসগৃহ দালানকোঠা ছিল অতি সীমিত

সংখ্যক। সাধারণ মানুষের বসবাসের আবাসগৃহ ছিল এক চালা দোচালা চারচালা কুঁড়েঘর। সহজলভ্য স্বল্পমূল্যের উপাদানে তৈরি— বাঁশের খুঁটির উপর ছনের চাল—ধনুকাকৃতি চালের উপরিভাগে পুরু করে ছন দিয়ে ছাওয়া হত, চালের শীর্ষে দৃষ্টিনন্দন মটকার কাজ। জোড়বাংলো রীতিটি দোচালা বা একবাংলা-রীতিরই পরিবর্ধিত বা উন্নততর রূপ। ইমারতের অধিকতর স্থায়িত্বের জন্য দুটি দোচালাকে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করে তাদের শীর্ষে কখনও এক সংযোগকারী চূড়া নির্মাণ করা হত, কখনও বা হত না। চারচালারীতি চারটি চালের সমাহার। আটচালা-মন্দির চারচালারই পরিবর্ধিত রূপ। নীচের চারটি ঢালু চালের উপরে, অল্পাধিক উচ্চতার চারটি খাড়া দেওয়াল তুলে, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরের আর চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের চালা বিন্যস্ত করাই সেখানে রীতি। রত্নমন্দিরে চারদিকের ঢালু ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ছাদের কেন্দ্রে একটি চূড়া থাকলে তাকে বলা হয় একরত্ন, আর ছাদের চারকোণে যদি অতিরিক্ত চারটি চূড়া থাকে তবে তার নাম পঞ্চরত্ন। বস্তুত, 'রত্ন' কথাটি এখানে চূড়ারই সমার্থক। কিন্তু সব রত্ন একই আয়তনের নয়। কেন্দ্রীয় চূড়াটি সব সময়েই কোণের চূড়াগুলি থেকে অল্পাধিক বড় হয়ে থাকে। পঞ্চরত্ন-মন্দিরের মাঝের চূড়াটির জায়গায় এক দোতলা কুঠরি বানিয়ে, তার ছাদের চারকোণে আর চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে কেন্দ্রীয় চূড়াটি বসালে তৈরি হবে নবরত্ন মন্দির। এইভাবে তলের সংখ্যা বাড়িয়ে অথবা প্রতি কোণে চূড়ার সংখ্যা একাধিক করে নির্মিত হয় চূড়ার সংখ্যা অনুযায়ী রত্নমন্দির। দালান-মন্দির আর্য ও আর্যেতর ধর্মচিন্তা মিশ্রণের ফলশ্রুতি। বাঁকানো-কার্নিসবর্জিত, সমতল ছাদের এই মন্দিরগুলি অনেক বেশি সাদাসিধে বলে তাদের নির্মাণ-প্রকরণে যে উন্নত কারিগরির ব্যবহার হয়নি এমন নয়। এদের ফুলকাটা (পত্রাকৃতি) প্রবেশখিলানগুলি যে সব থামের উপর ন্যস্ত হত তাদের স্তম্ভগুচ্ছ বলাই সমীচীন। গোল ইটের চাকতি পরপর সাজিয়ে অনেকগুলি সরু থামের সমন্বয়ে সেগুলি তৈরি হত। এসব মন্দিরের খিলানশীর্ষ বা দেওয়াল অলঙ্করণের জন্য বহুক্ষেত্রে পঙ্খের সজ্জা ব্যবহৃত হয়েছে। নদিয়ায় বাংলারীতির স্থাপত্য-ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি সবই শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী ১৭-১৯ শতকে নির্মিত। ১৬০৬ সালে মোগল-অনুগ্রহে নদিয়া রাজবংশের তথা জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেন ভবানন্দ মজুমদার। মূলত নদিয়ারাজেরা ও অন্যান্য বিত্তবৈভবশালীরা এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠায় পোষকতা করেছেন। নদিয়ারাজদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাঘব রায় (রাজত্বকাল ১৬৩২-৮৩ সাল)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির আকার, গঠন ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সব মন্দিরগুলিই চারচালা, উচ্চতাও প্রায় এক এবং মোটামুটি একই ধরনের উন্নতমানের পোড়ামাটির ভাস্কর্য মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সুগভীর যোগাযোগ। মন্দির নির্মাণ তাঁদের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক। অপরূপ মন্দির নির্মাণ তাঁদের চিত্তবৈভবের দৃশ্যমান পরিচায়ক। প্রতিষ্ঠাফলকে নাম ও বংশমর্যাদাদির পরিচয় বহন করছে।

বর্তমানে নদিয়ায় দোচালা মন্দির একটিও নেই। তবে কালীগঞ্জ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র (গোহরিক্ষেত্রের বিবর্তিত রূপ) ও করিমপুর থানার দোগাছি গ্রামে দোচালা মন্দির ছিল, এখনও ভিত্তিভূমি-পাদপীঠাদি বর্তমান। দুটি মন্দিরই ১৮ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত এবং দুটিতেই পোড়ামাটির ভাস্কর্য ছিল, তার নমুনা পাওয়া যায়। প্রথমটি শ্যামরায় কৃষ্ণবিগ্রহের মন্দির ছিল, দ্বিতীয়টিতে ছিল দুর্গা ও বিষ্ণুর দুটি সেনযুগের প্রস্তরমূর্তি, এখন অবশ্য পাশেই দালানমন্দিরে আছে।

নদিয়ায় এখন মাত্র দুটি জোড়বাংলা বা জোড়া দোচালা মন্দির আছে। বীরনগরে ১৬৯৪ সালে রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফি বংশীধারী কৃষ্ণ-রাধিকার জন্য একটি এবং তেহট্টে ১৬৭৮ সালে রামদেব বা বামদেব কৃষ্ণরাজ নামের কৃষ্ণবিগ্রহের অপরটি নির্মাণ করেন। দুটিতে প্রতিষ্ঠা-প্রস্তরফলক আছে। দুটি মন্দিরই পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত।

চারচালা মন্দির নদিয়ায় অনেকগুলি আছে। চাকদহ থানার পালপাড়ার মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত, সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে, প্রহরারও ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠাফলক এখন না থাকায় সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। তবে, সতের শতকের কোনও এক সময় নির্মিত বলে অনুমিত হয়। মন্দিরটির ভিতরের ছাদ গম্বুজাকৃতি, কাজেই এটি মুসলিম-পরবর্তীকালের। 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থে এ দেবালয়টিকে ৫০০ বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করা হলেও মন্দিরবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক David G. McCutchin তাঁর 'Late Mediaeval Temples of Bengal' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩১) সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মন্দিরটি সতের শতকে নির্মিত। নদিয়ারাজ রাঘব রায় এই মন্দির নির্মাণ করতে পারেন। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে অপরূপ টেরাকোটায় রামায়ণের দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটিতে অর্থবহ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ত্রিশূল আছে। শিবশক্তির মিলনের বা যোনিতন্ত্রের প্রতীকরূপে অনুমিত এ ধরনের ত্রিশূল বিরল। নদিয়ারাজ রাঘব রায় মাটিয়ারিতে (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) একটি (১৬৬৫ সালে), শ্রীনগরে (চাকদহ থানা) দুটি (১৬৭১ ও ১৬৭৪), দোগাছিতে (কোতোয়ালি থানা) একটি (১৬৬৯ সালে), দিগ্‌নগরে (কোতোয়ালি থানা) দুটি (১৬৬৯ সালে), শান্তিপুরে (জলেশ্বর শিবমন্দির) একটি, কৃষ্ণনগর শহরে চৌধুরীপাড়ায় একটি, সেনপাড়া ও ঘাটেশ্বরে (দুটিই কোতোয়ালি থানা) দুটি চারচালা শিবমন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক ও অন্যান্য প্রামাণ্য নথিসূত্রে এই তথ্য জানা যায়। সবগুলি মন্দিরই পোড়ামাটির অপরূপ মূর্তি ও অলঙ্করণে সুসজ্জিত। মন্দিরগুলির প্রত্যেকটিতেই চারকোণে লহরার বিন্যাস করে গম্বুজাকৃতি ছাদ আছে। এছাড়া, উলা-বীরনগরে ১৬৬৯ সালে কাশীশ্বর মিত্র প্রতিষ্ঠিত একটি, মৃগীতে (তেহট্ট থানা) রানী ভবানী (১১২১-১২০০ সন) প্রতিষ্ঠিত (১৭৬৭ সালে) একটি, ভালুকায় (সিংহ পরিবার প্রতিষ্ঠিত) একটি, বহিরগাছিতে (কোতোয়ালি থানা) একটি ও আকন্দবেড়িয়ায় (কালীগঞ্জ থানা) একটি চারচালা মন্দির আছে। নদিয়ার প্রায় সবগুলি চারচালা মন্দিরেরই আকার, গঠন ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য-অলঙ্করণ মোটামুটি একই ধরনের। অনুমান, এই চারচালা মন্দিরগুলির নির্মাতা একই গোষ্ঠীভুক্ত স্থপতি শিল্পীরা।

নদিয়ায় আটচালা মন্দির আছে অনেকগুলি। তার মধ্যে প্রাচীনতম হল শান্তিপুর থানার বাঘআঁচড়ার চাঁদ রায় কর্তৃক ১৬৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। বর্তমানে মন্দিরটি বিধ্বস্ত, কিন্তু তার দীর্ঘ বঙ্গাক্ষরের পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিফলকটি অক্ষত অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে। এখানে নাকি আরও মন্দির ছিল। চাকদহের কামালপুরে একটি, শান্তিপুরে দুটি (গোকুলচাঁদ ও অদ্বৈতপ্রভুর মন্দির) ও বেলপুকুরে (কোতোয়ালি থানা) একটি আটচালা মন্দির পোড়ামাটির অসামান্য ভাস্কর্যমণ্ডিত। এছাড়া, মাঝেরগ্রামে পাশাপাশি দুটি (নাকাশিপাড়া থানা), দিগম্বরপুরে (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) একটি ও বড়জাগুলীতে (হরিণঘাটা থানা) একটি আটচালা মন্দির আছে। মন্দিরগুলি সবই প্রাক্-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত।

অষ্টাদশ শতকে নদিয়ার মন্দির ইতিহাসে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। নদিয়া তখন বঙ্গসংস্কৃতির অভিকেন্দ্র। বিদ্যা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী-পোষক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-৮২, রাজত্বকাল ১৭২৮-৮২) নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের গঠনরীতিতে গতানুগতিকতাবর্জিত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় মন্দিরস্থাপত্যরীতি' বলে চিহ্নিত করা চলে। আজকের দিনে কলকাতা কালচার যেমন সারা বাংলার কালচার, আঠার শতকে নদিয়ার কালচার ছিল সারা বাংলার কালচার। 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন সেকালের জ্ঞানীগুণীরা। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সহ অনেককে অজস্র ভূমিদান-বৃত্তিদান করেছেন। আবার তিনি রকমারি মন্দির নির্মাণ করেছেন—মসজিদাদি নির্মাণেও ভূমি ও অর্থদান করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র-প্রবর্তিত মন্দিরশৈলীর বৈশিষ্ট্য হল—বৃহত্তম আকার। চিরাচরিত বাংলারীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও সম্পূর্ণ নতুন আয়তন ও রূপ, পোড়ামাটির ভাস্কর্যের অনুপস্থিতি (তখনও কিন্তু এই শিল্প উন্নত ছিল), এবং খিলান-মিনার প্রভৃতির সংযোজনে সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্যরীতির এমন কি গথিক স্থাপত্যশৈলীর প্রতিফলন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পরবর্তীকালে এই রীতি অনুসৃত হয়নি—কারণ, অর্থাভাব, যুগপরিবর্তন ও কারিগরি দক্ষতার হ্রাস। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবনিবাসের পাঁচটি মন্দির তাই বাংলা মন্দিররীতিতে উল্লেখ্য সংযোজন। শিবনিবাসের সবচেয়ে উঁচু দেবালয়টি সাধারণের কাছে বুড়োশিবের মন্দির নামে পরিচিত। শিবের আনুষ্ঠানিক নাম—'রাজরাজেশ্বর'। এই দেবালয়টি বাংলার প্রচলিত মন্দিররীতির কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। অষ্টকোণ প্রস্থচ্ছেদের এই মন্দিরের শিখর ছত্রাকার। খাড়া দেওয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরনের আটটি সরু থাম। উত্তর ছাড়া সবদিকেই প্রবেশদ্বার, প্রবেশদ্বারের খিলান ও অবশিষ্ট দেওয়ালে একই আকৃতির ভরাট করা নকল খিলানগুলি গথিক-রীতি অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৪ সাল। পূর্বভারতের বৃহদায়তন কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ এখানে নিত্যপূজিত। পাশেই রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দির উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে স্থাপিত বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬২ সাল। পাশেই রামসীতার মন্দির—উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর চারচালা মন্দির। চালার প্রতিটি পিঠ ত্রিভুজাকার না হয়ে অনেকটা ঘণ্টার লম্বচ্ছেদের মতো বিরল আকৃতির। দালানের পাঁচটি প্রবেশখিলান ও গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশখিলান গথিকরীতি অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬২ সাল। অদূরে চারচালা শীতলা মন্দির—ছাদ গর্ভগৃহের কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। কিছু দূরে আর একটি বিরাটাকার চারচালা শিবমন্দির। প্রথম তিনটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠাফলক থাকলেও শেষ দুটিতে নেই। কোনও মন্দিরেই পোড়ামাটির ভাস্কর্য নেই।

শিবনিবাসের কৃষ্ণচন্দ্রীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেই সম্ভবত শান্তিপুরে ১৭২৬ সালে শ্যামচাঁদের ও কাঞ্চনপল্লীতে ১৭৮৬ সালে কৃষ্ণরাজের আটচালা মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই দুটি মন্দির বাংলার অন্যতম বৃহৎ আটচালা মন্দির। এই দুটি মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আবৃত অলিন্দে পাঁচ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বৃহদাকার স্তম্ভের উপর রক্ষিত। নদিয়ারাজ গিরিশচন্দ্র রায় (রাজত্বকাল ১৮০২-৪১ সাল) উনিশ শতকের সূচনায় কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালীর ও নবদ্বীপে ভবতারিণী কালীর দুটি সমতল ছাদ-দালানের উপর চারচালা শিখরযুক্ত ও পঙ্খ-অলঙ্কৃত চারচালা মন্দির নির্মাণ করেন। আনন্দময়ী কালীমূর্তি বিচিত্র ধরনের, শয়ান মহাকালের উপর আসীনা। উভয় মন্দিরস্থলেই স্বতন্ত্র মন্দিরে ভবতারণ ও আনন্দময় শিবলিঙ্গের অবস্থান। রানাঘাটে পালচৌধুরীদের ও শান্তিপুরে কাঁসারীপাড়ায় নির্মিত চারটি আটচালা মন্দির পোড়ামাটির শিল্পের অবক্ষয়ের কালে নির্মিত, ভাস্কর্য ও অলঙ্করণ উল্লেখ্য নয়।

নদিয়ায় রত্নমন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। রত্নমন্দির হল চূড়াযুক্ত মন্দির, দেখতে রথের মতো। উলা-বীরনগরের ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত জগত্তারিণী ও দীন দয়াময়ী রত্নমন্দির দুটি নয় সংখ্যক বা ততোধিক চূড়াযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল যথাক্রমে ১৮১৭ ও ১৮১৮ সাল। শান্তিপুর, রানাঘাট, নবদ্বীপ, আঁইশমালী, সোনাডাঙা ও শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ রত্নমন্দির—অধিকাংশ পঞ্চরত্ন বা পঞ্চচূড়াযুক্ত।

নদিয়ায় দালানমন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্করণ আছে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সুবিশাল ঠাকুরদালান অপরূপ নকাশি-পঙ্খ-অলঙ্কৃত। আড়ংঘাটায় নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৭২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত যুগলকিশোর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পঙ্খ-অলঙ্কৃত ও পাঁচটি ফুলকাটা খিলানের দুই সারিসংযুক্ত প্রশস্ত দালানমন্দির বিরলরীতির।

শ্রীচৈতন্যস্মৃতি বিজড়িত ফুলিয়ায় (কল্যাণী থানা) রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি দেউল শ্রেণীর—একটি সমতল ছাদ দালানের উপর খাঁজকাটা দেউলশিখর স্থাপিত।

নদিয়ায় দোলমঞ্চ অনেকগুলি আছে। শ্রীচৈতন্যস্মৃতিমণ্ডিত যশড়া, কাঞ্চনপল্লী, তেহট্ট, ফুলিয়া, উলা-বীরনগর, মুড়াগাছা ও সুন্দলপুরের দোলমঞ্চ উল্লেখ্য। ভাস্কর্য নেই, তবে স্থাপত্যের নিদর্শন।

একদা নদিয়ার বহু দক্ষ কারিগর মন্দির স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পে যুক্ত ছিলেন। বলিষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম রেখামণ্ডিত

প্রাণবন্ত পোড়ামাটির মূর্তি-ভাস্কর্য—অনুপম অসামান্য নিদর্শন। জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারও ব্যবহার হয়েছে অজস্র। নদিয়ার মন্দির-ভাস্কর্যের উপজীব্য হল কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামায়ণ-মহাভারত-পৌরাণিক চিত্র। এ ছাড়া, পশুপাখি-লতাপাতা আছে, আছে অনেকগুলি মিথুনভাস্কর্য। নানা ধরনের সামাজিক চিত্র অজস্র দেখা যায়। এই সব ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সেকালের সামাজিক দৃশ্যগুলি জনসামাজিক ইতিহাসের অসামান্য উপাদান। নির্মাতাশিল্পীরা মানুষের কাছেও সমাজের কাছে ও ইতিহাসের কাছে তাঁদের দায়বদ্ধতাও পালন করেছেন। বীরনগরে দুটি ও মাঝেরগ্রামে একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে নির্মাতাশিল্পীদের নামধাম পাওয়া যায়। নদিয়ার চালারীতির নানা মন্দিরের খিলান ও প্রবেশদ্বারের দুপাশের ক্ষুদ্র স্তম্ভ মুসলিম কারুকৃতি অনুসারী। মুসলমান আমলের স্থাপত্য-ভাস্কর্য থেকে পরবর্তীকালের হিন্দু মন্দিরগুলি যে প্রভাবিত হয়েছিল—এই সব কারুকৃতিই তাঁর প্রমাণ। তাই, নদিয়ার কয়েকটি মন্দির হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক এবং সাংস্কৃতিক মিলনমিশ্রণের সম্প্রীতির সেতু।

নদিয়ার মন্দিরে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাফলকই পাথরের, অল্প কয়েকটি পোড়ামাটির ইটে। অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃতলিপি—সারিগুলি সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত বা মন্দাক্রান্তা ছন্দ অনুসারী। বাংলাভাষায় বঙ্গাক্ষরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠালিপিতে বানান ভুলও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম-পরিচয়াদি জানা যায়। অন্যান্য নানা তথ্যও থাকে, যেমন, শিবনিবাসের 'রাজ্ঞীশ্বর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষী ছিলেন 'মূর্তের লক্ষ্মী স্বয়ং'। প্রতিষ্ঠাফলকগুলিতে প্রতিষ্ঠাকাল সংখ্যায় ও প্রচ্ছন্নভাবে শকাব্দে লিখিত।

নদিয়ার মন্দির আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের ও সংস্কৃতির নীরব সাক্ষী। সরকার ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি সংরক্ষণে সচেষ্ট। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির ও দিগ্‌নগরের রাঘবেশ্বর মন্দির সংস্কার করা হয়েছে পুরাকীর্তি সংরক্ষণে সরকারি আইনও প্রচলিত। সরকারি প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির উৎস দেশের জনগণ। নদিয়ার মন্দির সংরক্ষণে নদিয়াবাসীর গণচেতনা প্রয়োজন।

দারু-তক্ষণ শিল্প

উলা-বীরনগরে মিত্রমুস্তৌফি বাড়ির সিংহদ্বারের কাছে একদা দারু-তক্ষণ শিল্পকর্মের অসামান্য নিদর্শন কারুকার্যশোভিত ও খড়ে-ছাওয়া এক দোচালা-চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। দক্ষিণমুখী এই মণ্ডপের অন্য তিন দিকে, চাল অবধি উঁচু দেওয়ালের ভিতরের সমতলে, পদ্মের দেবদেবীর মূর্তি ও ফুলকারি নকশা এখনও দেখা যায়। কাঠের থাম ও কড়ি-বরগাগুলির গায়ে খোদিত শিল্পকর্মের তুলনা হুগলি জেলার আঁটপুর ও শ্রীপুর-বলাগড়ের অপেক্ষাকৃত অক্ষত ও বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপ দুটিতেও নেই। আদিতে চালের ভিতরের পৃষ্ঠে রঙিন বেতের সূক্ষ্ম ঝাল্লরী কারুকার্য এবং অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের আবরণ ছিল। ১৮৬৪ সালে আশ্বিন মাসের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে চালাটি বিধ্বস্ত হলে, টিনের চালা তৈরি করা হয়। কিছুকাল পূর্বে সেটিও নষ্ট হওয়ায়, কাঠের থাম ও কড়ি-বরগাগুলি এখন মুস্তৌফিবাড়িতে রক্ষিত আছে। কীটপতঙ্গের অত্যাচারে বহুদিন আগে থেকেই সেগুলি অতিশয় জীর্ণ। এই অপূর্ব পুরাকীর্তিটির সংরক্ষণের জন্য কিছুমাত্র সরকারি বা বেসরকারি প্রচেষ্টা কখনই নিয়োজিত হয়নি। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফি ১৬০৬ শকাব্দে (১৬৮৪ সালে) চণ্ডীমণ্ডপটি নির্মাণ করেন। মুস্তৌফিদের দুর্গাপূজা এখানেই সম্পন্ন হত। সে সময় নাকি বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হত। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও একদা এই চণ্ডীমণ্ডপের শোভা দর্শন করেছিলেন বলে শোনা যায়। ভিত্তিবেদীর উপরে স্থাপিত চণ্ডীমণ্ডপটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছিল ১০ x ৫ x ৬ মিটার। কাঠের থাম ও কড়িবরগাগুলিতে প্রচুর পদ্ম ও ফুলকারি নকশা ছাড়াও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি, সামাজিক দৃশ্য ও কিছু মিথুনভাস্কর্য খোদিত ছিল।

নদিয়ার কয়েকটি মন্দিরপ্রবেশদ্বার অলঙ্কৃত-কারুকার্যশোভিত। ধর্মদহে প্রাপ্ত কাঠের একটি মন্দিরদ্বার অসামান্য কারুকার্যমণ্ডিত। বিরহীর চণ্ডীমন্দির ও মদনগোপালের, শান্তিপুরে শ্যামচাঁদের ও কাঞ্চনপল্লীর কৃষ্ণরায়ের কাঠের মন্দিরদ্বার অলঙ্কৃত।

নদিয়ায় এক সময় দারু-তক্ষণ শিল্পমণ্ডিত রথ ছিল, তাতে দেবদেবীর নানা মূর্তি খোদিত ও চিত্রিত ছিল। পিতলের ধাতব রথগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে, অপহৃত হয়েছে।

মসজিদ

আরবী শব্দ, মসজিদের অর্থ হল মুসলমানদের উপাসনাগৃহ। নদিয়ায় কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ আছে। নদিয়ার মসজিদ নদিয়ার মুসলনমানদের ধর্মস্থান শুধুমাত্র নয়, নদিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনইতিহাসের অন্যতম উপাদানও। নদিয়ায় তথা বাংলায় সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কী সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের ১২০২ সালের নদিয়া অভিযান থেকেই মুসলমান-অধিকার সূচিত হয়। বাংলায় বহমান ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, সংযোজিত হল মুসলমান সংস্কৃতি। মসজিদ-স্থাপত্যের চারটি অংশ—খিলান, গম্বুজ, মিনার ও মেহ্‌রাব। খিলানের গঠনরীতি নানা রূপ। তিনকোনা, পাঁচকোনা, আটকোনা, বহুকোনা, সমকোনা, গোলাকার, অশ্বক্ষুরাকৃতি, ক্ষেপণীক্ষেত্রানুগ, সমতল, চ্যাপটা, অভিলম্বিত, সূক্ষ্মাগ্র, সূচিমুখী, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, অর্ধবৃত্তাকার, ভাঁজবিশিষ্ট, খড়খড়ি (ঝিলমিল) যুক্ত, পাদদণ্ডের উপর উন্নত, ডিম্বাকৃতি, কৃত্রিম কোনা, স্কন্ধগ্রন্থিযুক্ত প্রভৃতি ৩৪ রকমের মসজিদ খিলান আছে। গম্বুজ হল ছাদ। গম্বুজ গোলাকার ও সূক্ষ্মাগ্র সূচিমুখী হয়ে থাকে। মিনার হল মসজিদের পাশ থেকে এক বা একের অধিক ঘেরা অলিন্দসংযুক্ত উচ্চস্তম্ভ। মিনার থেকে আজান দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রার্থনা বা নমাজের জন্য সকলের উদ্দেশে আহ্বানমন্ত্র পাঠ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত নদিয়ার মসজিদগুলি গঠনরীতিতে এক ও অভিন্ন নয়। নদিয়ায় পাথরের তৈরি মসজিদ নেই, সব মসজিদই পোড়ামাটির ইটের তৈরি।

তেহট্ট থানার বেতাইর কাছে সাধুবাজারে পোড়ামাটির জ্যামিতিক-ফুলকারি নকশা ভাস্কর্যমণ্ডিত ও পদ্ম-অলঙ্কৃত মসজিদটি প্রাচীনতম। ১৭ শতকের সূচনায় নির্মিত। বর্তমানে পরিত্যক্ত। করিমপুর থানার কেচুয়াডাঙার মসজিদটি প্রাচীন, অপরূপ

গঠনস্থাপত্যমণ্ডিত, পদ্ম-অলঙ্কৃত, প্রতিষ্ঠাপ্রস্তরফলক আছে। চাপড়া থানার পীতাম্বরপুর গ্রামের মসজিদ পদ্ম-অলঙ্কৃত, নির্মাতাশিল্পীর নাম উৎকীর্ণ আছে। শান্তিপুর শহরে অবস্থিত তোপখানা মসজিদ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৎকালীন শান্তিপুরের ধর্মপরায়ণ ফৌজদার গাজী মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক নির্মিত। পূবমুখী এই ইমারতের সামনের দিকের ত্রি-খিলান প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে আরবি ও ফারসি হরফে পাশাপাশি নিবদ্ধ তিনটি প্রস্তরফলকে প্রতিষ্ঠালিপি অনুযায়ী নির্মাণকালে ১১১৫ হিজরী অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ সাল। ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত মসজিদটির একটি বড় গম্বুজ ও মোট আটটি ছোট-বড় মিনার আছে। আকবর বাদশাহের আমলে শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে এক সেনানিবাস স্থাপিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সৈয়দ মহ্‌বুব আলম (মতান্তরে, সৈয়দ হজরত শাহ্‌) বাগদাদ থেকে শান্তিপুরে আসেন। তিনিই স্থানীয় সৈয়দ (খোন্দকার) বংশের আদিপুরুষ। তিনি নাকি বাদশাহের গুরু ছিলেন এবং সমগ্র কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। স্থানীয় সেনানিবাসে তখন ১৩০০ পাঠান ও ৯০০ রাজপুত সৈন্য থাকত। তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য বাদশাহ্‌ সৈয়দ আলমকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। তাঁরই আদেশে, সেনানিবাসের ফৌজদার ইয়ার খাঁ এই মসজিদ নির্মাণ করেন। সে সময়ে সুবে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিম-উস্‌-শান্‌। মসজিদটির কাছে ইয়ার খাঁ ও তাঁর পুত্রের সমাধি আছে। দানবীর শরিবৎ সাহেব (জন্ম ১৭৫৮ সাল) সামান্য অবস্থা থেকে বিত্তশালী হয়ে শান্তিপুরের নতুন হাট এলাকায় দশবিঘা জমির উপর ১৭৯৬ সালে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে এক মসজিদ ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠা-প্রস্তরফলক আছে। বহুবার সংস্কার করা হয়েছে। মোটামুটি সাবেক গঠনস্থাপত্য বর্তমান। শান্তিপুরের ডাকঘর পাড়ার মসজিদটি প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এবং তৎপার্শ্বে ফকির তোপ্‌সে মিএগর সমাধি আছে।

কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারি-বানপুরে হজরত সাউ মুলকে গোজ (গাউস) বা 'বুড়ো সাহেবের' একটি দরগা আছে। নদিয়ায় মুসলমানদের দরগাগুলির মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই মানত করেন। দরগার লোকায়ত নাম—মল্লিক গস্‌-এর দরগা। 'মল্লিক গস্‌' উপাধিবিশেষ। 'মলি-অল-গস্‌' শব্দ থেকে রূপান্তর হয়েছে বলে অনুমিত হত। 'মলি-অল' অর্থে বাদশা এবং 'গস' অর্থে ফকির বোঝায়। দুই মিলে—ফকিরের বাদশা। সতের দশকের সূচনায় এই দরগা নির্মিত। দরগার থাম পাথরের। খিলান পত্রাকৃতি। দরগার ভিতরে পীরের সমাধি—সমাধির শিরোভাগে প্রস্তরে ফারসি লিপি সংযুক্ত, তবে লিপি অস্পষ্ট হয়ে গেছে, পাঠোদ্ধার করা যায় না। এখানে অম্বুবাচী তিথিতে মেলা বসে।

শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুরে একটি প্রাচীন মসজিদ প্রস্তর প্রতিষ্ঠাফলক আছে। ফারসি লিপি উৎকীর্ণ। এখন পরিত্যক্ত।

নবদ্বীপ থানার ট্যাংরার, কালীগঞ্জ থানার বড় চাঁদ ঘরের ও বামনপুকুরে একটি করে প্রাচীন মসজিদ আছে। কৃষ্ণনগরের কয়েকটি মসজিদও প্রাচীন। কৃষ্ণনগরের রথতলার মসজিদ চত্বরে ফারসি লিপি উৎকীর্ণ বিশাল পাথর আছে, পাথরের কিছু অংশে হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়।

চাকদহ থানার শ্রীনগর গ্রামে গাজীতলায় গাজীর সমাধির পাশে রক্ষিত আছে একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি। আয়তনে (৬১ সেমি x ৩০.৫ সেমি), সেটির অলঙ্কৃত পাদপীঠে সাপের মাথায় পদ্ম, তার উপরে মূর্তির একটি পদ স্থাপিত। পাশে গরুড়। পিছনের পিঠে আরবি হরফে তিন লাইনের একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। হরফের আকার বেশ বড়। এটি প্রকাণ্ড কোনও বিষ্ণুমূর্তির নীচের অংশ হওয়া সম্ভব। গুরুদাস সরকারের মতেও ('শ্রীনগর' প্রবন্ধ, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ত্রয়োবিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৩ সন) এটি বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠ এবং তিনি অনুমান করেন, এটি একদা কোনও মসজিদ সংলগ্ন ছিল। মূর্তিটি কীভাবে এখানে এসেছে তা জানা যায় না। কাছাকাছি কোথাও কোনও মসজিদও নেই। গুরুদাস সরকার আরবি লিপির পাঠোদ্ধার করে লিখেছেন, সেটি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। লিপিটির তিনি বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন : "পরম শক্তিমান ভগবান কহিয়াছেন, মসজিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না। ....আমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক....বলিয়াছেন...আবুল মুজাফর হোসেন শাহ্‌, ভগবান তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্য ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।"

চাকদহ থানার পালপাড়ার কাজীপাড়ায় অবস্থিত কাজীবাড়ি প্রাচীন। এই এলাকার পুরাতন নাম পাজনৌর বা পাঁচনূর। আকবরের আমলে পাজনৌর নামে পরগনার সূচনা হয়। হজরত শাহ্‌ আদম শহিদ কাজীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মাজার (সমাধি) স্কুলের পাশের মসজিদটি প্রাচীন। কাজীবংশের মুন্সী এতেমুদ্দিন মহম্মদ মরহুমের সময়ে নির্মিত বিশাল ইমারত এখন ধ্বংসপ্রায়, এই ইমারতের মধ্যে তাঁদের পারিবারিক উপাসনালয় ছিল। নবদ্বীপ থানার বামনপুকুর বাজারের কাছে চাঁদ কাজীর সমাধি। শ্রীচৈতন্যজীবনী গ্রন্থে চাঁদ কাজীর নাম পাওয়া যায়। পরে তিনি হন চৈতন্যগতপ্রাণ। জনশ্রুতি, এই সমাধি পাঁচশো বছরের প্রাচীন।

গির্জা

কৃষ্ণনগর শহরে প্রোটেস্টান্ট গির্জার নির্মাণ ১৮৪০ সালে শুরু হয়ে ১৮৪৩ সালে শেষ হয়। গির্জার নকশা তৈরি করেন ক্যাপ্টেন স্মিথ। ইংরেজ শিল্পীপর্যটক কোলেসওয়ারদি গ্রান্ট (১৮১৩-৮০) লিখিত 'Rural Life in Bengal' গ্রন্থে (১৮৬০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত) তাঁর অঙ্কিত কৃষ্ণনগরের 'প্রোটেস্টান্ট চার্চ ১৮৪০' (চার্চ মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত) চিত্র আছে। এই গির্জা-ইমারত বহুবার সংস্কার ও সম্প্রসারিত হয়েছে। চাপড়ার প্রোটেস্টান্ট গির্জাও প্রাচীন।

১৮৫৭ সালে ফাদার লুইগি লিমানা কৃষ্ণনগরে আসেন ধর্মপ্রচারে এবং তিনি তখন কৃষ্ণনগরে যে বাড়িতে থাকতেন সেটিই পরে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পরিণত হয়। ১৮৯৮ সালে বর্তমান রোমান ক্যাথিড্রাল গির্জা নির্মিত হয়। এই গির্জাও বহুবার সংস্কার

ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে এই গির্জা শুধুমাত্র পুরাসম্পদ নয়, সৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যনিদর্শন।

ব্রাহ্মসমাজমন্দির

কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির অদূরে আমিনবাজারে ১৭৬৯ শকে অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে নদিয়ারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় (রাজত্বকাল ১৮৪১-৫৬ সাল)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ সাল)-এর এক হাজার টাকা আর্থিকদানে ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মিত হয়। দালানমন্দির। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারক ছিলেন ইন্দোরনিবাসী লালা হাজারীলাল।

শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজের দালানমন্দির নির্মিত হয় ১৩০৪ সনে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯) ও অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১-৮১) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। চাকদহ পালপাড়া নিবাসী ও ব্রাহ্মসমাজের আদি আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫)-এর শিক্ষাগুরু ছিলেন শান্তিপুর প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাধামোহন বাচস্পতি (জ-১৭৩০-৪০, মৃ-১৮২৩-৩০)।

ইমারত

নদিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারি গ্রামে প্রথম রাজধানী স্থাপন করে রাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করেন। নদিয়ারাজ রাঘব রায় চাকদহ থানায় শ্রীনগর নামে নগর পত্তন করে রাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামাকালে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনিবাসে 'কাশীতুল্য' জনপদ পত্তন করেন, রাজপ্রসাদ-সহ নানা সুরম্য ইমারত ও হস্তীশাল-অশ্বশালাদি নির্মাণ করেন। ১৮২৪ সালের ১৮ জুন, কলকাতার বিশপ হেবার, জলপথে ঢাকা যাবার পথে শিবনিবাসের মন্দির ও রাজপ্রাসাদাদি দেখে মুগ্ধ হন। ১৮২৮ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় ('Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vol.-I, 1824-1825' by the Right Rev. Reginald Hebber, Lord Bishop of Calcutta, Published by John Murray, London) তিনি শিবনিবাসের হিন্দু মন্দিরগুলিকে সুরম্য ও অতি উত্তম স্থাপত্যের নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের নির্মাণে 'গথিক' খিলানের ব্যবহার তাঁকে বিস্মিত করে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদটি তখন জীর্ণ ও জঙ্গলাবৃত হলেও, তিনি 'গথিক'-রীতির সুউচ্চ প্রবেশদ্বারটিকে 'ক্রেমলিন'-এর প্রধান তোরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং অকপটে স্বীকার করেছেন যে, সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদের মনোরম নির্মাণশৈলী তাঁকে 'কনওয়ে কাস্‌ল' ও 'বোলটন অ্যাবি'-র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। বিশপ হেবারের মতো বিদগ্ধ পর্যটকের এহেন উচ্চ সুখ্যাতি এবং ইউরোপীয় স্থাপত্যের সঙ্গে শিবনিবাসের মন্দির ও হর্ম্যাদির সপ্রশংস তুলনা বিশেষ অভিনিবেশের দাবি রাখে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শেষ বয়সে কৃষ্ণনগর শহরের অদূরে আমঘাটায় সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস করেন। প্রাসাদের পাশে তখন প্রবাহিত ছিল জলঙ্গীর শাখানদী অলকানন্দা, অদূরেই ছিল গঙ্গা নদী। সে কারণে কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রাসাদ ও গ্রামের নাম রাখেন গঙ্গাবাস এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখানে ১৬৯৮ শকে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে প্রাসাদাদি নির্মাণকালে কৃষ্ণচন্দ্র হরিহরমন্দির ও হরিহরের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠনরীতি অভিনব—সমতল ছাদ এক দালানের উপর দুটি ছুঁচালো শীর্ষ গম্বুজ স্থাপিত। হরিহরের যুগলমূর্তি অনুসারে এই যুগলশিখর। মন্দিরে মসজিদ স্থাপত্যরীতির সংযোজন-সংমিশ্রণ। রাজপ্রাসাদও নাকি সুরম্য ছিল। মাটিয়ারি, শ্রীনগর, শিবনিবাস ও গঙ্গাবাসের রাজপ্রাসাদ-সহ কোনও প্রাচীন ইমারত আজ আর নেই, ধ্বংসে হয়ে গেছে। কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থাপনের পর নদিয়ারাজ রুদ্র রায় (রাজত্বকাল ১৬৮৩-৯৪ সাল) কৃষ্ণনগরের নদিয়া রাজপ্রাসাদ, চক ও নহবতখানা, মুসলিম স্থাপত্যানুগ চারমিনার বিশিষ্ট তোরণাদি নির্মাণ করেন। বিষ্ণুমহল ও পদ্ম-অলঙ্কৃত পূজামণ্ডপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নির্মিত হয়। অবশ্য, পরবর্তী বিভিন্ন নদিয়ারাজদের সময়ে রাজবাড়ির সংস্কার ও নবীকরণ হয়। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত কৃষ্ণনগর কলেজের সুরম্য ইমারত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত। কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা-বীরনগর ও মুড়াগাছায় উনিশ শতকে নির্মিত ইমারত আছে। উজ্জ্বল অতীত বৈভবের নীরব সাক্ষ্য এই সব ইমারতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়—"Architecture is a frozen music' এবং 'Architecture....is still a living Art."

মুদ্রা

বাংলার প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ে গবেষণান্তে Dr. Rajib Kanti Sarmadhikari 'Indian Museum Bulletin' (Vol.-XIX, 1984) পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে ('Some observations on the coins of early Bengal', Pages 38-47) নদিয়ার রানাঘাট থানার দেবগ্রামে প্রাপ্ত 'punch-marked copper coin'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া, তিনি কৃষ্ণনগরে রক্ষিত কুষাণ-সম্রাট হুবিষ্ক-এর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাকার স্বর্ণমুদ্রার বিষয়ে লিখেছেন : 'On an examination it is found that the issuer of the coin-type is the Kusana ruler Huviska. But one cannot make out clearly what the legend stands for. The Greek script on both the obverse and reverse is written in an extremely careless manner. The earlier part of the obverse marginal legend is to be read clokwise from left to right. But the later part of the legend should be read from outside the border of the coin from left to right. Similarly, the reverse legend erroneously represents Osheo (Opho) instead of the normal (Ohpo).

Indian Museum প্রকাশিত 'Catalogue of Coins in the Indian Museum'—Vol.-II, Pt. II, P-146, No. 61 গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে মুগীসুদ্দিন ইউজবক নদিয়া ও তৎসন্নিহিত গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চল বিজয়ের স্মারক রূপে ১২৫৫ সালে নদিয়ার ভূমিরাজস্ব থেকে প্রস্তুত এক বিশেষ শ্রেণীর রজতমুদ্রার প্রচলন করেন এবং এই মুদ্রাটি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে মুদ্রাবিভাগে সংরক্ষিত আছে।

এই মুদ্রার প্রকাশকাল ৬৫৩ হিজরা অর্থাৎ ১২৫৫ সাল। ওজন ১৬৮ গ্রেন, গোলাকৃতি। এক পিঠে আছে চক্রের (গোল দাগের) মধ্যে একটি বর্গক্ষেত্র (জোড়া দাগের), অংশমধ্যে আরবি হরফে লিপি। অপর পিঠও প্রায় অনুরূপ, তবে কিনারা (margin) আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'History of Bengal' (Vol-II), ডঃ আবদুল করিম লিখিত 'বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)' ও 'Corpus of the Muslim Coins of Bengal' এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব' অনুযায়ী জানা যায়:. ইখতিয়ারুদ্দিন ইউজবক তুগরল খান সুলতান হবার পর নাম গ্রহণ করেন—মুগীসুদ্দিন ইউজবক শাহ্, তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১২৫১-৫৭ সাল। মুগীসুদ্দিনের সাহস, বীরত্ব ও সমরকুশলতার তুলনা হয় না। মুগীসুদ্দিন নদিয়া পুনরধিকার করে সগর্বে মুদ্রা প্রকাশ করে তাতে লিখেছেন যে এগুলি নদিয়ার ভূমিরাজস্ব থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত মুগীসুদ্দিনের তিন রকম মুদ্রা পাওয়া গেছে (Journal of the Numismatic Society of India, 1983, p-180): (১) দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে উৎকীর্ণ ৬৫১ বা ৬৫২ হিজরার মুদ্রা। এতে ইউজবকের উপাধি 'ফি নৌ বৎ অল আবদ্ ইউজবক অস্-সুলতানী'। এখানে ইউজবক নিজেকে সুলতানের দাস বলেছেন। (২) নদিয়া টাঁকশাল থেকে উৎকীর্ণ ৬৫২ হিজরার মুদ্রা —ইউজবক এতে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলেছেন। (৩) লখনৌতি টাঁকশাল থেকে উৎকীর্ণ উমর্দন ও নদিয়ার রাজস্ব থেকে প্রস্তুত ৬৫৩ হিজরার মুদ্রা। এতেও ইউজবক নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের পূর্বতন রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার শীতলমঠ গ্রামে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তাতেও স্বাধীন সুলতান হিসাবে মুগীসুদ্দিন ইউজবকের নাম উৎকীর্ণ আছে। নদিয়ার ইতিহাসে নদিয়ায় মুসলমান শাসনাধিকারের সূচনা পর্বে মুগীসুদ্দিন ইউজবকের তিনটি মুদ্রা ও শিলালিপিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও পুরাবস্তু।

মোগল ও তৎপরবর্তী আমলের বহু মুদ্রা (স্বর্ণ, রজত ও তাম্র) নদিয়ায় অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে, এগুলিও উল্লেখ্য পুরাবস্তু। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শেরশাহের একটি রজত মুদ্রা। বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে কলিমা উৎকীর্ণ করা এবং চারধারে 'আবুবকর অল্ সিদ্দিক, উমর অল ফারুক, উসমান অল্ আফান অল্ আলি অল্ মুরতাজি'। বিপরীত দিক: চৌকো ক্ষেত্রের মধ্যে উৎকীর্ণ করা 'শের শাহ সুলতান ৯৪৭ খালদ্ আল্লা মুলকা'। নীচে দেবনাগরী হরফে 'শ্রী শের শাহী' উৎকীর্ণ করা। চারদিকে উৎকীর্ণ লিপি—'ফরিদ অল্ দুনিয়া ওয়া অল্দীন আবু অল্ মুজাফফর জার্ব জহাঁপনা।' মুদ্রাটি চাপড়া থানার ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত।

পুঁথি ও পাটা

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া, কামালপুর, মাটিকোমড়া ও শিমহাট প্রভৃতি স্থানে ছিল সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা কেন্দ্র, গড়ে উঠেছিল বিদ্যাসমাজ, নানা কালে রচিত হয়েছিল সংস্কৃত হরফে সংস্কৃত পুঁথি, বাংলা হরফে সংস্কৃত পুঁথি এবং বাংলা হরফে বাংলা পুঁথি। অনেক পুঁথি ছিল চিত্রিত-অলঙ্কৃত। আবার পুঁথির পাটাও (কাঠাবরণ) ছিল দেশজ রঙে নানা দেবদেবীর মূর্তি-সহ জ্যামিতিক-ফুলকারি নকশায় চিত্রিত। এগুলি উল্লেখ্য পুরাবস্তু। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে, শান্তিপুর পুরাণ পরিষদে, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদে এবং নানা স্থানে নব্যন্যায়ের পণ্ডিতদের বংশধরদের কাছে প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন পুঁথি ও পুঁথির চিত্রিত কাঠাবরণ (পাটা) আছে। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত সহস্রাধিক পুঁথির ও পাটার বিবরণাত্মক সূচির মুদ্রিত তালিকা আছে। এই পুঁথি ও পাটা দর্শনীয় পুরাবস্তু।

চিত্রকলা

নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে কৃষ্ণনগর তথা নদিয়ায় রাজপোষকতায় চিত্রকলা চর্চা ব্যাপকভাবে সূচিত হয়। তৎপূর্বে নদিয়ায় চিত্রকলা চর্চা হত, তবে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথমে চিত্রকরেরা, দেশজ জলরঙেই পট বা চিত্র তৈরি করতেন, পরে শুরু হয় তেলরঙের চিত্র। Directorate of Archaeology, Govt. of West Bengal প্রকাশিত Dr. Pratip Kumar Mitra লিখিত 'Treasures of the State Archaeological Museum West Bengal-Vol.-3: PAINTINGS' গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের চিত্রকলার বিবরণ আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে রক্ষিত কৃষ্ণনগরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাসম্পদ চিত্রকলা:

Museum No. 08.48
Durga Mahisamardini. Accompanied by Laksmi, Saraswati, Kartikeya and Ganesha. Chalchitra Brilliantly illustrated with mythological scenes. Krishnagore (Bengal), Water colour on paper. 51.1 cm x 38.5 cm. First half on Nineteenth century.

Museum No. 08.118
Manabhanjana (of Radha). Krishnagore (Bengal). Water colour on paper, with gold and silver details. 38.3 cm x 51 cm. First half of the Nineteenth century.

Museum No. 08.114
Sita Parinaya. Krishnagore (Bengal). Water colour on paper with gold and silver details. 38 cm x 50.4 cm. First half of Nineteenth century.

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নদিয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায়ের আমলে (১৮০২-৪১) তৈরি তেলরঙের কালী মূর্তির একটি অসামান্য চিত্র আছে। এ ছাড়া, বিষ্ণুমহলের দেওয়ালে টাঙানো আছে গত শতকের নদিয়ারাজদের বিশালাকার তৈলচিত্র। আনুলিয়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবারে আছে গত শতকের সূচনায় তৈরি জলরঙের কালী মূর্তির চিত্র।

কৃষক আন্দোলনে নদিয়া জেলা

অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার যত দূর জানা আছে, তাতে বলা যায়, নদিয়া জেলা কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন দীর্ঘদিনের। বেশি পুরনো দিনের কথার মধ্যে না গিয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে সমগ্র বাংলা এবং বিহারে নীলচাষীদের বিদ্রোহ হয়েছিল—নীল বিদ্রোহের কথা এখানে বলা যায়। সেই অগ্নিদিনে নদিয়া জেলার কৃষকদের এক ব্যাপক অংশ এই সংগ্রামের শরিক ছিল। নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার চৌগাছা গ্রামে বিদ্রোহী কৃষকদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামের কাহিনী—দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এ লিপিবদ্ধ আছে। এই কাহিনী দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেছেন কৃষ্ণনগর শহরে বসে। তখনকার দিনের সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিশেষ করে সুখ্যাত সাংবাদিক হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ বাংলাদেশের কৃষকদের বিদ্রোহের কাহিনীর মধ্যে ২৪ পরগনা ও যশোহরের কৃষক সংগ্রামের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। নদিয়া জেলার বাঁশবেড়িয়া, কাপাসডাঙা, ভেড়ামারা ও শিকারপুর নীল কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষুব্ধ কৃষকসমাজ কুঠিয়াল সাহেব ও তাদের জো-হুকুম নায়েব-গোমস্তাদের বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যে, তখনকার (১৮৫৪ সাল) নদিয়ার জেলা জজ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের

কাছে অনুরোধ করেন যে, কৃষকদের অভিযোগের তদন্ত করে তার প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হোক। গভর্নমেন্টে সে অনুরোধে কান দেয়নি। কিন্তু সংগ্রাম ও ঐক্যের পতাকা তুলে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান কৃষক জনগণের সংগ্রাম সাফল্যলাভ করেছিল। নীল বিদ্রোহের অনেক পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশের কোনও কোনও জেলা ও অঞ্চলে আবাদিজমিতে কৃষকদের অধিকার ও স্বত্ব দাবিতে আন্দোলন জেগে ওঠে। নদিয়া জেলাতেও ,তার ঢেউ আসে। সামন্ত প্রথার যেমন নায়েব, গোমস্তা মুহুরীর, জমির খাজনা হার কষার—হিসাবানা হার, পার্বণি, নজরানা আদায় বন্ধ এবং উঠবন্দি প্রথা রদ, উঠবন্দি চাষীদের দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজাস্বত্ব স্বীকৃতি, ভাগচাষের ন্যায্য হার, হিস্যা প্রভৃতি দাবি নিয়ে আন্দোলন ক্রমশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নদিয়া জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনকে জোটবদ্ধ করা ও সংগঠিত রূপ দেবার লক্ষ্য নিয়ে ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে নদিয়া জেলার চুয়াডাঙা মহকুমার কাপাসডাঙা গ্রামে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যাঁরা এই সম্মেলন সংগঠনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাঁদের সঠিক পরিচয় আমার জানা নেই। তবে পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে আমি নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে—

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ক্যাথলিক গির্জার পাদ্রী ফাদার বারেতো। ফাদার বারেতো ছিলেন ইতালির কোনও গ্রামের এক গরিব কৃষক সন্তান। তাঁর পিতা ইতালিতে গির্জার জমিদারির বিরুদ্ধে আন্দোলনে একসময় অংশীদার ছিলেন। ফাদার বারেতো পাদ্রী হয়ে ভারতে আসার পর গরিব কৃষকদের দাবি ও আন্দোলনের পক্ষে যোগ দেন। কাপাসডাঙা গ্রামের শ্রীহর্ষ বিশ্বাস, পেশায় শিক্ষক, ধর্মবিশ্বাসে খ্রিস্টান ছিলেন। তাঁর কাছে আমি এই তথ্য জানতে পারি। শ্রীহর্ষ বিশ্বাস পরবর্তীকালে নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির একজন জনপ্রিয় সংগঠক হন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সারা ভারত কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত কমরেড মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল বলেছেন : 'এই শতকে বাংলাদেশের মধ্যে নদিয়া জেলার এই কৃষক সম্মেলনই ছিল সম্ভবত প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন।'

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' পুস্তকে উল্লেখ আছে—১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর দি লেবর স্বরাজ পার্টি অফ্ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। প্রধান উদ্যোগকারীদের ভিতরে চারজন বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নাম—(১) কুতুবুদ্দীন আহমদ, (২) হেমন্তকুমার সরকার, (৩) কাজী নজরুল ইসলাম, (৪) শ্যামসুদ্দীন শুসয়ন (কমরেড আবদুল হালিমের দাদা)।

১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর লেবর স্বরাজ পার্টির (শ্রমিক, প্রজা স্বরাজ দলের) মুখপত্ররূপে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। তার নাম ছিল 'লাঙল'। এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক নজরুল ইসলাম, সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (মণিভূষণ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বাঙালি পল্টনের সৈনিক সঙ্গী)। পরে আবার 'লাঙল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' করা হয় এবং সম্পাদক হন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ নিজে। পরে আবার 'গণবাণী' যুগ্ম-সম্পাদক হন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও কমরেড কালীকুমার সেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর উল্লিখিত পুস্তকে লিখেছেন—'অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পরে হেমন্তকুমার সরকার কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। লেবর স্বরাজ পার্টির গঠনপ্রণালী প্রোগ্রাম ও পলিসি ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বরই কাজী নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়।' 'গণবাণী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে ছাপা হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের 'আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি' পুস্তকের ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠার লেখা থেকে উল্লেখ।

এই সময়কালেই ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হেমন্তকুমার সরকার নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন ডাকেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে। এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯২৫ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়া শহরে। সম্মেলনের আলোচ্যসূচি ছিল—(১) কৃষকশ্রমিক দল গঠন, (২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও (৩) কাউন্সিল গঠন। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন শামসুদ্দীন আহমদ, কুষ্টিয়া মহকুমার অধিবাসী ও কৃষ্ণনগর জজ আদালতের এক সুখ্যাত আইনজীবী এবং সেক্রেটারি হন হেমন্তকুমার সরকার। সম্মেলন হয় ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি ময়দানে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রজা, রায়ত ও কৃষক আন্দোলনের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও বাংলা সাহিত্যের সুখ্যাত ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অ্যাডভোকেট অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সম্মেলনে যোগ দেন।

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতি ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনে স্থির হয় দি লেবর স্বরাজ পার্টির নাম বদলে পার্টির নাম হবে দি বেঙ্গল পেজান্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি— 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। শেষ পর্যন্ত পার্টির নাম দাঁড়ায় দি পেজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল।

কৃষ্ণনগর সম্মেলনে পার্টির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন কুতুবুদ্দীন আহমদ ও হেমন্তকুমার সরকার। অফিস ছিল কলকাতায় হ্যারিসন রোডের এক ভাড়াবাড়িতে। কমরেড মুজাফ্‌ফর লিখেছেন যুগ্ম সম্পাদক থাকা সত্ত্বেও তাঁকেই কার্যত সম্পাদকের কাজ করতে হত। পার্টির পতাকা ছিল কাস্তে হাতুড়ি খচিত লাল পতাকা।

এই সমস্ত তথ্য এই লেখায় উপস্থিত করা হয়েছে এই কারণে যে, প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগেও নদিয়া জেলা কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল। বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' বই থেকে নেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৩৮—৩৪০)।

১৯২০ সাল থেকেই নদিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন চলতে থাকে। কুষ্টিয়া মহকুমার পোড়াদহ ও ভেড়ামারা, খোকসা অঞ্চলে, দামুরহুদা থানার কাপাসডাঙা অঞ্চলে, চাকদহ থানার কোনও কোনও এলাকায় উঠবন্দী প্রথা বিলোপ ও জমিতে উঠবন্দী প্রজার রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব কায়েম করার দাবিতে যে আঞ্চলিক আন্দোলন হয়, তার
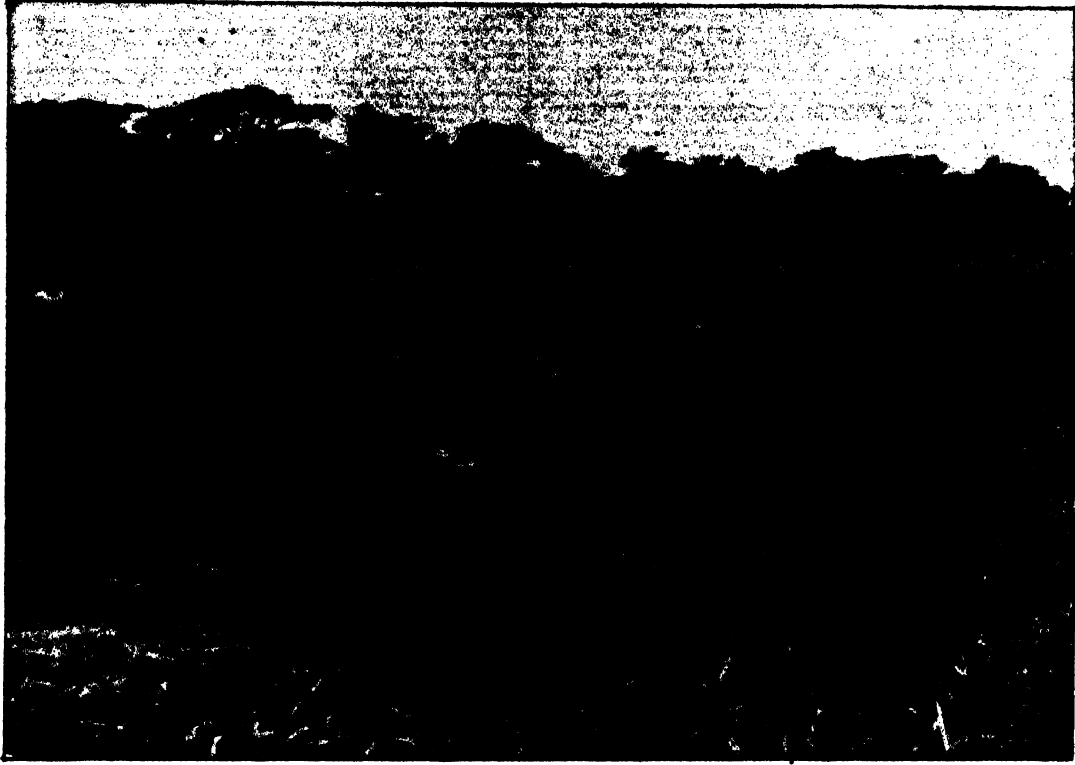
নেতৃত্বে ছিল কোথাও বঙ্গীয় রায়ত সমিতি কোথাও বঙ্গীয় প্রজা সমিতি। আইনজীবী শামসুদ্দীন আহমদ, তাঁর বড় ভাই মৌলভী আফ্‌সারউদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, বর্ধমান জেলার সোমেশ্বর চৌধুরী আন্দোলনগুলিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেন।

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ফাদার বারেতা, কাপাসডাঙা অঞ্চলের অধিবাসী বৈদ্যনাথ বিশ্বাস প্রমুখ নেতা নেতৃত্ব দেন। অনেক অনুসন্ধানের ফলে সাংগঠনিক নেতৃত্বের কাহিনী ও বিবরণ সংগ্রহ করা গিয়েছে। নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের অতীত ইতিহাস লেখার সময় এই তথ্যগুলি সাহায্যকারী হতে পারে ভেবে আমি এগুলি গুছিয়ে দিলাম।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন ফিরে যাও আওয়াজ তুলে—(Simon Commission Go Back) বাংলাদেশে যে আন্দোলন হয়, তাতে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল যোগ দেয় এবং ছাপানো লাল ইস্তাহার প্রচার করে, কৃষক জনগণকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে ডাক দেয় নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা, চুয়াডাঙা মহকুমার কোনও কোনও অঞ্চলে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, 'সাইমন কমিশন ফিরে যাও' আওয়াজ তুলে কৃষকেরা হাট ও গঞ্জে মিছিল করেন।

নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের বিস্তার ও সংগঠনের বিকাশ

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষকসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠনগতভাবে দৃঢ়ীকৃত হবার পর নদিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সমিতির সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। আর এই সব আঞ্চলিক সমিতির নেতৃত্বে নানা জরুরি দাবি নিয়ে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেন। জেলার নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া, সজিনপুর, ভিওড়খালি, বামনপুকুর এবং কোতয়ালি থানার ব্রহ্মনগর, উসিদপুর, নিজামপুর, কাশীবাস, গদাবাস প্রভৃতি গ্রামের ব্যাপক কৃষকসমাজ গঙ্গার চর জমিতে দখল রেখে চাষ, হাট-বাজারে বে-আইনি তোলা রদ করা, আবাদি জমির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতির দাবিতে তীব্র আন্দোলন চালায় ও আংশিক জয়লাভ করে। সময়কাল ১৯৩৮-৩৯ সাল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বৃটিশ শাসনকালে বিনাবিচারে আটক বন্দী যাঁরা মুক্তি পেয়ে এসে নবদ্বীপে বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্যে কমরেড সুকুমার মুখার্জি (প্রয়াত)-র নাম উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মনগর গ্রামের কৃষকনেতা অনন্ত ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মনগর গ্রামের সর্বক্ষণের কৃষককর্মী মানগোবিন্দ ঘটক, শিশির হালদার, হারান মণ্ডল এলাকায় কৃষক সমিতির মজবুত বনিয়াদ গড়ে তোলেন। কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন আন্দামান সেলুলার জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কমরেড মুরারি গোস্বামী এবং মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা কমরেড কানাই কুণ্ডু। জমিদার ও পুলিসী দমননীতি সত্ত্বেও কৃষক ও মৎস্যজীবী আন্দোলনের ময়দান থেকে তাঁরা বারবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। কৃষক সংগ্রামের ময়দানে মূল রণধ্বনি ওঠে—'বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হোক, বিনামূল্যে কৃষকদের হাতে জমি চাই, লাঙল যার জমি তার।' মৎস্যজীবীদের রণধ্বনি ওঠে—'জাল যার জল তার, জলে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার চাই।' চাপড়া

থানার তিলকপুর, পুকুরিয়া, মহৎপুর, জামিরডাঙা ও ও কোতয়ালি থানার দেবীপুর, দলুয়ামোলা, পণ্ডিতপুর, হাঁসাডাঙা গ্রামের কৃষকেরা চরের জমিতে দখল রেখে চাষ করার দাবি নিয়ে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলেন। হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের দৃঢ় ঐক্যের জোরে আন্দোলনে সাফল্য আসে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার নদিয়া জেলা শাখা সংগঠন

এই সব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিলকপুর গ্রামে নদিয়া জেলা কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ও ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা কমরেড আবদুল মোমিন। ছয় জোড়া (১২ বলদের) বলদের গাড়িতে কমরেড আবদুল মোমিনকে সম্মেলনে আনা হয়।

জেলা ভিত্তিতে নদিয়া জেলায় প্রথম কৃষক সমিতির সংগঠন

সারা ভারত কৃষকসভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত হয় নদিয়া জেলা কৃষক সমিতি। তিলকপুর জেলা কৃষক সম্মেলনে নদিয়া জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। ব্রহ্মনগর গ্রামে কৃষক সমিতির অফিস খোলা হয়। নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির নির্বাচিত কমিটিতে ছিলেন ২৩ জন সদস্য। তার মধ্যে,—সভাপতি—কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি, সহ-সভাপতিগণ—কমরেড পূর্ণ পাল (কুষ্টিয়ার শ্রমিক-কৃষক নেতা), কমরেড অনন্ত ঘোষ (ব্রহ্মনগর, কোতয়ালি থানা), কমরেড সদরুদ্দীন বিশ্বাস (হাঁসাডাঙা, কোতয়ালি থানা) ও কমরেড মাধবেন্দু মোহন্ত (মেহেরপুর থানা), সম্পাদক—কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি, সহ-সম্পাদকগণ—কমরেড বিপুল পাল (শান্তিপুর) ও কমরেড মুরারি গোস্বামী (নবদ্বীপ) এবং কোষাধ্যক্ষ—কমরেড অমিয় রায় (নবদ্বীপ)।

১৯৩৮-৩৯ সালে চিনিকল ও মদের কারখানার মালিক কেরু অ্যান্ড কোম্পানি নদিয়া জেলার দামুরহুদা থানার দর্শনাতে চিনিকল ও মদের কারখানা স্থাপন করে। কেরু অ্যান্ড কোম্পানি স্থানীয় জমিদার, জোতদারদের কাছ থেকে আবাদি জমির মালিকানা স্বত্ব খরিদ করে এবং আখচাষের কার্য করার জন্য জমি দখল নেয়। জমিদার-জোতদারেরা জমির মালিকানা স্বত্ব বিক্রয় করে, কিন্তু এই সব জমির প্রায় নব্বই ভাগে চাষীরাও উঠবন্দী ও শস্য কড়ারে ভাগচাষ করেন। আবার অনেক চাষীর দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমিসত্ত্বও ছিল। জমির উপর গাছগাছালি, ছোট ছোট বাগান, যার দখল ছিল জমিতে আবাদকারী কৃষকদের—সেগুলি কেরু অ্যান্ড কোম্পানি জোর করে দখল করে। জমিতে প্রজাস্বত্বে ন্যায্য খেসারত, গরিব কৃষকদের আবাদের জমি। বিকল্প জমি, গাছের ক্ষতিপূরণ, কৃষকরা যারা আখ চাষ করতে ইচ্ছুক তাদের ন্যায্য দরে আখের বীজ বণ্টন, দাদনের টাকা, আখ ফসলের ন্যায্য দাম ও সঠিক ওজন প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলে। প্রথমে হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা গ্রামে কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালি থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে, পরে এ আন্দোলন দর্শনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দামুরহুদা থানা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ব্যাপক অঞ্চল, চুয়াডাঙা থানার নীলমণিগঞ্জ, আলমডাঙা থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রসারিত হয়। কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি, কমরেড সন্তোষ পাল (প্রয়াত), কমরেড বিমল পাল, দামুরহুদার কমরেড পাঁচু বিশ্বাস, কুষ্টিয়ার কমরেড ধীরেন দাশগুপ্ত এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি দর্শনা কেন্দ্রে ছিলেন।

এই আন্দোলনের পাশাপাশি দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চিনি ও মদ কারখানার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে ওঠে, শ্রমিক-কৃষক একতার বনিয়াদে শক্তিশালী আন্দোলন চলতে থাকে। কৃষকদের আন্দোলন জয়যুক্ত হয় এবং শ্রমিকদের নিজস্ব শ্রেণী দাবির আন্দোলনে আংশিক জয় হয়। দর্শনার পাশের গ্রামগুলিতে চাঁদপুর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, নিজামপুর, আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া, ফুলবাড়ি, ঝাঝরি ও বেগমপুর গ্রামেও এই আন্দোলন প্রসারিত হয়। শহিদ অনন্তহরি মিত্রের মাতুলালয় ও জন্মস্থান বেগমপুর। দর্শনার কাছে ফুলবাড়ি গ্রামে ছিলেন প্রয়াত হরিদাস ভট্টাচার্য, তিনি তখন চুয়াডাঙা মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন, তিনি হলেন কৃষ্ণনগরের আইনজীবী প্রয়াত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্যের কাকা।

১৯৩৯ সালের জুন মাসে দর্শনায় নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির এক বিশেষ কনভেনশন হয়, কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদ এই কনভেনশন শেষে দর্শনা বাজারে এক বিশাল শ্রমিক-কৃষক সমাবেশে—বিনা খেসারতে জমি থেকে উচ্ছেদ, জাতীয় স্বার্থে বিনামূল্যে গরিব কৃষকদের চাষের জমি এবং ভূমিসংস্কারের দাবি ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। পরবর্তীকালে কমরেড জ্যোতি বসু, কমরেড রণেন সেন, কমরেড মহম্মদ ইসমাইল দর্শনার শ্রমিক সমাবেশে যোগ দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে জুন মাসের শেষে কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামে সারা ভারত কৃষকসভার নদিয়া জেলা শাখা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন—সারা ভারত কৃষক কমিটির সদস্য কমরেড আবুল হায়াত। সম্মেলনে তিনি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সম্মেলনে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদ উপস্থিত ছিলেন। হরিনারায়ণপুর কৃষক সম্মেলনে সংক্ষিপ্ত ভাষণে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ বলেন—'প্রত্যেক বিপ্লবের দ্বারাই একটা আমূল পরিবর্তন সংগঠিত হইয়া থাকে। আমরা যে সামাজিক বিপ্লবের কথা বলিয়া থাকি তাহার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আসিবে। আগেই বলিয়াছি যে কৃষি বিপ্লবের রূপেই এই বিপ্লব দেখা দিবে।' (মুজফ্ফর আহ্‌মদ রচিত 'ভারতের কৃষক সমস্যা' পুস্তক থেকে এই উদ্ধৃতি তিনি দেন)।

কৃষ্ণনগরের প্রয়াত শিবরাম গুপ্ত ও শান্তিপুরের বিমল পালের নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ড্রাম, বিউগল-বাঁশি বাজিয়ে আলমডাঙা রেলস্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে দিয়ে হরিনারায়ণপুর কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত হন। এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে আরও অনেকে ছিলেন তাঁদের নাম (আমার যত দূর মনে আছে)—হরিদাস দে (শান্তিপুর), আশুতোষ পাল (কৃষ্ণনগর) ও বামনপুকুরের একজন মুসলমান কৃষকযুবক।

হরিনারায়ণপুর সম্মেলনে জেলা কমিটির সদস্যসংখ্যা ২৭ করা হয়—জেলা সভাপতি—কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি, যুগ্ম সম্পাদক করা হয়—কমরেড সুরেশ রায় ও কমরেড মাধবেন্দু মোহন্তকে। কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি একজন সহ-সভাপতি হন।

এই সময়ে কুষ্টিয়া থেকে হরিনারায়ণপুর যাবার পথে এক গভীর খাল ছিল। সম্ভবত নাম ধলনগরের খাল। সরকার থেকে এই খাল সংস্কার ও খালের উপর পুল (সাঁকো) তৈরি করে। হরিনারায়ণপুর-কুষ্টিয়া পথের উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টা হয়নি। বহু আবেদন-নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে নদিয়া জেলা কৃষক সমিতি ও কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও তন্তুজীবীরা নিজেরা 'হাওড়' বাঁধার কর্মসূচি নেয়। কয়েক হাজার শ্রমিক কৃষক ও তন্তুজীবী নিজেরা মাটি কেটে খাল সংস্কার ও বাঁশ এবং শালকাঠ দিয়ে পুল তৈরি করেন। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান ঘরের মেয়েরাও কর্মরত কৃষকদের ভাত, ডাল রান্না করা, এমন কি মাটির ঝুড়ি বহনের কাজও করেন। স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রাম উন্নয়নের এক উৎসব শুরু হয়ে যায় 'হাওড়' বাঁধার জায়গায়।

কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিকরা গঠন করেছিলেন জমিরুদ্দীন ব্রিগেড, এই জমিরুদ্দীন ব্রিগেডের শ্রমিকেরা কুষ্টিয়া-হরিনারায়ণপুর রাস্তায় সেই সেতুবন্ধনে স্বেচ্ছাশ্রম দান করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জমিরুদ্দীন ছিলেন কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে একজন তরুণ শ্রমিক। শ্রমিকদের আর্থিক দাবিদাওয়া এবং ট্রেড ইউনিয়নগত অধিকার নিয়ে আন্দোলনের গতিপথে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট চলাকালে ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর মোহিনী মিলের মালিকপক্ষ গুণ্ডাদের সাহায্যে হিংস্র আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তরুণ শ্রমিক জমিরুদ্দীন, ওমর আলি ও জুলফিকার প্রমুখ গুরুতর আহত হন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় কোনও সরকারি হাসপাতালে আনা হয়। সেখানেই আহত তরুণ শ্রমিক জমিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। জমিরুদ্দীনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলার সুতাকল শ্রমিকরা তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময়েই গঠিত হয় জমিরুদ্দীন ব্রিগেড।

হরিনারায়ণপুর কৃষক সম্মেলনে হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা তিলক সরকার এবং তাঁর সহকারি হিসাবে কমরেড ইন্দু ভৌমিক ও কমরেড তারাপদ ভৌমিক স্থানীয় কৃষকদের এই কৃষক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেন।

নদিয়া জেলায় নবপর্যায়ের কৃষক আন্দোলন

মূল রণধ্বনি—বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ—বিনামূল্যে কৃষকদের হাতে জমি চাই, জেলার কৃষক সম্মেলনগুলির মধ্যে দিয়ে কৃষকসভার দাবি—কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ওই আঞ্চলিক ভিত্তিতে কৃষকদের জরুরি আর্থিক ও জমির স্বত্ব বিষয়ে দাবির আন্দোলন নদিয়া জেলার কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টি করে।

মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক কাজকর্ম শুরু হয়। নদিয়া জেলায় মুসলিম লিগ পৃথক কৃষক সংগঠন করে। কৃষক সমিতিভুক্ত মুসলিম কৃষকদের লিগ সংগঠনে টানার প্রবল চেষ্টা হয়। জমিদারি প্রথার বিলোপ, জাতীয় স্বার্থে (কৃষকের স্বার্থে)

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচি নিয়ে জেলার কৃষক সমিতির কর্মীরা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে অবিরাম প্রচারকাজ চালাতে থাকেন।

ভূমিসংস্কার ও কৃষকদের আশু দাবির সংগ্রামে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক বিভেদের নীতি জেলায় গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিমাণে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচি নিয়ে জেলার কৃষক সমিতির কর্মীরা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে অবিরাম প্রচারকাজ চালাতে থাকেন। এই প্রচার কর্মসূচি গ্রামের শত শত কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের আন্দোলনের ময়দানে টেনে আনে। মুসলিম লিগের বিভেদ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এই সময় পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, ও দক্ষিণ বাংলার ২৪ পরগনা, হুগলি জেলার তেভাগা আন্দোলনের জোয়ার নদিয়া জেলাতেও আসে।

কুষ্টিয়া মহকুমার পোড়াদহ, খোকসা-জানিপুর গ্রামে মেহেরপুর মহকুমার তেহট্ট থানার বহু গ্রামে, পলাশীপাড়া ও সাহেবনগর দরিবাপুর (দেরেপুর) এলাকায় আধাভাগের বদলে তেভাগা দাবিতে জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ, খেত-মজুরের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন হয়। পোড়াদহ এলাকায় শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবদের কৃষকপ্রজা পার্টির কর্মীরা কৃষক সমিতির সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। খোক্‌সা-জানিপুর এলাকার কমরেড সুরেশ রায়, কমরেড শশাঙ্ক বিশ্বাস (ঈশ্বরদি), কমরেড তারাপদ সাহা, কমরেড আজিজুর রহমান (খোক্‌সা) তেভাগা ও উচ্ছেদ বন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পরের দিকে আসেন কমরেড সাহাবুদ্দীন মণ্ডল (তেহট্ট থানার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন)।

মেহেরপুর মহকুমার তেহট্ট, পলাশীপাড়া, হাঁসপুকুর অঞ্চলে কমরেড মাধবেন্দু মোহন্ত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। বহু কৃষককর্মী কমরেড নসীরাম দাস, কমরেড নলিনী মণ্ডল প্রমুখ আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। রাধাকান্তপুর কৃষক সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি ও পালচৌধুরীদের জমিদারি এলাকায় উঠবন্দী প্রজা উচ্ছেদ বন্ধের আন্দোলন শক্তিশালী হয়। এই সময় করিমপুরের ধোড়াদহ এবং আরও কয়েকখানি গ্রামে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ ও রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের দাবির আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন কমরেড সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল (মটর সান্যাল), কমরেড চণ্ডী কর প্রমুখ নেতা।

শান্তিপুর থানার গঙ্গাচরের জমি—'কালেকটারির চর' বলে পরিচিত এলাকার কমরেড বিমল পাল ও কমরেড সুনীল লাহিড়ীর (প্রয়াত) নেতৃত্বে 'দখল রেখে চাষ কর' চরজমিতে আবাদকারী কৃষকদের জমিতে স্থিতিবান দিতে হবে ছিল আন্দোলনের প্রধান আওয়াজ। সরকারের দমননীতির জন্য আন্দোলনের অনেক কর্মীকে গোপন অবস্থায় থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের উপর এবং তখনকার দিনের কংগ্রেসের ভিতর বামপন্থীদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রচণ্ড দমননীতি জারি হয়, বিনা বিচারে আটক, ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও গণ-আন্দোলনের সভা-সমাবেশ এবং সংগঠন বে-আইনি ঘোষণা করা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়ায়। সারা ভারত কৃষকসভা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার আন্দোলন ও সংগঠনের উপর, সংগঠনের কর্মীদের উপর প্রচণ্ড দমননীতি নেমে আসে, কার্যত বেআইনি অবস্থার মধ্যে কৃষক আন্দোলন চালানোর কর্মকৌশল গ্রহণ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা।

কৃষক আন্দোলনের অন্য সমস্ত কর্মসূচির কথা না তুলে এখানে নদিয়া জেলা চাকদহ ও কোতয়ালি থানা এলাকায় বৃটিশ শাসকদের সামরিক প্রতিরক্ষাবেষ্টনীর (ডিফেন্স রিং) জন্য বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করে সামরিক প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ জমি দখল শুরু হয়। কৃষ্ণনগর কোতয়ালি থানার ধুবুলিয়া অঞ্চলে ও চাকদহ থানার এবং রাণাঘাট থানার এখনকার কুপার্স ক্যাম্প এলাকার পাশের গ্রামগুলিতে বিস্তৃত অঞ্চলে জমি দখল শুরু হয়। কার্যত বেআইনি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে নদিয়া জেলা কৃষক সমিতি কৃষকদের স্বার্থরক্ষা যেমন, ক্রস্ত জমির ক্ষতিপূরণ, উচ্ছেদ হওয়া কৃষক ও চাকদহ থানার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত গ্রামবাসীর জমি-ঘরবাড়ি, গাছ-গাছালি প্রভৃতির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, বিকল্প পুনর্বাসন ব্যবস্থার দাবি নিয়ে ভারতরক্ষা আইনের কঠিন নাগপাশ অগ্রাহ্য করে শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালন করে।

এখন কল্যাণীতে যে শিল্পনগরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দোহ উন্নয়ন প্রকল্প, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এখানে ছিল ছোট-বড় অনেক মৌজা ও গ্রাম। ভারতের বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে আমেরিকার প্রশাসনের 'মিত্রশক্তি'-র যুদ্ধ সম্পর্কিত চুক্তির ভিত্তিতে বর্তমানের কল্যাণীতে তখন রুজভেল্টনগরী স্থাপিত হয়। এখানে যে সামরিক প্রতিরক্ষাবেষ্টনী গড়া হয় তা ছিল মার্কিন জঙ্গি বিমানবাহিনীর অন্যতম এক প্রধান ঘাঁটি। অনেক পরে সেখানে কল্যাণী গড়ে উঠেছে। রুজভেল্টনগরী গড়ে তোলায় সেই বেদনাবিধুর দিনগুলিতে এই এলাকার ছোট-বড় গ্রামগুলির প্রায় এক-দেড় হাজার গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি কিভাবে মার্কিন সেনার ইঞ্জিনিয়াররা ট্রাক্টর দিয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে রুজভেল্টনগরীর বনিয়াদ তৈরি করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে—এই ছিল সামরিক আদেশ। বাস্তুত্যাগের গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে কৃষকরা নিজেদের পরিজনদের হাত ধরে সেদিন অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে গঙ্গা পার হয়ে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাজার হাজার নর-নারী-শিশুর চোখের জল সেদিন যে মাটিতে ঝরে পড়েছিল, আজ সেখানেই গড়ে উঠেছে 'কল্যাণী'—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তথাকথিত 'মানসকন্যা'। আজ আমার মনে পড়ছে সময়মত ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার ক্ষোভে এই এলাকার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কল্যাণী ঘোষপাড়া কর্তাভজা লোকধর্ম সম্প্রদায়ের সত্যশিব পাল (বর্তমানে প্রয়াত) সেদিন অনশন-সত্যাগ্রহ পর্যন্ত করেছিলেন।

নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি এখানে কৃষক আন্দোলনের কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য পাঠান—কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জীকে ও কমরেড সমরেন্দ্র মুনশীকে (প্রয়াত), কমরেড বৈদ্যনাথ মুনশীর দাদা। কাঁচড়াপাড়া কৃষক সমিতি থেকে আসেন কমরেড কুঞ্জ বসু, আর আসেন বড়জাগুলির কমরেড অশোক বসু (অশোকের নামে তখন তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপারে একখানা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল)। তখনকার বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য ও কৃষ্ণনগরের আইনজীবী কমরেড দেবীভূষণ ভট্টাচার্য (প্রয়াত) উচ্ছেদ হওয়া কয়েক হাজার কৃষকের পক্ষে আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা দায়ের করেন। উচ্ছেদ হওয়া কৃষক ও গ্রামবাসীর বেশি অংশ গঙ্গা পারে হুগলি জেলায় গিয়ে বসতি করেন। কিছু অংশ চাকদহ থানা ও হরিণঘাটা থানার বিভিন্ন গ্রামে বসতি করেন। কমরেড দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে পুরানো নথিপত্রাদি ছিল। তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ কৃষকদের পক্ষে আদায় করিয়ে দেন।

আমার মনে আছে সেদিনের গ্রাম কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড সভাপতি এবং কাঁচড়াপাড়ার কমরেড কুঞ্জ বসু, কমরেড সমরেন্দ্র মুনশী ও উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের পক্ষে জনৈক ভদ্রলোক—যিনি হুগলিতে বসতি করেছিলেন, এই চারজন একটি কমিটি করে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক ও গ্রামবাসীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ বণ্টনের সুব্যবস্থা করেন। নদিয়া জেলার বর্তমান কল্যাণীর কত সংখ্যক মৌজা, প্রতি মৌজায় বসবাসকারী কৃষক সহ কত গ্রামবাসীর কত একর জমি সেদিনের সরকার সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দখল করে তার পূর্ণ বিবরণ এই কমিটি প্রস্তুত করে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও আইনজীবী দেবীভূষণ ভট্টাচার্য কত সংখ্যক গ্রামবাসীর বাস্তুভিটা, আবাদি জমি, পুকুর, গাছগাছালি বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা আদালতে মামলার সাহায্যে আদায় করে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্তের সম্পূর্ণ পাওনা মিটিয়ে দেন—সে বিবরণ কমরেড দেবীভূষণ ভট্টাচার্য নদিয়া জেলার কৃষক সমিতিকে দিয়েছিলেন। এ সব তথ্য পুরানো দিনের কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান উপাদান। কৃষক সমিতি, বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এবং কৃষক-গ্রামবাসীদের চরম বিপদে সাহায্যকারী কিছু ব্যক্তি ছাড়া নদিয়া জেলার অন্য রাজনৈতিক

দলের নেতা-কর্মীদের সেদিনের বিপন্ন কৃষক ও গ্রামবাসীরা তাঁদের সাহায্যের জন্য পাননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নদিয়া জেলায় কৃষক আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও আন্দোলন, শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জাতীয়তাধর্মী সংবাদপত্র প্রভৃতির উপর বৃটিশ শাসকদের প্রচণ্ড দমননীতি নেমে আসে। ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে বাঁধা পড়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্রোতধারা ও শ্রমজীবী জনগণের জীবন-জীবিকা ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম। নদিয়া জেলাতেও এই দমননীতি নেমে আসে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে আটক ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদ, কমরেড রণেন সেন, কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি গোপনে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। অল্প কয়েকদিন পর কমরেড রণেন সেন ও কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী গোপনে যশোর যান। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে যান। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদ নদিয়া জেলায় থাকেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে নবদ্বীপে গোপন পার্টি কেন্দ্রে রাখা হয়। কিছুদিন পরে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে গোপনে নৌকাযোগে গঙ্গা পার করে বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। বর্ধমান জেলার দায়িত্বসম্পন্ন এক পার্টি নেতার হেফাজতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে পৌঁছে দিতে যান নদিয়া জেলার মৎস্যজীবী আন্দোলনের দুই নেতা কমরেড কানাই কুণ্ডু ও কমরেড মুরারি গোস্বামী (দুজনেই প্রয়াত)। নাকাশিপাড়া থানার দাদুপুর গ্রাম থেকে দু'খানি ছৈতোলা নৌকায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে নিয়ে তাঁরা যাত্রা করেন। প্রথম নৌকা পাহারাদারি ছিল, দ্বিতীয় নৌকায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদ, কমরেড কানাই কুণ্ডু ছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গায়ে ফরাসডাঙার জরিপাড় চাদর দিয়ে নৌকায় ওঠেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে সবাই চিরকাল সাহেবি পোশাকে দেখেছে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় কেউ কখনও দেখেনি। পুলিসের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দেবার জন্যই কমরেডের পোশাক বদল করা হয়।

সমস্ত গোপন কাজ সম্পন্ন করা হয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপদেশে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদ নিরাপদে বর্ধমানে পৌঁছে যান। পরে সেখান থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গোপন পার্টিকেন্দ্রে তাঁকে নিয়ে যান। নাকাশিপাড়া থানার দাদুপুর গ্রামে কৃষক সমিতির একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল, সেজন্যই নদিয়া জেলার তখনকার পার্টি নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করে দাদুপুর থেকে গোপনে নৌকাযোগে গঙ্গা পার করে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্মদকে কাটোয়ায় (বর্ধমান) এক জায়গায় পাঠানোর পরিকল্পনা নেয় ও তা সুসম্পন্ন করে।

নাকাশিপাড়া থানার দাদুপুর অঞ্চলে গঙ্গার চরজমিতে চাষ নিয়ে চরের জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিল। কৃষকদের দাবি ছিল চরের জমিতে সবজি চাষের সুযোগ চাই। চর ডুবে গেলে জমির ভাগ-খাজনা মকুব, শুকনো চরে সবজি ফসলের সিকিভাগ খাজনা, উচ্ছেদ বন্ধ প্রভৃতি—নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে চরজমির চাষীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। জমিদার পুলিসের সাহায্যে জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ শুরু করে। মামলামোকদ্দমা দায়ের করে। কৃষক সমিতি আওয়াজ তোলে—'দখল রেখে চাষ কর'। যুদ্ধ শুরু হয়, জমিদারের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় দাদুপুরে এক বিশেষ কৃষক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থির হয় সরকারের কাছে সম্মেলন ও সমাবেশের অনুমতি নিয়ে সম্মেলন এবং সমাবেশ করা হবে। নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি নদিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাদুপুরে কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

সম্মেলনের দিন নির্দিষ্ট হয়, প্রচারপ্রস্তুতি ভালভাবেই চলে। সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি। কমরেড সন্তোষ পালের (প্রয়াত) উপর ভার ছিল কৃষ্ণনগরে নদিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে সমাবেশের সরকারি অনুমতিপত্র নিয়ে যাওয়ার। কমরেড সন্তোষ পাল যথারীতি নদিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে সরকারি খামে আঁটা চিঠি নিয়ে দাদুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে সম্মেলন মঞ্চে আসেন। কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি, কমরেড পাঁচু রায়, দাদুপুরের কৃষক সমিতির শাখা সম্পাদক সম্মেলন মঞ্চে বসে আছেন। পুলিস এসে সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, সম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। তখন কমরেড সন্তোষ পালের আনা সরকারি চিঠি খুলে দেখা গেল—নদিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমরেড সুশীল চ্যাটার্জির অনুমতি আবেদন মঞ্জুর করেননি—দাদুপুরের কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য পুলিসকে আদেশ দিয়েছেন। কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের প্রতিবাদে মিছিল সংগঠিত করেন। পুলিস কমরেড সুশীল চ্যাটার্জিকে ও কমরেড পাঁচু রায়কে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য কৃষক কর্মী গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য নৌকাযোগে চলে যান। কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি, কমরেড ননী রায়, কমরেড কানাই কুণ্ডু, কমরেড সন্তোষ পাল তাঁদের সঙ্গে চলে যান। ভারতরক্ষা আইন অগ্রাহ্য করে নাকাশিপাড়া থানার দাদুপুর গ্রামে কৃষক মিছিল করার অপরাধে কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি ও কমরেড পাঁচু রায়ের আদালতের বিচারে ছয় মাস করে জেল হয়।

আমার স্মৃতির মণিকোঠা থেকে অতীত দিনে নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের এবং কৃষক সমিতির কর্মীদের কাজের কিছু বিবরণ লিখলাম। জেলায় কৃষক আন্দোলন, সংগ্রাম ও সংগঠনের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পাশাপাশি কৃষকদের সংগঠিত সংগ্রামগুলি যেমন কৃষকসমাজের সর্বস্তরের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে, তেমনই জাতীয় ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামকে প্রান্তরে পৌঁছে দেয়।

হরিণঘাটা মূল দোহ কারখানা
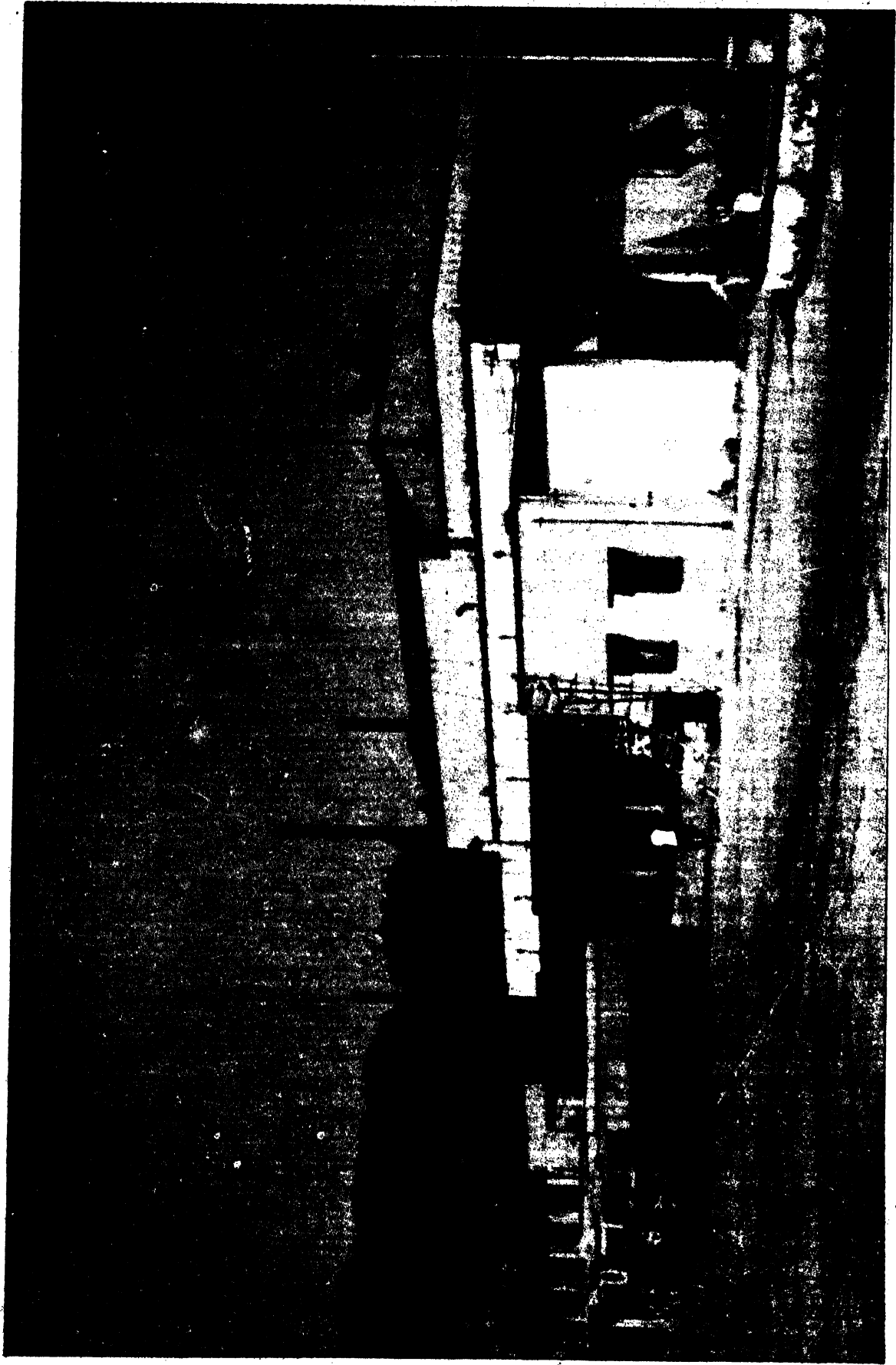
কৃষিস্থিতি পরিসম্পৎ এবং সম্ভাবনা

ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায়
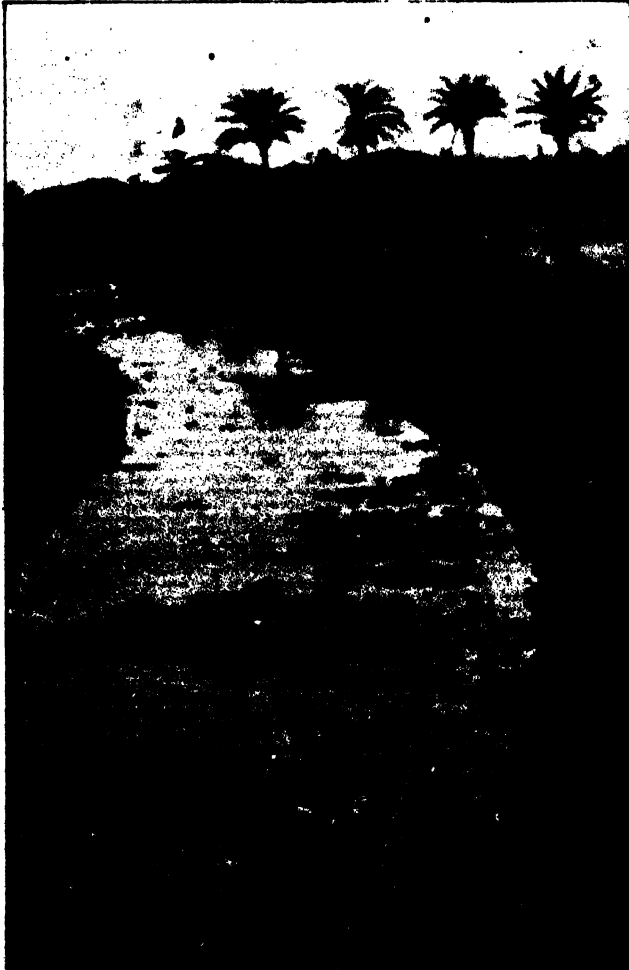
প্রাক্-কথন

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে আপনমনে বিচরণ করত পশুপাখিরা অরণ্যের গভীরে আর মুক্ত আকাশে। বনজঙ্গলে স্বাধীনভাবে জন্মাত গাছ। আদিম মানব তার মৌলিক প্রয়োজনের প্রধানতম প্রয়োজন মেটাত শিকার করে আর গাছের ফলে। তারপর কোনও একদিন পশুপাখিকে তারা পোষ মানাল—শিখল চাষ—যাত্রা হল ইতিহাসের। বিকাশ হল সভ্যতার। সমাজবদ্ধ মানুষ বশে আনতে চাইল খাদ্য সরবরাহের মূল উপাদান—মাটি, জল, জীবজন্তু আর গাছপালাকে, জন্ম হল মানবসংস্কৃতির। সে যুগে কৃষ্টি বলতে একটাই বোঝাত তা হল কৃষি। আজও তাই কৃষি আর কৃষ্টি সমার্থক। মাটির মালিকানা হল। মানব-সংস্কৃতিই জমির মালিকানাকেও সীমায়িত করল। এর পর এল জনবিস্ফোরণের যুগ। খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার অসাম্য সূচনা করল কৃষি গবেষণার ইতিহাস। যে সব স্থানে মানুষ প্রথম সভ্যতার পত্তন করেছিল কালচক্রে সে সব দেশের চরম দুর্দশা দেখা গেল। তারা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে, খাদ্য সরবরাহ এবং অর্থকরী, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য। কিন্তু মানব ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে যে সব দেশে কৃষির বিকাশ হয় সে সব দেশে এখন খাদ্য উদ্বৃত্ত।

আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক আগে আগেই এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দুইহন্ড্রেডওয়েট খাদ্যশস্য উৎপাদনে এশিয়া-আফ্রিকার নানা দেশে লেগেছে দশটি শ্রমদিবস—যেখানে ফ্রান্সে তিন ঘণ্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় থেকে বারো মিনিট। স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী যুগে কৃষিশ্রমের উৎপাদনশীলতা তথা কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমের বিনিময়ে লভ্য আয় ও ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক পার্থক্য ছিল ১:৮০০। এই ব্যবধান সেই থেকে বেড়েই চলেছে (ড. স্বামীনাথন, 1973 Our Agricultural Future)। অবশ্য এখানে একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার ষাটের দশকে ভারতের মতো দেশে এক কেজি চালজাত প্রোটিন উৎপাদনে ২৮৬ কিলো ক্যালোরি শক্তির দরকার হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে এক কেজি গম-জাত প্রোটিন উৎপাদনে ২৮৬০ কিলো ক্যালোরি খরচ হয়ে গেছে। এতে এই সোজা কথাটা বোঝা যাচ্ছে যদি কোনও সীমিত সম্পদ যার আর পূরণ হবে না (তেল, কয়লা ইত্যাদি), এইভাবে খরচ করা হয় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তা হলে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উপর নির্ভরশীল উন্নয়নেরও সমূহ সর্বনাশ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত শক্তির ৯৬% এসেছে তেল, কয়লা, গ্যাস থেকে। আর আমাদের চাহিদা ৫২% মিটিয়েছে কাঠ, গোবর, আবর্জনা। আশঙ্কা আগামী এক দশকেই ফসিলজাত জ্বালানির এক অবর্ণনীয় টান দেখা দেবে। আনন্দের কথা এই যে আমাদের দেশের জনবিস্ফোরণ যেমন চিন্তার কিন্তু এই জনসমুদ্রকে শ্রমদিবসে রূপান্তর তেমনই স্বস্তির। আমাদের কৃষি মূলত নির্ভর করছে এই পূরণযোগ্য সম্পদের উপর। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে যাতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে অথচ শক্তি উৎপাদনের অপূরণযোগ্য উপাদানের উপর চাপ কমবে।

বিশাল আমাদের জনশক্তি, প্রাণিসম্পদ প্রচুর, উর্বর মাটি, মহাদ্যুতিমান সূর্যের মহান উপস্থিতি, প্রকৃতির পরিবেশে বৈভব ও বৈচিত্র্য অন্তহীন, সার হিসাবে ব্যবহার্য জৈবজ জঞ্জাল অনেক। সেচের উৎস সুবিস্তৃত। আমাদের কৃষিব্যবস্থা এমন হবে যাতে এইসব সম্পদের সুষ্ঠুতম প্রয়োগ হবে এবং উৎপাদন বাড়বে নিরবচ্ছিন্ন অথচ মাটি বন্ধ্যা হবে না। স্থিতি আসবে কৃষি উৎপাদনে। শ্রম ও ভূমির বহুল ব্যবহার হবে। আমরা নাকি আর কোনও দিনই কৃষিব্যবস্থায় সুবিধাজনক অবস্থায় যেতে পারব না এ রকম একটা ধারণা কেউ কেউ পোষণ করতেন। নিরাশাবাদীদের এই ধারণা পুষ্ট করেছে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের গোড়ায় আমাদের সমষ্টি উন্নয়ন ও জেলাভিত্তিক নিবিড় চাষ প্রকল্প দুটোর ব্যর্থতা। সকলে মনে করতেন কৃষক সমাজের সীমিত চিন্তাধারাই আমাদের কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টার একমাত্র প্রতিবন্ধক। উন্নতি যা হয়েছে তা চাষের ও সেচের আওতায় বেশি করে জমি এনে, উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে নয়। বহু গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্রে বললেন প্রান্তিক চাষীর কৃষি খামার কখনই অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে পারে না। তাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং অবিদ্যাজনিত গতানুগতিকতায় বিশ্বাস যেমন দায়ী তেমনই তার ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া ফসলেও যখন তার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না তখন তাকে অন্য জীবিকার সন্ধানে ছুটতে হয়। এ অবস্থায় প্রান্তিক চাষী দ্বারা নিবিড় চাষপদ্ধতি সফল হবে না বলে ওইসব কৃষি সম্প্রসারণ গবেষকরা মত দিলেন। তাঁরা এটাও বললেন বড় কৃষি খামারে শ্রমদিবসের ব্যবহার কম এবং ফলনও আশানুরূপ নয়। এখানে বড় কৃষি খামার বলতে ৫ হেক্টর জমির খামারকেই বোঝানো হয়েছে। এই খামারগুলিতে জমির বহুল ব্যবহার নেই। ফলে বাৎসরিক কৃষি উৎপাদন প্রতি একক জমিতে কম। এ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত কৃষি খামারগুলিকে এঁরা উৎসাহব্যঞ্জক বলেছেন। এঁরাই নাকি কৃষি সম্প্রসারণের ধারক-বাহক। সে ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারের ও বণ্টনের জন্য ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের না বেছে যদি প্রান্তিক চাষীকে বাছা হয় তবে অলাভজনক কৃষি খামারগুলি লাভজনক কৃষি খামারে উন্নীত হতে পারে। তখন এই বাড়তি উৎপাদনকে ভিত্তি করে জেলাভিত্তিক কৃষিনির্ভর শিল্প গড়া যাবে। ওতে ওইসব ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা স্থায়ী কাজ পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বণ্টনিকৃত জমি দান হিসাবে না দিয়ে কিছু নিয়মনীতির বাঁধনে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে।

অনেকে বললেন বণ্টনিকৃত জমি ভূমিহীনদেরই দেওয়া উচিত ফলে ভূমিহীনদের মধ্যে যে মালিকানার উৎসাহ জাগবে তাতে ওই ভূমিখণ্ডের ফলন আগের চেয়ে বেশি হবেই। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক। সদ্যপ্রাপ্ত ভূমির মালিকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা যদি অন্যভাবে পূরণ করতে হয় তবুও কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকার সন্ধানে ছোটার ব্যাপারটা থেকেই যায়। ফলে জমির উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে জোয়ার এলেও পরবর্তীকালে তা নামতে বাধ্য—এটাও কেউ কেউ মত দিলেন। গবেষকদের মতামত এ রকম হলেও বিগত দশ বছরের কৃষি উৎপাদনের পরিসংখ্যান বলছে যে ওই ক্ষুদ্র প্রান্তিক-বর্গাদার কৃষকদের হাতে জমির ফলন কিন্তু কমেনি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাই হোক, সুদূরপ্রসারী ভাবনা করতে হলে উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে প্রতিটি জেলার পরিকাঠামোগত দিক তার সম্পদ এবং কৃষি উন্নয়নের পরিবর্তনযোগ্য দিক বা বাধাগুলি অপসারণ করে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা করা দরকার। অসংগঠিত কৃষিকে একটা পরিকল্পনার বাঁধনে বাঁধা প্রয়োজন। তা কৃষি ও কৃষকের উভয়ের জন্যই জরুরি। এ বিষয়ে দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা পদ্ধতিতে গ্রামের সম্পদের বিবরণ তৈরির ভিত্তিতে কৃষি পরিকল্পনা করা যাবে। বর্গাদার ও জমির মালিকের সম্পর্ক এবং কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়টি যদিও খুবই স্পর্শকাতর তবুও পরিকল্পনা করার সময় সেটাও মাথায় রাখা উচিত।

একনজরে নদিয়ার কৃষি

এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মুখ্যত কৃষিনির্ভর। গঙ্গা ও অন্যান্য শাখানদীর সৃষ্ট পলিজ দোআঁশ, দোআঁশ ও কোথায় কোথায় বেলে দোআঁশ মাটি এ জেলার কৃষিকে উন্নত করার একটা সোপান। মোট ভৌগোলিক এলাকার ৬৯.৩ শতাংশ জমি চাষযোগ্য অতএব জেলার অর্থনৈতিক কাঠামো একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হতে বাধ্য। শতকরা ৭৮.৪ ভাগ মানুষই গ্রামাঞ্চলে যাঁরা মূলত কৃষিকর্ম ও কৃষিনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও এই

জেলাকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছে। কর্কটক্রান্তি রেখা নদিয়াকে প্রায় দু-ভাগ করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। জেলার উত্তর অংশে অবস্থিত করিমপুর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৮ ফুট উর্দ্ধে এবং দক্ষিণের চাকদহ ২৪ ফুট উর্দ্ধে। জেলার ঢাল উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে। জেলার ভূগর্ভের জল মোটামুটি এই ঢাল অনুযায়ী অতীব ধীর গতিতে নড়াচড়া করছে। বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং সেচের বাড়তি জলে নভেম্বরের শেষ নাগাদ স্বেদন ও নলকূপের জল টানার ফলে মে মাসে জলের স্তর নেমে যায়। সম্পৃক্ত মণ্ডলে (Zone of Saturation) ভূগর্ভে জল থাকে সাধারণত সুষম পর্যায়ে। এখানে বেলে মাটির স্তরের এবং জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতা (Hydraulic Continuity) অন্তত ৪৭৮ ফুট গভীর পর্যন্ত বিনা বাধায় বজায় রয়েছে তাই মোট বৃষ্টিপাতের অন্তত ৩০ ভাগ মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত অনায়াসে চুঁইয়ে যাচ্ছে। ফলে এখানকার ভূগর্ভের জলরাশি পর্যাপ্ততার দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৮০-৮১ সালের পূর্বে এ জেলায় খরিফ মরসুমে প্রধানত পাট, আউস ও আমন ধান চাষ হত—রবি মরসুমে ডাল ও তৈলবীজ। কিন্তু কৃষি প্রযুক্তি ও সেচব্যবস্থার সুফল প্রয়োগে বছরে তিন থেকে চারটি ফসলও চাষ হচ্ছে। তবে এটা ঠিক কিছু জমি আছে বিল এলাকায় যেখানে একটা ফসল ছাড়া করা যায় না কিন্তু জেলার গড় চাষের নিবিড়তা ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে ১৫১.৬ ছিল ১৯৯৫-৯৬ তা বেড়ে ২২৩ শতাংশে পৌঁছেছে। এটা নদিয়ার কৃষিক্ষেত্রে একটা বিপ্লব বলা যেতে পারে। সবজি চাষের এলাকা ক্রমেই বাড়ছে। মসলা যেমন আদা, হলুদ ছাড়াও কালোজিরে, মেথি, ধনের চাষ হচ্ছে তা ছাড়া ফুল চাষেও বেশ এগিয়ে চলেছে। মোট তিনটি কৃষি মহকুমায় ১৭টি ব্লকে কৃষি বিভাগের কর্মীরা কাজ করে চলেছেন এই ক্রমোন্নতিকে বজায় রাখতে। সারের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। সারের এবং কীটনাশক জোগান দেবার জন্য দোকান প্রায় কৃষকের ঘরের কাছে পৌঁছে গেছে। যেখানে ১৯৭৯-৮০ সালে ৬৭৭টি মাত্র দোকান ছিল সারের, ১৯৯৫-৯৬-তে ৩০৬৭ দোকান এই চাহিদা মেটাচ্ছে। ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ১২০২৩ মেঃ টন সার ব্যবহার হয়েছিল তা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪৮৭৬০ মেঃ টন ব্যবহার হচ্ছে। প্রায় ৪ গুণ সার ব্যবহার আমাদের কৃষকভাইদের এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক বলা যায়।

সেচব্যবস্থা (আকাশগঙ্গা-পাতালগঙ্গা)

নদিয়ার গড় বৃষ্টিপাত ১৪৬৪ মিমি। মে মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যে এর অর্ধেকটায় এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ১/২ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তবে সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, চাষের নিবিড়তা এবং জলদি জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃত্রিম সেচের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগেই বলা হয়েছে এ জেলার এক শাশ্বত সম্পদ ভূমির উপরের খাল-বিল, নদীর জল এবং ভূগর্ভস্থ অফুরন্ত জল আছে। তাই এই ভোগবতী গঙ্গাজলে আজ নদিয়ার মাটি সিক্ত। ১৯৬২ সালে অগভীর নলকূপ—গভীর নলকূপ ও নদী জলোত্তলন সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল এখন তা বেশ পুষ্ট। নিচের সারণিতে এটার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

গড়পড়তা হিসাবে গভীর নলকূপের আয়ু ২০-২৫ বৎসর। নদী সেচপ্রকল্পের ৮-১০ বছর অগভীর নলকূপের আয়ু আরও কম। বিশেষজ্ঞের মতে, এ জেলার জলে Bi-carborate থাকায় অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে পেতলের stainer পাঁচ বছরেই নষ্ট হয়ে যায় তাই নারকেল দড়ির ফিল্টারই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। যা হোক একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন ভূগর্ভে শাশ্বত কাল ধরে যে জল সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই ভোগবতী গঙ্গাজল এবং প্রতি বছর নতুন করে যে জল জমা (Re-charge) হয় সেই জল এখন প্রচুর পরিমাণে তোলা হচ্ছে। তাই কোনও কোনও এলাকায় চৈত্রের টানের সময় নলকূপগুলি আর জল সরবরাহ করতে পারছে না। এটা এখনই ভাববার সময়। শস্য পর্যায়ে কম জল লাগে এমন ফসল (যেমন—গম, ডাল ও তৈলবীজ) লাগানোর উপর জোর দেওয়া দরকার। বোরো ধান চাষের উপর শুধু নিষেধাজ্ঞা নয় কৃষককুলকে এই সমূহ বিপদ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষিত করা প্রয়োজন। মাটির উপরে বয়ে যাওয়া নদী, বিলের জল ব্যবহার আরও বাড়ানো সম্ভব। ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙা, চুর্ণী, ইছামতী কত নদী এই নদিয়ায়। গোপিয়া, পলদা, হাসাডাঙা, পদমবিল, বয়সাবিল, পদমমালা শুকনির মতো বিলগুলি সংস্কার করে যেমন মাছচাষ বাড়ানো সম্ভব তেমনই এই মুক্ত জলকে অনেক কম খরচে সেচের জন্য ব্যবহার করা জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে নদিয়ার জলময় স্তরের storage co-efficient জেলায় ৪৭৮ ফুট গভীর পর্যন্ত বেলেমাটির স্তর,

উৎস	সংখ্যা		সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ (হেক্টরে)		নীট চাষে শতকরা এলাকা	
	১৯৭১	১৯৯৪	১৯৭১	১৯৯৪	১৯৭১	১৯৯৪
গভীর নলকূপ	৪৬৯	৬২৫	১৮৭৬০	২৫০০৫	৬.৮৯	৯.০
নদী সেচ উত্তোলন প্রকল্প	৬৪	৩১৯	২৫৬০	১২৭৬০	০.৯২	৪
অগভীর নলকূপ প্রকল্প	৪৯৪১	৬৭৬২৪	১৯৬০০	১,৪৬১৪৬	৯.০২	৫৩.৮৬
অন্যান্য			১৮৪৮	৪৯৭৪	০.৬৭	১.৮২
		মোট	৪২৭৬৮	১,৮৮৮৮০	১৫.৫০	৬৮.৬৭

জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতা, ভূগর্ভের গভীরের মোটা বালি, নুড়ি ও কাঁকরের স্তর এবং ঢাল বিবেচনা করে অগভীর নলকূপ যত বসানো উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অগভীর নলকূপে জল আমরা তুলছি। যা এখন থেকে বিচার করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নদীগুলিতে দু-ধারে আধ মাইল পর্যন্ত এলাকার নদী জলোত্তলন সেচপ্রকল্প চালু করা সম্ভব। এতেও শতকরা ১০ ভাগ জমি সেচসেবিত করা যাবে। এর সঙ্গে দরকার ভূগর্ভের জলের সুসমন্বিত ব্যবহার, জলের অপব্যয় নিবারণ ও সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন।

বিল ও নদীগুলি থেকে জলোত্তলন প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লক্ষ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষি খামারের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার খামারের চাষের ব্যয় কমানো সম্ভব। এ ছাড়া ওই বিলগুলি ও নদীর তীরবর্তী পড়ে থাকা জমিতে ফল বা অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করা, বিল ও নদী সংস্কারের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের প্রসার করার বিষয়টিও ভাবা যেতে পারে।

মরসুমি ফসলের চাষ

এই জেলার প্রধান ফসলের মধ্যে ধান, পাট, ডাল, তৈলবীজ ও সবজিই প্রধান। গমের চাষ এখন অনেক কম হচ্ছে। এ ছাড়া আখ, আলু, বিভিন্ন মসলা ছাড়াও কিছু স্থানে পানচাষ হয়। ফুলের চাষ ক্রমেই বাড়ছে। সবজি চাষের এখন যেন জোয়ার এসেছে প্রধানত হরিণঘাটা, চাকদহ, রানাঘাট, করিমপুর, কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার সবজি। করিমপুর ও চাকদহের শিমুরালি অঞ্চলে পানচাষ হচ্ছে। করিমপুর, তেহট্ট এবং কৃষ্ণনগরে কলার চাষ ক্রমেই বাড়ছে। বাদাম তৈলবীজ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট ২নং ব্লকে বেশ আশাব্যঞ্জক। ধান ছাড়া নদিয়ার প্রধান ফসল হল পাট। জেলার মোট আবাদি জমির প্রায় ৯% জমিতে পাটচাষ হয়। করিমপুর, চাপড়া, তেহট্ট, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া পাট উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। প্রতি পাট গাছ থেকে একটি একটি করে আঁশ ছাড়ানোর কৌশল এ জেলার পাটের গুণগত মান বৃদ্ধি করেছে। আখ নদিয়ার অতি পুরনো চাষ। কিন্তু এখন এই অর্থকরী ফসলটির চাষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। নদিয়ার একমাত্র 'চিনিকল' পলাশীর রামনগরে, কিন্তু ওই মিলের আখ ক্রয় করার স্থিরতা নেই। যার ফলে এই চাষ মার খাচ্ছে। চিনিকলের নিজস্ব বিশাল ইক্ষু খামারগুলি ক্রমেই বাগিচায় রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

জমির অবস্থানগত কারণেই এবং সেচের বিস্তার ভাল থাকার ফলে খরা বা বন্যায় সমস্ত ফসলের সমূহ ক্ষতি হয় না। তবে অতিরিক্ত বর্ষণের সময় জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার জন্য নিচু জমির ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু উঁচু জমির ফসল উপকৃত হয়। আবার বৃষ্টিনির্ভর জমিতে খরার সময় উঁচু জমিগুলি মার খেলেও নিচু জমিগুলির ফসল উপকৃত হয়।

বাগিচা ফসল ও উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র

নদিয়ার বাগিচা ফসলের এলাকা প্রায় ১২১৬ হেক্টর। এই ফসলের চাষ বাড়ানোর উপায় হল চাষযোগ্য অথচ পড়ে থাকা জমি বিশেষত—রাস্তার দুই পার্শ্বে—বিল, নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং সমাজভিত্তিক বাগিচা সৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে। অবশ্যই তণ্ডুল, ডাল বা তৈলবীজের এলাকার অপসারণ করে নয়। যদিও এখন এই জেলায় ফলবাগান তৈরি করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিশেষত কৃষ্ণগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, করিমপুর, তেহট্ট, কৃষ্ণনগর-২ (ধুবুলিয়া) ব্লকে। এ বিষয়ে এই জেলায় অবস্থিত বহু পুরাতন উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রের দীর্ঘকালীন উপস্থিতি একটা কারণ। আম, লিচু প্রধানত শান্তিপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, তেহট্ট, নাকাশিপাড়া, চাকদহ, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর ব্লকে উৎপন্ন হয়। এ জেলায় অর্থকরী ফল হিসাবে আমলকি, কুল, আতা, সফেদা, বেল, পেয়ারা, করমচা, কালোজাম, আনারস চাষ বাণিজ্যিকভিত্তিক করা সম্ভব। এ বিষয়ে ভাল জাতের চারা/কলম সরবরাহ ও কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। ভাল জাতের চারা/কলম ইত্যাদি সাধারণত বে-সরকারি নার্সারিগুলিই সরবরাহ করে থাকে। সরকারি পর্যায়ে এর সরবরাহ সীমিত। কৃষ্ণনগরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে মূলত বাগিচা ও সবজি বিষয়ে গবেষণা হয়। এই গবেষণা কেন্দ্রে কিছু কিছু সঙ্কর জাতের (Hybrid) বীজের গুণগত মান বিচারের পরীক্ষাও হয়। এখান থেকে উদ্ভূত আমের 'এপিকোটাইল গ্রাফটিং' সবচেয়ে কম খরচে স্বল্প পরিসরে চারা তৈরির উপায় কিন্তু সেভাবে প্রচার পায়নি। পরিকাঠামোগত কিছু কারণে এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজ কিছুটা ব্যাহত। বে-সরকারি স্তরে চারা বা কলম অনেক ক্ষেত্রেই মান ভাল না হওয়ায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁরা সরকারি উদ্যোগে তৈরি চারার প্রতি অধিক আস্থাশীল। সেজন্য এই গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত মালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির প্রতি আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মালীরা পরবর্তীকালে যেমন নিজে নার্সারি করে প্রকৃত ভাল জাতের চারা কলম তৈরি করবেন তেমনই প্রশিক্ষণ চলাকালীন সরকারি খামারেই প্রচুর চারা তৈরি করতে পারবেন। এই কেন্দ্রটি প্রায় এক দশক হল বন্ধ আছে। যদিও সরকারি পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি খালার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই গবেষণা কেন্দ্রের আম, লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম, সফেদা, বাতাবি ইত্যাদি নানা জাতের মা-গাছের অবস্থান বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এই পরিকাঠামোকে কাজে লাগালে বাগিচা ফলের বিশেষ উপকার হবে। যদিও এই গবেষণা কেন্দ্রে ফুলের উপর গবেষণা হয় না তবুও ফুলচাষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় রজনীগন্ধার নানা সমস্যা জেলায় দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ শাখা, গবেষণা শাখা একসঙ্গে মিলে ফুলচাষ এলাকার নানা ধরনের প্রয়োজনানুগ গবেষণা চালাচ্ছেন যাতে ওই সমস্যার স্বরূপগুলি ধরা যায়।

এ ছাড়াও বেথুয়াডহরীতে রাজ্যের একমাত্র ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র এবং রানাঘাটে সুষম জল ব্যবহার গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষ্ণনগরে আঞ্চলিক প্রয়োজনানুগ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলিতেও পরিকাঠামোগত অসুবিধাগুলি দূর করে আরও সৃষ্টিধর্মী কাজ করা সম্ভব। ফলস্বরূপ শুধু এই জেলা নয় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজ উপকৃত হবেন।

বে-সরকারি স্তরে চারা বা কলম অনেক ক্ষেত্রেই মান ভাল না হওয়ায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁরা সরকারি উদ্যোগে তৈরি চারার প্রতি অধিক আস্থাশীল। সেজন্য এই গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত মালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির প্রতি আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

নদিয়ার মোহনপুরে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এটি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, উদ্যানবিদ্যা, কৃষি কারিগরি বিষয়ে পঠন-পাঠন, গবেষণা এবং সীমিত এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণের কাজ হয়। অন্যান্য প্রদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেইসব প্রদেশগুলির কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা অসীম, সে তুলনায় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো নয়। জেলার প্রয়োজনীয় নতুন নতুন ভাল জাতের বীজ উৎপাদন এবং মাটি পরীক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিলে বড় উপকার হবে কৃষক সমাজের।

কৃষি বিপণন

এই জেলায় ১৪১টি ছোট বাজার এবং ২৩টি মাঝারি পাইকারি, ১১৭টি খুচরা বাজার মিলে মোট ২৮১টি বাজার আছে। চাকদহ, করিমপুর এবং বেথুয়াডহরীতে মোট তিনটি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি রয়েছে। কলকাতা কাছে থাকার জন্য সবজি চাষের এলাকা ক্রমেই বাড়ছে। বাজারগুলিতে ধান-পাট থেকে সবজি-আম-লিচু সমস্ত রকম ফসের পাইকারি বেচাকেনা হয়। নিচে পাইকারি বাজারগুলি ও তাদের সরবরাহকারী বাজারের তালিকা পরের পাতায় দেওয়া হল।

নদিয়া জেলার পাইকারি বাজার ও সরবরাহকারী বাজারের তালিকা

বাজারের অবস্থান	ব্লক	সরবরাহকারী বাজার	গন্তব্য বাজার
বাদকুল্লা	হাঁসখালি	তাহেরপুর, মামজোয়ান	কলকাতা
বগুলা	হাঁসখালি	রামনগর, ভৈরবচন্দ্রপুর	কলকাতা
বালিয়া	চাকদহ	শিলিন্দা, শিমুলিয়া, গোপালপুর, চাঁদডাঙা, দোরাবপুর	কলকাতা চাকদহ
বড় আন্দুলিয়া	চাপড়া	মালিয়াপোতা, বালিউরা, মহেশনগর, বীরপুর	কলকাতা
বেথুয়াডহরী	নাকাশীপাড়া	মাটিয়ারি, বড়চাঁদঘর, গাছা, বীরপুর, ধর্মদা	কলকাতা, নবদ্বীপ
ভীমপুর	কৃষ্ণনগর ১নং	ডফরপোতা, আন্দুলপোতা, মুড়াগাছা	কলকাতা
চাকদহ	চাকদহ	শিলিন্দা, বিষ্ণুপুর, চাঁদডাঙা, পায়রাডাঙা শিমুরালি, বিরহী	কলকাতা
চাপড়া	চাপড়া	দৈয়েরবাজার, রানাবন্ধ, হৃদয়পুর	কলকাতা, কৃষ্ণনগর
দেবগ্রাম	কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ, বার্নিয়া	কলকাতা, নবদ্বীপ, কাটোয়া
ধুবুলিয়া	কৃষ্ণনগর ২নং	গাছা, ধর্মদা	কলকাতা
হরিণঘাটা	হরিণঘাটা	নগর উখরা, কাঠডাঙা, বিরহী, বড়জাগুলিয়া	কলকাতা, নৈহাটি, ব্যারাকপুর
করিমপুর	করিমপুর ১নং	কেচুয়াডাঙা, বেতাই, নাজেরপুর, কাঁঠালিয়া, বাজিতপুর, মহিষবাথান, গোপালপুর ঘাট, হোগলাবেড়িয়া, শিকারপুর	কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, বহরমপুর, কাশিমবাজার
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর ১নং	দৈয়েরবাজার, কালিনগর, ভালুকা	কলকাতা ও কৃষ্ণনগর
মদনপুর	চাকদহ	বিরহী, মদনপুর	কলকাতা, নৈহাটি, ব্যারাকপুর
মাজদিয়া	কৃষ্ণগঞ্জ	বগুলা, বানপুর, গেদে, কৃষ্ণনগর, ভাজনঘাট, খালবোয়ালিয়া	কলকাতা
মীরাপলাশী	কালিগঞ্জ	শক্তিপুর, রেজিনগর, সাহেবনগর, বড়চাঁদঘর	কলকাতা
নবদ্বীপ	নবদ্বীপ	কৃষ্ণনগর, আসানসোল, নাদনঘাট, কলাতলা, ভালুকা	কলকাতা, কালনা, কৃষ্ণনগর রানাঘাট, বারাসাত, দমদম
নগর উখরা	হরিণঘাটা	নিমতলা, ঝিকরা, কাঠডাঙা	কলকাতা
নাজিরপুর	তেহট্ট ১নং	হরিপুর, মিরগি, নারায়ণপুর	কলকাতা, কৃষ্ণনগর, করিমপুর
পলাশীপাড়া	তেহট্ট ২নং	পাটিকাবাড়ি, কুলগাছি, সাহেবনগর, বেতাই, শ্যামনগর	কলকাতা
রানাঘাট	রানাঘাট ১নং	হবিবপুর, দত্তফুলিয়া, গাংনাপুর, ঘোলা, এরুলি	কলকাতা
শান্তিপুর	শান্তিপুর	ফুলিয়া, হবিবপুর, দিগনগর, তাহেরপুর, গোবিন্দপুর, নৃসিংহপুর, বাগ আঁচড়া	কলকাতা
তেহট্ট	তেহট্ট-১নং	বলিউড়া, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, গরিবপুর, রঘুনাথপুর	কলকাতা

রোগ পোকা দমন—সমন্বয় ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য :

গাছের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন উৎকর্ষসাধনের ক্ষেত্রে সুপরিচালনার কথা এসেই যায়। রোগ নিয়ন্ত্রণের আদর্শ নীতি হল। 'নিরাময়ের চেয়ে প্রতিবেধ ভাল।' এই কথাটি কৃষককুলকে প্রতিনিয়ত বোঝানো চলছে। ন্যূনতম রাসায়নিক প্রণালী ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উত্তম ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই জেলাতে সুসংহত রোগ পোকা দমন প্রকল্পের (IPM) কাজ খুবই সাড়া জাগানোভাবে চলছে। প্রতিরোধ প্রজাতি নির্বাচন, পরভুক জীব ও পরভোজীদের ব্যবহার, শস্য ও কৃষিব্যবস্থার পরিমার্জনার মাধ্যমে দেশীয় ও প্রবর্তিত প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, জীবাণুজাত ঔষধ তৈরি, যৌন হরমোন-সহ নানা আকর্ষক বিকর্ষকের ব্যবহার, নির্বাজিত করা ও বাছাই করা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটঘ্নের ব্যবহার প্রণালী গড়ে তোলার বিষয়ে যেমন কৃষকভাইদের বলা হচ্ছে তেমনই এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে প্রকৃতিজাত শত্রু দ্বারা পোকা দমন, মিত্র পোকা বা উপকারী পরজীবী চিহ্নিতকরণ এবং তার লালন-পালন করার প্রাথমিক স্তরগুলির বিষয়েও। ধানের উপর এই প্রকল্পের কাজ চলছে।

পরবর্তীতে অন্য ফসলের উপরও হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকারের সুসংহত উপায়ে রোগ পোকা দমন 'প্রকৃতিদেবী যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের সকলেরই একটা ইতিবাচক দিক আছে' এই আপ্ত-বাক্যকে পুষ্ট করছে। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবে পাশাপাশি ফসল উৎপাদনের খরচ কমাবে।

কৃষককে প্রযুক্তি অর্পণ :

মোটামুটি হিসাবে পুষ্টি জোগানের ফল হল এক কেজি এন পি কে লাগালে ১০ কেজি শস্য উৎপাদন বাড়ে। মাটি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সারের মাত্রা নির্ণয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আগাছা দমন, সুষম সার ব্যবহার, প্রয়োজনভিত্তিক অনুখাদ্যের প্রয়োজন, শস্য, সবজি ও ফল আহরণের আগে পরের ক্ষতি কমানোর প্রযুক্তিগুলি বর্তমান কৃষিব্যবস্থায় হাইব্রিড অতি উৎপাদনশীল বীজ, সুপারফাস্ট ধান ইত্যাদি অত্যাধুনিক সমস্ত প্রযুক্তিই নদিয়ার কৃষকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। রাসায়নিক দ্বারা আগাছা দমনের পদ্ধতিও বিশেষত ধানে ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব সারের মধ্যে বিশেষ করে সবুজ সারের চাষ, কচুরিপানা বা খামার কুড়ানো সারের উৎকর্ষ বাড়ানোর, ভার্মি কালচার বা কৃত্রিম উপায়ে কেঁচো চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আরও জোরদার হলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামে পণ্যমূল্য কম এমন জিনিস যথা গোবর, জ্বালানি কাঠ (পাটকাঠি) ও ফসলের বর্জিত অংশ অর্থাৎ অব্যবসায়িক সব জিনিস যা দিয়ে শক্তি উৎপাদনের মূল কাজটি হয়ে থাকে তাকে পুনশ্চ-ক্রায়িত করা অর্থাৎ এ সব বর্জিত বস্তু থেকে শক্তি উৎপাদনের যে সমস্ত কার্যকরী উপায় ইদানীং আবিষ্কৃত হচ্ছে তা আমরা এই জেলায় তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারিনি, বিশেষত গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট এই জেলায় সেভাবে গড়ে ওঠেনি। অবায়ুজীবীদের দ্বারা গাঁজিয়ে পুনশ্চ-ক্রায়িত করার এই পদ্ধতি সার ও শক্তি দুটিরই সমান্তরাল ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। আর একটি বিষয় এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন বীজ (বিশেষত সংকর জাতের) কৃষকরা বিভিন্ন বেসরকারি বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করছেন। এর ভাল দিক যেমন আছে তেমনই তিক্ত দিক হল নদিয়ার মাটি ও আবহাওয়ার অপরীক্ষিত এই নিত্যনতুন বীজ, কৃষিতে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করছে। চাষীর ফসল যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা কোনও কারণে তখন সরকারি কৃষি বিশেষজ্ঞরা বিব্রত বোধ করেন। তাই এই অবাধে সংকর জাতের বীজ বিক্রয়ের বিষয়টি ভাবা দরকার। সরকারি ও বেসরকারি যে স্তরেই হোক কৃষকের আরও কাছে যেতে হবে। নতুন গবেষণালব্ধ ফলকে প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে কৃষকের ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের পাশে

থেকে অর্পিত হওয়া উচিত এই প্রযুক্তি। এ বিষয়ে গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষি-ছাত্র, পঞ্চায়েত, সমাজসেবী সংস্থার একটা মেলবন্ধন দরকার। যদিও এই মেলবন্ধনই নদিয়া জেলাকে কৃষি বিপ্লবের সুফলগুলি দিয়েছে তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ফলনের জোয়ার দেখে কর্মে শিথিলতা কাম্য নয়। কৃষকের মনের আঙিনায় নতুন প্রযুক্তিকে পৌঁছে দেবার একটি সোপান হচ্ছে কৃষি সংবাদপত্র। জেলার কৃষি সংবাদপত্রগুলি সে দায়িত্ব পালনে যথাযথ এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে। তাই কৃষি সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা আরও সুসংহত হওয়া প্রয়োজন।

বীজ উৎপাদন ও বীজ খামার :

এই জেলায় মোট ৮টি খামার আছে এবং ৪টি গবেষণা কেন্দ্রের সংলগ্ন কৃষি খামার আছে। পরিকাঠামোগত কারণে কৃষি খামারগুলির অবস্থা ভাল নয়। ৮টি ফার্মের মধ্যে ৩টি মহকুমা প্রয়োজনানুগ কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র। এই কৃষি খামারগুলিতে নতুন নতুন শংসিত বীজ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে জেলায় প্রতি পাঁচ বছরে পুরনো বীজের পরিবর্তন করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হবে। ধান ও অন্যান্য যে সমস্ত ফসলের দেশি জাতগুলি এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তার সংরক্ষণ অতীব জরুরি। না হলে পরবর্তীকালে কৃষি গবেষরা ভীষণভাবে মার খাবে। হয়তো আমাদের একান্ত পরিচিত দেশি বীজটির চারা বিদেশ থেকে বহু অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি কৃষি খামারে অন্তত কিছু এলাকা ওই অঞ্চলের দেশি ধান ও অন্যান্য ফসলের প্রজাতিগুলি নিয়মমাফিক চাষ করে 'আদি প্রজাতি সংরক্ষণ' করা উচিত।

কৃষিনির্ভর শিল্পের সম্ভাবনা :

নদিয়া জেলায় কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত গ্রামীণ শিল্প সমবায়ভিত্তিক হতে পারে অবশ্য এই সমবায়ে অর্থলগ্নি করা গ্রামীণ মানুষগুলির আর্থিক ক্ষতির ব্যক্তিগত ঝুঁকি কম থাকবে তেমনই ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রের মতো লাভের অংশ হাতে পাবার সরাসরি সুযোগ রাখতে হবে। এ ছাড়া যে স্থানগুলিতে নতুন নতুন লাভজনক অথচ কম টাকা লগ্নি করতে হয় এমন চাষগুলির এলাকাভিত্তিক বাজার তৈরি করার ব্যবস্থা নিয়ে চাষীমহলে উৎসাহ সঞ্চার করা যেতে পারে। নদিয়া জেলায় শীতের মরসুমে গ্লাডিওনাস, চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ বা হোহোবা, মেন্থাখাস অথবা সিট্রেনিলা চাষ করা যায়। এতে ফুল বিদেশে পাঠানোর ব্যবসা বা হোহোবা থেকে ট্রান্সফর্মার তেল বা মেন্থা থেকে মেন্থল এবং সিট্রেনিলা তেল নিষ্কাশন শিল্প তৈরি হয়ে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের বেকার সমস্যার সমাধান করবে।

কাঁচামাল পাট ও পাটকাঠি :

নদিয়া জেলার করিমপুর, চাপড়া, তেহট্ট, কৃষ্ণনগর, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি প্রায় সব ব্লকেই প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। এই পাটের চট, সুতালি তৈরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাটকাঠি দিয়ে পিজবোর্ড (Paste board) বা কাগজ অথবা পাটকাঠির গুঁড়া দিয়ে নকল ছাদ তৈরির শৌখিন জিনিস হতে পারে। জেলায় ৭২৮৫০ হেক্টর জমিতে ৮৯৩৭৪১ বেল পাট উৎপাদিত হয় এবং প্রায় ৩২১৮৯০ টন পাটকাঠি পাওয়া যায়। যার বেশির ভাগটায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উৎপাদিত পাটকাঠির ৪০ শতাংশ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার ঠেকানো মুশকিল তা হলেও প্রায় ২ লক্ষ টন মতো পাটকাঠি এই শিল্পে লাগানো সম্ভব।

নদিয়া জেলায় কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত গ্রামীণ শিল্প সমবায়ভিত্তিক হতে পারে অবশ্য এই সমবায়ে অর্থলগ্নি করা গ্রামীণ মানুষগুলির আর্থিক ক্ষতির ব্যক্তিগত ঝুঁকি কম থাকবে তেমনই ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রের মতো লাভের অংশ হাতে পাবার সরাসরি সুযোগ রাখতে হবে।

পাট ও পাটকাঠি ব্লকভিত্তিক উৎপাদন

	পাট (বেল)	পাটকাঠি (টনে)
কৃষ্ণনগর ১নং	৫৯৮৫০	২১৫৪৬
কৃষ্ণনগর ২নং	৩৯৫৫০	১৪২৩৮
নবদ্বীপ	১৯৪৭৫	৭০১১
চাপড়া	৮৩৩০০	২৯৯৮৮
কৃষ্ণগঞ্জ	৫৫৩০০	১৯৯০৮
তেহট্ট ১নং	৫৬৬০০	২০৩৭৬
তেহট্ট ২নং	৪৫৫০০	১৬৩৮০
করিমপুর	১৯০৪০০	৬৮৬৮৮
নাকাশিপাড়া	৬৭২০০	২৪১৯২
কালিগঞ্জ	৩৩৩২০	১১৯৯৫
শান্তিপুর	১৯০০০	৬৮৪০
হাঁসখালি	৫২৬৫০	১৮৯৫৪
রানাঘাট ১নং	৩৩২০০	১১৯৫২
রানাঘাট ২নং	৩৭০৭৬	১৩৩৪৭
চাকদহ	৬৬৬০০	২৩৯৭৬
হরিণঘাটা	৩৪৭২০	১২৪৯৯
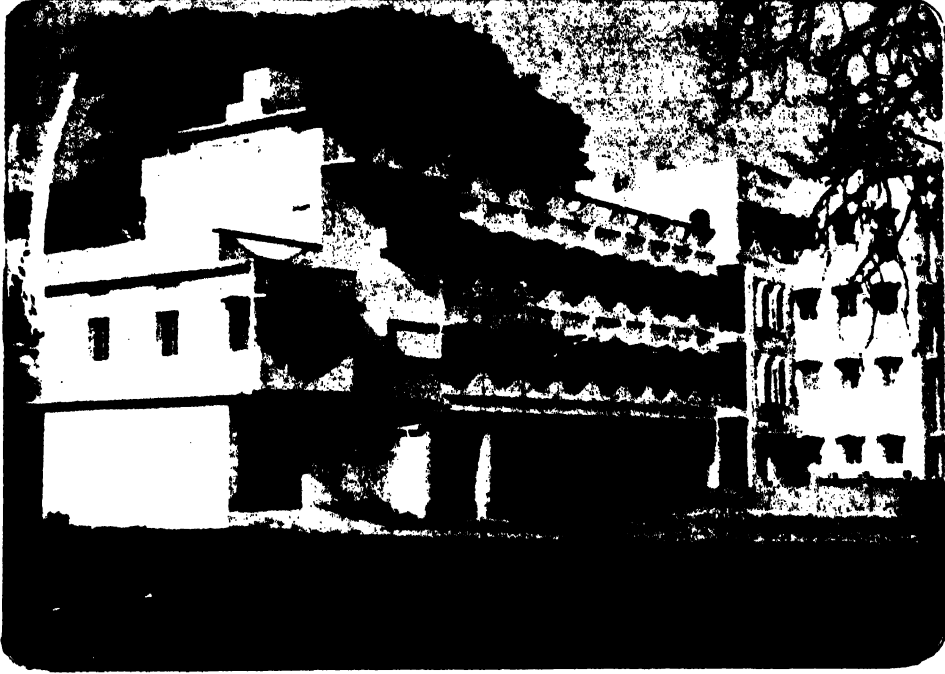
গ্রীন ভবন ।। কৃষ্ণনগর　　　　ছবি : সত্যেন মণ্ডল

কাঁচা মাল : হলুদ

করিমপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, হরিণঘাটা, কৃষ্ণনগর ১নং, চাকদহ, রানাঘাট ইত্যাদি ব্লকে হলুদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। নদিয়া জেলায় প্রায় ৫৭০ হেক্টর জমিতে হলুদ হয়। ফলন ১০৬৫ মেঃ টন। এই ফলনের কিছু অংশ পরবর্তী বছরের বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য ২৫০ মেঃ টন বাদ দিলেও ৮০০ মেঃ টন হলুদ গুঁড়ো করে প্যাকেটে বিক্রয় করা যাবে। ওই ব্লকগুলিতে পেঁপের চাষ বেশ হয়। ফলে প্যাপিন সংগ্রহ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

ডালের খোসা ছাড়ানো

জেলায় ডালের চাষ প্রায় ৭৩২৯৪ হেক্টর জমিতে ফলন: ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪৭১২২ মেঃ টন, এই ডালের বেশ কিছু অংশ খোসা ছাড়ানো মেশিনের সাহায্যে খাদ্য উপযোগী করে মহিলা শ্রমিক কাজ পাবেন। তা ছাড়া পাশাপাশি গোখাদ্যের জন্য চুনি করার ব্যবস্থা রাখা যাবে।

বাদাম তেলের কল

নবদ্বীপ, শান্তিপুর ইত্যাদি ব্লকে এখন প্রচুর চীনাবাদামের চাষ হচ্ছে। এই মূল্যবান ফসলের চাষ ব্যাহত হচ্ছে বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য। বাদাম তেলকল হলে চীনাবাদামের একটা তেজি বাজার গড়ে উঠবে ফলে এই ফসলের চাষে চাষীরা উৎসাহ পাবেন। এখন জেলায় প্রায় ১৪১/২ হাজার টন বাদাম উৎপন্ন হয়।

সবজি, ফল সংরক্ষণ ও হিমবাক্সে রপ্তানি শিল্প

এই জেলা সবজি ও ফল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। বাজারে হঠাৎ প্রচুর সবজি ও ফল আসার জন্য অনেক সময়ই দাম কমে যায়

সবজির বাজারদরের উঠানামার তালিকা (টাকা প্রতি কুইন্টাল)

সবজির নাম	সর্বোচ্চ দাম	মাস	সর্বনিম্ন দাম	মাস
বাঁধাকপি	৪০০	মার্চ	১০০	ফেব্রুয়ারি
ফুলকপি	৪০০	জুন	১২৫	সেপ্টেম্বর - অক্টোবর
টমাটো	১০০০	আগস্ট	১২৫	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি
বেগুন	৫০০	অক্টোবর	১৩০	ফেব্রুয়ারি
ঢেঁড়স	৭০০	জানুয়ারি	২০০	জুন
পটল	১০০০	মার্চ	৩০০	জুলাই - আগস্ট
কুমড়া জাতীয় ফসল	২৫০	নভেম্বর	১০০	এপ্রিল

সূত্র : Techno-Economic Possibility Report, July 1994, Finance Corpn. of India.

বিশেষ করে শীতকালীন সবজি। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে দাম কোনও কোনও ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ কমে যায়।

কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র মহীশূর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুষম খাদ্য-তালিকায় অন্তত ১৫২ গ্রাম সবুজপাতা সবজি ও অন্যান্য সবজি মিলিয়ে রাখতে বলেছেন। জেলায় কমপক্ষে ৬ লক্ষ মেঃ টন সবজি উৎপাদন হয় অথচ জনসংখ্যার নিরিখে এই জেলা সুষম আহারের ভিত্তিতে সবজি ব্যবহার করলেও ২ লক্ষ মেঃ টনের বেশি সবজি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে এই উদ্বৃত্ত বিশাল সবজি বাজারে ভিড় করলে দামের ক্ষেত্রে চাষী মার খেতে বাধ্য। সহজে পচনশীল এই সবজি যদি অন্তত ৩ মাস হিমঘরে রেখে বাজারে ছাড়া যায় তবে অন্তত ১০০ শতাংশ লাভ হবে। অথবা অন্য প্রদেশ থেকে যে পদ্ধতিতে মাছ পশ্চিমবঙ্গে আসে অর্থাৎ ইনসুলেশন ভ্যানে সেই পদ্ধতিতে পটল, চিচিঙ্গা, টমাটো, মূলা, বেগুন, ঝিঙা অন্য প্রদেশে চাহিদা অনুসারে চালান করা যায় তা একটা লাভজনক শিল্প হিসাবে এ জেলাকে সমৃদ্ধ করবে আশা করা যায়।

খেজুর গুড়—রপ্তানি শিল্প

জেলায় খেজুরের গুড় একটা সম্পদ। কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, কালিগঞ্জ, তেহট্ট ইত্যাদি ব্লকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের খেজুরের গুড় উৎপন্ন হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাজারে প্রচুর গুড় আমদানি হওয়ায় দাম অত্যন্ত নেমে যায়। এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট পাত্রে গুড় প্যাকিং করে পলিপ্যাকে অন্য প্রদেশগুলিতে রপ্তানির প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

কাঁচামাল—বোরো ধানের বিচালি

নদিয়ার আর একটি কাঁচামাল প্রচুর পাওয়া যায়। সেটি হল বোরো ধানের বিচালি। বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করতে পারেন এই সম্পদের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে।

১৯৯৪-৯৫ সালে ৮৪৩৬৫ হেক্টর জমিতে ৩০৪৮৩৭ লক্ষ মেঃ টন ধান ও সমপরিমাণ বিচালি হয়। শতকরা ৪০ ভাগ গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু এর ব্যবহার কম সেহেতু ১.৮ লক্ষ মেঃ টন বিচালি সম্ভাব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে পাওয়া যাবে।

একনজরে নদিয়ার কৃষি

১। নীট আবাদি জমি : ২৭২১৩৫ হে.

২। বহুফসলী এলাকা : ৩৩৪৫৭৫ হে.

৩। বাগিচা ফসলের এলাকা : ৭৭৫৭ হে. (ফল)
১৪৫৪ হে. (ফুল

৪। মোট আবাদি জমি : ৬৩৪০০ হে.

৫। চাষের নিবিড়তা : ২২৩

৬। সেচপ্রাপ্ত এলাকা
(ক) খরিফ : ১০৪৯২৮ হে.
(খ) রবি : ১২১২২৮ হে.
(গ) গ্রীষ্ম : ৮৬১৪৫ হে.
৩১২৩০১ হে.

৭। বার্ষিক গড় বৃষ্টি : ১৪৬৪ মি. মি.

৮। কৃষক পরিবার : ২৪৭৪৫৭

৯। ক্ষুদ্র কৃষক : ৭৩৩৭৩

১০। প্রান্তিক কৃষক : ১২১৬০৫

১১। কৃষি মজুর : ২২৫১৯৭

১২। সরকারি বীজ খামার :৮টি (এর মধ্যে তিনটি প্রয়োজনানুগ কৃষি গবেষণা খামার)

১৩। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র : ৪টি

১৪। বীজ সংস্কারণ সংস্থা : ১টি

১৫। সার বিক্রয়কেন্দ্র : ৩০৬৭

১৬। কীটনাশক ঔষধ বিক্রয়কেন্দ্র : সমবায়-৬১
ব্যক্তিগত-৮৬২
অন্যান্য ৬

১৭। হিমঘর : (ক) ৩টি
মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা : ১৬৪৫০০ মেঃ টন
স্থান—কৃষ্ণনগর, ফুলিয়া, নগর উখরা

১৮। বাজার
(ক) নিয়ন্ত্রিত - ২ (করিমপুর, বেথুয়াডহরী)
(খ) পাইকারি - ২৩
(গ) প্রাথমিক - ১৩২
(ঘ) খুচরা - ১৭২

১৯। ব্যাঙ্ক শাখাসমূহ
(ক) বাণিজ্যিক - ১১৪
(খ) গ্রামীণ - ৬৫
(গ) সমবায় - ১৩
(ঘ) ভূমি উন্নয়ন - ৫
(ঙ) অন্যান্য - ২

২০। ফল ও সব্জী সংরক্ষণ কেন্দ্র
(ক) সরকারি - ১ (প্রশিক্ষন ব্যবস্থা-সহ)
(খ) ব্যক্তিগত - ৬

২১। গভীর নলকূপ : ৬২৫

২২। নদী সেচ উত্তলন প্রকল্প : ৩১৯

২৩। অগভীর নলকূপ প্রকল্প : ৬৭৬২৪

উল্লেখপঞ্জি

ড. এম এস স্বামীনাথন — Our Agricultural future
শ্রীকালিপ্রসাদ বসু — 20 points, Nadia
নদিয়া জেলা নাগরিক পরিষদ — নদিয়া
মুখ্য কৃষি আধিকারিক, নদিয়া — নদিয়ার কৃষি
Agriculture finance Corpn. Ltd — Techno-Economic Feasibility Report, July, 1994

নদিয়ার লোকধর্ম ও লোকসমাজ

সুধীর চক্রবর্তী

বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত শ্রীচৈতন্যমূর্তি *ছবি : সত্যেন মণ্ডল*

আমাদের দেশে যত জিনিসের অপব্যাখ্যা হয়েছে লোকধর্ম তার মধ্যে একটি। ভদ্র রুচির শিক্ষিত উচ্চসমাজের মানুষ বহুবার লোকধর্মকে অনাচারবাদী, বিকৃতরুচি ও দেহসর্বস্ব বলে অপব্যাখ্যা করেছেন। এইসব ভুল বোঝাবুঝি ও বিতর্কের অবসান হতে পারে এদের পরম্পরা যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই চেষ্টার প্রথমেই একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া ভাল যে, বাউল ধারা আর সহজিয়া ধারা সমার্থক নয়। বাউল মতের সঙ্গে সুফি-ইসলামি-ফকিরি ও তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে একাত্ম হয়ে আছে। সহজিয়া মতে মিশে আছে তন্ত্র-বৈষ্ণবধর্ম-নাথপন্থ।

এই দুই ধারায় বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্য, ঠিক তেমনই বাস্তব এদের ভাবের একাত্মতা। শাস্ত্র কোরাণ মন্দির, মসজিদ, মোল্লাতন্ত্র যেমন বাউলের ঘৃণার সামগ্রী, তেমনই তাদের আস্থা মুর্শেদ আর মারফতী পথে। সহজিয়ারা বেদাচার মূর্তি ও মন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাদের আস্থা ভাবের মানুষ আর গুরুর প্রতি। মূলত সমাজে নিষ্পেষিত এইসব গৌণধর্মের মানুষ আত্মরক্ষার সহজ তাগিদে স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে আত্মগোপন করে থাকে। এই একই কারণে তাদের ক্রিয়াকরণ বাহ্যিকভাবে বর্জন করে চলে। সাধারণ মানুষের কথার জবাবে তারা প্রহেলিকা ভাষায় বিভ্রান্ত করে। সামাজিক সাধারণ

লোকাচার মেনে চলে। তাই এদের সহসা শনাক্ত করা যায় না। অথচ আমাদের উচ্চবর্গের পাশাপাশি এই লোকায়ত জীবনচর্যা গ্রামীণ জীবনের গভীরে সূক্ষ্মভাবে বহমান থাকে। এদের জগৎ নানা কিংবদন্তী অলৌকিকতায় ভরা। বহু গ্রামীণ মানুষ এই নিগূঢ় ধর্মের প্রবল আকর্ষণে একত্রিত হয়। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে—এইসব শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী মানুষ অন্তরের টানে মেলে। এদের মধ্যে যুগযুগান্তের সংক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। উচ্চবর্ণের কাছে এদের স্বীকৃতি বা সহানুভূতি কিছু জোটেনি। ধর্ম সাধনার স্বাভাবিক মানবিক স্বীকৃতিটুকুও এদের দেওয়া হয়নি।

শ্রীচৈতন্যের উদার উন্মুক্ত বৈষ্ণবধর্মের সংস্পর্শে এসে এইসব দলিত নিপীড়িত লোকধর্মের মানুষ বাঁচার একটি দিশা যেন পেল। জাতিবর্ণের সব বাধা-বিরোধ ঘুচিয়ে, শুধু হৃদয়ের নির্দেশে ভক্ত মানুষজনকে সংঘবদ্ধ করার প্রথম সর্বব্যাপী প্রয়াস শ্রীচৈতন্যই করেন। তাই আজও গ্রামীণ অসহায় মানুষ চৈতন্যকে ত্রাতা হিসাবে মানে।

সুদীর্ঘ ব্রাহ্মণ্য শাসনের ঝাপট এবং শক্তিমান সমাজপতিদের সামাজিক অগ্রাধিকার সমাজের নিম্নবর্গের মানুষকে শোষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবধর্মের নানারকম বিচ্ছিন্নতা ও তত্ত্বগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ে বাংলার বৈষ্ণবসমাজে দু'টি বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ছোট উপদলও কয়েকটি ছিল। এইভাবে বৈষ্ণবধর্ম দল- উপদলে বিল্লিষ্ট কণ্টকিত হয়ে এক চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হল। একদিনে এসব হয়নি। ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে চৈতন্য তিরোভাবের একশো বছরের মধ্যেই চৈতন্যের সমন্বয়বাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে থাকল। এই সময়ে বৈষ্ণবধর্মের একটি অংশ মননশীল শাস্ত্রের সংক্রামে মূল জনজীবন থেকে উচ্চমার্গে চলে গিয়েছিল—আর যে বিপুল সাধারণ বৈষ্ণবধর্মের অংশ—তারা নিমজ্জিত হল বিকৃত বৌদ্ধ যোগাচারের যৌনপঙ্কে। ইতিমধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সুফি সাধকদের আনাগোনা শুরু হয়। তাদের সরল সমর্পিত জীবনযাপন ও উদার ধর্মের পাশে কোরান ও নামাজ সংক্রান্ত মোল্লাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি খুব কট্টর পর্যায়ে পৌছে যায়। সাধারণ মুসলমান ও বহু শূদ্র, সুফিধর্মের উদার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। এই সময়ে যে সব সুফি প্রচারক প্রধানত নদিয়া জেলায় সুফিতত্ত্বের উদারতার কথা প্রচার করতে এসেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা দিয়েছেন আনোয়ারুল করিম তাঁর 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' বইতে। এইসব সুফি ফকিরদের কেউ চিসতিয়রা কেউ কাদেরিয়া গোষ্ঠীর। তাঁদের অনাড়ম্বর জীবন, একান্ত ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্মের সুন্দর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুব সহজে এইসব বিপথগামী, বিভ্রান্ত সরল মানুষকে আকর্ষণ করল ও সঠিক পথের দিশা দিল। লোকায়ত উদার ধর্মধারণার মধ্যে এইসব সুফি উদারচেতা সমন্বয়বাদী সাধকের কণ্ঠস্বরই সুনিশ্চিতভাবে ধ্বনিত হল। বাংলাদেশের তাত্ত্বিক লেখক বোরহামউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'বাউল গান ও দুদ্দুশাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন : 'সুফি প্রভাব বাউল মতবাদের চেয়ে বাউলদের জীবনযাপনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করেছে'। ১৭শ—১৮শ শতাব্দীতে এদেশে আগত সুফি প্রচারকরা তাঁদের উদার উজ্জ্বল, নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের প্রভাবে—সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করেছিলেন। দর্পিত ব্রাহ্মণসমাজ কিংবা কট্টর মোল্লাদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের দমন, পীড়ন ও শোষণের পথ ধরেননি। বরং জনজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের অংশী হয়েছেন। অবহেলিত এইসব মানুষের মনে বিশ্বাসে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন—ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়ে। ভক্ত সরল গ্রামীণ মানুষ তাই সহজেই উচ্চারণ করে উঠেছে রাধাকৃষ্ণ আল্লারসুলের নাম। সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ও মূর্তিপূজা বর্জন করে এরা শ্বাসের কাজ বা দমের কাজ যা সুফি সাধনার একান্ত নিজস্ব, তাকে গ্রহণ করেছে।

মধ্যযুগের বাংলায় বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতির নানারকম গূঢ় মিশ্রণ ঘটেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেক সময়ই দেখা যায় ধর্মের নির্দেশ বা শাস্ত্রধারণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব বিচারশীল বা নিষ্ঠাশীল হয় না। কারণ, শাস্ত্র বা ধর্ম সম্পর্কে সঠিক পথ বা নির্দেশ তাদের কাছে পৌছোয় না। এইসব অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ সংস্কৃত বা আরবিতে লেখা শাস্ত্রের মর্ম জানে না—কারণ, পড়তে পারে না। তারা নিজেদের মতো করে সব তৈরি করে নেয়। শাস্ত্র বিশ্বাস আর আচরণবাদকে বড় করে না দেখে ভাব ও আবেগ দিয়েই সব অনুভব করার চেষ্টা করে। এরাই কালক্রমে সত্যনারায়ণের সঙ্গে পিরবাদকে মিলিয়ে সত্যপীর দেবতা তৈরি করেছে, যেখানে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে তাদের প্রাণের আর্তি পেশ করেছে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর উদার বৈষ্ণব মত নিম্নবর্গের মানুষের মনে যে উদ্দীপনা ও বাঁচার মন্ত্র রচনা করেছিল তার সঙ্গে সুফি মতের উদার মানবতার মিশ্রণে বহু গৌণধর্ম গড়ে ওঠে।

আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান ইত্যাদি বড় বড় ধর্ম সম্প্রদায়গুলির প্রধান লক্ষণ শাস্ত্র-নির্ভরতা। এদের বাইরে ছোট ছোট যে লোকধর্ম গড়ে উঠেছিল, সেগুলো সবই বড় ধর্মের বিরুদ্ধতা করে নয়, অনেকটা সমান্তরাল চিন্তাধারা থেকেই। শাস্ত্র নয়, গুরুকে অবলম্বন করেই এই ব্রাত্য, গ্রামীণ সাধারণ বঞ্চিত হতদরিদ্র মানুষ তাদের বাঁচার আশ্রয় রচনা করেছে। স্বনির্ভর এই ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে তারা নিজেদের ধর্ম নিজেদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মন্ত্র রচনা ও গুরু নির্বাচন করে নিয়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে এরা নিজেদের গোপ্য সাধনার ধারা রক্ষা করে চলছিল। প্রাথমিকভাবে এই সাধনার অঙ্গ ছিল নাম ও রূপ সম্পর্কে ঠিকঠাক ধারণা তৈরি করা। দেহ ও দেহকেন্দ্রিক সবকিছু সম্পর্কে মনকে নির্বিকার করে তোলা, শাস্ত্র, পুরাণ, মন্ত্র মূর্তি ও জাতিবর্ণ. সম্পর্কে প্রতিবাদী করে তোলা। গুরু ও গুরুবাদের প্রাধান্য এই ধর্মের ভিত্তিমূল এবং তার থেকে অনুমান থেকে বর্তমানের সাধনার প্রতিষ্ঠা। রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বৃন্দাবন ইত্যাদি বলতে 'অনুমান', বাস্তব নরনারী, তাদের দেহ ও দেহধর্ম, কাম ও কামকে অতিক্রম করা ইত্যাদি 'বর্তমান'। এ সবই তারা ব্যক্ত করেছে গানে। সেইজন্যই দেহতত্ত্বের গান লোকধর্মের সবচেয়ে দ্যোতনাময় অঙ্গ। ভেবে দেখতে গেলে মনে হয়, ইংরেজই শুধু আমাদের এই তিমিরান্ধ দেশে আলোর মশাল জ্বেলে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে সমাজ আর ব্যক্তির মনে

বহুতাধর্ম এনেছে—এই মতবাদ সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে। আমাদের অনুন্নত সমাজে নিজেদেরই একটা অন্তশ্চেতনাময় উৎস আছে, মুক্ত ভাবনার জানলা আছে, মানবিক বিশ্বাসের ভিত আছে। তার অনুসন্ধান পাওয়া যায় লোকধর্মে, হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত গ্রামীণ লোকজীবনে, গুহ্য আউল-বাউল-দরবেশ-কর্তাভজা সাহেবধনীদের ক্রিয়াকরণে। হয়ত তাঁদের মুক্ত বিশ্বাসের উৎসারণে কাজ করেছে পরোক্ষ চার্বাক পন্থা বা মরমী সুফিবাদ। গ্রামীণ জীবনে নানা জীবিকার নিত্য লেনদেন। কিংবা এক একজন লৌকিক সাধকের আদর্শ জীবনের বিগ্রহ তার সহায়তা করে থাকতে পারে। ধর্মের নামে কুহক, শাস্ত্রের নামে পুরোহিত তন্ত্র, উপাসনার চেয়ে উপসনাগৃহের গুরুত্ব, ঈশ্বরের নামে দারুমূর্তি এইসব গ্রামীণ সাধককে মনঃপুত ছিল না। লোকধর্মের দিগন্ত বহুধা প্রসারিত এবং অনাবিল ঔদার্যে বিস্তৃত। ভূগোলের বেড়া নেই, ধর্মের বেড়ি নেই, কারণ, একমাত্র মানুষই তাদের উপাস্য। তত্ত্বগতভাবে ও বিশ্বাসে, আচরণে লোকধর্ম শরিয়ত- বিরোধী। বিরোধী শাস্ত্রশাসিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যতারও। বিরোধিতার বিস্তার আরও বহুদিকে। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও শাস্ত্রাচারের বাইরে লোকধর্মের অনীহা আছে বেদ-কোরানে, মন্দিরে-মসজিদে, পুতুলপুজো আর অপদেবতার বন্দনায়, অলৌকিকে। জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদ তাদের স্পর্শ করে না, গঙ্গাজলের মহিমা নেই। স্মৃতিশাস্ত্রের পুরোহিত আর কোরানজীবিত আলেম মোল্লাকে তারা দূরে রাখে। তারা কাছে টানে কেবল মানুষকে, যে মানুষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। যে মানুষ দেহধারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কদাচ বৈরাগ্যবাদী নয়। তারা চায় নরনারীর সবল ও সহজ যৌনতা, আবার সেই যৌনতার কর্তৃত্ব দেহবোধের এবং শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে। এইখানে তারা মানে গুরু কিংবা মুরশিদকে। কেননা, গুরু ও মুরশিদ পথদ্রষ্টা, পরিচালক। লোকধর্মে সবচেয়ে বড় স্থান পায় অনুমানের চেয়ে বর্তমান, পরলোকের চেয়ে ইহলোক, আত্মার চেয়ে দেহ, মন্ত্রের চেয়ে গান, ঈশ্বরের চেয়ে গুরু। তারা মেনে নেয় মাটি আর মানুষ, বীজ আর জমি, নর আর নারী, উর্বরতা আর প্রজনন এবং তার নিয়ন্ত্রণ আপন পরিসীমায়। এতসব অনন্যতা অনুধাবন করলে বোঝা যায় লোকধর্ম আসলে এক ধরনের প্রতিবাদ কিংবা দ্রোহ থেকে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ বা দ্রোহই হয়ত তার শেষ কথা নয়। একটা ভিন্নতর পথের নির্দেশ, জীবনযাপনের অন্যতর এক দিশা দেখানোও তার লক্ষ্য। নানা স্ববিরোধে ও তত্ত্ব জটিলতায় কোনও কোনও লোকধর্ম উচ্চবর্গের সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক ধরনের সহকারিতাও করে ফেলে হয়ত। শাস্ত্র, প্রতিমা, মন্দির, পুরোহিতকে বর্জন করে কোনও কোনও লোকধর্ম গড়ে তোলে সমান্তরাল ধর্মনির্দেশ, গুরুপাট কিংবা ধর্মাচার। প্রবর্তকের নামে গড়ে ওঠে কিংবদন্তী। স্থান মাহাত্ম্য কিংবা বাকসিদ্ধির অলৌকিকতা আচ্ছন্ন করে তোলে মূল আয়োজনের শুদ্ধতা। ধীরে ধীরে লোকধর্মের প্রবর্তকের উত্তরপুরুষ শিষ্যদের কাছ থেকে অর্থ আদায় (যাকে বলে খাজনা বা জরিমানা) করতে থাকেন। বড় ধর্মের মতো লোকধর্মেও আসে বিকৃতি ও ব্যভিচার, পথভ্রান্তি ও ভুল ভাষ্য। কিন্তু সব বর্গের গৌণধর্ম এমন হয় না।

হিসেব করে দেখা গেছে, দীর্ঘ দু'শো বছর ধরে বাংলার লোকধর্মের প্রধান শাখা ক'টির উদ্ভব ঘটেছিল নদিয়া জেলাতেই এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়ে গেছে এখানে যে, ধর্ম সাধনায় তারা মানুষকেই প্রধান স্থান দিয়েছে। নদিয়া থেকে সংগৃহীত একটি গানে বলা হয়েছে :

মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ সাধন ধন
করো সেই মানুষের অন্বেষণ।

আমাদের জেলার গগন হরকরার গানে মনের মানুষের জন্য আর্তি রবীন্দ্রনাথেরও মনে ঢেউ তুলেছিল। লালন ফকিরের গানে কাঙাল হরিনাথের গানে গোঁসাই গোপালের গানে, এমন কি মীর মশাররফ হোসেনের গানেও মানুষের সম্পর্কে আকুলতার শেষ নেই। মেহেরপুরে বলরাম ভজাদের গানে শ্রীচৈতন্যের যে প্রতিমা দেখতে পাই, তাতে দেখা যায় :

নবদ্বীপে এসে ছিন্নবেশে কেঁদে গেল শচীর গোরা
কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণ মানুষ দেখসে তোরা

লেখনীর একটানে ছিন্নবেশ উদাসী গোরাচাঁদ পেয়ে যান বলরাম হাড়ির মানবিক মূর্তি। বলরাম ভজারাই আর একটা গানে বলেছেন : 'মানুষ মানুষ সবাই বলে কে করে তার অন্বেষণ'? নদিয়ার লোকধর্ম প্রকৃতপক্ষে ধারাবাহিক এক মানবিক অন্বেষার আখ্যান। এই আখ্যানের নায়করূপে যদি আমরা লালন ফকিরকে স্থাপন করি, তবে দেখা যাবে রামমোহনের সমকালীন এই গীতিকার দু'শো বছর আগে জাতি-বর্ণের উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে জাতিবর্ণ ধ্বংসের ফতোয়া দিয়েছিলেন। আমাদের সভ্য সমাজে 'জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা'—তাঁরই প্রথম চোখে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলোকিত বিকিরণ এবং উচ্চবর্গের আভিজাত্যের দম্ভ আমাদের এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, আমরা বহুদিন ধরে নিম্নবর্গে ধর্মসাধনার শক্তি, সাহস ও স্বাধিকারকে বুঝতে পারিনি।

আসলে বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের এক ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রামিক নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের শতাব্দীবাহিত ধর্মাচরণের মূল সূত্রটি পাওয়া যাবে না। বাংলা লোকধর্মের উদ্ভব ও বিস্তৃতির এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ নানা কারণেই রচিত হওয়া জরুরি। বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস প্রণেতারা শ্রীচৈতন্যদেবকে বাঙালির ধর্মমুক্তির ভগীরথ হিসাবে চিহ্নিত করলেও সেই ধর্ম সমন্বয়ের প্রবল বেগ কীভাবে গ্রামীণ ধর্মকে জাগরিত করেছে, তার বিবরণ পেশ করেননি।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বাংলার যাবতীয় উপধর্মগুলিকে 'বাউল' নামাঙ্কে সাধারণীকরণ করেছেন, ফলত, তাঁর মতে পশ্চিমবাংলার বাউলদের দু'টি শ্রেণী—রাঢ়ের বাউল আর নবদ্বীপের বাউল।

বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য। বাংলার লোকধর্মের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখা (যেমন : কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী) আদৌ বাউল মতাবলম্বী নয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদেও তারা ভিন্ন। আলখাল্লা, কেশবিন্যাস, তিলকধারণ প্রভৃতির বদলে তারা গৃহস্থের

বীরনগরের উলাই মেলা — ছবি : প্রকাশ চক্রবর্তী

মতো সাধারণ পোশাকধারী। কৃষিকর্মে উৎসাহী সামাজিক জীবনের অংশী। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্রে এদের সাংবৎসরিক যাতায়াত এবং বছরের বাকি সময় সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে গুরুপাটে অথবা স্বগৃহে নিজস্ব গুহ্যসাধনা অব্যাহতভাবে চলে। সেই কারণে এদের আলাদাভাবে বাউলদের মতো চিহ্নিত করা মুশকিল। তা ছাড়া, এইসব সম্প্রদায় ক্রমাগ্রসর আধুনিক সভ্যতার চাপে ও উচ্চবর্ণের প্রভাবে বিলীয়মান হয়ে আসছে। তবু শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বাংলার বিচিত্র লোকধর্মের সজীব প্রবাহের সত্য ইতিহাস এইসব ক্ষীণায়ু ধর্মসম্প্রদায়ের ভীরু ও দরিদ্র গ্রামীণ ধর্মগুরুর সান্নিধ্যে পরিস্ফুট হয়। হাতে লেখা নানা পুস্তিকা ও বিচিত্র ভাষায় বিরচিত মন্ত্রতন্ত্র, আয়ুর্বেদবিধি, কবচ নির্ণয়ের মধ্যে বাংলার ব্রাহ্মণেতর নানা সম্প্রদায়ের সরল জীবনযাপনের সুতীব্র সরসতা আমাদের নাড়িয়ে দেয়।

বিশেষভাবে নদিয়া জেলাতেই আউলেচাঁদ প্রতিষ্ঠিত কর্তাভজা সম্প্রদায় সাহেবধনী প্রতিষ্ঠিত সাহেবধনী বা দীনদয়ালের ঘর, বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত বলরামীগোষ্ঠী, খুশি বিশ্বাসের নামে খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং লালন প্রবর্তিত লালনশাহী মত—এমন প্রবল পাঁচটি লোকধর্ম উদ্ভূত হল তার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। বস্তুত, বাংলার ধর্মসাধনা ও সমাজবিপ্লবের ভিত্তিমূল নদিয়ার মাটিতে প্রোথিত এবং তার বীজাঙ্কুর নবদ্বীপে প্রথম শাখায়িত হয়। বাংলার আদি ইতিহাসে গৌড়ের পতনের পর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে বাংলা সংস্কৃতির নবরূপ গড়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই নবদ্বীপ সংস্কৃত শাস্ত্র ও ন্যায়চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রবর্তনায় যে বুধমণ্ডলী বিশুদ্ধভক্তি ও জ্ঞানমার্গের চর্চা করতেন, মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গঙ্গাতীরবর্তী নদিয়ার কয়েকটি গ্রামে (বামুনপুকুর, বেলপুকুর, মুড়াগাছা, ধর্মদহ, বিল্বগ্রাম, দেবগ্রাম ও কালীগঞ্জ) আত্মগোপন করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখেন। নদিয়ার জাতিবর্ণ সংক্রান্ত, সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই জেলা অব্রাহ্মণপ্রধান। মূলত, বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায় নিয়ে এখানকার জনসমষ্টি গড়ে উঠেছে। অথচ উল্লিখিত সাতটি গ্রামে এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণপ্রধান ও শাক্তধর্মে উদ্বুদ্ধ।

বিগত পাঁচশো বছরে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র ও নব্যভক্তিবাদের এক অভূতপূর্ব সঙ্গমে সামগ্রিকভাবে বাঙালির ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন প্রমুখ শতাধিক পণ্ডিত চিরস্মরণীয়। বাংলার নব্যস্মৃতি শাস্ত্রে স্মার্ত রঘুনন্দনের নাম পূর্বাচার্য হিসাবে স্বীকৃত। বাঙালির দীর্ঘজীবিত তন্ত্রসাধনার নবরূপকার তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ (বর্তমানে বাংলার সর্বত্র পূজিত কালীমূর্তি এঁরই পরিকল্পিত) নবদ্বীপে চৈতন্য সমসাময়িক বলে অনুমিত হয়। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য নব্যভক্তিবাদের প্রবক্তা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তথ্য। একদিকে ব্রাহ্মণের সমাজশাসন আরেকদিকে মুসলমানদের অত্যাচার থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব উদার মানবধর্ম প্রচার করেন, যার নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে মানুষের মুক্তিদূতরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। নদিয়া তথা বাংলার লোকধর্মের উৎস সন্ধানে শ্রীচৈতন্যের পরিকল্পিত উদার ধর্মমত ব্যাপকভাবে খুঁজে পাই।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব দেন। নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্র বজ্রভ্রষ্ট ও পলাতক বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্মের উদার ছত্রতলে আশ্রয় দেন।

এই নিয়ে অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত অদ্বৈত সমর্থিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম মূলত শান্তিপুরে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উদার বৈষ্ণবতার সার্বজনীন প্রসার সারা বাংলার অনুন্নত মুমূর্ষু ও অবজ্ঞাত নানা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

হতমান মানবতার এই জ্যোতিরুৎসবে শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেন মুক্তিদূত ও ত্রাতার সাধারণ প্রতীক। সাধারণ মানুষের এই নবোন্মাদনা ও বিপুল উৎসবে নানা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিশ্বাস ও আচার কালে কালে বৈষ্ণবধর্মে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সার্বিক সমীকরণের তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রবেশ করে তন্ত্রসাধনা, বিকৃত বৌদ্ধবাদ, নাথপন্থের গুরুবাদ ও সহজিয়া ধর্মের যৌন-যোগাচার। সহজিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের গোপীভাবে সাধনার বিরোধিতা করে নরনারী মিথুনাত্মক (কৃষ্ণরাধার নামাশ্রয়ে) এক প্রত্যক্ষ দেহবাদী সাধনা প্রবর্তন করেন। এই সাধনায়, 'The worshipper is to think of himself as Krishna and is to realise within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by the female companion of his worship. Through sexual passion salvetion is to be found. The Radha-Krishna stories are held as the justification of their practice, which are secret and held at night'.

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রাধার বৃন্দাবনলীলা এইভাবে লৌকিক ধর্মকে স্বতন্ত্র পথচারী করল। লৌকিক ধর্মসাধকরা কৃষ্ণরাধাকে তাঁদের কায়াসাধনার ভিত্তিমূলে আদর্শরূপে স্থাপন করলেন। প্রসঙ্গত তাঁরা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ, বীরভদ্র ও রায়রামানন্দকে এবং সর্বোপরি শ্রীচৈতন্য গৃহীত হলেন এইসব লোকধর্মের সর্বস্বীকৃত দিশারিরূপে। কারণ, এঁদের 'জনশ্রুতিজাত ধারণা স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধনপ্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক'।

পরবর্তীকালে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলেচাঁদকে চৈতন্যের অবতাররূপে নির্দিষ্ট করে এঁরা প্রচার করেন, 'চৈতন্যদেব স্বয়ং আউলেচাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধনপ্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।'

নদিয়া জেলার কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ। আউলেচাঁদ উলা, খোলাদুবলি প্রভৃতি গ্রামকে দীক্ষিত করে অবশেষে ঘোষপাড়ায় প্রেরিত শিষ্য রামশরণ পালকে খুঁজে পান। রামশরণ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, জাতিতে সদ্‌গোপ। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ধনী নামে মুসলমান নারী মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে আবির্ভূতা হন। পরে শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি নদিয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। এঁদের শ্রীপাট চাপড়া থানার অন্তর্গত বৃত্তিহুদা গ্রাম। সম্প্রদায় সংগঠকের নাম চরণ পাল, জাতি, গোপ, খুশি বিশ্বাস সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ নদিয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাগাগ্রামে। খুশি বিশ্বাস মুসলমান সম্প্রদায়ের। বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরামচন্দ্র নদিয়া জেলার মেহেরপুর নিবাসী, জাতিতে হাড়ি। লালন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক লালন শাহ্ নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া থানার অন্তর্গত সেঁউরিয়া গ্রামে আখড়া বেঁধেছিলেন।

তিনি হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান কিংবা মুসলমান ফকির তার নিষ্পত্তি হয়নি। যাই হোক, এই তালিকা থেকে নদিয়া জেলার লোকধর্মের সূচনা ও বিকাশে ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ও নেতৃত্বের চিত্র স্বতঃস্ফুট। শুধু চৈতন্যস্পর্শধন্যতা এর কারণ নয়। তার সঙ্গে জেলার জনসমষ্টির সাধারণ চারিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। এই জেলার প্রধান অধিবাসীরা মাহিষ্য সম্প্রদায়, গোপ, সদগোপ, মুসলমান (প্রধানত মাহিষ্য সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত), কর্মকার, মুচি, জোলা, যুগী, তাঁতি, প্রামাণিক ও অন্যান্য। বিগত দুই-তিনশো বছরব্যাপী নদিয়ার অভিজাত শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈবধর্মের তীব্র প্রতিস্পর্ধীরূপে এইসব লোকধর্ম প্রধানত গ্রামকে ঘিরে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধানত নগরকেন্দ্রিক অভিজাত শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈবধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে গ্রামে-গাথা লোকধর্মের প্রবল পরাক্রম ও সত্য মূল্য যাচাই করেননি। তা করতে পারলে আমাদের বৈষ্ণব ও শাক্তপদ সাহিত্যের সমান্তরালে বাংলার লোকধর্মবাহিত লোকসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র গীতিশাখার রূপ উন্মোচন হত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, লালশশী, কুবির গোঁসাই, যাদু বিন্দু প্রমুখের গান যথার্থরূপে প্রতিভাত হত। বাউল গানের অস্পষ্ট ও সাধারণ সংজ্ঞায় রুদ্ধ হয়ে থাকত না।

ধর্মাদর্শগত সংঘাত, সংগ্রাম এবং তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া ও বৈপরীত্য নদিয়া জেলায় যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনই রোমাঞ্চকর। নবদ্বীপ-শান্তিপুরে বৈষ্ণবরস সাধনার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। সেখানকার পাড়ায় পাড়ায় বৈষ্ণবতীর্থ ও রসনিকুঞ্জ। নবদ্বীপের অনতিদূরে অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবতীর্থ। চৈত্রমাসের বারুণীমেলায় এখানে জয়দেব কেঁদুলীর মতো বিপুল জনসমাগম হয়। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের রাসের উৎসব ভারতবিখ্যাত। এ ছাড়া নদিয়ার বিভিন্ন অংশে রাসযাত্রা ও স্নানযাত্রা লোকপ্রিয়। প্রসিদ্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : চৈত্রমাসে কৃষ্ণনগরে বারদোল, কৃষ্ণগঞ্জের অন্তর্গত দিগম্বরপুরের স্নানযাত্রা, নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত গোটপাড়ার স্নানযাত্রা। এ ছাড়া কালীগঞ্জের মহুয়া, তেহট্টে কৃষ্ণরায়ের রাস, করিমপুরের মুরুটিয়া, চাকদার যশড়া, আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের রাস ও শান্তিপুরের বাবলার রাসও প্রসিদ্ধ।

নদিয়ার ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকায় শক্তিসাধনার বাহুল্য লক্ষণীয়। বামুনপুকুর, বেলপুকুর, বিল্বগ্রাম ও কালীগঞ্জে কালীপূজার রাতে ঘরে ঘরে শক্তিসাধনা হয়। এ ছাড়া আঞ্চলিক শক্তিদেবীর বিবিধ পূজার তালিকায় মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কালীগঞ্জের অন্তর্গত জুড়নপুরের কালী, কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরী ও আনন্দময়ী, নবদ্বীপের 'পোড়ামা' বা বিদগ্ধজননী, বিল্বগ্রামের বিল্বেশ্বরীদেবী, মুড়াগাছার সর্বমঙ্গলা, বড়চাঁদ ঘরের যশদায়িনী, বীরনগরের উলাইচণ্ডী, যশড়ার বুড়ো মা, কালীগঞ্জের রাজরাজেশ্বরী বাগ আঁচড়ায় বন্দেবী। নবদ্বীপে বৈষ্ণব রাসযাত্রার জনপ্রিয়তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অজস্র শক্তিমূর্তি রাসযাত্রার দিন পূজিত হয়। শক্তিপূজার ক্ষেত্রে অন্যতর উদাহরণ কৃষ্ণনগরের

জগদ্ধাত্রী পুজো, যার পরিকল্পক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। নদিয়া জেলার শৈবপ্রভাব তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ।

নবদ্বীপের কাছে সুবর্ণবিহার বৌদ্ধপ্রভাবের ক্ষীণ সূত্র বহন করছে। এ ছাড়া নবদ্বীপে প্রাচীন মূর্তিগুলির যুগনাথ শিব, পারডাঙ্গার শিব, দণ্ডপাণি শিব প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাবান্বিত।

নদিয়া জেলার অভিজাত ধর্মসাধনার পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবী ও ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয় উন্মোচন করা প্রয়োজন। পঞ্চানন্দের পূজাও জেলার দু'জায়গায় প্রসিদ্ধি পেয়েছে— কৃষ্ণনগর থানার হরিশপুরে এবং নাকাশিপাড়ার বেকোয়াইল গ্রামে। অম্বুবাচির পর্ব বসে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আশানগরে, কৃষ্ণগঞ্জের খাটুরায় এবং নাকাশিপাড়ার সাহেবতলায়। মনসাপুজার প্রধান কেন্দ্র চাকদহের অন্তর্গত জলকর মথুরাপুরে, চাকদহে, মথুরাগাছিতে ও নাকাশিপাড়ার ব্রাহ্মণীতলায়।

বস্তুত, নদিয়া জেলার লোকধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান যৌথ সাধনার ক্ষেত্রে। নদিয়ার প্রসিদ্ধ পীরতলাগুলির সংখ্যাবাহুল্যে এই বিস্ময়কর সত্যের আভাস মেলে। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য : নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত নাঙ্গলা গ্রামের কাটাপীর, করিমপুরের থানাপাড়ার জঙ্গলিপীর, রানাঘাটের মাজদিয়ায় গোরা শহিদ পীর, রানাঘাটের হবিবপুরে মীর মহম্মদ ফকিরের দরগা, চাকদহের শ্রীনগরে গাজীসাহেবের থান, চাকদহের কুমারপুরে মানিকপীর ও সত্যপীর, চাকদহের চাঁদমারিতে গাজীসাহেবের দরগা, চাকদহের ঘোড়াগাছায় ঘোড়াপীর, কুমারপুকুরের বড়পীর, হরিণঘাটার উত্তর রাজপুরে ফতেমা বিবির থান, হরিণঘাটার কাটডাঙায় মানিকপীর এবং শান্তিপুরের মালঞ্চ গ্রামে গাজীমিঞার দরগা। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির conception-এ গত শতাব্দীর লোকধর্মের বহুপূজিত 'সত্য'— নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। গুরু সত্য, সাঁই সত্য, খাকি (অর্থাৎ মাটি) সত্য, আলোক সত্য—এই কথাগুলি সকল লোকধর্মের সাধারণ বীজমন্ত্র। এঁদের ধর্মসাধনায় গুরুবন্দনা, রাতশোধনের মন্ত্র, মাটির কার্য, নলের কার্য প্রভৃতি মন্ত্র সাধনে ও পদ্ধতিতে বিশেষ ঐক্য রয়েছে। আমাদের সংগৃহীত এই জাতীয় গুপ্তমন্ত্রের একত্র সন্নিবেশ থেকে গোরক্ষনাথের ঘর, কর্তাভজা বা সতীমার ঘর, সাহেবধনী বা দীনদয়ালের ঘর, কালার ঘর ও বলরামী সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতিগত সমতা প্রমাণিত হয়। যেমন :

সতীমা-র ঘর

বং চং হং সত্য।
ভগ শুদ্ধ নিরঞ্জন।
সতীমা সত্য। গুরু সত্য। বাক সত্য। ঠাকুর সত্য।

সাহেবধনীর ঘর

ক্লিং ক্লিং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়।
গুরু সত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্র-সূর্য সত্য।
খাকি সত্য। দীননাথ সত্য। দীনদয়াল সত্য। দীনবন্ধু সত্য।

কালার ঘর

রাধা-কৃষ্ণ যুগল রূপ কামবীজ সার।
এই তিনবীজের পরে বীজ নাহিক আর॥
নিত্যরূপে কালাবীজ কালাসত্য সার।
তিলে তিলে না ভাবিলে তত্ত্ব জানা ভার॥
দোহাই কালা সত্য। কালা সত্য। কালা সত্য।

এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এইসব লোকধর্মের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন যে খুবই ছিল, তা এদের মন্ত্র, আচার, লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাদৃশ্য থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় করা যায়। এইসব বিতর্কিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নিন্দিত লোকধর্ম সম্প্রদায় বাংলার অসংখ্য গ্রামে স্বনির্বাসিত ছিল ও আছে। ব্যাপকভাবে বাংলার উচ্চসমাজে এঁদের ভাবসাধনা উপেক্ষিত। সারস্বত সমাজেও এইসব লোকধর্ম উপেক্ষিত থেকে যেত, যদি না এইসব সম্প্রদায়ের কেউ না কেউ গান লিখতেন। কর্তাভজাদের ধর্মীয় তত্ত্বরূপ পেয়েছে লাল শশীর গানে, লালন ঘরানার মূল সত্য মেলে লালনের গানে আর সাহেবধনীদের দীনদয়াল মত অভিব্যক্ত কুবিরের গানে। এ সব গান ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য শুধু নয়, এক-একজন বিশিষ্ট লোকসাধকের অসাম্প্রদায়িক দর্শনসমৃদ্ধ জীবনবেদ। যার জন্য লালন বা কুবিরের গান অতি সহজেই নাড়া দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মতো সৃজনশীল প্রতিভাকে কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো সমন্বয়বাদী ধর্মনেতাকে।

কুবির গোঁসাই রচিত বারোশত গানের মধ্যে অন্তত অর্ধেক গান ধর্মমূলক। এই জাতীয় গানে রূপায়িত হয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচারের নিগূঢ় বাণী ও উপদেশ-নির্দেশ। সেগুলির মর্মোদ্ধার করতে হলে দীনদয়ালের ঘর সম্পর্কে এবং তাঁদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে। মুসলমান মহিলা বলে অনুমিত সাহেবধনীকে জঙ্গিপুরের বাসিন্দা মনে করা হয়। তাই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে বলে অনুমান করা হয়। কুবির লিখেছেন :

সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী
জঙ্গীপুরে যার মোকাম॥

দোগাছিয়ার মুলীরাম পাল এই মহিলার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। তাঁর পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়কে পরিবর্ধিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন মূলত তাঁর ঐশী শক্তির মহিমা ও ভেষজবিদ্যার প্রয়োগে। তাঁর আমলে দোগাছিয়া থেকে জলঙ্গি নদির অপর পারে বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনীর শ্রীপাট গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের আদিপর্বে ইসলাম সংসর্গ ছিল বলে এই ধর্মমতে সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। উভয় ধর্মের সমদর্শিতাই এই ধর্মে বড় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক উপাস্যের নাম দীনদয়াল, যাঁর কখনও কখনও নামান্তর ঘটেছে দীনবন্ধু। সাহেবধনীদের পুঁথিপত্র ও পুস্তিকার শিরোদেশে লেখা থাকে 'শ্রীশ্রী দীনদয়াল প্রভুর পাদপদ্ম ভরসা'। বৃত্তিহুদার মূলপাটে চরণ পালের ব্যবহৃত দণ্ড, ত্রিশূল ও হুঁকা আজও নিত্য পূজিত হয়। তা ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেইখানে ভোগরাগ নিবেদন, নিজস্ব গীতার্চনা ও সাহেবধনীদের স্বকীয় 'গোষ্ঠ' সাধনা হয়। সাধনার স্থানের নাম 'আসন'। সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা স্বগৃহে 'আসন' নির্মাণ

ডালিমতলার মেলা

ছবি : প্রকাশ চক্রবর্তী

করতে অধিকারি, তাঁদের নাম 'আসুনে ফকির'। প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে চৈতী একাদশীতে এঁদের তিনদিনব্যাপী মহোৎসব হয়। সেখানে আসুনে ফকিররা সম্প্রদায় গুরুকে বংশানুক্রমিকভাবে খাজনা দেয়। তার বদলে গুরু প্রত্যেক ফকিরকে দেন পাটি ও হুকা-কল্কে। তিনদিনব্যাপী মহোৎসবে চাল, চিঁড়া গুড়, দই, তরকারি প্রভৃতি সব শিষ্য সরবরাহ করেন। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসরূপে আমরা সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'অগ্রদ্বীপের কাগজ' বা হিসাব-নিকাশ সমীক্ষা করে দেখেছি, সে বৎসর প্রধান সেবাইত ছিলেন চরণ পালের প্রপৌত্র প্রাণভদ্র পাল। ব্যয় হয়েছিল ৪০৫ টাকা ১৫ পয়সা। তা ছাড়া ভোগবাবদ লেগেছিল ৩০ মণ চাল, ১৬ মণ চিঁড়ে এবং ৫॥ মণ কলাই। শতাধিক আসুনে ফকির এই মেলায় জমায়েত হয়েছিলেন। আবার বেশ কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের হিসাব থেকে দেখা যায় ৪৪ জন আসুনে ফকির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কাজেই সাহেবধনী সম্প্রদায় এখনও হারিয়ে যায়নি। বরং সম্প্রদায়ে নবগৃহীত শিষ্যের তালিকা থেকে এঁদের অস্তিত্বের চিহ্ন মিলছে। বর্তমান ধর্মগুরু জানিয়েছেন, এখন সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা তিন হাজারের বেশি এবং কয়েক হাজার অজানিত শিষ্য আছেন উত্তরবঙ্গের রংপুরে, রাজনৈতিক কারণে তাঁরা বিচ্ছিন্ন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে সাহেবধনীদের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য লোকধর্মের অনেক সাদৃশ্যসূত্র ও আচরণগত সমতা আছে। এঁরা বৈষ্ণবদের মতো ভেকধারী নন। বাউলদের মতো আলখাল্লাও পরেন না। প্রধানত গৃহী, তবে পরকীয়া প্রকৃতি সাধনে অনাগ্রহী নন। এঁরা পুরোপুরি গুরুবাদী এবং গুরুবংশ বংশানুক্রমে মন্ত্রদীক্ষা দানের অধিকারি। বিশেষভাবে দীক্ষিত সদস্য যৌন যোগাচোরের অধিকারি। বিন্দুসাধন, মাটির কাজ, বিষ্ঠামূত্র রজবীর্য একত্র করে পান (যার ধর্মীয় নাম 'চারিচন্দ্রের সাধনা') এঁদের মধ্যে প্রচারিত। এঁরা জীবনবাদী। 'সাহেবধনী ঘরের শিক্ষার সত্য নাম শিরোনামায় এঁদের গোপন পুঁথি থেকে আমরা যে বীজমন্ত্র পাই তাতে আছে : (১) ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য। চারিযুগ সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। ঠাকুর সত্য। দীনদয়াল সত্য।... দীননাথ সত্য।... দীনবন্ধু সত্য। গোঁসাই দরদী সাঁই / তোমা বই আর আমার কেহ নাই।। (২) গুরু তুমি সত্যধন / সত্য তুমি নিরঞ্জন। খাকি তোমার নাম সত্য। কাম সত্য। সেবা সত্য। ঠাকুর সত্য। বাক সত্য। গুরু সত্য।

—সাহেবধনীদের এই সব বীজমন্ত্র কুবিরের গানে সম্প্রসারিত ও ভাবঘন হয়েছে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে এই সত্য দেখতে পাই। প্রথমে দেখা যাক 'ক্লিং সাহেবধনী আল্লা ধনী দীনদয়াল নাম সত্য' এই বীজ মন্ত্রটিকে। সাহেবধনী মুসলমান নারী হলেও এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস যে তিনি রাধার অবতার। তত্ত্বটি কুবিরের গানে এইভাবে রূপ পেয়েছে :

> সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
> রাইধনী সেই নামটি শুনি
> সেই ধনী এই সাহেবধনী
> জল্লীপুরে যার মোকাম॥

এই ব্রজতত্ত্ব থেকেই 'চারিযুগ সত্য' বীজ মন্ত্রটির অর্থোদ্ধার সম্ভব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের পর কলিতে চৈতন্যলীলায় মহিমা আরোপ করেছেন কুবির তাঁর অনেক গানে। এই কৃষ্ণাবতার তত্ত্বের সঙ্গে সাহেবধনীদের তাত্ত্বিক যোগ (রাই = সাহেবধনী) সুতরাং স্বীকৃত। এর সঙ্গে তাঁরা ইসলামি তত্ত্বটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন। কুবিরের অনবদ্য অভিব্যক্তি :

আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মাসার
....
একহাতে বাজে না তালি একসুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা হল ভার।

আল্লার আহ্লাদিনী শক্তিরূপে রাধার কল্পনা ব্যাপারটি যেমন অভিনব তেমনই লৌকিক ধর্মসাধনার অকপট উদার চেতনা, সহজ সাম্যবোধ ও প্রবল সমীকরণ শক্তির পরিচয়।

ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মের বীজমন্ত্রকে এমন অসামান্য ঐক্যমন্ত্রে পরিণত করা সার্থক কবিত্বের পরিচয়। এই উদার চেতনা থেকেই কুবির আরও পরিবর্ধিত সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছেছেন :

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
....
এক হাওয়া এক আগুন পানি
একে একা দিনের লেখা এক রজনী
সবই এক জানি
নারি ঠাওরাতে

এবার দেখা যাক, বীজমন্ত্রের অন্তর্গত 'খাকি তোমার নাম সত্য' এই বাণীটির কুবিরকৃত ভাষ্য। 'খাকি' অর্থ মাটি। কুবির মাটির মহিমা ব্যক্ত করেছেন :

নাই এমন আর। এই মাটিকে খাঁটি কর মন আমার।
মাটি ব্রহ্মাণ্ড মূলাধার।
এই মাটিতে একে একে দীননাথ হয়েছেন দশ অবতার।।
এই মাটিতে সৃষ্টি স্থিতি। করেছেন অখিলের পতি।
এই মাটিতে ভাগীরথী করেন সগরকুল উদ্ধার।
সাগর সঙ্গম এই মাটিতে রাত্রিদিন ভাটি উজান বচ্ছে ধার।।
নীচ হয়ে রয়েছেন মাটি এই মাটিতে বসত বাটি
হলে মাটি মলে মাটি মন মাটি কর সার।
চাষ আবাদ হয় এই মাটিতে ফলে তায় নানা শষ্য জীবাহার।।

মাটি সম্পর্কে একই সঙ্গে জীবনধর্মী ও ঐশী ভাবনার যুগলস্রোত নিঃসন্দেহে অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয়বাহী। কুবির সেই দুর্লভ ধ্যানদৃষ্টিকে প্রসারিত করে আর এক গানে বলেছেন :

আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়
খাকির উপর ঘরবাড়ী সকলরে।।
ভাইরে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মা বিষ্টু
ও সেই বিষ্টুর পদে হল গঙ্গার সৃষ্টি রে।
ভাইরে হিন্দু মলে গঙ্গা পায় যবন থাকে জমিনায়
শাস্ত্রমতে বলি শোন স্পষ্ট রে।।
যখন এই খাকি একাকী সরে দাঁড়াবে
তখন সব নৈরাকার হবে।
সংসার যাবে রে গঙ্গা গঙ্গাজলে মিশাবে
সকলি গঙ্গা হবে যবনদের প্রমাদ ঘটাবে রে।।
বুঝে দেখ দেখি হবে কি খাকি পালাবে
যবন মলে পরে কবর কোথা পাবেরে।
এই সংসার অসার হবে ঘরবাড়ি কোথা রবে
এই কথাটি বিচার কর সবে রে।।
পানি আছেন কুদরতে খাকি আছেন পানিতে
খাকির উপর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের এই কথা।
এই খাকিতে জীবজানোয়ার দেবতা পীর পয়গম্বর
বিরাজ করছেন সর্বদারে।।
আব আতশ খাক বাদ চারে কূলে আলম পয়দা করে
হিন্দু যবন জানে না কিছু বোঝে না বিরাজে এই সংসারে।
এই ব্যাভার মত চলল ভাই এতে কোনও দ্বিধা নাই
জন্মমৃত্যু এই খাকিতে সবাই রে।।

'খাকি তোমার নাম সত্য' এই সামান্য বীজটুকু কবি কল্পনার অমোঘ স্পর্শে এক বিরাট দার্শনিক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আব, আতস, খাক, বাদ অর্থাৎ জল আকাশ মাটি ও হাওয়া যে আমাদের মূল উপাদান এই সত্য এখানে ব্যক্ত হয়েছে। জাতি বর্ণ আচার যে জীবনের উপাদান নয়, কবি সে ইঙ্গিতই এই পদে রেখে গিয়েছেন।

নদিয়ার লোকধর্ম কখনওই তার লোকসমাজকে উপেক্ষা করে ঊর্ধ্বতর ভাবময়তা বা দার্শনিক কণ্ডুয়নে আচ্ছন্ন হয়নি। তা সব সময় গড়ে উঠেছে মাটি আর মানুষকে ঘিরে। এই করুণ পৃথিবীতে শোষিত সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের দুঃখ-বেদনা সব সময়ই লেগে আছে নদিয়ার লোকধর্মের যাপনে। কাঙাল হরিনাথের গানে 'দীন ভিখারী নাইকো কড়ি' যে মানুষটির অসহায় অস্তিত্ব আমরা দেখি তার সম্প্রসারণ নদিয়ার লোকধর্মের গানে বারে বারেই বেজে ওঠে। একটি গানে পাই 'মুষ্টিভিক্ষা করে আমি খেতে পাই না উদর ভরে'—এরই গায়ে গায়ে ওই গানে এমন খেদোক্তিও আছে যে, ভিক্ষার জন্য 'বাড়ি বাড়ি ঘুরব কত' ও 'ভূত খাটুনি খাটবো কত' মানুষের ক্ষুধাজনিত এই আক্ষেপ আমাদের গ্রামিক সমাজের সত্য ইতিহাসকেই বহন করছে। এঁদের লেখা ধর্মের গানে মাঝে মাঝে চকমকির আগুনের মতো ঝলকিত হয় দু-একটি অমর উচ্চারণ যা নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা জমিদারে অবিচারের বিরুদ্ধে, এমন কি সবরকম শোষণের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় গানে অন্তস্থলে একটি চকিত পঙ্‌ক্তি খুঁজে পেয়েছিলাম : 'সাত সমুদ্র পার হয়ে ইংরেজ রাক্ষস এল' সাম্রাজ্যবাদীকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করার এই গানকে শিক্ষিত সমাজ আজও শনাক্ত করতে পারেনি। একইভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেছে এমনতর গান যার বলার কথা হল :

যে ভাবেতে রাখেন গোঁসাই আমি সেইভাবে থাকি
আমি অধিক আর বলব কি
কখনও দুগ্ধ দধি ছানা মাখন ননী
কখনও জোটে না ফ্যান আমানি
কখনও আলবণে কচুর শাক ভখি

উচ্চাবচ সমাজব্যবস্থায়, আদি মানবসমাজের মতো 'Life is either a feast or a fast'—এর সূত্র অনুযায়ী এই দেশ এই নিম্নবর্গের সমাজ বয়ে চলেছে। ভোগবাদী জীবন, বিশ্বায়ন ও বৈদ্যুতিন উন্নতির চাপে লোকধর্ম আজ বিপন্ন, তার উচ্চারণ অপ্রস্তুত।

নদিয়া জেলার গ্রাম-শহরের পূজা-পার্বণ ও মেলা

শ্যামল মৈত্র

শবশিবা ॥ ব্যানরাপাড়া

হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণবধর্মের অহিংসা ও প্রেম, শাক্তধর্মের তন্ত্র-আচার-সাধনা, ইসলাম ধর্মের সুফি উপাসনা, হজরত মহম্মদের শিষ্যদের দৃঢ়তা ও বীরত্বের উদাহরণ, খ্রিস্টধর্মের ত্যাগ ও সেবার উচ্চ আদর্শ, বাউল-ফকির-মুসাফিরদের ঔদার্য ও উচ্চ মানবিকতার এক মহামিলনক্ষেত্র এই নদিয়া জেলা। শ্রীচৈতন্য, লালন ফকির, কৃত্তিবাস ওঝা থেকে শুরু করে এ যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, মীর মশার্‌রফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মতিলাল রায়, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ অসংখ্য বিস্ময়কর প্রতিভা-প্রসবিনী এই নদিয়া জেলা। তার গৌরবময় অতীত নিয়ে এই ছোট্ট জেলা পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে জ্বলজ্বল করছে তার স্বমহিমায়।

লোকসংস্কৃতি হল ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতি। যেহেতু নদিয়া জেলা একটি অতি প্রাচীন জনপদবিশিষ্ট এলাকা, সেজন্য এই জেলায় লোকসংস্কৃতির উপাদান প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। শিয়ালদহ থেকে লালগোলার ট্রেনে চাপলে কাঁচরাপাড়ার পর থেকেই নদিয়া জেলা শুরু আর বহরমপুরের খানিকটা আগে পলাশী স্টেশন পার

হয়ে নদিয়া জেলার এলাকা শেষ হচ্ছে। পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভাগীরথী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই জেলা। দেশভাগের আগে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙা ইত্যাদি এলাকা নিয়ে নদিয়া বেশ বড়সড় একটা জেলা ছিল। এখন এই অর্ধেক নদিয়ারও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির সমগ্র পরিচয় এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক অঞ্চলই হয়তো বাদ থেকে যাবে।

দক্ষিণ দিক থেকেই শুরু করা যাক। কাঁচরাপাড়া আর কল্যাণীর মধ্যবর্তী এলাকা ঘোষপাড়া। কল্যাণী সীমান্ত স্টেশনের আগের স্টেশন ঘোষপাড়া, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভজনসাধনের মূল কেন্দ্র। দোলপূর্ণিমার দিনে এখানে সতীমার বিরাট উৎসব ও মেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সহজিয়া আউলচাঁদের (১৬৯৪-১৭৪৯) শিষ্য রামশরণ পালের স্ত্রীই হলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সতীমা। এখানে কোনও মন্দির বা মূর্তি নেই। শুধু একটি ডালিমগাছ আছে আর আছে একটি পুষ্করিণী, তার নাম হিমসাগর। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সাধক আউলচাঁদের শিষ্য।

কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশনে নেমে হরিণঘাটা যাবার বাসে চেপে সামান্য কিছুদূর গেলেই পাবেন উত্তর রাজপুর গ্রাম। প্রতি বছর এখানে ২৫ বৈশাখ থেকে তিনদিনব্যাপী হজরত মহম্মদের কন্যা ফতিমা বিবির উৎসব ও মেলা বসে। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এই মেলায় তরজা, লায়লা-মজনুর গান, পুতুলনাচ ও যাত্রাভিনয় হয়। কল্যাণীর পরের স্টেশন মদনপুরে নেমে বাসে করে যেতে পারেন বিরহী গ্রামে। এখানকার মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় দুদিনব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়। চারশো বছরের প্রাচীন এই মেলার একটি অনন্য পরিচয় আছে। যে মেয়েদের ভাই নেই, তারা এখানে এসে ওইদিন মদনমোহনের কপালে ফোঁটা দেয়। মদনপুর স্টেশনে নেমে আর একটি গ্রামেও যেতে পারেন, তার নাম কুমারপুর। এখানে সত্যপীর ও মানিক পীরের উরস উৎসব হয় যথাক্রমে পৌষ সংক্রান্তির দিন এবং ১৩ ফাল্গুন তারিখে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে সমবেত হন। হরিণঘাটার কাছে কাঠডাঙা গ্রামেও একই সময় মানিক পীরের উৎসব হয়। মানিক পীর এই গ্রামেই দেহরক্ষা করেন, ডোমরা বিলের ধারে তাঁর সমাধি রয়েছে।

মদনপুরের দু-একটি স্টেশন পরেই চাকদহ একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু-সমাগম এখানকার ঘনবসতির অন্যতম কারণ হলেও এই জনপদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। সুদূর অতীতে এখানে কাঁঠালপুলি ও আনন্দগঞ্জ নামে বন্দর ও বাজার ছিল। কথিত আছে, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকালে রথচক্র এখানে প্রোথিত হয়ে যায়, তারপর থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। মাঘী পূর্ণিমায় এখানে ধুমধামের সঙ্গে গণেশ-জননীর পূজা ও পক্ষকালব্যাপী মেলা বসে। চাকদহের অদূরে পালপাড়া গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, সম্ভবত পাঁচশো বছরের পুরনো। চাকদহের সন্নিকটে আর একটি গ্রাম কাঁঠালপুলি। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সেবক মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে এই গ্রামে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়। চাকদহ-বনগাঁ বাসরাস্তার ধারে যশড়া গ্রামে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবটি প্রায় চারশো বছরের পুরনো। লোকশ্রুতি এই যে, মহেশ পণ্ডিতের ভাই বিশিষ্ট বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথদেবের নবকলেবরের সময় পুরীতে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় পরিত্যক্ত পুরাতন দারুমূর্তিটি স্বয়ং পদব্রজে বহন করে এই গ্রামে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চাকদহ থেকে বনগাঁ যাবার বাসরাস্তায় আর একটি গ্রাম হল কামালপুর। এককালে এই গ্রামে কেবল শূদ্রের বাস ছিল। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলা থেকে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি নবাবী শাসনকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং কামাল নামে পরিচিত হন। সেজন্য এই গ্রামকে অনেকে ভট্টাচার্য কামালপুর নামেও অভিহিত করে থাকেন। কাছেই খলসিয়া বিলের পাশে সোরাবপুর গ্রামে পোড়া মহেশ্বর নামক এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি এই যে, একদা এক লোভী সন্ন্যাসী ওই প্রস্তরলিঙ্গটির মাথায় স্পর্শমণি লুকানো আছে জানতে পেরে ওই মন্দিরে এসে কিছুকাল বাস করতে থাকে এবং প্রস্তরখণ্ডটিতে উত্তাপ দিলে স্পর্শমণিটিকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে ভেবে তার চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে মন্দিরটি পুড়ে যায়, অসাধু সন্ন্যাসী স্পর্শমণিটি হস্তগত করে সেখান থেকে পালিয়ে এসে অন্য এক গ্রামে দেবপাল নামক এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নেয়। দেবপাল আবার চোরের ওপর বাটপাড়ি করে সন্ন্যাসীর ঝুলি থেকে সেটি বের করে লুকিয়ে রাখে। সন্ন্যাসী তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও স্পর্শমণিটি ফেরত না পেয়ে তাকে অভিশাপ দিয়ে চলে যায়। দেবপাল স্পর্শমণির সাহায্যে বিশাল ধনী হয়ে উঠে সরোবর খনন, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজকর্মের মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তার নামানুসারে এই গ্রাম দেবগ্রাম নামে পরিচিত হয়। চাকদহের কাছাকাছি আর একটি গ্রামের নাম মথুরাগাছি। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এখানে খেদাই ঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়। খেদাই হল সর্পদেবতা, ক্ষেত্রপাল থেকে এই শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়।

রানাঘাটের পাঁচ মাইল পূর্বদিকে মাটিকুমড়া গ্রাম। পূর্বে এই অঞ্চলে হাজার হাজার মিষ্টি কুমড়োয় খেত ভরে থাকত, তাই গ্রামের নাম হয়েছে এইরকম। এখানে একটি পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে চক্রবর্তী পরিবারের বাস। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে নীল ও চড়কের মেলা বসে। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল, এখানে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ এবং চক্রবর্তীরা মেলার জন্য সরকারি অনুদান গ্রহণ করেন না। রানাঘাট থেকে বানপুর সীমান্ত অঞ্চলের দিকে মাত্র ছয় মাইল দূরে আড়ংঘাটা। চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামে জ্যৈষ্ঠমাসব্যাপী যুগলকিশোরের উৎসব হয়। বিখ্যাত এই মন্দিরটি ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গঙ্গারাম দাস ও রামপ্রসাদ পাণ্ডে নামক দুজন অবাঙালি ভক্ত। স্থাপত্যশিল্পের গবেষকদের পক্ষে আকর্ষণীয় এই মন্দিরের চণ্ডীমণ্ডপ আকারে থামযুক্ত প্রশস্ত বারান্দার পাশে পরপর পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দিরের মধ্যস্থলে গোপীনাথ ও রাধিকার যুগলমূর্তি অধিষ্ঠিত। বাকি চারটি প্রকোষ্ঠে কালাচাঁদ-শ্যামচাঁদ, রাধাবল্লভ-গোপীবল্লভ, বালগোপাল,

বলরাম-রেবতী, শালগ্রাম, গণেশ ইত্যাদি বিগ্রহ রয়েছে। প্রতিদিন যুগলকিশোরের বেশ পরিবর্তন করা হয়। রবিবার রাজবেশ, সোমবার গোপবেশ, বুধবার নটবরবেশ, বৃহস্পতিবার সুবলবেশ, শনিবার রাখালবেশ ইত্যাদি। দূর-দূরান্ত থেকে অজস্র মানুষ, বিশেষত মহিলারা এখানে আসেন। তাঁদের বিশ্বাস, যুগলকিশোর দর্শনে পরজন্মে বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রানাঘাট থেকে হবিবপুরগামী বাসে অথবা চূর্ণী নদীপথে মাজদিয়া গ্রামে যেতে হয়। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শহিদ পীর সাহেবের উরস উৎসব পালিত হয়। গ্রামে একটি বটগাছের নীচে মাটির ঘোড়া রাখা আছে। এটিই গোরাসাহেব শহিদ পীরের স্থান। কেউ কেউ একে ঘোড়া শহিদ পীরও বলে। এখানকার উৎসবটি দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন। এই একই তিথিতে হবিবপুর গ্রামে পীর মহম্মদের তিরোভাব উপলক্ষে অ্যালা উৎসব পালিত হয়। মাজদিয়া গ্রামের অনতিদূরে **শিবনিবাস**। ১৭৫৭-৬২ কয়েক বছর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আবাসস্থল ছিল এখানে। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে আতঙ্কিত এবং ১৭৭৬-এর মন্বন্তরের প্রাক্কালে প্রজাদের অবস্থার ক্রমাবনতি প্রতিকারে ব্যর্থ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর ছেড়ে এখানে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন এবং এখানে কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাজদিয়া রেল স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে **আশাননগর**। এখানকার ঘোড়াপীরের সমাধি ও ইদ্‌গাহ সুপ্রাচীন। ইদানীং এখানে বিশেষ গুরুত্বসহকারে লালন মেলা উদ্‌যাপিত হয় এবং দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে এই মেলা কয়েকবছর ধরে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে আসছে। রানাঘাট-বনগাঁ রেললাইনে মাঝেরগ্রাম স্টেশনে নেমে অদূরেই চামটার বিল। তার পশ্চিমপারে আধঘণ্টা হাঁটাপথে গেলে **পূর্বশিমুলিয়া** গ্রাম। এই গ্রামের পর থেকেই উত্তর ২৪-পরগণার এলাকা শুরু। অগ্রহায়ণ মাসে এখানকার রহিম ফকিরের সুপ্রাচীন মেলাটিতে অনেক ফকির-দরবেশের সমাগম হয়।

রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে পাঁচ মাইল গেলে রেল স্টেশন **বীরনগর**। পূর্বনাম **উলা**। সুপ্রাচীন শহর। ১৮৬৯ সাল থেকে এখানে নির্বাচিত পুরসভা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাইচণ্ডীর পূজায় হাড়ি-ডোমেরা শূকর বলি দেয়। একই সময়ে উচ্চজাতির মানুষেরা মহিষমর্দিনী ও বিন্ধ্যবাসিনীর বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠান করে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে, শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলে বাণিজ্য করতে যাবার পথে এইখানে গঙ্গায় ভীষণ ঝড় ওঠে। তিনি জাহাজ নোঙর করে শিবের পত্নী উলাইচণ্ডীর আরাধনা করলে ঝড় থেমে যায়। সেই থেকে এই গ্রামের নাম উলা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শান্তিপুরের এক গোয়ালা ডাকাত শোনাশানির উপদ্রবে সমগ্র নদিয়া জেলা তটস্থ হয়ে পড়ে। এই সময়ে উলার মুস্তাফি পরিবারের অনাদিনাথের বীরত্বে ওই ডাকাত দমন হয়। তার কিছুকাল পরে বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথ ডাকাতদ্বয়ের তাণ্ডবে নদিয়া জেলা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সেবারও উলার মহাদেব মুখোপাধ্যায় ডাকাতদলকে পর্যুদস্ত করেন। এই দুটি বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার পরে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের নাম দেন বীরনগর। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের আতিথেয়তার জন্যও সুনাম ও সুখ্যাতি আছে। অবশ্য, নিন্দুকদের একটি ছড়ায় মেয়েদের সম্পর্কে কিছু কটাক্ষ আছে। 'উলোর মেয়ের কলকলানি / শান্তিপুরের চোপা ; গুপ্তিপাড়ার হাত নাড়া / বাঘনাপাড়ার খোঁপা। শেষোক্ত দুটি অঞ্চল নদিয়া জেলার পার্শ্ববর্তী হলেও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত।

কৃষ্ণনগরে পৌঁছনোর আগে বাদকুল্লা স্টেশনে নেমে যেতে পারেন **পাটুলি** গ্রামে। এখানে অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় ডাকাতে কালীর পূজা হয়। সূর্যোদয় থেকে নিশাবসানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৭/১৮ হাত উঁচু দক্ষিণা কালীমূর্তির নির্মাণ, পূজা এবং বিসর্জন সম্পন্ন করতে হয়। কালীমন্দিরটি ডাকাতদের দ্বারা নির্মিত। এখানকার মেলা উপলক্ষে সারারাত কবিগান, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বাদকুল্লা রেল স্টেশনে যখন নেমেছেন, তখন চলে আসুন **আড়বন্দি** গ্রামে। ফাল্গুন মাসে এখানে সাতদিনব্যাপী যে ব্রহ্মাপূজা ও মেলা হয় তা তিনশো বছরের প্রাচীন। মেলায় পুতুলনাচ, ঘেমটা নাচ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

এবার আসা যাক, নদিয়া জেলার রাজধানী **কৃষ্ণনগর শহরে**। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, শহর হিসেবে এর খুব একটা প্রাচীনত্ব নেই। কয়েকশো বছর আগে এই অঞ্চলের নাম ছিল রেউই। জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর ইংরেজ শাসনকালেই বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে যে একমাসব্যাপী বারদোল উৎসব ও মেলা হয় তা প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন। এখানে যেমন সুদৃশ্য রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে তেমনই এখানে জগদ্ধাত্রী পূজাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা সংখ্যার দিক থেকে চন্দননগরের চেয়েও বেশি। এখানে জগদ্ধাত্রীর বাহন

কোনও পাড়ায় হাতি, কোথাও ঘোড়া, কোথাও একটি সিংহ, কোথাও দুটি বা কোথাও একটি বাঘ, কোথাও দুটি। বারদোলের সময় নদিয়া জেলার ১২টি অঞ্চল থেকে ১২টি কৃষ্ণমূর্তি এখানকার রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিমাচলপ্রদেশের কুলুতে দশেরা উৎসবের সময় দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে রঘুনাথজির মূর্তিও অনুরূপভাবে আনা হয়।

কৃষ্ণনগরের পাশেই পূর্বদিকে ঘূর্ণী। এখানকার মৃৎশিল্পীরা পৃথিবীবিখ্যাত। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির সময় এখানে যে জলেশ্বর শিবের মেলা হয় এবং ধর্মরাজতলায় ধর্মঠাকুরের যে পূজা হয় তা খুবই প্রাচীন। চৈত্রমাসে পেস্তীপুকুরের চড়কের মেলাও উল্লেখযোগ্য। একটি প্রাচীন নিমগাছের নীচে পীরের দরগা আছে। কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপঘাট ন্যারোগেজ রেলপথে কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে দে-পাড়া বা দেবপাড়া গ্রাম। বৈশাখ মাসে চতুর্দশীর দিন এখানে নৃসিংহদেবের সর্বজনীন পূজা হয়। এখানকার মেলাটি তিনশো বছরের প্রাচীন। এই নৃসিংহদেবের প্রসাদী পরমান্ন দিয়ে দূর-দূরান্তের মানুষ নবজাত শিশুদের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করে থাকেন। কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন থেকে একমাইলের মধ্যে হরিশপুর গ্রাম। মাঘমাসে শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে এখানে পঞ্চানন্দ ও রক্ষাকালীর বারোয়ারি পূজা হয়। এই উপলক্ষে তিন-চারদিনব্যাপী মেলায় পংক্তিভোজন হয়। কবিগান, তরজা ও অন্যান্য লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়। এই রেলপথেই আমঘাটা রেল স্টেশনের কাছেই ভালুকা গ্রামে নববর্ষের দিনে যে ভগবতী যাত্রার অনুষ্ঠান হয়, সেটির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে।

এবার কৃষ্ণনগর থেকে আরও উত্তরে যাওয়া যাক। ধুবুলিয়া রেল স্টেশনের এবং কৃষ্ণনগর-বহরমপুর বাসরাস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলের গ্রাম রূপদহ। বৈশাখ মাসে এখানে যে রূপাই কালীর পূজা হয় তা প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। এখানে কাটারী ফকির নামে প্রসিদ্ধ পীরের আস্তানা আছে। রূপদহের সন্নিকটে চুয়াখালি গ্রামে চড়কপূজা উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলায় কবিগান, তরজা, যাত্রা, লাঠিখেলা, বোলান গান প্রভৃতির আসর বসে। কৃষ্ণনগরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণবিহার গ্রাম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজার কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এই গ্রামে রয়েছে। একটি নৃসিংহ মন্দিরও আছে এখানে। চৈত্রমাসে শিবের গাজন মহোৎসবে পালিত হয়।

মুড়াগাছা রেল স্টেশনে নেমে এখানকার বিখ্যাত ছানার জিলিপি খেয়ে কাছে দোগাছিয়া গ্রামে চলে আসুন। বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে বিগত পাঁচশো বছর ধরে সাধক মুলীচাঁদের স্মরণোৎসব হয়। জাতে গোয়ালা এই সাধক হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আরাধ্য। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানকার চড়ক উৎসবও দুশো বছরের প্রাচীন। মুড়াগাছা গ্রামেও প্রতি বছর বৈশাখ সংক্রান্তির দিন থেকে সর্বমঙ্গলার মেলা বসে। এটিও দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন মেলা। সহস্র মানুষের সমাগমে মুখরিত এই মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, তরজা, পালাকীর্তন ও বিশিষ্ট যাত্রাদলের অনুষ্ঠান হয়। মুড়াগাছার পর বেথুয়াডহরি স্টেশনে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে হয় বড়গাছি গ্রামে। বৈশাখ মাসের শেষে এই গ্রামের বাগদি সম্প্রদায়ের লোকেরা কালীমূর্তি নির্মাণ করে পূজা করে। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে বিল্বগ্রাম বিশিষ্ট পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মস্থান। এখানকার মদনমোহনদেব ও বিশ্বেশ্বরী মন্দির অন্তত দুশো বছরের প্রাচীন। পাশেই বিশ্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর। কাছেই আর একটি গ্রাম ব্রহ্মাণীতলা ; সেখানকার এক বিরাট অশ্বত্থ গাছের নীচে ব্রহ্মাণী (মনসা) দেবীর মেলা বসে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। ছয়-সাতদিন ধরে মেলা চলে। বেথুয়াডহরি থেকে বাসে যেতে হয় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে, দুশো বছরের পুরনো মহরম উৎসবে যোগ দেবার জন্য।

নদিয়া জেলার উত্তর সীমান্ত এলাকা পলাশী, ইতিহাসখ্যাত স্থান। কাছেই গ্রাম সাহেবনগর ; এখানে বলরামদাস বাবাজীর আখড়ায় বহু ভক্তসমাগম হয়। মাইল দুয়েক দূরে চান্দেরঘাট গ্রামে আষাঢ় মাসে হরিদাস বাবাজীর উৎসব হয়। পলাশী থেকে বেতাই যাবার বাসে চেপে এবার চলে আসুন বড়চাঁদঘর গ্রামে। বৈশাখ মাসে এখানে দুশো বছরের প্রাচীন যশোদায়িনীর পূজা ও মেলা বসে। চৈত্রমাসের বারুণী তিথি থেকে হরিঠাকুরের মেলা ও উৎসব চলে তিনদিন ধরে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হরিঠাকুরের ধর্মমত প্রচারিত। তাঁর প্রপৌত্র পি আর ঠাকুর বনগাঁর কাছে ঠাকুরনগরে অনুরূপ যে মেলার আয়োজন করেন তার এখন খুব নামডাক। মুড়াগাছা রেল স্টেশন থেকে প্রথমে জাতীয় সড়ক তারপর খানিকটা কাঁচা রাস্তা ধরে গেলে কিছুদূরেই পড়ে নাজলাগ্রাম। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময়ে এখানে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ও হিন্দু-মুসলমানের ভেদ মানে না।

এই দিকটায় এলে আরও দুটো গ্রাম ঘুরে যাওয়া উচিত। কৃষ্ণনগর থেকে শিকারপুর যাবার বাসে ৫৫ মাইল দূরে একটি গ্রাম জুলখালি। এখানে চৈত্রমাসে বারুণীস্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। কবিগান, গুনাইযাত্রা, ভাসান ও আলকাপ গান, থিয়েটার যাত্রা প্রভৃতি মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে ৪৯ মাইল দূরে করিমপুর, এখান থানাপাড়া গ্রামে জঙ্গলী পীরের দরগা আছে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সময় উরস উৎসব উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ এই মেলায় সমবেত হন। ভুট্টার খই কেনা-বেচার জন্য এই মেলার বিশেষ গুরুত্ব আছে। মেলায় আলকাপ ও যাত্রার আয়োজন হয়।

এই নদিয়া জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ এলাকা শান্তিপুর শহরে আসা যাক। বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার এখানকার মালঞ্চের মাঠে এক মেলা বসে। উপলক্ষ : গাজীমিঞার বিবাহ। তিনশো বছরের বেশি প্রাচীন এই মেলা দুদিন ধরে চলে। বিষয়বস্তু : গাজীমিঞার বিবাহের প্রস্তুতি। পাত্রী জহরা বিবির মামা হঠাৎ এসে বিবাহবাসরে উপস্থিত হলে বিয়ে ভেঙে যায়। তরজা গায়িকা আবিরা বেগম প্রায়ই এবে এই আসর মাতিয়ে দিয়ে যেতেন। শান্তিপুরের বড়বাজারে বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্যবসায়ীরা সাড়ম্বরে ব্রহ্মাপূজার আয়োজন করে। বাজারের মধ্যে একটি মন্দিরে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মার বিশাল মূর্তি আছে। আড়াইশো বছর আগে একবার বড়বাজার চাউলপট্টিতে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে

প্রভূত ক্ষতি হয়। সেই থেকে এই পূজার আয়োজন। পাঁচদিনব্যাপী উৎসবে ময়ূরপঙ্খী হাওদার ওপর নাচ-গান, পুতুলনাচ, মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর নানারকমের মূর্তিসহকারে শোভাযাত্রা, ঢপকীর্তন ও যাত্রাভিনয় এই মেলার অঙ্গ।

শান্তিপুরের রাস উৎসব পৃথিবীবিখ্যাত। এই রাস দেখেই লোককবি গেয়েছেন, 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়'। প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন এই লোক উৎসব কার্তিক পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। তার একমাস আগে থেকেই প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে শহরের দেবমন্দিরগুলির সংস্কার, পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলতে থাকে। বড় গোস্বামীর রাধারমণ, খাঁ চৌধুরীদের শ্যামচাঁদ, আতাবুনিয়ার গোঁসাইদের শ্যামসুন্দর, পাগলা গোঁসাইয়ের মদনমোহন, ডাকঘরের মোড়ে চাকফেরা গোঁসাই, হাটখোলার গোঁসাই, মদনগোপাল পাড়া, সাহাবাড়ি প্রভৃতির নানা নামের সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে রাস উৎসব চারদিন ধরে চলে। প্রথম দুদিন গোঁসাইদের বাড়িতেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগ, আরতি ইত্যাদি এবং হরিধ্বনি, বাদ্যধ্বনি, আলোকসজ্জা প্রভৃতিতে সমগ্র শহর মুখরিত, আলোকিত হয়ে থাকে। তৃতীয় দিনে হয় ভাঙা রাস। সারাদিন মন্দিরে পূজা-অর্চনার পর গভীর রাত্রে গোস্বামী সকলের বিগ্রহসমূহ নগর পরিক্রমার জন্য এক বিশাল মিছিলে সমবেত হয়। ওই দিন সারারাত ধরে শান্তিপুর শহরের রাস্তায় বিগ্রহের মিছিল চলে। বিগ্রহগুলি যে যে দোলায় বসানো হয় সেগুলিকেও নানা সাজে সজ্জিত করা হয়। বিগ্রহের দোলার সামনে থাকে বালক নৃত্য, আর সুন্দরী কিশোরীদের রাইরাজা সাজিয়ে আর একটি ময়ূরপঙ্খী দোলায় বসানো হয়, তার সামনে চলে বাদ্যযন্ত্রীর দল, কোথাও কোথাও মাটির পুতুলের প্রদর্শনীও চলতে থাকে। দোলাগুলি সিল্কের পর্দা, জরির ঝালর এবং ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো হয়। বসনে-ভূষণে-চন্দনে সজ্জিতা রাইরাজা দোলায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে থাকে আর আটজন বেহারা সেই দোলা কাঁধে নিয়ে চলতে থাকে। কোনও মিছিলে থাকে সঙনাচ। সব মিলিয়ে আলো-ঝলমল শহরের এই রাতটি এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু-ধারে, বাড়ির বারান্দায়, ছাদের ওপর বসে এই ভাঙা রাসের মিছিল দেখে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে। সারারাত নগর পরিক্রমার পর ভোররাতে বিগ্রহগুলি স্ব-স্ব মন্দিরে ফিরে যায়। চতুর্থ দিনে কুঞ্জভঙ্গের পর 'ঠাকুর তোলা' উৎসব হয়। দুপুরবেলা মূর্তিগুলিকে পুষ্পরাগে সাজিয়ে গোস্বামীরা কোলে নিয়ে নৃত্যগীতসহকারে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন, তখন গোস্বামীদের মাথায় রাজছত্র ধরা হয়। অপরাহ্নে বিগ্রহের অলঙ্কারগুলি খুলে অভিষেক সম্পন্ন করা হয়।

শান্তিপুরের রাস মূলত বৈষ্ণব সমাজের উৎসব হলেও শাক্ত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। নবদ্বীপের মতো এখানেও ৮/১০ খানি বিরাট বারোয়ারি কালীপূজা হয়। 'পটেশ্বরী' নামে পটে-আঁকা একখানি কালীমূর্তি পটশিল্পের ঐতিহ্য বহন করছে। রাসমেলা উপলক্ষে সারা শহর জুড়ে বিভিন্ন স্থানে কবিগান, ময়ূরপঙ্খী গান, কীর্তন, তরজা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিপুরের গোপ সম্প্রদায়ের আর একটি উৎসব হয় পয়লা বৈশাখ। গরুর গাড়িকে ময়ূরপঙ্খীর আকারে সাজিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। গাড়িতে গায়ক এবং বাদকদল বসে থাকে। ময়ূরপঙ্খী গানে কোথাও ভাটিয়ালি, কোথাও কীর্তন, কোথাও বা মালসীর সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গানের বাণী এবং সুর গম্ভীরা গানের মতোই একে জনগণের সংগীতের মর্যাদা দিয়েছে।

এবার নবদ্বীপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই নদিয়া জেলার গ্রাম-শহরের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পরিচিতিপর্ব আপাতত শেষ করব। তবে গঙ্গা পেরিয়ে নবদ্বীপ শহরে ঢোকার আগে ডানদিকে অর্থাৎ নবদ্বীপ শহরের ওপারে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত মায়াপুর ঘুরে যাওয়া উচিত। আমেরিকান সাহেবদের বদন্যতায় অধুনা এখানে ইসকনের যে মন্দির গড়ে উঠেছে সেটিই এখন নদিয়া জেলার সবচেয়ে বেশি পর্যটক-আকর্ষণকারী কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। নবদ্বীপ শহরে যেমন অনেকগুলি মন্দিরই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে দাবি করে আসছে, তেমনই মায়াপুরেও বেশ কয়েকটি মন্দির এই দাবি করে আসছে। মায়াপুরের উত্তরে অনতিদূরে বামনপুকুরে অবস্থিত বল্লাল ঢিবির নীচে বল্লাল সেনের আমলে নির্মিত প্রাসাদ ছিল বলে অনুমান করা হয়। বল্লাল সেন গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন বলে ইতিহাসে কথিত আছে। সুতরাং, উক্ত অঞ্চল যদি নবদ্বীপ শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তৎসন্নিহিত অঞ্চল মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান বলে গণ্য হতে পারে। তবে চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিমাইয়ের জন্মস্থান নবদ্বীপ শহরের অবস্থান বর্ণনায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'গঙ্গার পশ্চিমকূল/ বারাণসী সমতুল'। সেই হিসেবে অবশ্য গঙ্গার পশ্চিমতীর বলতে বর্তমান নবদ্বীপ শহরকেই বোঝায়। অপরদিকে বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এক জায়গায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকৈশোর বর্ণনাকালে বলেছেন যে নিমাই গঙ্গা পার হয়ে টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যেতেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তিনি সাঁতরে গঙ্গা পার হতেন এবং গঙ্গাস্নান অন্তে সিক্তবস্ত্রে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়কালে সূর্যপ্রণাম করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে টোল চতুষ্পাঠীগুলি গঙ্গার অপর পারে ছিল। আজও অনেক টোলবাড়ি ও চতুষ্পাঠী বর্তমান, যেগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও ছিল। ইতিহাসের সত্যনির্ধারণে এই দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে ২০/২৫ বছর আগে নবদ্বীপের অধিবাসী ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নবদ্বীপের অনতিদূরে পশ্চিমপ্রান্তে বিদ্যানগর গ্রামে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষকদের এক মহাসম্মেলন আহূত হয়েছিল। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছিল যে গঙ্গার পশ্চিমদিকেই নবদ্বীপ শহরের অবস্থান ছিল এবং তা বর্তমানে মায়াপুর নামে পরিচিত অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। নরহরি কবিরাজের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে, 'জাহ্নবীর পশ্চিমকূলেতে/ কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে / নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর / যথা জন্ম হৈল শ্রীচৈতন্যপ্রভুর'। আসলে কালের বিবর্তনে গঙ্গা অর্থাৎ ভাগীরথী ক্রমাগত পশ্চিমদিকে সরে এসেছে। সম্ভবত শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে এই নদী বর্তমান মায়াপুর এবং বামনপুকুরেরও পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল। কালপ্রবাহে সেই নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং নবদ্বীপের অধিবাসীরা আরও

পশ্চিমে সরে গিয়ে বর্তমান নবদ্বীপ শহরে বসতি স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ জলপথে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার সময়ে নবদ্বীপের ঘাট অতিক্রম করার পরই হঠাৎ নদীবক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "ঐ যে.....যাঃ, মিলিয়ে গেল।" তাঁর এই উক্তি থেকে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা ধরে নিতে পারেন যে শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত জন্মস্থান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যদিও এই বক্তব্য যুক্তিবাদী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত জন্মস্থান সম্পর্কে তাঁর সময়েও যে মতান্তর ছিল সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন এবং ওই জায়গায় তাঁর ঐ উক্তি উক্ত মতান্তরজনিত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতবহ বলেই মনে হয়। তবে মায়াপুরের বিশাল চরভূমিতে ঠিক কোন জায়গায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল তাও স্পষ্ট নয়। অবশ্য গঙ্গাগর্ভে বিলীন হওয়া বল্লাল সেনের প্রাসাদের কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে নিমাইয়ের জন্মস্থান কতটা দূরত্বে ছিল, ঠিক কোনদিকে তার অবস্থান ছিল এ সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি, ফলে বিষয়টি এখনও কিছুটা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নবদ্বীপ শহরে একাধিক গোঁসাই মন্দির নির্মাণ করে সেটিকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলে চালাচ্ছেন এটিও যেমন সত্য নয়, তেমনই মায়াপুরেও প্রভুপাদ নামধারী অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বিগত কয়েক দশকের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করে তাঁদের মন্দিরই শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত জন্মস্থান বলে যে দাবি করছেন তার মধ্যেও ব্যবসাবুদ্ধিই প্রবল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইসব মন্দিরের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত যোগপীঠই প্রাচীনতম এবং আমেরিকান সাহেবদের অর্থানুকূল্যে সৃষ্ট চোখ-ঝলসানো ইসকন মন্দিরটিই সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক।

মায়াপুরের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত বামনপুকুর গ্রামে বল্লাল ঢিবি ও চাঁদ কাজীর সমাধি রয়েছে। বল্লাল ঢিবির কথা আগেই বলেছি। চাঁদ কাজী গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে বিচারকের ভূমিকাও পালন করতেন। কথিত আছে, চাঁদ কাজী একবার শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলে ওই আদেশ অগ্রাহ্য করে শ্রীচৈতন্য বিরাট সংকীর্তন শোভাযাত্রা নিয়ে চাঁদ কাজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং চাঁদ কাজীকে স্বমতে আনেন। (এ যুগের মিছিল ও ডেপুটেশনের অনুরূপ)। চাঁদ কাজীর সমাধির উপরে চারশো বছরের পুরনো একটি গোলকচাঁপার গাছ আছে। লর্ড হেস্টিংসের দেওয়ান কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ বয়সে নবদ্বীপে এসে গঙ্গাতীরে বাস করতে থাকেন এবং শ্রীচৈতন্যের জন্মভিটা আবিষ্কারে ব্রতী হন। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের পরামর্শে তিনি নবদ্বীপ শহরের উত্তরে অবস্থিত রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ৬৫ ফুট উঁচু একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই মন্দির ১৮২১ সালে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মণিপুর রাজবাড়ি। মণিপুরের অধিকাংশ মানুষ বৈষ্ণব, চৈতন্যদেবের ভক্ত। মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে তাঁর কন্যা লাইওরবিকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপে আসেন এবং ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করে এখানেই শেষজীবন অতিবাহিত করেন। প্রায় একই সময়ে রামচন্দ্রপুরে নির্মিত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলেও মণিপুর রাজার মন্দির ও প্রাসাদ আজও অক্ষত রয়েছে।

নবদ্বীপধাম রেল স্টেশনের কাছে চারিচারাপাড়া থেকে সোজা পূর্বদিকে গঙ্গার ঘাটে যাবার পথে দণ্ডপাণিতলা নামে একটি পাড়া আছে। সেখানে দণ্ডপাণি শিব অধিষ্ঠিত আছেন। একটা বড় পাথরের গায়ে দণ্ড হাতে একজন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন, খোদিত মূর্তিটি এইরকম। মূর্তিটির আকৃতি এবং দণ্ডপাণি নামকরণ থেকে অনুমান হয় এটি শিবমূর্তি নয়, সম্ভবত এটি যমরাজের মূর্তি। কারণ, নবদ্বীপের শ্মশানঘাটে যাবার পথেই এই মূর্তিটি দণ্ডায়মান রয়েছে। নবদ্বীপ শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আগমেশ্বরীতলা। 'তন্ত্রসার' প্রণেতা বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ষোড়শ শতকে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাপূজার পরে কালীপূজার দিন উক্ত সাধকের বাড়ির সামনে যে কালীপূজা হয় তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ঐদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালীমূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রথমে খড় বাঁধা, তারপর মাটি লেপা, তারপর দো-মেটে করে মুণ্ডস্থাপন, খড়িলেপন ও রং করার পর মূর্তিতে চোখ আঁকা হয়। কমপক্ষে ২০ হাত লম্বা এই মূর্তিটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে শুধু নির্মাণই নয়, তার পূজা, বলিদান, আরতি, বিসর্জন যাবতীয় কাজ নিশাবসানের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। এই উপলক্ষে আগমেশ্বরী তলায় সারারাত জমজমাট মেলা এবং লোকসংস্কৃতির আসর বসে।

নবদ্বীপ শহরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখা দরকার। এই শহরের পূর্বদিকে ভাগীরথী আর বাকি তিনদিকেই বর্ধমান জেলা। দক্ষিণে সমুদ্রগড়, উত্তরে পূর্বস্থলী এবং পশ্চিমে রেললাইনের ওপারে শ্রীরামপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি গ্রাম সবই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। সেই হিসেবে নবদ্বীপ শহরটির বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু নবদ্বীপকে বাদ দিয়ে নদিয়া জেলার কল্পনাই করা যায় না, রাম ছাড়া রামায়ণের মতো হয়ে যায়, সেজন্যই প্রশাসকেরা বাধ্য হয়ে নবদ্বীপকে নদিয়া জেলার মধ্যে রেখেছেন। সেই কারণেই জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে দীর্ঘকাল ধরে এই শহরটির উন্নয়নের কাজ অবহেলিত হয়ে এসেছে। সর্বাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহর হওয়া সত্ত্বেও জেলা প্রশাসকেরা এতকাল এর নাগরিক সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ নজর দেননি। অতি সম্প্রতি, বিগত দুই দশকে শহরটির উন্নয়নের বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে বলে লক্ষ করা যায়।

নবদ্বীপের রাসযাত্রাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোক উৎসব। তবে সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে এখানকার আর একটি সুপ্রাচীন লোক উৎসব নীল, গাজন ও শিবের বিয়ের কথাটি সেরে নিই। চৈত্রমাসে বাংলার প্রায় সর্বত্রই শিবপূজা হয়ে থাকে, নবদ্বীপও তার ব্যতিক্রম নয়, বরং কিছুটা বেশিমাত্রাতেই হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবদ্বীপ শহরে যাঁরা তীর্থযাত্রী হিসেবে আসেন অথবা শহর সম্পর্কে ধারণাটা যাঁদের বাইরে থেকে হয়েছে, তেমন অন্তরঙ্গ নয়, তাঁরা জানেন নবদ্বীপ হচ্ছে বৈষ্ণবপ্রধান শহর। এ রকম ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপ শহরে শৈব ও শাক্তধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য। এখানকার প্রাচীন লোক উৎসবগুলির

সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই সেই বোধোদয় ঘটবে। অবশ্য, দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের পর বিশেষত তন্তুবায় ও সাহা সম্প্রদায়ের লোকজন আসার ফলে বর্তমানে এই শহরে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ৫০/৬০ বছর আগেও নবদ্বীপ শহরে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা হাতে গোনা যেত ; একমাত্র সোনার গৌরাঙ্গবাড়ি-সমাজবাড়ি আর মহাপ্রভু পাড়া এই দুটি পল্লীতেই তাঁদের সন্ধান মিলত ; সে অন্য প্রসঙ্গ। আপাতত নীল, গাজন ও শিবের বিয়ের কথায় ফিরে আসা যাক। চৈত্র সংক্রান্তির ২/৩ দিন আগে নীলের পূজা হয়। এই সময় নবদ্বীপ শহরে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের বেশ কিছু মানুষ সন্ন্যাসব্রত পালন করেন। ব্রতের দিনগুলিতে তাঁরা গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন, গলায় সুতোর সঙ্গে কুশ ঝুলতে থাকে, নিরামিষ শুধু নয়, এই কয়দিন তাঁরা ফলমূল ও হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকেন। নীল পূজার দিন এলাকার শিবলিঙ্গটি (প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই ছোট-বড় শিবমন্দির আছে) মন্দির থেকে মাথায় করে বয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পূজা করেন। ঐদিন ঐ এলাকায় যত মানুষ সন্ন্যাসব্রত নেন, সকলের বাড়িতেই এই শিবলিঙ্গ রিলে সিস্টেমে বাহিত এবং পূজিত হন। যোগনাথতলার যোগনাথ, বুড়াশিবতলার বুড়াশিব, চারিচারাপাড়ার বালকনাথ, দণ্ডপাণিতলার দণ্ডপাণি, পোড়ামাতলার মহেশ্বর, রামসীতাপাড়ার পঞ্চানন প্রভৃতি প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গই কমপক্ষে ৩০/৩৫ কেজি ওজনের প্রস্তরখণ্ড। সন্ন্যাসব্রতধারীরা সেই প্রচণ্ড ভারী শিবলিঙ্গ মাথায় করে বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে স্বগৃহে নিয়ে যান। সেই বাড়ির পূজা সম্পন্ন হলে আর একজন সন্ন্যাসব্রতধারী আবার সেই শিবলিঙ্গ মাথায় করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। এইভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে বাহিত ও পূজিত হবার পর শিবলিঙ্গ মন্দিরে ফিরে আসেন।

নীলপূজার পরদিন গাজন। সারাদিন ধরে সন্ন্যাসব্রতধারীরা নানারকম শারীরিক কসরৎ করেন (নিজের শরীরের ওপর নিজেরাই অত্যাচার করেন)। কেউ গায়ে কাঁটার বাড়ি মারেন, কেউ আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটেন, কেউ বুকে বেলকাঁটা ফুটিয়ে রক্ত বের করেন, কেউ কোমরে দড়ি বেঁধে চড়কের মাথায় উঠে ঘুরপাক খান, ইত্যাদি। এইদিন গভীর রাতে হয় শিবের বিয়ে। সুসজ্জিত দোলায় চেপে প্রত্যেক এলাকার শিব (বর) বাবাজীরা কনের উদ্দেশে পথে বের হন। বরযাত্রীদের সঙ্গে ব্যান্ড পার্টি, আলোকসজ্জা বের হয়। শিবের চতুর্দোলাটি নিশীথ রাতে পার্বতীর দোলাকে খুঁজতে থাকে। অনেকটা চোর-পুলিশ খেলার মতো। আসলে সমগ্র এলাকাটি পরিভ্রমণের পর শিবের চতুর্দোলার সঙ্গে পার্বতীর চতুর্দোলার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন ভোরের আলো প্রায় ফুটে আসছে। এই সময় উভয় পক্ষের বাদ্যকরদের চাপান-উতোর, মহিলাদের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত পরিবেশে পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে সম্পন্ন হয়। চৈত্রমাসের শেষে দিনের বেলায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর সারারাত্রিব্যাপী শিবের বিয়ে উপলক্ষে মেলা ও আনন্দানুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

রাসপূর্ণিমা নবদ্বীপ শহরের এক অভিনব লোক উৎসব ; নবদ্বীপবাসীদের কাছে শারদীয় দুর্গাপূজার চেয়েও এই উৎসবের

রাধারমণ জিউ মন্দির ॥ শান্তিপুর ছবি : কালাচাঁদ কুণ্ডু

আবেদন বেশি। সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে জানেন, নবদ্বীপ আর শান্তিপুরের রাস উৎসব খুবই বিখ্যাত, এর বেশি কিছু তাঁদের জানা নেই। বিশেষত যাঁদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা ভাবতেও পারেন না যে নবদ্বীপের রাস আর শান্তিপুরের রাস প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। শুনলে বিস্মিত হবেন যে নবদ্বীপ শহরে রাসপূর্ণিমার দিন দুপুরবেলা অসংখ্য কালীপূজা হয় (দুর্গাপূজাও হয়) সাড়ম্বরে এবং কয়েকশো প্রতিমার সামনে ওইদিন দুপুরে হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। (৬০/৭০ বছর আগে নাকি মোষবলিও দেওয়া হত)। এককথায় নবদ্বীপের রাস হল, মূলত শাক্ত আরাধনাকেন্দ্রিক উৎসব। প্রতিটি পাড়ায়, প্রায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বিশাল বিশাল কালীমূর্তি, দুর্গা অথবা অন্য কোনও শক্তির মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয়। এইসব মূর্তি এত বিশাল আকৃতির হয় যে কুমোরবাড়িতে তৈরি করে সেটিকে পূজাবেদিতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। পর্বত মহম্মদের কাছে না গেলে যেমন মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হয়, তেমনই নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার মূর্তি গড়ার জন্য মৃৎশিল্পীকেই ঠাকুরতলায় আসতে হয়। এক একটি মূর্তি গড়ে ২০/২২ হাত উঁচু হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরদিন থেকে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়। কালীপূজার বিসর্জনের দিন মূর্তির খড় বাঁধার কাজ আরম্ভ হয়। কাটোয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে সোলার সাজের শিল্পীরাও প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে এসে কাজ শুরু করে দেন।

নবদ্বীপে রাসযাত্রা উপলক্ষে কতগুলি ঠাকুর তৈরি হয় তার পুরো হিসেব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন বারোয়ারী পূজার উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে তেঘরিপাড়ায় বড়শ্যামা, মেজশ্যামা, ছোটশ্যামা খুবই প্রাচীন, ছোট যিনি তাঁরই উচ্চতা ১৫/১৬ হাত। এ ছাড়াও ওই পাড়ায় মহিষমর্দিনী, গঙ্গা ইত্যাদির মূর্তিও নির্মিত হয়। নবদ্বীপধাম রেল স্টেশন থেকে শহরে ঢুকতে প্রথমেই পড়বে গোয়ালাপাড়ার নেত্যকালী (নৃত্যরতা কালী), তারপর ব্যাদরাপাড়ার শবশিবা (নীচে মড়াশিব, তার ওপরে জ্যান্ত শিব তার ওপরে কালী), নন্দীপাড়ার মোরমন্দানী (মহিষমর্দিনী), চারিচারাপাড়ার ভদ্রাকালী (দুর্গা সপরিবারে অসুরসহ আর তার নীচে হনুমান, দুপাশে রাম-লক্ষ্মণ), বুঁইচারাপাড়ার ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী, দেয়ারাপাড়ার অ্যালানে কালী (মূর্তিটি কিঞ্চিৎ হেলানো), রাধাবাজারের রণকালী, রামসীতাপাড়ায় পাশাপাশি মণ্ডপে বামাকালী এবং মহিষমর্দিনীর বিশাল বিশাল মূর্তি, আগমেশ্বরীতলার জোড়াবাঘ বিন্ধ্যবাসিনী, যোগনাথতলার সিংহবাহিনী, বড়ালঘাটের কৃষ্ণকালী (সঙ্গে আয়ান ঘোষ ও রাধিকার মূর্তি) আমকুলিয়াপাড়ার শ্যামা প্রভৃতি বারোয়ারী পূজাগুলির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। আজকাল অবশ্য পার্থসারথি, নরনারায়ণ, সমুদ্রমন্থন ইত্যাকার নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মূর্তিও নির্মিত হয়ে পূজিত হচ্ছে।

দুপুরবেলা ওইসব কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিমূর্তির সামনে পাঁঠাবলি দেবার পর সেই রক্তের ফোঁটা পরে উদ্যোক্তারা ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসি সহকারে নাচতে নাচতে অন্যান্য পূজামণ্ডপে গিয়ে জানিয়ে আসেন যে তাঁদের পূজা ও বলি সম্পন্ন হয়েছে। রাত্রে সারা শহর আলোয় ঝলমল করে আর সানাই-ঢাক-ঢোলের আওয়াজে মুখরিত হয়ে থাকে। অনেক পূজামণ্ডপে কবিগান, বাউলগান, তরজা, যাত্রা প্রভৃতির আসর বসে। ৪০ বছর আগে নদিয়ার প্রখ্যাত কবিয়াল হাজারী দাসের ছেলে নিমাইচাঁদ এখানে এসে তাঁর বাবার বিখ্যাত গান গেয়ে গেছেন,

ও ভাই নষ্ট করে কষ্ট দিল কোম্পানি
যার ভয়েতে এ ভারতে এল না জার্মানি
তবে এক টাকা চালের কাঠা, গেরস্তর কপাল ফাটা
তাই লেগেছে ল্যাঠা —

দেশবিভাগের আগে একবার বন্যার পরবর্তী সময়ে কবিয়াল পার্বতীবালা দাসী আর আবিরা বেগম পূজামণ্ডপের আসরে গেয়েছেন.

এবার বানে বাংলা মুলুক গেল গো রসাতলে
আঠাশ জেলা খেয়ে ঠেলা ডুবছে গো পলে পলে
উত্তরবঙ্গ মুর্শিদাবাদ ডুবে গেল সব আবাদ
নদে জেলা গেল না বাদ, পড়ল বানের কবলে।

এ ছাড়াও নদিয়া জেলার জনপ্রিয় তরজা গায়ক নফর ঘোষ আর দাশু অধিকারীও রাসের সময় পূজামণ্ডপ মাতিয়ে দিয়ে যেতেন। এ যুগে বাউল ষষ্ঠী ক্ষ্যাপা গাইছেন,

দেশে ধর্মের চাকা ঘুরছে উজান জগৎ সুদ্ধ চোর
ছোট বড় নাই, সবাই সমান ওই নেশায় বিভোর
তাই চোর-বন্দনা আগেই হবে নৈলে নাই নিস্তার—

সাম্প্রতিক যে কোনও বিষয় এইসব কবিয়াল তরজা গায়ক বা বাউলদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে, শ্রোতারাও মুগ্ধ হন।

রাসপূর্ণিমার পরের দিন হল বিসর্জনের পালা। বিসর্জনের আগে ঐদিন বিকালে ঐসব বিশাল বিশাল মূর্তিকে বিশেষভাবে নির্মিত গাড়িতে চাপিয়ে বাদ্যকরের দল ও আলোকসজ্জাসহকারে শোভাযাত্রা বের হয়। এর নাম হল আড়ং। ২০/২২ হাত লম্বা এইসব ঠাকুর পূজামণ্ডপ থেকে তুলে এনে কোনও গাড়িতে চাপানো মানুষের কম্মো নয়, কোনও সাধারণ গাড়ির এইসব ঠাকুর বহন করারও মুরোদ নেই। পূজামণ্ডপে যখন এইসব মূর্তির কাঠামো নির্মাণ করা হয়, তখন একই সঙ্গে তার নীচে ছয়টা বা আটটা গরুর গাড়ির চাকা ডবল 'ধুরো' (অ্যাক্সেল রড) দিয়ে এই মূর্তি বহনকারী শকট নির্মিত হয়। আড়ং-এর সময় যখন ঠাকুর বের করা হয়, তখন এই বিশেষভাবে নির্মিত শকটের নীচের খুঁটিগুলি কেটে দেওয়া হয়, ফলে ওই বিশাল মূর্তি কাঠামোসহ শকটের ওপর বসে যায়। এইবার পাড়ার যত শক্তসমর্থ মানুষ আছেন সকলকে এই গাড়ি ঠেলার কাজে হাত লাগাতে হয়। এ এক অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। নবদ্বীপ শহরের সরু সরু রাস্তা দিয়ে এই বিশাল বিশাল ঠাকুর যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন পাশ দিয়ে একটা রিকশা যাবারও জায়গা থাকে না। সারা রাস্তাজুড়ে ঠাকুর চলেছেন। ওপরে ইলেকট্রিকের তারে চালচিত্র ঠেকে কয়েকবার আগুন লেগে গিয়েছে, সেজন্য পুর কর্তৃপক্ষ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং টেলিফোন নিগম ওইদিন বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের তার খুলে নেন। ঠাকুর ঠেলার অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় বলে ওইদিন শহরের যুবক-প্রৌঢ় কারোই মদ্যপানে বাধা নেই। যাঁরা মাত্রা বেশি করে ফেলেন তাঁরা মাঝেমধ্যেই মারামারি-গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলেন। আড়ং-এর দিন সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় উন্মত্ত মানুষের ঢল নামে। শান্তিপ্রিয় ছাপোষা মানুষেরা এবং নারী-শিশুরা সাধারণত বাড়ির ছাদ থেকে ঠাকুর দর্শন করে এবং এই উন্মত্ততা উপভোগ করে। রাধাবাজার অঞ্চলের রাস্তা কিছুটা প্রশস্ত বলে সব ঠাকুর ওইখানে সমবেত হতে চেষ্টা করে। সেখানে পৌঁছবার পর ঠাকুরগুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট জলাশয়গুলিতে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশাল বিশাল মূর্তিগুলিকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয় না, কারণ ওই মূর্তির নীচের পাটাতনটি আবার বৎসরান্তে জল থেকে তুলে আনতে হয়। আবার একই পুষ্করিণী বা দিঘিতে ২/৩টির বেশি মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হলে জলাশয়টি তাতেই ভরাট হয়ে যাবে। তাই ঐসব মূর্তির বিসর্জনের জন্য জলাশয় নির্দিষ্ট করা থাকে। যাই হোক, এই বিসর্জনের পালা শেষ হতে হতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাতভোর হয়ে যায়। পরদিন সকালে শূন্য পূজামণ্ডপগুলির সামনে এসে যখন বাদ্যযন্ত্রীরা সানাইয়ে করুণ সুর বাজাতে থাকেন তখন আপনা থেকেই পল্লীবাসীর চোখে জল এসে যায়, পরের বছর রাসের দিনের আশায় চোখ মুছে বুক বাঁধে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। নদিয়া কাহিনী : কুমুদনাথ মল্লিক
২। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা : অশোক মিত্র সম্পাদিত
৩। নদিয়া জেলার ঐতিহ্য : মোহিত রায়

নদিয়া জেলার শিক্ষা-গ্রন্থাগার-সাক্ষরতা

আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবন ছবি : সত্যেন মণ্ডল

বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে নদিয়া প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ'-এর বর্ণনানুযায়ী ২৫০০ বছর আগে শিক্ষায় সমৃদ্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। বর্তমান নদিয়া জেলার অতীত ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনও সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু নদিয়ার নবদ্বীপ ও শান্তিপুর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এসেছে, তার প্রমাণ মেলে।

প্রাক্-ইংরেজ শাসনকাল

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানের মতো নদিয়া জেলাতেও প্রথাগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ছিল পাঠশালা, আর উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্যে ছিল চতুষ্পাঠী ও টোল।

বাংলায় পাল ও সেন রাজাদের আমলে নবদ্বীপ ও অন্যান্য এলাকায় কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়স্মৃতি-জ্যোতিষ প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানচর্চার জন্যে চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। তারপর বাংলার সিংহাসনে বসেন তুর্কি-আফগান সুলতানগণ। পাঠান হুসেন শাহ্‌র আমলে নতুন করে রাজপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়ে নবদ্বীপ নব্য-ন্যায়চর্চার পীঠস্থান হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন দাসের

'চৈতন্য ভাগবত' অনুযায়ী নবদ্বীপে তখন লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়তেন। এ যুগেই নবদ্বীপ হয়ে ওঠে বাংলার 'অক্সফোর্ড'। এ যুগকে সংস্কৃতচর্চার সুবর্ণ যুগ' বলা যায়। ন্যায়াচার্য বাসুদেব সার্বভৌম, নব্য-ন্যায়ের প্রবক্তা রঘুনাথ, স্মার্ত রঘুনন্দন, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা নবদ্বীপে জ্ঞানার্জনের জন্যে উপস্থিত হতেন। মুসলিম যুগে বারাণসী, মিথিলার মতো নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী ও টোলগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র।'

পাঠশালাগুলিতে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট ভাষায় লিখতে পড়তে এবং সামান্য অঙ্ক শেখান হত। পাঠশালার শিক্ষায় অন্য কিছু শেখান হত কি না, শিক্ষার্থী হিসেবে কারা পাঠশালায় আসতেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। শিক্ষাদানের মাধ্যম কি ছিল, বাংলা বা সংস্কৃত, তাও সঠিক জানা যায় না।

চতুষ্পাঠী বা টোলগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত (গুরু) যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন তাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের সকল বিষয়ে পাঠদান হত না। তিনি যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শুধু সেই বিষয়গুলি ছাত্রদের পড়াতেন। যে প্রতিষ্ঠানে কল্প, ব্যাকরণ, পুরাণ ও দর্শনচর্চা হত, তাকেই বলা হত চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠীরই পরিবর্তিত রূপ হল টোল। টোল সৃষ্টির প্রথম যুগে হয়ত এদের শ্রেণীবিভাগ ছিল, কোনটায় পড়ানো হত ন্যায়, কোনটায় কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ এবং কোনটায় পুরাণ ও কল্প প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিষয়বস্তুগত শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হয়। তখন পণ্ডিত অধ্যাপকের শিক্ষা ও সাধনা অনুযায়ী টোলের অধীতব্য বিষয় নির্ধারিত হত। একই টোলে কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ, ন্যায়-দর্শন পড়ানো হত, এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

প্রাচীন তপোবনের শিক্ষা বা আশ্রমিক শিক্ষার মতো টোলের শিক্ষাও ছিল অবৈতনিক। রাজা-জমিদারেরা দেবত্র, ব্রহ্মত্র, ভোগত্র সূত্রে ভূমিদান করতেন। তাঁদের ভূমিদানে এবং আর্থিক বৃত্তির সাহায্যে টোলগুলির ব্যয় নির্বাহ হত। দেশ-দেশান্তর থেকে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা এ সব জায়গায় এসে সমবেত হত। অধ্যাপকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। উচ্চশিক্ষার টোলগুলি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, গুরু বা পণ্ডিত অধ্যাপকের মৃত্যুতে যোগ্য উত্তরাধিকারি টোল পরিচালনা করতেন, নতুবা সেগুলি বন্ধ হয়ে যেত। অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ছিল সহজ মানবিক সম্পর্ক। সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জ্ঞানব্রতী অধ্যাপকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্য শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। তখন কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগ ছিল না। সমাজে অধ্যাপকরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'বুনো রামনাথ'-এর (রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত) আদর্শ আধুনিককালেও উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে প্রচারিত হয়।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত পূর্ব ভারতে স্মৃতি ও ন্যায় চর্চার কেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল বহু দূর বিস্তৃত। নদিয়ায় নবদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য খ্যাতনামা সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ছিল শান্তিপুর, উলা-বীরনগর, বেলপুকুর, বিল্বগ্রাম, কামালপুর (চাকদহ), কাঁচকুলি, পালপাড়া প্রভৃতি'।

১৮২৪ সালে মিঃ উইলসন (H. H. Wilson) নদিয়ার টোল সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরও টোলের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তিনি নবদ্বীপে ২৫টি টোল দেখেছেন। এই টোলগুলিতে ৫০০/৬০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। তা ছাড়া অসম, ত্রিহুত, নেপাল প্রভৃতি স্থান থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত।

এ সব টোলে খড়ের ঘরে ছাত্ররা পড়াশোনা করত। তারই সংলগ্ন দু-তিন সারি মাটির ঘর, সেখানে ছাত্ররা থাকত। অধ্যাপক এ সব ঘর তৈরি ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতেন। থাকা, খাওয়া, বেশভূষা সবকিছুর ব্যবস্থাই অধ্যাপকরা করতেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা প্রতি টোলে একশো টাকা বৃত্তি দিতেন। অধ্যাপকরা বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান পেতেন। প্রধান প্রধান উৎসবের সময় ছাত্ররা পাঠ বিরতি দিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়তেন। শিক্ষার্থীদের বয়সের কোনও সীমা ছিল না। মধ্যবয়স্ক, এমন কি পক্ককেশ ব্যক্তিরা পর্যন্ত টোলে পড়তেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে টোলের শিক্ষার আকর্ষণ কমে যেতে থাকে। নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং জেলার অন্যত্র এখনও টোল আছে। টোলের অধ্যাপকরা সরকারি বৃত্তিও পেয়ে থাকেন। কিন্তু সামান্য ছাত্র আসে শিক্ষার জন্যে। টোলের শিক্ষার প্রধান ত্রুটি ছিল শিক্ষা জীবনমুখী না হওয়ায় পাণ্ডিত্যলাভ যতটা সম্ভব হত, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ততটা এ শিক্ষায় মিটত না। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন এ শিক্ষার দ্বারা মেটান সম্ভব নয় বলেই টোলের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়েছে। ধীরে ধীরে টোলের শিক্ষা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

নদিয়ায় মুসলমান সুলতানদের আমলে ফার্সি ভাষা ছিল রাজভাষা। ফার্সি ভাষা-সাহিত্য, মুসলিম আইন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল অনুমান করা যায়। অভিজাত মুসলমান পরিবার, জমিদার এবং সেনাবাহিনীর উচ্চবর্গের সন্তান-সন্ততিদের ফার্সি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নদিয়া জেলার ফার্সি মাধ্যম মক্তব বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্র শিক্ষায় আরবি ভাষার ব্যবহার ছিল অনুমান করা যায়। কিন্তু মসজিদ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষায় ধর্মশিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন

ভারতে ইংরেজ শাসনকালে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে যে প্রভাবগুলি কাজ করেছে, তা হল—মিশনারি প্রচেষ্টা, ব্রিটিশ সরকারের আইন এবং ভারতীয় প্রচেষ্টা ও বাংলার নবজাগরণ। ইংরেজরা এদেশের মানুষকে শিক্ষিত করার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি। প্রশাসনিক স্বার্থেই তাদের এ কাজ করতে হয়েছিল (The introduction of modern education in India was primarily motivated by the political-administrative and economic needs of Britain in India—*A. R. Desai, Social Book ground of Indian Nationalism*)। প্রশাসনব্যবস্থা চালু রাখতে এবং ইংরেজ
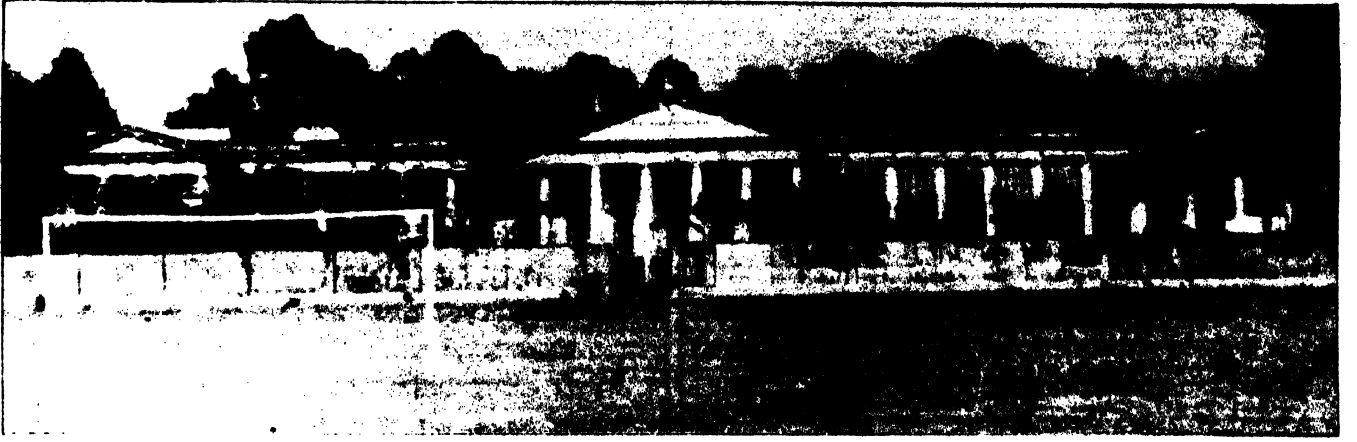
কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় ছবি : সত্যেন মণ্ডল

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ চালানোর জন্যে প্রয়োজন হল অসংখ্য নিম্নস্তরের কর্মচারীর। ভারতীয়দের মধ্যে থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল (from the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta a fresh class is springing up endowed with the requirements of government and imbued with European Science—*Karl Marx : On Colonialism*)।

১৮১৩ সালের (আ্যাডামের রিপোর্ট) পর থেকে ১৮৫৪ সালের উড্স ডেস্প্যাচ-এর মধ্যে দিয়ে সরকারি ব্যবস্থায় প্রবর্তিত শিক্ষাকাঠামো সুস্পষ্ট রূপ পায়। ১৮৩৫ সালের মেকলের মাইন্যুস্ট-এর মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ধরা পড়ে। মেকলে চেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে পুরোপুরি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি চেয়েছিলেন এমন একদল ভারতীয় গড়ে তুলতে, যারা চেহারায় ভারতীয় হলেও রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিতে একেবারে ইংরেজ বনে যাবে ("creation of a class of Indians who would be Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect–Lord Macauly)। মেকলের সে আশা সম্পূর্ণ পূরণ হয়নি। কার্ল মার্কস বলেছেন, ইংরেজরা হিন্দুস্থানে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইংরেজদের অপরাধ যাই হোক না কেন, সমাজবিপ্লব সম্ভব করার ক্ষেত্রে তারা ইতিহাসের অবচেতন অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম অঙ্কে ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মিশনারিরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মিশনারিরা এদেশে মূলত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আসে। এ দেশীয় মানুষকে ধর্মে দীক্ষিত করা এবং তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অগ্রণী হয়। এই প্রেক্ষাপটেই নদিয়া জেলায় আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ধারা বিচার করতে হয়।

নদিয়ায় ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করেন খ্রিস্টান মিশনারি মিঃ ডিয়ার।

"But the first schools were not opened before 1832, when a Church of England Missionary by the name of Mr. Deerr, then stationed at Kalna in Barddhaman district, went to Krishnagar and Nabadwip. He opened two schools in Nabadwip and one in Krishnagar (Bengal District Gazetters : Nadia, 1910-J.H.E. Garrett). চার্চ মিশনারি সোসাইটি নদিয়া জেলার অন্যত্রও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ১৮৫০ সালে চাপড়ায় ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সালে কৃষ্ণনগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

কৃষ্ণনগরে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক হলেন রামতনু লাহিড়ীর অনুজ ডেভিড হেয়ারের ছাত্র প্রসাদ লাহিড়ী। তিনি নিজগৃহে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নিজেই ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীকালে এই স্কুল কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পরিণত হয়। বর্তমানে স্কুলটি বঙ্গের গৌরব বিখ্যাত মনমোহন ঘোষের বাড়িতে অবস্থিত। প্রসাদ লাহিড়ীর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। ১৮৩৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটি কৃষ্ণনগর সেন্ট জন'স স্কুল স্থাপন করে। মিশনারিদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি নদিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে নবজাগরণের ধারণায় উদ্বুদ্ধ কিছু প্রগতিশীল মানুষ ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ সালে কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল (Anglo-Vernacular) স্থাপন। এই স্কুলে একসময় ছাত্র ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও অনন্তহরি মিত্র।

১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডি এল রিচার্ডসন। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন অধ্যাপক। একশো বিঘা জমির ওপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। নদিয়ার মহারাজ এই জমি দান করেন। তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯০৯ সালে কলেজের ছাত্র ছিল ১২৪ জন এবং ১ জন প্রিন্সিপাল, ৫ জন প্রফেসর ও ৪ জন লেকচারার ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার জন্যে নদিয়া জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। হান্টার সাহেবের (W. W. Hunter) তথ্য অনুযায়ী ১৮৭১-৭২ সালে নদিয়া জেলায় পাঠশালাসহ ২২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মোট ৪৮৩৬ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করত। ১৮৯৮-৯৯ সালে ৬১৫টি নিম্নপ্রাথমিক এবং ৮৫টি উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৮২৪। জে এইচ ই গ্যারেট সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার (Bengal District Gazetters : Nadia, 1910) থেকে জানা যায় যে, নদিয়া জেলায় ৭০৬টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১২৩টি উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩১২৩৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ১৫২টি ছিল বালিকা বিদ্যালয় এবং এগুলিতে ৩৯৮৩ জন ছাত্রী ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নদিয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো পুনর্গঠিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে নদিয়ার ৮০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৩১৭৪ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা হয় ১৩৯৩ এবং ছাত্রসংখ্যা হয় ১,৫৩,০৭৭। এর মধ্যে ১২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা— ২৪৩০৫) সরকার পরিচালনা করতেন এবং পৌরসভা ও নদিয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ ১১২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা— ১,১০,৬১০) পরিচালনা করতেন। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা যায় ৫—১৪ বছর বয়স্কদের মোট সংখ্যার বালক ৩৫.৫৮ শতাংশ এবং বালিকা ২৯.১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে পড়ে।

১৯৩০ সালে Bengal Rural Primary Education Act পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে গঠিত নদিয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ (District School Board, Nadia) আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১ মার্চ, ১৯৩৫। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সভাপতি হন প্রয়াত জননেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক থাকেন জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক। ১৯৬৩, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮০ এবং ১৯৮৯ সালে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের (১৯৩০) সংযোজন-সংশোধন হয় এবং নিয়মাবলী প্রণীত হয়। বর্তমানে রয়েছে নদিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ (District Primary School Council, Nadia)। নির্বাচিত সংসদ এখনও গঠিত হয়নি। তদর্থক সমিতি (Adhoc Committee) কাজ করে চলেছে। ১ জন সভাপতি আছেন, সম্পাদক, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং ২১ জন সদস্য। সকলে সরকার কর্তৃক মনোনীত। নদিয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যায়।

আর্থিক বছর	মোট ব্যয় (বাজেট)
১৯৭০ - ৭১	১,২৪,৪৩,২৪২ = ৯৯ টাকা
১৯৭১ - ৭২	১,২৯,০৫,৫৮৭ = ৩৯ টাকা
১৯৯৫ - ৯৬	৩৭,৩৮,২২,৭৯১ = ০০ টাকা
১৯৯৬ - ৯৭	৫৫,৪৫,৯৮,৯৬৯ = ০০ টাকা

নদিয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বুনিয়াদি শিক্ষণের জন্যে বড় আন্দুলিয়া, বড় জাগুলি ও ধর্মদায় 'জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ' আছে। কৃষ্ণনগরে শিক্ষিকাদের জন্যে আছে 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহিলা শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়'।

মাধ্যমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের অধ্যায় থেকে নদিয়া জেলায় দু'টি স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে প্রথম স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে ছিল (১) মিডল ইংলিশ স্কুল এবং (২) হাই ইংলিশ স্কুল। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে এগুলিই পরিণত হয়েছে (১) জুনিয়ার হাই ও সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং (২) দশম শ্রেণীর, একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই কাঠামো এখনও অপরিবর্তিত আছে।

হান্টার সাহেবের (Statistical Account of Bengal : W. W. Hunter, 1875) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭১-৭২ সালে নদিয়া জেলায় ৬৯টি মিডল স্কুল ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫২৬। এর মধ্যে ৪টি ছিল সরকার পরিচালনাধীন, ৫৩টি ছিল সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, ৮টি ছিল ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন ইংলিশ স্কুল এবং ৪টি ছিল ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন মাতৃভাষা-মাধ্যম (Vernacular) স্কুল। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন স্কুলগুলির মধ্যে ৪টি ইউরোপীয় মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হত। উনবিংশ শতকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলকে নদিয়া জেলার প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় বলা যায়। সেন্ট জন'স সি এম এস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৪ সালে এবং হাটচাপড়া কিং এডওয়ার্ড স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালে। কিন্তু ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল প্রথম অনুমোদন লাভ করে।

স্বাধীনতার পর নদিয়া জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ১৯৫১-৫২ সালে জেলায় ৬০টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৯৭২১। ১৯৬১ সালে জেলার উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৬২ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয় ৩৬। ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫,২৪৭ এবং ১৫,৯২৫। ১৯৫১-৫২ সালে নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় ছিল মাত্র ৪৫ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪,৬২৯। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায়—বিদ্যালয় ১১৭ এবং ছাত্র ১১,৭৬৪। বর্তমানে ('৯৩-৯৪) নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা হল ১৪২ , উচ্চ বিদ্যালয় ২৩৪ এবং উচ্চ মাধ্যমিক ৬২। এই বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫,০৪৩, ১,৯০,৩০১ এবং ৬৬,৬১৪।

নদিয়া জেলার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে আছেন নদিয়া জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষা।

জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্যে শিমুরালি ও কল্যাণীতে একটি করে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে।

উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশের শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে।

	বিদ্যালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার বছর
(১)	সেন্ট জন'স সি এম এস স্কুল, কৃষ্ণনগর	১৮৩৪	১৯০১
(২)	হাটচাপড়া কিং এডওয়ার্ড স্কুল গ্রাম ও থানা—চাপড়া	১৮৪১	১৯৪৮
(৩)	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল	১৮৪৬	১৮৪৬
(৪)	লাখুরিয়া হাই স্কুল গ্রাম ও থানা—কালীগঞ্জ	১৮৪৮	১৮৫০
(৫)	কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল	১৮৪৯	১৮৬৩
(৬)	রানাঘাট পালচৌধুরী স্কুল রানাঘাট	১৮৫৩	১৮৫৭
(৭)	শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল শান্তিপুর	১৮৫৬	১৮৬১
(৮)	মুড়াগাছা হাই স্কুল গ্রাম—মুড়াগাছা থানা—নাকাশীপাড়া	১৮৬৪	১৮৬৯
(৯)	মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুল গ্রাম—মাজদিয়া থানা—কৃষ্ণগঞ্জ	১৮৬৮	১৮৯১
(১০)	তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় নবদ্বীপ	১৮৭০	১৯৫০
(১১)	সূত্রাগড় নদিয়া মহারাজ (এন এম) হাই স্কুল শান্তিপুর	১৮৭২	১৯০১
(১২)	নবদ্বীপ হিন্দু হাই স্কুল	১৮৭৩	১৮৭৩
(১৩)	কৃষ্ণনগর দেবনাথ হাই স্কুল	১৮৭৩	১৯৩৮
(১৪)	সুধাকরপুর হাই স্কুল গ্রাম—কাশিয়াডাঙ্গা থানা—নাকাশীপাড়া	১৮৮৬	১৮৮৮
(১৫)	নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুল নবদ্বীপ	১৮৭৫	১৯২৪
(১৬)	বেলপুকুর হাই স্কুল গ্রাম—বেলপুকুর, থানা—কোতোয়ালি	১৮৯৫	১৮৯৫
(১৭)	শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল একাডেমি শান্তিপুর	১৮৯৬	১৯০২
(১৮)	পলাশী হাই স্কুল গ্রাম—পলাশী, থানা—কালীগঞ্জ	১৮৯৭	১৯০২
(১৯)	মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয় কৃষ্ণনগর	১৮৯৭	১৯৬১
(২০)	জামসেরপুর বি এন হাই স্কুল গ্রাম—জামসেরপুর থানা—করিমপুর	১৮৯৯	১৯০০
(২১)	শিকারপুর হাই স্কুল গ্রাম—বারুইপাড়া থানা—করিমপুর	১৯০০	১৯১৬
(২২)	আড়ংঘাটা হাই স্কুল গ্রাম—আড়ংঘাটা, থানা—রানাঘাট	১৯০০	১৯৪৮

উচ্চশিক্ষা : কলেজ

উনবিংশ শতকে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে নদিয়া জেলাতে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। ১৮৪৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ। এই কলেজটি জেলার প্রাচীনতম কলেজ শুধু নয়, বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন ডি এল রিচার্ডসন। প্রথম বছর থেকেই শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণনগর কলেজ স্নাতক স্তর পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করে। ১৮৯৬-৯৭ সাল থেকে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে আইন (Bachelor of law and pleadership) পড়ান হত। বর্তমান কলেজটিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী এবং বি এ, বি এস-সি-তে পাস ও বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪২) নবদ্বীপে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের শাখা স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার আগে কৃষ্ণনগর কলেজই ছিল নদিয়া জেলার একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

স্বাধীনতার পর নদিয়া জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি উদ্যোগে এবং সরকারি সহযোগিতায় জেলায় বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে জেলায় ৪টি কলেজ ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০৮৩। ১৯৭০-৭১ সালে কলা-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠনের জন্যে ৯টি কলেজ ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৬১৯। ১৯৪৮ সালে শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য শাখায় স্নাতক সাম্মানিক স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। নদিয়া জেলার কলেজগুলির মধ্যে শান্তিপুর কলেজেই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বৃত্তিশিক্ষার (Vocational Courses) ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫০ সালে রাণাঘাট কলেজ স্থাপিত হয়। একের পর এক জেলায় বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, মাজদিয়া সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজ, কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজ (বর্তমানে দ্বিজেন্দ্রলাল কমার্স কলেজ নামে স্বীকৃত), বেতাই বি আর আম্বেদকর কলেজ, চাকদহ কলেজ, শিমুরালি বি টি কলেজ, হরিণঘাটা কলেজ এবং বেথুয়াডহরি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জেলার ১৪টি কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২৫৭৯। এর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১৫৩০০ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৭২৭৯। নদিয়া জেলার কলেজগুলির মধ্যে চাকদহ কলেজ, হরিণঘাটা কলেজ ও শিমুরালি বি টি কলেজ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকিগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬০ সালে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যে নদিয়া জেলায় স্থাপিত হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। কল্যাণীর 'সি' ব্লকে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। মোট জমির পরিমাণ ৮৩২ একর। কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ান হয়।

কলা বিভাগ : বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বি এ (অনার্স) ও এম এ পড়ান হয়। লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ পড়ার ব্যবস্থা আছে।

বিজ্ঞান বিভাগ : রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, পরিসংখ্যানতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে অনার্স ও এম এস-সি পড়ান হয়।

শিক্ষা বিভাগ : বি টি এম এড এবং শারীর শিক্ষায় বি এড, এম এড পড়ান হয়।

বাণিজ্যে এম কম, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও বয়স্কশিক্ষার (Diploma in Adult Education) পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। উচ্চতর গবেষণার জন্যে Ph. D. ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একাধিক হস্টেল আছে।

১৯৭৪ সালে হরিণঘাটায় (মোহনপুর) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন হয়। কৃষিখামারে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাটি, বীজ, সার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়। সম্প্রতি (১৯৯৬-৯৭) উদ্যান-বিজ্ঞানে স্নাতক পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। পাঠ্যক্রমটি ৪ বছর মেয়াদের হবে।

সম্প্রতি চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও গবেষণার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দিল্লির 'All India Institute of Medical Sciences'-এর ধাঁচে কল্যাণীতে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রাক্তন রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসানের নামে 'নুরুল হাসান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরিশিক্ষা

নদিয়া জেলায় কারিগরিশিক্ষার সূচনা হয় ১৮৫০—৫২ সালে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে। চার্চ মিশনারি সোসাইটি হাটচাপড়ায় ১৯০০ সালে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করে। জি এইচ ব্র্যাডবার্ন (Rev. G. H. Bradburn) এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বনিযুক্তির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের কাঠের কাজ (carpentry), টিনের কাজ (tin-smithy), কামারশালার কাজ (Blacksmithy), পিতল-কাঁসার কাজ (brass work) এবং ঝুড়ি (Basket-making) তৈরির কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে নদিয়ায় ১০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৪০। জেলায় কারিগরি শিক্ষার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 'বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' এখান থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যালে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এ চাড়া ফুলিয়া পলিটেকনিক, কৃষ্ণনগর জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে।

কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত মহিলা শিল্প বিদ্যালয় ও উৎপাদন কেন্দ্র আছে। উমাশশী নারী শিল্পশিক্ষা মন্দির (প্রতিষ্ঠা-১৯৪৪) জেলার সবচেয়ে পুরনো মহিলা শিল্প বিদ্যালয়। এ ছাড়া আছে কৃষ্ণনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় মহিলা সমিতি, উকিলপাড়ায় কৃষ্ণনগর মহিলা সংঘ শিল্প বিদ্যালয়, শান্তিপুর তন্তুবায় বিদ্যালয়, চাকদহ

শিল্প বিদ্যালয়, নবদ্বীপ 'কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান', রানাঘাট কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, মহিলাদের তাঁত সুচি, এমব্রয়ডারি শেখান হয় এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে লেডি ব্রাবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স শেখান হয়। নদিয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমানে কারিগরিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজশিক্ষা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেলায় সমাজশিক্ষার প্রসার হতে থাকে। সারা জেলায় নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। কৃষ্ণনগর ও রানাঘাটে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সরকার ও জনগণের অর্থে নির্মিত হয় 'রবীন্দ্র ভবন'। কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রানাঘাটসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে নৃত্যগীত শিক্ষার অনেক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। বাংলা রামায়ণ প্রণেতা কবি কৃত্তিবাসের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত ফুলিয়ায় 'কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল' এবং 'মিউজিয়াম' এক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি কেন্দ্র।

নদিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সভ্য দুনিয়ায় মানুষের অগ্রগতির পথে বড় সম্বল দু'টি— একটি হল শিক্ষা, অন্যটি হল গ্রন্থাগারের সহায়তা। মানব সভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে কখনও রাজা-উজিরের প্রাসাদে, কখনও বা মন্দির-গির্জায়; সেটা ছিল যুগোপযোগী সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মপ্রবণ রাষ্ট্রের প্রতিফলনমাত্র। সাধারণের জন্যে গ্রন্থাগার তিনশো বছর আগেও কল্পনা করা যায়নি। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে নিজেকে শিক্ষিত করতে হলে একমাত্র উপায় গ্রন্থাগার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন, "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়া যায়।" স্কুল-কলেজের শিক্ষাই চরম শিক্ষা নয়। শিক্ষালয়ের শিক্ষা কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, যদি না ছাত্র তার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ করার জন্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলে। সেখানেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। আনাতোলি লুনাচারস্কির কথায়, 'প্রথাগত শিক্ষা যদি জীবনভোর প্রথামুক্ত শিক্ষাচর্চার মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ না পায়, তা হলে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না।'

উনবিংশ শতকে নবজাগরণের ভাবধারায় প্রাণিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মানুষের একাংশের উদ্যোগে বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। বিংশ শতকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণায় দেশপ্রেমী যুবশক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের তৎপরতায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের এই প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুনজরে দেখেনি। গ্রন্থাগারে নানা ধরনের নিষিদ্ধ বৈপ্লবিক গ্রন্থপাঠে যুবসমাজ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত। অনেক গ্রন্থাগার বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র হওয়ায় তাদের ওপর বারবার নেমে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর খড়্গহস্ত।

নদিয়া জেলায় একইভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। নদিয়া জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমানে শহর গ্রন্থাগার) 'পশ্চিমবাংলার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম বলা যায়। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি কৃষ্ণনগর তথা নদিয়া জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতির মনন কেন্দ্র। ১৮৫৬ সালে তৎকালীন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হজ্‌সন্ প্র্যাট্ কৃষ্ণনগরে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নদিয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, জেলার মুখ্য আমিন রামলোচন ঘোষ, উলার জমিদারবাবুরা, রানাঘাটের পালচৌধুরীবাবুরা, অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এক সভায় মিলিত হয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নদিয়ার মহারাজা, রামলোচন ঘোষ, তৎপুত্র মনমোহন ঘোষ ও জেলাশাসক যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন। মহারাজা গ্রন্থাগারের জমি দান করেন এবং সভায় দশ হাজার টাকা চাঁদা ওঠে। ১৮৫৯ সালে বর্তমান গ্রন্থাগারগৃহটি নির্মিত হয়। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন দীননাথ পাল। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ গ্রন্থাগারের ওপরও পড়ে। গ্রন্থাগারের পরিচালককর্মীরা অনেকে কারারুদ্ধ হন। রাজরোষের ফলে গ্রন্থাগারের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বিনষ্ট হয়। স্বাধীনতার পর গ্রন্থাগারে 'কিশোর বিভাগ' খোলা হয়। সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্যে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তুষার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং জেলাশাসক অতনু পুরকায়স্থের আর্থিক সহযোগিতায় 'Jumigation chamber' (১০ হাজার টাকা মূল্যে) কেনা সম্ভব হয়েছে। 'Imperial Shakespeare' এবং 'Historian's History of the world'-এর মতো মূল্যবান গ্রন্থকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব হয়েছে।

নদিয়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার হল নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে নাম হয় 'সপ্তম এডওয়ার্ড অ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরি'। নদিয়া রাজবাড়ি থেকে এখানে অজস্র দুর্লভ পুঁথি আনা হয় মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্নের প্রচেষ্টায়। স্বাধীনতার পর গ্রন্থাগারটি 'শহর গ্রন্থাগার' হয়েছে এবং নামকরণ হয়েছে 'নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার'। এই পাঠাগারের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে নবদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক প্রাচীন পুঁথির কাষ্ঠাবরণ (পাটা) আছে। সমগ্র পুঁথিশালা প্রাচীন বিদ্যাসমাজের প্রামাণ্য দলিল।

১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রানাঘাট স্টুডেন্টস লাইব্রেরি' যা পরে রানাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি নামে পরিচিত। ১৯০২ সালে গ্রন্থাগারটি পঞ্জিভুক্ত হয়, গ্রন্থাগারটি তখনও সরকারপোষিত গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

১৯২৩ সালে কৃষ্ণনগরে 'সাধনা লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর ও নদিয়ার খ্যাতনামা স্বদেশী কর্মী ও বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র ছিল এই সাধনা লাইব্রেরি। কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক জীবন ও ক্রীড়াক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারি কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, ১৯৪৪ সালে চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এর প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটি এখনও বেসরকারি পরিচালনায়।

নদিয়ার শান্তিপুরেরও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ১৩২১ সালের ১ চৈত্র প্রভাস রায়ের উদ্যোগে শান্তিপুর 'সাহিত্য পরিষদ' স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষাসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান এবং লোকশিক্ষা প্রচারে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ কাজ শুরু করে। পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন—দীনেশচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর সেন, সরলা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখ গুণিজন। সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় ৩০০ প্রাচীন পুঁথি, নানা ঐতিহাসিক উপাদান ও পুরাকীর্তি রয়েছে। পরিষদের উদ্যোগে দীর্ঘদিন ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শান্তিপুরে ১৩১৬ সালে 'বালকসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বালকমনের উৎকর্ষ বিধান ছিল এর উদ্দেশ্য। জ্ঞানানুসন্ধান ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুরাণ বিষয়ে মাতৃভাষায় তিনটি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ১৩২৩ সালে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে বালকসমাজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানান হয়। সেই সময় থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ'। শিক্ষা প্রচার, চতুষ্পাঠী পরিচালনা, পুঁথি সংগ্রহ ও গবেষণার ব্যবস্থা, ব্যায়ামাগার এবং সেবাসদন প্রতিষ্ঠা—এই সেবাধর্মী কার্যক্রম নিয়ে পুরাণ পরিষদের কাজ শুরু হয়।

১৯২২ সালে শান্তিপুরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি'। প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী (ছোটু), প্যারীমোহন সান্যাল এবং আরও অনেক বিদ্যানুরাগী এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত মৈত্র অর্থ সাহায্য করে গ্রন্থাগারটি পরিপুষ্ট করেন। ১৯৪০-৪১ সালে পাবলিক লাইব্রেরির হলটি (Hall) নবরূপে রূপায়িত হয়। এটি নদিয়া জেলার উল্লেখযোগ্য স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠেছে, (সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় হলটির সংস্কার করা হয়েছে)। প্রখ্যাত নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রচেষ্টায় গৌরীপুরের রাজকুমার ও প্রতিভাবান পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার অনেক মূল্যবান গ্রন্থ পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শান্তিপুরের রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই পাবলিক লাইব্রেরি। জেলে রাজবন্দীদের বই সরবরাহ পাবলিক লাইব্রেরির স্মরণীয় কীর্তি। ১৯৫৩ সালে পাবলিক লাইব্রেরি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করে। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব চন্দ, বি এস কেশবন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শশী খাঁ। এটি বর্তমানে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নদিয়া জেলায় সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার ছিল ৪০টি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগার সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। বর্তমানে ১টি জেলা গ্রন্থাগার, সরকার-পোষিত ৮টি শহর গ্রন্থাগার এবং ১০০টি প্রাইমারি ইউনিট লাইব্রেরি/গ্রামীণ গ্রন্থাগার সহ মোট ১০৯টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার রয়েছে। তা ছাড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৬৫টি বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে।

নদিয়া জেলা গ্রন্থাগারে দু'টি বিভাগ আছে—স্থানীয় ও ভ্রাম্যমাণ। জেলার ১১২টি সরকার-পোষিত ও বেসরকারি গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ থেকে বই সরবরাহ করা হয়।

১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার পর ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট সরকার পৃথক গ্রন্থাগার দপ্তর প্রবর্তন করেন। জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনায় নতুন গতি সঞ্চার হয়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক (District Library Officer) এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বা L. L. A. জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন।

গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জনশিক্ষার প্রসারে তাকে কার্যকর করতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদিয়া জেলা শাখা এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান ছাড়া গ্রন্থাগারকর্মীদের নিয়ে নানা সমস্যার আলোচনা, গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম ও তথ্যকেন্দ্র (information centre) হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে তাঁরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি রূপায়ণে জেলার গ্রন্থাগারকর্মিগণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৯৫ সাল থেকে সাক্ষরোত্তর পর্যায়ে নবসাক্ষরদের গ্রন্থাগারমুখী করা ও তাঁদের সদস্য করার জন্যে কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। জেলায় আরও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং চালু গ্রন্থাগারগুলিকে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। 'প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার'—এটাই আগামীদিনের স্লোগান হওয়া উচিত।

১৯৮২ সাল থেকে অন্য জেলার মতো নদিয়া জেলাতেও জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের 'Every reader his book' এবং 'Every book its reader'—এই নীতিদ্বয়ের সার্থক মিলন ঘটে বইমেলায়। গ্রন্থাগারকর্মী, মেলা সংগঠক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক, প্রকাশক মিলে বইমেলা প্রাঙ্গণে 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'-এর পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রদর্শনী, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট হয় বইমেলা প্রাঙ্গণ। বইমেলা গ্রন্থাগারগুলিকে বই নির্বাচনে সহায়তা করে। বইমেলার ক্রেতাদের মধ্যে ছোটদের উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগরে একাদশ নদিয়া বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মেলায় এসেছেন। বইয়ের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং সঙ্গতি অনুযায়ী কিছু না কিছু বই সংগ্রহ করেছেন। একাদশ নদিয়া বইমেলায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও বিধায়ক প্রয়াত অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম।

জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সাক্ষরোত্তর ও প্রবহমান শিক্ষার মূল কথা হল—'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থাগারের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'লাইব্রেরি অংশে মুখ্যত জমা করে রাখে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।' সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীরা,

জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠকরা গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলতে আন্তরিক সচেষ্ট হলে জেলার গ্রন্থাগার সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারবে।

জেলার সাক্ষরতাচিত্র

শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব—একথা আজ সর্বত্র উচ্চারিত ও প্রচারিত, শিক্ষাজাত চেতনার অভাবে মানুষ ক্ষুধার্ত বোধ করলেও এটুকু সহজে বুঝতে পারে না যে, ক্ষুধার খাদ্যেও আছে তার সহজাত অধিকার। এই দুর্বলতার জন্যই যুগে যুগে দেশে দেশে দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষকে প্রতারিত হতে হয়েছে। নিরক্ষরতা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যই দেশ ও সমাজের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকদের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি জনচেতনার প্রসার বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়নি। সে শিক্ষা ছিল সমাজের স্বল্পসংখ্যক মানুষের জন্যে। শিক্ষা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই ছিলেন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালে তাঁর 'শিক্ষার বিকিরণ' নামের ভাষণে বলেছিলেন, 'এই বিদেশি শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটা যেন অবাস্তব'। ওপরের কিছু মানুষ আলো পেল, আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নেমে এল নিরক্ষরতার অভিশাপ। এ তো গেল ইংরেজ আমলের কথা। স্বাধীন ভারতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হল না। সংবিধানের ঘোষণা, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীশিক্ষার কথা বড় গলায় প্রচার করা হল, কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছাল না। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নিরক্ষর দেশ হিসেবে পরিগণিত হল।

পশ্চিমবাংলা বা আমাদের নদিয়া জেলার চিত্রও ভিন্ন ছিল না। বিংশ শতকের সূচনাপর্বে ১৯০১ সালে জেলার জনসংখ্যার ১২.০৮ শতাংশ ছিলেন সাক্ষর। নদিয়া জেলার সাক্ষরতার একটি কালানুক্রমিক চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

সাক্ষরতার হার

বছর	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯০১	১২.০৮	২২.৪৩	১.৮৭
১৯১১	১১.৭২	২০.৫৫	২.৮৫
১৯২১	১৩.৫৪	২২.৩৫	৪.৩১
১৯৩১	১২.৪৯	১৯.৮৫	৪.৭৪
১৯৪১	২০.৩২	৩০.২৪	৯.৮৩
১৯৫১	১৫.৩১	১৮.১৬	১২.২৩
১৯৬১	২৭.২৫	৩৫.৭৮	১৮.২৪
১৯৭১	৩১.৩১	৩৯.২৮	২২.৯২

এই চিত্র থেকে লক্ষ করা যায় যে, ১৯৩১ পর্যন্ত সাক্ষরতার হার বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। বরং ১৯০১ ও ১৯১১-র মধ্যে এবং ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার নিম্নাভিমুখী। অন্যদিকে ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯৩১ সালে ৪.৭৪ শতাংশ থেকে ১৯৪১ সালে ৯.৮৩ শতাংশ মহিলা সাক্ষর হয়েছেন। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হারের পার্থক্য লক্ষণীয়।

জেলার জনগণনার রিপোর্ট থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সাক্ষরতার হারের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নীচের চিত্রে এটা দেখান যেতে পারে :

সাক্ষরতার হার

বছর	শহর / গ্রাম	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৫১	শহর	২৮.১৭	২৮.০৩	২৮.৩১
	গ্রাম	১২.৪১	১৬.০৬	৮.৭৬
১৯৬১	শহর	৫২.১০	৬১.৩৩	৪২.২০
	গ্রাম	২১.৬৪	২৯.৯৭	১২.৮৯

এই তথ্যের একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫১ সালে গ্রাম এলাকায় মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষের প্রায় অর্ধেক, কিন্তু শহর এলাকায় মহিলা সাক্ষরতার হার পুরুষের চেয়ে কিছু বেশি। আবার ১৯৬১ সালে শহরে মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের সাক্ষরতার অনেক বেশি হার লক্ষ করা যায়।

১৯৬১ সালের জনগণনায় সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গ্রামে নদিয়ার স্থান ছিল ৬ষ্ঠ এবং শহরে ৩য়।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নদিয়ায় নিরক্ষর দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি, কিন্তু তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল না। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন কিছু দেশপ্রেমী শিক্ষিত মানুষ। হেমন্তকুমার সরকার বন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে (নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন) কৃষ্ণনগরে মালোপাড়ায় 'শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগর চাষাপাড়ায় তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় নগেন্দ্রনগর চর্মকারপল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ নৈশ বিদ্যালয়'। নিরক্ষর বয়স্ক মানুষের সাক্ষরতার জন্যে জেলার শান্তিপুর, রানাঘাট, নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা ছিল সামান্যই।

স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে নদিয়া জেলায় সমাজশিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের জন্যে স্থাপিত হয় বয়স্ক সাক্ষরতা কেন্দ্র। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস আমলে বয়স্ক শিক্ষার অনেক পরিকল্পনাই শুধু নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার ত্রুটির জন্যে এবং আন্তরিকতার অভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। নদিয়া
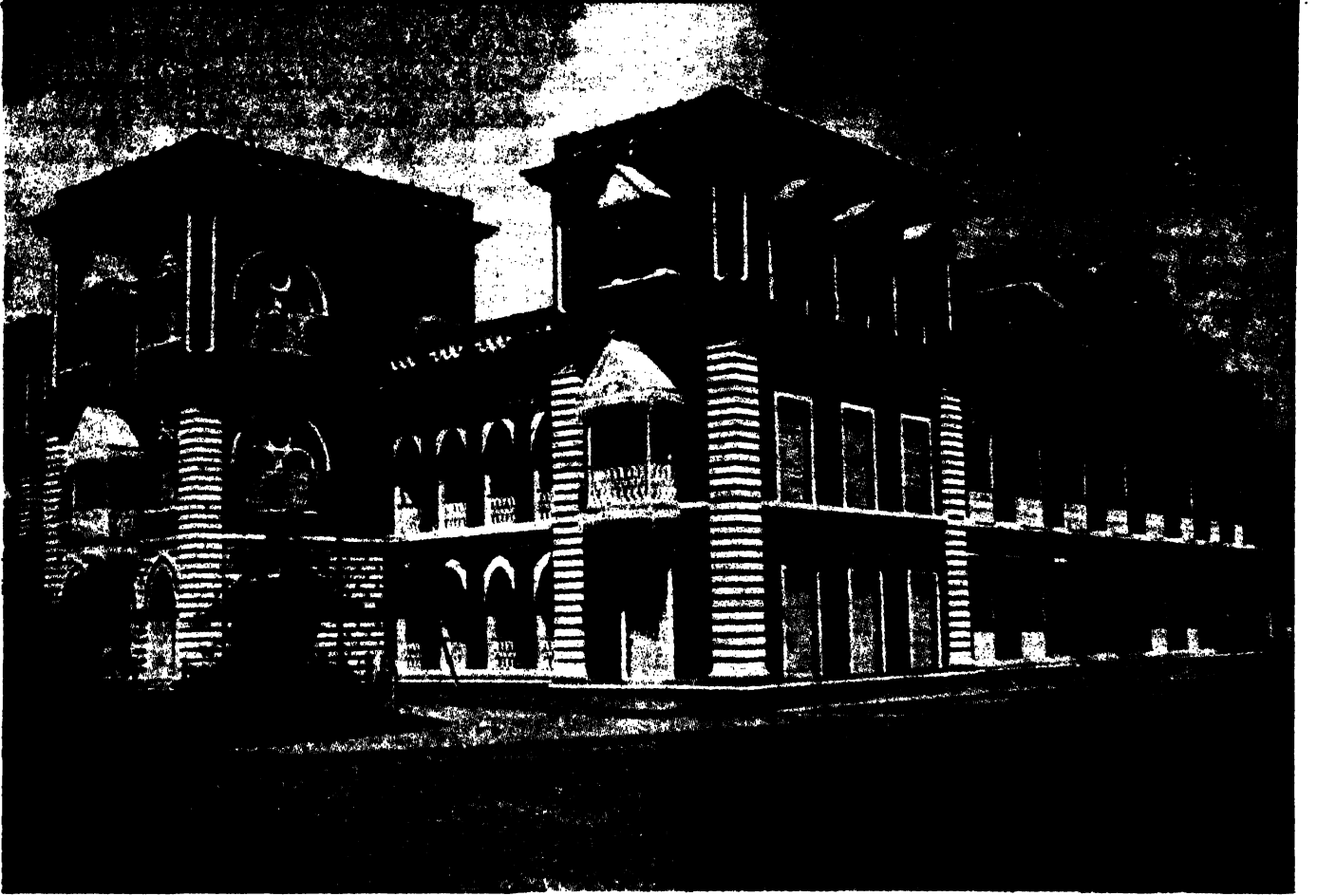
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ছবি : সত্যেন মণ্ডল

জেলায় প্রায় ৬০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রগুলি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়।

১৯৯০ সালকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতার দশক হিসাবে ঘোষণা করে। সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় জাতীয় সাক্ষরতা মিশন। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 'সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি' গ্রহণ করেন। অন্যান্য জেলার মতো নদিয়া জেলাতেও এই উদ্দেশ্যে নদিয়া জেলা সাক্ষরতা সমিতি (২৩.৪.১৯৯২) গঠিত হয়। সার্বিক সাক্ষরতার কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে চেতনা সঞ্চার, উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এবং সকলের জন্যে শিক্ষার বিষয় নিয়ে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সারা জেলায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে পালন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে 'পূর্ণ সাক্ষরতা' (Total Literacy) কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। অনেকের মধ্যে এ সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকারের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। তিনি বলেন, "'পূর্ণ সাক্ষর' কথাটায় আক্ষরিক অর্থে শতকরা একশো ভাগ সাক্ষরতা বোঝায় না। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা রাজ্যের সাক্ষরতা সমিতিগুলির তৈরি শব্দও নয়। এই শব্দটি সাক্ষরতা কর্ম প্রকল্পের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লির জাতীয় সাক্ষরতা মিশন—ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন বা সংক্ষেপে এন এল এম পূর্ণ সাক্ষরতা সম্পর্কে এন এল এম-এর 'নর্ম' (Norm) হল, জেলার যত নিরক্ষরকে সাক্ষরতার পরীক্ষায় বসান সম্ভব হবে, তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ যদি ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় শতকরা ৭০ (কোথাও ৮০%) নম্বর পায়, তবে সেই জেলাকে 'পূর্ণ সাক্ষর' হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।"

নদিয়া জেলা সাক্ষরতা সমিতি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির অভিযান শুরু করেন। ৯ থেকে ১৪ এবং ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের নিরক্ষরদের সাক্ষরতা কেন্দ্রে এনে কার্যকরী সাক্ষরতা দেওয়ার লক্ষ্য স্থির হয়।

নদিয়া জেলা সাক্ষরতা সমিতি জেলার ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্য স্থির করেন। ১৯৯২ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কল্যাণীতে স্টেট রিসোর্স

সেন্টারের সহযোগিতায় ৮৩ জন কে পি (Key person) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এঁরা প্রশিক্ষণ দেন ১৩৫০ জন মুখ্য প্রশিক্ষক বা এম টি-কে (Master trainer)। এ ছাড়া ৫২৫১৯ জন ভি টি (Volunteer trainer) প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ভি টি বা স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষর শিক্ষার্থীদের সাক্ষর করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনকে সফল করার জন্যে জেলা সাক্ষরতা সমিতি জেলার সকল জনগণ, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংগঠন, স্কুল-কলেজ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, লেখক-শিল্পী ব্যাঙ্ক কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী, মহিলা সংগঠনের কাছে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিকে সফল করার জন্যে জেলা স্তরে, মহকুমা স্তরে, পৌরসভা স্তরে, প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল স্তরে, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সাক্ষরতা কমিটি গঠন করা হয়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির নদিয়া জেলা কমিটি এই অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নিরক্ষরদের সংখ্যাকে ভিত্তি করে এক সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত জেলার মোট ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৩৭ জন নিরক্ষরকে জেলার মোট ৬৭২০৪টি শিক্ষা-প্রদান কেন্দ্রের আওতায় আনা সম্ভব হয়।

সাক্ষরতা অভিযানের প্রথমদিকে মহিলাদের যুক্ত করা কঠিন কাজ মনে হয়েছিল। কিন্তু সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের ব্যাপক আগ্রহ অভিযানের সফলতায় আশার সঞ্চার করে। সাধারণ মানুষের মনে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা প্রসারের উদ্দেশ্যে জেলা স্তর, মহকুমা স্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত মিটিং, মিছিল, আলোচনাসভা, পদযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পথনাটিকা, বাউলগান, ভিডিও প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রচার অভিযান বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে সাড়া জাগায়।

নদিয়া জেলায় ১৯৯৪ সালের ২৪ মে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় বহির্মূল্যায়ন টিম (External Evaluation Team) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এই টিমে ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত, স্টেট রিসোর্স সেন্টারের ডিরেক্টর সত্যেন মৈত্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কনটিনিউয়িং এডুকেশন সেন্টারের ডিরেক্টর ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, অর্থনীতির অধ্যাপক ভি এন নাগ রেড্ডি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা দেববানী দেব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মল দাস প্রমুখ। ১৯৯৪ সালের ৭ জুন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে নদিয়া জেলার সার্বিক সাক্ষরতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি হরিপ্রসাদ তালুকদার ও জেলাশাসক হেম পাণ্ডে।

ডঃ পবিত্র সরকার ঘোষণা করেন, নদিয়া জেলার ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার নিরক্ষরের মধ্যে মোট ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৩৭ জনকে বিভিন্ন সাক্ষরতা কেন্দ্রের আওতায় আনা সম্ভব হয়। তাঁদের মধ্যে মোট ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার পড়ুয়া নবসাক্ষরতার পরীক্ষা দেন এবং ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁদের শিক্ষাপ্রদানের জন্যে ২০০ ঘণ্টা ব্যয় করা হয়েছে।

নদিয়া জেলার সাক্ষরতা কর্মসূচিকে সফল করার জন্যে জেলার সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে, তা ডঃ পবিত্র সরকারের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। নদিয়া জেলার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের প্রথম পর্ব এভাবে সমাপ্ত হয়। জেলার সাক্ষরতার হার ৫২.৫৯ শতাংশ থেকে ৬৭.৬৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার সাফল্যকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শুরু হয়েছে নতুন প্রচেষ্টা।

সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি

নদিয়া জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির সাফল্যের পাশাপাশি অন্য দিকটিও মনে রাখতে হয়। লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পরও ৯—৫০ বয়সের যে সব নিরক্ষরকে সাক্ষরতা কেন্দ্রে আনা গেল না, যাঁরা সার্বিক মূল্যায়ণ পরীক্ষায় বসলেন না, যাঁরা জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের 'নর্ম' পূরণ করতে পারলেন না— তাঁদের সমস্যা।

তা ছাড়া ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১৯ জন নবসাক্ষরের অর্জন করা শিক্ষার মান ধরে রাখা এবং নবসাক্ষরদের ক্রমাগত শিক্ষাদানের বিষয়টি জেলা সাক্ষরতা সমিতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়েছে। প্রয়াত রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বাত্তি জ্বালাও, মগর্ নিভ্ না যায়ে'। জেলা সাক্ষরতা সমিতি এ বিষয়টি গভীরভাবে ভেবেছেন। সাক্ষরতা সংগ্রামের আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে—আলো, আরও আলো—নিভতে দিলে চলবে না।

নবসাক্ষরদের সাক্ষরতাকে স্থায়ী রূপ দিতে গেলে সাক্ষরোত্তর ধারাবাহিক কর্মসূচি (Post Literacy and continuing education, PL & CE)। জেলার সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি ও ধারাবাহিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে।

প্রথমত, ৬ থেকে ৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, ৯ থেকে ৫০ বছর বয়স্কের জন্যে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তৃতীয় স্তরে, সার্বজনীন রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সাক্ষরতা কর্মসূচিকে মূলত তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। (ক) যারা জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়েছে;

(খ) যারা জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের 'নর্ম' পূরণ করতে পারেনি এবং (গ) যারা সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় আসেনি। নবসাক্ষর এবং যারা এখনও সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি, তাদের নিয়েই জেলায় সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১৯ জন নবসাক্ষরের জন্যে ১৫৯০০ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ২০০০ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রগুলিতে অন্তত দু'জন করে ভি টি-র তত্ত্বাবধানে ৩০/৩৫ জন করে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করবে। সপ্তাহে ৫দিন করে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে ১ বছর ধরে কেন্দ্রগুলি কাজ করবে। শিক্ষার্থীদের পাঠসহায়ক সামগ্রী সরবরাহ করা, নবসাক্ষরদের বই পড়ায় সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়ার কাজ চলতে থাকবে। পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা ও আগ্রহ জাগানোর উদ্দেশ্যে সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নবসাক্ষরদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছে। জেলার সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে নবসাক্ষরদের সদস্য করা, গ্রন্থাগারে নবসাক্ষরদের জন্যে বই সংগ্রহ করার কাজ চলছে। বিভিন্ন বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগার ও সংগঠনকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলার সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির জন্যে আনুমানিক ব্যয়ের নিম্নলিখিত হিসাব করা হয়েছে

বাজেট	
(১) প্রশিক্ষণের ব্যয়	৬৪,৩০,০০০ টাকা
(২) প্রচার আন্দোলন	৩৪,৭৩,০০০ টাকা
(৩) শিক্ষাদান ও পাঠসহায়ক সামগ্রী	১,৫৬,৫৮,০০০ টাকা
(৪) কেন্দ্র পরিচালনার ব্যয়	১,০০,৮০,০০০ টাকা
(৫) তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন	৪৬,২৪,০০০ টাকা
মোট :	৪,০২,৬৫,০০০ টাকা

নদিয়া জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির সাফল্য প্রমাণ করেছে যে, সার্বিক সাক্ষরতা অর্জন আজ আর কোনও স্বপ্নের বিষয় নয়, বাস্তব সত্য। সাক্ষরতা কর্মসূচির লক্ষ্য কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান দান নয়, বোঝায় কার্যকরী সাক্ষরতা অর্থাৎ পড়ুয়া যা শিখবেন, ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করবেন। ভারতীয় সংবিধানে প্রতিশ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই সমাজ পরিবর্তন। সাক্ষরতা কর্মসূচি এই চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল্যবান ও অপরিহার্য হাতিয়ার। জেলার সকল মানুষ সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে এই কর্মযজ্ঞে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে জেলায় সাক্ষরতার সকল উত্তরাধিকারকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। নদিয়া জেলার গ্রাম-শহরের অন্ধকার গৃহগুলিতে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে সকলকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

Nadia : West Bengal District Gazetteer,
Nadia : District Statisticals 1978, Hand Book, 1994
Post Literacy Campaign : Action plan-1994-95. নদিয়া কাহিনী : কুমুদনাথ মল্লিক (মোহিত রায় সম্পাদিত) নদিয়া : স্বাধীনতার রজত- জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। একাদশ নদিয়া বইমেলা (১৯৯৬) স্মরণিকা।

পরিশিষ্ট : 'ক'

নদিয়া জেলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

কলেজ

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
(১) কৃষ্ণনগর কলেজ	১৮৪৬
(২) নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ	১৯৪২
(৩) শান্তিপুর কলেজ	১৯৪৮
(৪) রানাঘাট কলেজ	১৯৫০
(৫) শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা	১৯৫২
(৬) কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজ	১৯৫৮
(৭) সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, মাজদিয়া	১৯৬৬
(৮) পান্নাদেবী কলেজ, করিমপুর	১৯৬৮
(৯) কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ অব কমার্স	১৯৬৮
(১০) বি আর আম্বেদকর কলেজ, বেতাই	১৯৭৩
(১১) চাকদহ কলেজ	১৯৭২
(১২) হরিণঘাটা কলেজ	১৯৮৬
(১৩) বেথুয়াডহরি কলেজ	১৯৮৬

শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

(১) শিমুরালি বি টি কলেজ	১৯৭১
(২) কল্যাণী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১৯৫১

কারিগরি প্রতিষ্ঠান

(১) বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর	১৯৫৬

বিশ্ববিদ্যালয়

(১) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬০
(২) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মোহনপুর	১৯৭৪

পরিশিষ্ট - 'খ'

নদিয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা : তুলনামূলক চিত্র

	১৯৭১ - ৭২				১৯৯৫ - ৯৬			
(১) নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয়	শহব		গ্রাম		শহর		গ্রাম	
	১২		১৩২		৫৭		৭২	
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	১,৪২০	৮০৪	৮,৬০৮	৫,৩৪৬	১০,৭০২	৬,৭৯৬	২০,২৬০	৭,৭৭৬
মোট ছাত্রসংখ্যা	২,২২৪ +		১৩,৯৯৫		১৭,৪৯৮ +		২৮,০৩৬	
	(১৬,২১৯)				(৪৫,৫৩৪)			
শিক্ষক সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	৩৬	১২	৪৯১	২১	৩০৩	১৪০	৫২৩	১৯৭
(২) দশম শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮		৯১		১১১		১২৯	
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	২,৬২০	২,৬৭৮	২৫,৬৬৫	১১,০৪৭	৫০,২৮৬	৩৫,১২৯	৭১,৮৯৫	৩৪,৫৩৯
মোট ছাত্রসংখ্যা	৫,২৯৮ +		৩৬,৭১২		৮৫,৪১৫ +		১,০৬,৪৩৪	
	(৪২,০১০)				(১,৯১,৮৪৯)			
শিক্ষকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	৯৩	১৩১	৭১৮	১৮৩	১,০৫৩	৫৮৬	১,৫৪৬	৪৫৬
(৩) একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮		৫১		৪৪		২৮	
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	১৫,৭২৫	৭,৯৩৮	২৬,৬৭৫	৪,০৭০	২৭,৭৬২	৮,২৪৩	৩৫,৬০১	১১,১২৬
মোট ছাত্রসংখ্যা	২৩,৬৬৩ +		৩০,৭৪৫		৩৬,০০৫ +		৪৬,৭২৭	
	(৫৪,৪০৮)				(৮২,৭৩২)			
শিক্ষকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	৬০৫	২৮০	৭০০	৬৩	৫৯৭	১৭৭	১,১১৩	১২৭
মোট সবকারি ব্যয় :	৬৮ লক্ষ ২৬ হাজার ১২০ টাকা				৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা			

[জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষা, নদিয়ার সৌজন্যে]

পরিশিষ্ট - 'গ'

নদিয়া প্রাথমিক শিক্ষা : তুলনামূলক চিত্র

	১৯৭১ - ৭২				১৯৯৫ - ৯৬			
(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	শহর		গ্রাম		শহর		গ্রাম	
	২৮৬		১,৫২২		৩৩৫		২,১১৭	
মোট :	(১,৮০৮)				(২,৪৫২)			
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	৩৬,৫৮০	১৪,৮৫৪	১,০৭,২১৩	৭০৯৮৩	২৮,৮৩২	২৪,৩৩১	২,২৬,৩৪৯	২,০০,৯৩৮
মোট	৫১,৪৩৪		১,৭৮,১৯৬		৫৩,১৬৩		৪,২৭,২৮৭	
শিক্ষক সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	১,০৫৭	৩৫৪	৪,৪০১	৬৫৫	৬২৪	৬৯৮	৬,৬৫৮ (পৃথকভাবে তথ্য পাওয়া যায়নি)	
(২) নিম্ন বুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয়	৪		১১৮		৪		১১৫	
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	৫৪০	৪০৫	৬,৮৯১	৪,৭৭৪	৭৫২	৬৪৭	১০,৪১৭	১১,১০১
শিক্ষকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	১৯	৪	৫২৭	২৪	২১	১০	৩৪৫	৩৪০
(৩) প্রাক্-বুনিয়াদি ও নারসারি বিদ্যালয় সংখ্যা	৪		৫		৩		৬	
ছাত্রসংখ্যা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
	১৬৫	১০০	২৩৫	২১৫	১৪৪	১৪১	১৫৬	১২৮
শিক্ষকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	x	৮	x	৯	২	৬	৪	১৭
(৪) প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়	১		৩		২		৩	
শিক্ষার্থীসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
	২৪	১৬	৪৮	x	৪০	৪৫	২৫৬	১২৪
(৫) চতুষ্পাঠী (টোল)								
সংখ্যা	৩৯				৩৯			
ছাত্রসংখ্যা	৫৩০				৫০০			
শিক্ষক	৬৬				৬৬			
মোট সরকারি ব্যয় :	১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৯৩ টাকা				৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯১ টাকা (১৯৯৬-৯৭ বাজেট) ৫৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৬৯ টাকা।			

[জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রাথমিক শিক্ষা, নদিয়ার সৌজন্যে]
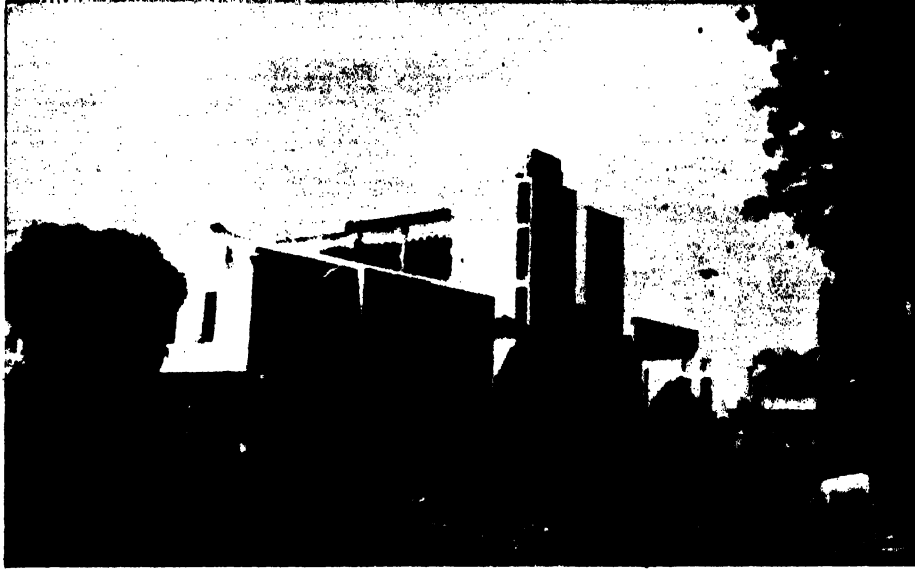
রিজিওন্যাল টেলিকম শিক্ষণ কেন্দ্র ।। কল্যাণী — ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

পরিশিষ্ট : 'ঘ'

নদিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অগ্রগতির চিত্র

জেলার সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার

১৯৭৭ সালের আগে		১৯৭৭ সালের পরে
ব্লক	সংখ্যা	
করিমপুর	৩	৯
কল্যাণী	২	৬ (১টি শহর গ্রন্থাগার)
কালীগঞ্জ	৫	৬
কৃষ্ণগঞ্জ	২	৫
কৃষ্ণনগর-১	৩	১১ (১টি শহর গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগার)
কৃষ্ণনগর-২	১	৪
চাকদহ	২	৮ (২টি শহর গ্রন্থাগার)
চাপড়া	২	৭
তেহট্ট - ১	১	৫
তেহট্ট - ২	১	৪
নবদ্বীপ	৩	৭ (২টি শহর গ্রন্থাগার)
নাকাশীপাড়া	৩	৭
রানাঘাট - ১	৩	৮ (১টি শহর গ্রন্থাগার)
রানাঘাট - ২	১	৫
শান্তিপুর	৩	৭ (কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল কাম
হরিণঘাটা	২	মিউজিয়াম-বিশেষ গ্রন্থাগার)
হাঁস খালি	৩	৪
		৬ (১টি শহর গ্রন্থাগার)
মোট	৪০	মোট ১০৯

সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারে বার্ষিক অনুদানের হার

১৯৭৭ সালের আগে		১৯৯২ সাল থেকে	
জেলা গ্রন্থাগার	**টাকা**	**জেলা গ্রন্থাগার**	**টাকা**
পুস্তক	X		৩০,০০০ = ০০
পত্র-পত্রিকা	২,০০০ = ০০		৯,০০০ = ০০
আসবাবপত্র	X		৩,০০০ = ০০
বাঁধাই-সংরক্ষণ	X		৩,৫০০ = ০০
কন্টিজেন্সি	৩,০০০ = ০০		৯,৫০০ = ০০
ভ্রাম্যমাণ বিভাগ	X		১৫,০০০ = ০০
মোট	৫,০০০ = ০০	মোট	৭০,০০০ = ০০
মহকুমা / শহর গ্রন্থাগার		**মহকুমা / শহর গ্রন্থাগার**	
পুস্তক	১,৮০০ = ০০		৮,০০০ = ০০
পত্র-পত্রিকা	X		২,৩০০ = ০০
আসবাবপত্র	X		১,২৫০ = ০০
বাঁধাই-সংরক্ষণ	X		১,২০০ = ০০
কন্টিজেন্সি	১,২০০ = ০০		২,৭৫০ = ০০
মোট	৩,০০০ = ০০	মোট	১৫,৫০০ = ০০
গ্রামীণ / প্রাঃ ইউঃ / এরিয়া গ্রন্থাগার		**গ্রামীণ / প্রাঃ ইউঃ / এরিয়া গ্রন্থাগার**	
পুস্তক	X		২,৯০০ = ০০
পত্র-পত্রিকা	X		৮০০ = ০০
আসবাবপত্র	X		৬০০ = ০০
বাঁধাই-সংরক্ষণ	X		৬০০ = ০০
কন্টিজেন্সি	৬০০ = ০০		১,১০০ = ০০
মোট	৬০০ = ০০	মোট	৬,০০০ = ০০

তথ্য সংগ্রহ সহায়তা :

মোহিত রায়
রাজকুমার প্রামানিক (কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি—শহর গ্রন্থাগার)
এবং মদনলাল মল্লিক (নদিয়া জেলা গ্রন্থাগার)

পরিশিষ্ট : 'ঙ'

নদিয়া জেলার সাক্ষরতা সম্পর্কে তথ্য

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সাক্ষরতার হার

মোট সাক্ষর	:	১৬৮৮৮৯৭	(৫২.৫৯%)
পুরুষ	:	১০০২৩০৭	(৬০.১৩%)
মহিলা	:	৬৮৬৫৯০	(৪৪.৪৪%)

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি

লক্ষ্যমাত্রা (৯—৫০ বছর বয়স)	:	৭,৭৫,১২৬
সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের আওতাভুক্ত	:	৬,৬৬,২৩৭
সাক্ষরতা কেন্দ্রে আনা যায়নি	:	১,০৮,৮৮৯
চূড়ান্ত মূল্যায়নে অংশগ্রহণ (২৪.৫.৯৪)	:	৫,৫৯,৭০৫
জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নর্ম অনুযায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (৭০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর প্রাপ্ত)	:	৪,৮৪,৭১৯
জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নর্ম-এ অনুত্তীর্ণ		
(ক) ৫১% - ৬৯% নম্বর প্রাপ্ত	:	৫৩,৯৯১
(খ) ৫০% কম নম্বর প্রাপ্ত	:	২০,৯৯৫

চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

পুরুষ	:	২,৪৪,০০৬
মহিলা	:	২,৪০,৭১৩

মোট সাক্ষর সংখ্যা (সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর)	:	২১,৭৩,৬১৬ (৬৭.৬৮%)
পুরুষ	:	১২,৪৬,৩১৩ (৭৪.৭৭%)
মহিলা	:	৯,২৭,৩০৩ (৬০.০৩%)

সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার

১৯৯১	:	৫২.৫৯%
১৯৯৪	:	৬৭.৬৮%

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগর মঞ্চ ।। কল্যাণী

ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য
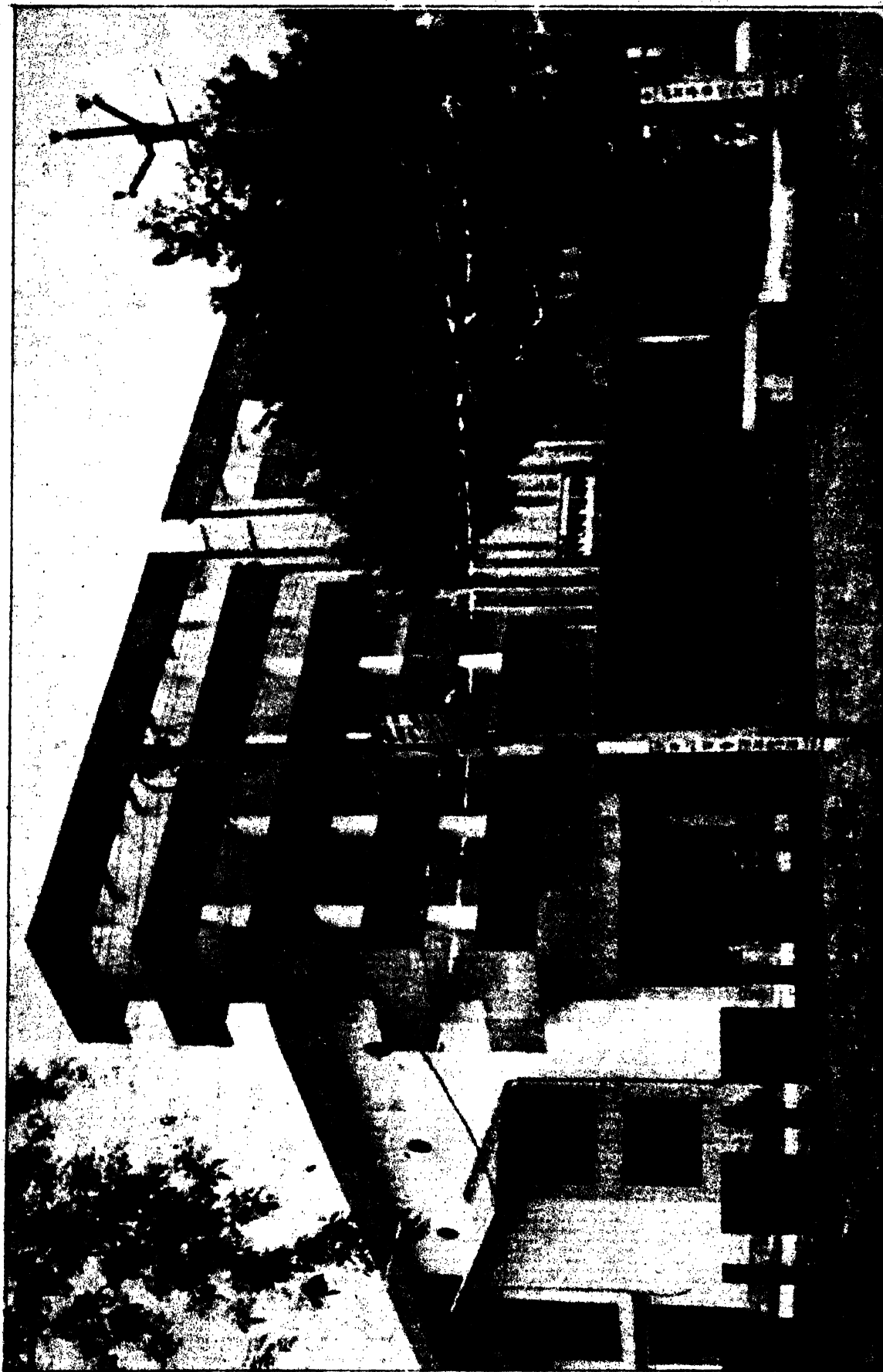
ইংরেজ রাজত্বকালে নবদ্বীপের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত

মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি। ওই বছরে যে ছ'জন পণ্ডিত প্রথম এই উপাধি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রধান ছিলেন। ভুবনমোহনের সময়ে তাঁর মতো তার্কিক এদেশে আর ছিল না। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র তিনি পণ্ডিতসভায় যোগদান করেন এবং সেইসব সভায় বিজয়ী হয়ে

তিনি নবদ্বীপ তথা বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁর টোল পূর্ণ থাকত। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপের দুজন ন্যায়ের পণ্ডিতকে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা চালু হলে তিনি ১০০ টাকার প্রথম বৃত্তি পান।

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন
(১৮৩৩ খ্রিঃ—১৯১১ খ্রিঃ)

মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নবদ্বীপের ন্যায়ের প্রধান পদ পান। বাংলার তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর উডবার্ন-এর সময় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। রাজকৃষ্ণ অতিশয়

তেজস্বী ও বিচারদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর ছাত্রদের মধ্যে হরিশচন্দ্র তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রধান।

মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্বভৌম
(১৮৪১ খ্রিঃ—১৯১২ খ্রিঃ)

যদুনাথ বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। উদয়নাচার্যের বৌদ্ধাধিকার বা আত্মতত্ত্ববিবেকের মথুরানাথ তর্কবাগীশকৃত বিবৃতির টিপ্পনী রচনা করে যদুনাথ আপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন। যদুনাথের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, মিথিলার চন্দ্রশেখর ঝা ও বৃন্দাবনের দামোদরলাল শাস্ত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ
(১৮৬১ খ্রিঃ—১৯২৫ খ্রিঃ)

আশুতোষ তর্কভূষণ প্রথমে কৃষ্ণনগরের রাজার টোলে অধ্যাপনা করতেন। পরে

নবদ্বীপের পাকাটোলের প্রধান হন। 'কুসুমাঞ্জলি'র সটীক বঙ্গানুবাদ করে ইনি বিখ্যাত হন। ন্যায় দর্শনের বঙ্গানুবাদের কাজেও ইনি হাত দিয়েছিলেন ; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কেবল প্রথম খণ্ড রচনা ছাড়া আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ইনি 'গৌতম সূত্রে'-রও টীকা রচনা করেন।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন

খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ব্রজনাথের জন্ম। পিতা রাজপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের কাছে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে কলকাতায় রাজা

রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে যে সভা হয়েছিল, সেখানে ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পুরস্কৃত হন। চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণের জন্য ইনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের চৈতন্যানুরাগী বৈষ্ণবদের প্রতি নবদ্বীপাধিপতি ও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর যে বিদ্বেষ ছিল, তা ব্রজনাথের চেষ্টাতেই দূর হয়। ময়মনসিংহের শেরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, 'রাই-উন্মাদিনী' গ্রন্থের লেখক কাঞ্চনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামী ছাড়াও অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত তাঁর ছাত্র ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন।
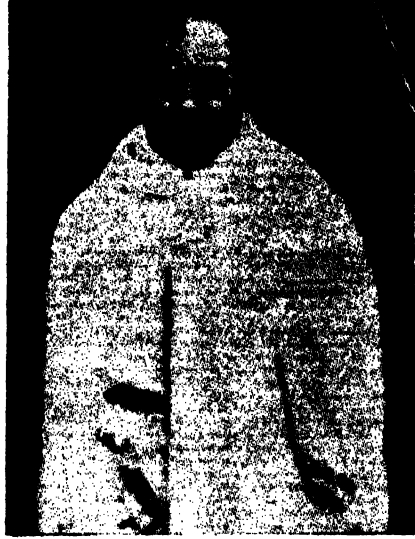
বিদ্যাবত্তা, ভূয়োদর্শিতা ও বিচারশক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত। নবদ্বীপের যে সব পণ্ডিত বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করেছিলেন। ইনি তাঁদের অন্যতম। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান। ইনিই নবদ্বীপের দ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের অনেকগুলিই ইনি মুদ্রিত করেন।

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
(১৮৩৩ খ্রিঃ—১৯১১ খ্রিঃ)

কৃষ্ণনাথ বহুদিন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিরপেক্ষতার গুণে

ইনি 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'-র ব্যবস্থাপক হন এবং এই সভাই কৃষ্ণনাথকে 'পণ্ডিতকুল চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা', 'দায়ভাগ প্রবোধিনী টীকা', 'মলমাসতত্ত্বের টীকা' প্রভৃতি রচনা করেন।

মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন
(১৮৩৯ খ্রিঃ—১৯২০ খ্রিঃ)

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ভ্রাতা মাধবানন্দের বংশে অজিতনাথের জন্ম। কৃষ্ণনগরের মহারাজার টোলে বহুদিন অধ্যাপনা করেন। ইনি কবিত্বগুণের জন্য

বিখ্যাত ছিলেন। দ্ব্যর্থবোধক সরস সংস্কৃত শ্লোক রচনায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁকে কবিভূষণ উপাধি দেন। মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন।

অজিতনাথ বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে শিবনারায়ণ শিরোমণির সহযোগিতায় রাম তর্কবাগীশের টীকা-সহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সম্পাদনা করেন। অজিত ন্যায়রত্নই রত্নপ্রসবিনী নবদ্বীপের শেষ রত্ন।

সংকলন : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ

ছবি : গোপাল ঘোষ

নদিয়ার সামাজিক আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া

শতঞ্জীব রাহা

দীনবন্ধু মিত্র

জেলা তো এক ভৌগোলিক সীমাচিহ্নিত প্রশাসনিক বিভাজন, অন্যদিকে সমাজ বৃহত্তর অর্থে বহু মানুষের যূথতার এক চেহারা। শুধুমাত্র প্রশাসনিক সীমার কারণেই সমাজের প্রকৃতি ও সামাজিকদের অভিব্যক্তি কিছু বদলে যায় না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও অর্জন করতে পারে না। ভূগোল ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতাতেই এই জাতীয় বিশিষ্টতা দেখা দিতে পারে। তা হলে কোনও জেলায় সামাজিক আন্দোলন বলতে কি বোঝায় ?

প্রায়শই সমাজের যূথজীবন ও যাপনের অধিকার দল-গোষ্ঠী-ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। অর্থ, বুদ্ধি বা বাহুবলে বলীয়ান, উৎপাদনের উপাদানের নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীই বরাবর রাষ্ট্রতন্ত্রেরও নিয়ন্ত্রক। সমাজের এই দুর্বিপাকের কোনও প্রাকৃতিক কারণ থাকে না, তা সামাজিক ব্যবস্থায় বলের অপপ্রয়োগের ফলশ্রুতিমাত্র। এবং এই অপপ্রয়োগকে প্রতিরোধ করে ন্যায় ফিরিয়ে আনার যাবতীয় প্রচেষ্টাই সম্ভবত সামাজিক আন্দোলন।

১.১

ইতিহাস 'নদিয়া' বলতে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ ও সমৃদ্ধ জনপদকে বুঝে এসেছে। জেলা হিসেবে নদিয়া দেখা দিয়েছে অনেক পরে, কিন্তু বঙ্গের মধ্যে প্রথম। নদিয়ার জনসমাজ অতিপ্রাচীন, সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু। এই ভূভাগকে

বঙ্গ-ইতিহাসের পর্বান্তরের কেন্দ্রভূমি বললে আদৌ বেশি বলা হয় না। কেননা, তুর্কী আক্রমণ কিংবা ইংরেজের পলাশী বিজয়ের সূচনা হয়েছিল নদিয়াতেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নদিয়া বঙ্গীয় সমাজের পথ-প্রদর্শক, নিয়ন্ত্রকও। সামাজিক বাস্তবতার কারণেই নদিয়ায় নানান সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে, বৃহত্তর আন্দোলনের উত্তাপও অনুভূত হয়েছে তীব্রমাত্রায়।

১.২

শুধু নদিয়ায় নয়, সমগ্র বাঙলাদেশেই যে-কোনও ধরনের সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা আপাদমাথা বিজড়িত আছে ধর্মের সঙ্গে। যুগে যুগে আমাদের ধর্মনিয়ন্ত্রিত সমাজে যাবতীয় অত্যাচার নিয়ন্ত্রক শ্রেণীগুলি ধর্মের নামেই করে এসেছে। আবার যে-কোনও ক্রান্তিকালে সমাজ নেতারা বুঝেছেন : সংস্কার ও অবিদ্যাতাড়িত আমাদের সমাজে যে-কোনও প্রচেষ্টাকেই দিতে হবে ধর্মের পোশাক ; ধর্মের পরিচ্ছদ ছাড়া কোনও তত্ত্ব এ দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেননা, ধর্মের ভাষ্যই এ দেশের লোকের শ্রবণে শোনায় ভাল। চৈতন্যের ভাবান্দোলন থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর নব্যযুক্তিবাদী আন্দোলন পর্যন্ত এই একই ধারার অনুবর্তন। এর ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিলোড়নের কালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষঙ্গ বড় হয়ে ওঠেনি, যেমন : নীল আন্দোলন।

চৈতন্য থেকে উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করলে আমরা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের দেহে পরিবর্তনের সুমুদ্রিত যে পথরেখার সন্ধান পাই, সেই পথের বাঁকে বাঁকে সঞ্চিত বিস্ময়ের সিংহভাগের দাবিদার নদিয়া জেলা।

২. চৈতন্য ও বৈষ্ণবীয় পর্ব

চৈতন্যদেবের যখন আবির্ভাব ঘটে তখনকার সামাজিক জাগরণের গভীরে ছিল তার শিকড়।

মুখ্যত ধর্মান্দোলন পরিচালনা করলেও তাঁর সাধনা ও পদক্ষেপের ভিতরের দিকে বহুলাংশে নিহিত ছিল সমাজনীতি। তদানীন্তন সামাজিক সঙ্কট থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তির লক্ষ্যেই চৈতন্যদেব দেখা দিয়েছিলেন—এ কথা লিখতে গিয়ে সকল চৈতন্যজীবনীকারই গর্ববোধ করেছেন।

'সমাজ', 'সঙ্কট' ইত্যাদি শব্দ এখানে প্রায়োগিক অর্থে বিচার্য। মধ্যযুগের সমাজ ধর্মনিয়ন্ত্রিত বলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট বিচারের ক্ষেত্রেও ধর্মের নিরিখটি এসে পড়ে, চৈতন্যদেবের কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রেও। ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসন ও বর্ণাশ্রমের কাঠিন্যলাঞ্ছিত সমাজে রাষ্ট্রপোষিত ধর্মের আগ্রাসন ও আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে পতিতদের উদ্ধারকর্তারূপে, সামাজিক উদারতার উদ্‌গাতা হিসেবে, মানুষে-মানুষে সামাজিক দূরত্বের অপনোদনকারীরূপে চৈতন্যদেব খ্যাত ও নন্দিত হয়েছেন। চৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের একাংশ তাঁদের ভক্তি আন্দোলনকে সামূহিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নবদ্বীপলীলায় চৈতন্যদেব সচেতনভাবেই শাস্ত্র বর্জন করে ভক্তিকে আশ্রয় করেছিলেন। এই ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রে আছে সমবেত প্রচার সংগঠিত করা। ভক্তির আধারে নগর-সংকীর্তন, সম্মিলিত নামকীর্তনের ব্যাপক প্রচলন চৈতন্যদেবের প্রচার আন্দোলনের কৌশলগত দিক। কাজীদলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কীর্তনের প্রচার, নবদ্বীপলীলায় একের পর এক পরিকর সংগ্রহ ইত্যাদি তাঁর প্রচার আন্দোলনের সাফল্য সূচিত করে। এই আন্দোলন বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে হায়...হায়... গেল...গেল...রব ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার অভিঘাতে 'শান্তিপুর ডুবুডুবু' হয়েছিল বটে, কিন্তু আদৌ সমগ্র নদিয়া ভেসে যায়নি। বরং আক্রমণ ও প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল চৈতন্য-অনুগামীদের। তন্ত্রাশ্রয়ী শাক্তধর্ম বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজ, সংস্কার-শাস্ত্র আর প্রাতিষ্ঠানিক প্রথায় জর্জরিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাধারীদের সঙ্গে উদারতা সম্বল করে লড়াই করা কঠিন ছিল। তারও উপরে রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল এমত উদারতার বৈরী।

এ কথা যেমন সত্য : 'প্রযৌক্তিক অর্থে চৈতন্য আন্দোলন ছিল একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ'[১], তেমনই এ কথাও সমানভাবে সত্য যে, এই আন্দোলনের বাইরে-ভেতরে সামাজিক ক্রূর বাস্তবতার সঙ্গে অনাগত স্বপ্নের যে সংঘর্ষ চলেছিল তাকে আজও স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায়।

এই সংঘর্ষ শুধুমাত্র ভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়ত চৈতন্যদেবকে নবদ্বীপ ছেড়ে যেতে হত না। এবং তাঁর নবদ্বীপলীলার অবসানে 'হরিভক্তিপরায়ণ হলে চণ্ডাল দ্বিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ'—এই ক্রান্তিকারী উচ্চারণ হয়ত নিছক আপ্তবাক্যে পরিণত হত না। যে শাস্ত্রকে নিজে পণ্ডিত হয়েও নিমাই বিসর্জন দিয়েছিলেন, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এবং গোপাল ভট্টগোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাসে'র হাত ধরে সেই শাস্ত্রাচারের জালেই হয়ত বৈষ্ণবধর্ম নিমগ্ন হয়ে যেত না।

চৈতন্যদেব ও তাঁর বঙ্গীয় পরিকরেরা নবদ্বীপলীলার সাফল্য পুরোপুরি ধরে রাখতে না পারলেও বঙ্গের জনমানসে এক বিপুল বেগ ও আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থে, সামর্থ্যে ও বর্ণগতভাবে হিন্দুসমাজের নিচের থাকের মানুষের মনে এই উজ্জীবনের সঞ্চার হয়েছিল যে, মানুষ হিসেবে নবতর উদারতায় তাঁদের আশা ও আশ্রয় মিলবে। এবং অবশ্যই 'জ্ঞানবাদী আচারসর্বস্ব' বৈষ্ণববাদ পরবর্তী সময়ে গরিষ্ঠসংখ্যক নিচের থাকের হিন্দুসমাজকে আশাহত করেছিল। সুতরাং চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ, নবদ্বীপ ত্যাগ ও তাঁর উদার ভক্তিবাদী আন্দোলনের এই ব্যর্থ পরিণতি সম্পর্কে সমাজমনিষ্ঠ লেখকের অনুমান গণনীয় সন্দেহ নেই[২]।

মনে রাখা প্রয়োজন : এই ভাঙনের মধ্যে বরাবর চলছিল ইসলামধর্মের প্রসার। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা আর অত্যাচারের ছিদ্রপথে সামাজিকদের ধর্মান্তরকরণ খুব স্বাভাবিকই ছিল। হিন্দু ও ইসলামধর্মের বিধিবিধান প্রায় সমান হলেও জাতপাতের কাঠিন্য থেকে নিচুতলার মানুষকে ইসলামধর্ম হয়ত কিছুটা রেহাই দিতেও পেরেছিল। হিন্দু ছাড়াও এদের মধ্যে তাই ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং 'পথভ্রষ্ট' অবলুপ্ত বৌদ্ধরাও ছিলেন।

২.১.
নদিয়ার ভূভাগ ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা যতটা, তার থেকে ঢের বেশি প্রভাবিত হয়েছিল এর প্রতিক্রিয়াজাত বিপরীতমুখী সত্তের দ্বারা।

বৈষ্ণবীয় উদার ভক্তিবাদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়েছিল দু'ভাবে : এক. 'বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবনে, 'বৃন্দাবনে বিরচিত ধর্মের তত্ত্বে, কান্তিবিদ্যার অনুশীলনে, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এবং স্মার্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখ্যায়। বৃন্দাবনের উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে চৈতন্যের দ্বারা সূত্রকারে নির্দেশিত পরিকল্পনাসমূহ এমনভাবে রূপায়িত হল যে, তাতে নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে ভক্তিপ্রচারের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইরূপে পরিবর্তন চৈতন্যের ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল কিনা, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই'[৩] এবং দুই. এই পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল নদিয়ার রাজবংশের উত্থানে, বিশেষভাবে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে। এই যুগে গোটা হিন্দুসমাজই বস্তুত দু'টিমাত্র স্থূল ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে : ব্রাহ্মণ এবং (ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সবাই) শূদ্র। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ হিন্দুসমাজের নেতা হিসাবে দেখা দেয়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে সেই নেতৃত্ব অবিসম্বাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রবল বিরোধী, শাস্ত্র ও আচারবিচারের প্রবলতম সমর্থক কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে হিন্দুসমাজের প্রাতিষ্ঠানিকতা ও শাক্তাচার চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এই যুগের আচারবিচার ও প্রথার মধ্যে কি ছিল না ? নদিয়ায় এই সময়ে চালু ছিল : ক. কৌলীন্য প্রথা, খ. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, গ. গঙ্গা বা অন্তর্জলী যাত্রা, ঘ. ব্যাপকহারে সতীদাহ, ঙ. ব্যাপক সংখ্যায় পশুবলি, চ. নরবলি, ছ. শিশুসন্তানকে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন, জ. স্তনবৃন্তে বিষপ্রয়োগে শিশুহত্যা, ঝ. গঙ্গায় আত্মবিসর্জন, ঞ. বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অসম্ভব বাঁধাবাঁধি প্রয়োগ, জল-অচল প্রথার কঠোর বাস্তবায়ন, জাতপাতের সূক্ষ্ম স্খলন, জাত যাওয়ার বিধি, জাত খাওয়ার সহজ পন্থা.....ইত্যাদি ছাড়াও ট. দরিদ্রের দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে আত্মবিক্রয়। কৃষ্ণচন্দ্রই বিধবাবিবাহের যাবতীয় শাস্ত্রীয় সমর্থনকে স্বীয় পৃষ্ঠপোষিত নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বাল্যবিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল কঠোরতম বিধিনিষেধ।

একদিকে হিন্দু মৌলবাদীদের এই জাতীয় আক্রমণ, অন্যদিকে একদা ঐসলামিক শাসনের মদতপুষ্ট মুসলিম মৌলবাদের বিধিনিষেধের তাড়নায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিচুতলার মানুষ যে অসহায় হয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থায় শাস্ত্রনির্দেশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অঘোষিত অবরোধে ব্রাত্য গরিষ্ঠ মানুষ এক অভূতপূর্ব অসহায়তার বোধে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

সামাজিক তাড়না থেকেই জন্ম নেয় আত্মরক্ষার তাগিদ। এই তাগিদেই নদিয়ায় প্রায় একই ভৌগোলিক ও কালবলয়ে জন্ম নিয়েছিল কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী, খুশিবিশ্বাসী, বীরভদ্রী, লালন শাহী কিংবা রামবল্লভীর মতো একগুচ্ছ উদারনৈতিকপন্থা।

সমাজবিজ্ঞানগত কারণ ছাড়া এতগুলি আন্তর্সাযুজ্য সমন্বিত পন্থা প্রায় একই কালে, একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উদ্ভূত হতে পারে না। এদের সাধন পদ্ধতির বিভিন্নতা, গুপ্ত ও আলো-আঁধারি ধর্মব্যাখ্যান সত্ত্বেও সামাজিক বোধের থেকে এগুলি সমধর্মী। এগুলিকে গৌণধর্ম বা লোকধর্ম না বলে, কিংবা আদৌ ধর্মসম্প্রদায় আখ্যা না দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলাই সঙ্গত।

এদের বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস অর্জনের পথে গান ছিল। ভাবের কথাই ছিল এই সমস্ত বিশ্বাসপন্থার একমাত্র অবলম্বন, গুরুবাদী আনুগত্যই ছিল একমাত্র বন্ধন। বন্ধন ছিল হৃদয়ের, ভক্তির, ভাবের—শাস্ত্রের নয়। এদের শাস্ত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের কাছে শাস্ত্রহীন, মন্ত্রহীন, ভ্রষ্ট, অপাংক্তেয় পরিত্যক্ত অন্ত্যজ মানুষজন, ভাবের কথা বলায় কোরআন-আশ্রিত মুসলমান সমাজের কাছে বর্জনীয় মানুষজনও জাতি-বর্ণনির্বিশেষে আশ্রয় পেয়েছিল এইসব পন্থায়—এমন কি পথভ্রষ্ট ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধরাও।

এই সব পন্থার গুরু ও অনুগামীদের অধিকাংশই ছিলেন নদিয়ার মূল অধিবাসী, বংশপরম্পরায় অত্যাচারিত ও জল-অচল। মাহিষ্য ছাড়া নাথ, যুগী, গোপ, জোলা, হাড়ি, নাপিত, ধর্মান্তরিত মুসলমান—ইত্যাদি সকলেই ছিল এই সব পন্থায় আশ্রয়প্রাপ্ত। নদিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বাসীপন্থাগুলি সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপুল প্রসার, লোকপ্রিয়তা, সহজের কাছে মানুষের দলে দলে আত্মসমর্পণ, অন্ত্যজ মানুষের নিজস্ব আইডেন্টিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অভিজাত শ্রেণীকেও একদা ভাবিয়েছিল, কাঁপিয়েছিল শাস্ত্রীয় ধর্মধ্বজাধারীদের।

কিন্তু বলা একান্ত আবশ্যক যে, অভিজাত ও শাস্ত্রীয় ধর্মগুলির অপপ্রচার, আক্রমণ আর চাপের মুখে শুধুমাত্র গান ও বিশ্বাস নিয়ে, ভাবের গান গেয়ে, সকল মানুষকে ভাবের মানুষ বলে কাছে টেনে নিয়ে এ-জাতীয় বিশ্বাসপন্থাগুলি সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করতে পারেনি, নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ হয়েছে। জটিল যুক্তিজালের অবতারণা করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মদতপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বরাবরই এদের উদারতাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে, এদের বিশ্বাসাচরণকে কদাচার আখ্যা দিয়েছে, এদের সাধনপথকে পায়খানায় যাওয়ার পথ বলে বিবমিষা প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে স্বভাবশিক্ষিত, গ্রামীণ ও ব্রাত্য মানুষের ভাব-ও বিশ্বাসের ফাঁক দিয়ে ঘটেছে উনিশ শতকের রাজকীয় ধর্মের অনুপ্রবেশ। বরাবর হিন্দুসমাজের তথাকথিত মূলধারার আক্রমণের কূলাগ্রে থাকা গুরুবাদী বিশ্বাসপন্থার শাস্ত্রহীন গুরুরা সুশিক্ষিত, যুক্তিবাদে বলীয়ান খ্রিশ্চান মিশনারীদের কাছে বিচারে পরাজিত হয়ে শিষ্যপরম্পরায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। আবার এর মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই, উভয় সমাজের কাছেই অপাংক্তেয় থাকার বেদনা হয়ত অপনোদনের পথ পেতে চেয়েছে। প্রথমে প্রটেস্টান্ট মিশনারিরা, পরে ক্যাথলিকেরাও এজাতীয় ধর্মবিচারে অংশগ্রহণ করে।

তথাপি বিশ্বাসপন্থা শেষ হয়ে গেল না, শুধু তার প্রাসঙ্গিকতায় মাত্রাভেদ ঘটল বলা যায়। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের নির্যাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্য দিয়ে নয়, নদিয়ায় উদ্ভূত উদারনৈতিক, শাস্ত্রহীন, বিশ্বাসভিত্তিক পন্থাগুলির মধ্য দিয়েই অধিকমাত্রায় ও স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। বাঙালার সুফিসাধনার মূল প্রত্যয়ও সহজ বিশ্বাসে যুক্ত হয়েছে।

বাঙালির ধর্মীয় উদারতা, সহিষ্ণুতা ('কৃষ্ণকালী গাড় খোদা, কোন নামে নাই বাধা'... ইত্যাদি। রামবল্লভীদের বিশ্বাসের গান।) হঠাৎ করে অর্জিত হয়। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে ঐতিহ্য আমরা আজও বহন করে চলেছি, তা এই সমস্ত ভালবাসাসর্বস্ব বিশ্বাসপন্থার কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—এইভাবেই কোনও সামাজিক আন্দোলনের অন্তঃশারী প্রগতির লক্ষণগুলি যুগপরম্পরায় কাজ করে চলে।

৩. নীলপর্ব

বাইরের দিক থেকে পুরোদস্তুর অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও নীল আন্দোলনের ভিতরের দিক বিরল কিছু তাৎপর্য আছে।

নীল আন্দোলনের আগেই নদিয়ায় স্মরণযোগ্য প্রজাবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তিতুমীরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তিতুমীর (১৭৭২—১৮৩১) প্রথমে ওয়াহাবি মতানুসারে ইসলামের সংস্কারসাধনের চেষ্টা চালান। হিন্দু জমিদারেরা তো বটেই, বিত্তবান মুসলমানেরাও তাঁর প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। অপর দিকে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে তিতুর প্রভাব দারুণ বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়।

তিতুমীরের জন্মস্থান গোবরডাঙার নিকটবর্তী হায়দারপুর গ্রামটির সংলগ্ন অঞ্চল তৎকালে নদিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। হায়দারপুর ছিল নদিয়া-চব্বিশ পরগনার সীমা-চিহ্নিত স্থান। তিতুর কার্যকলাপ ও প্রভাবের এলাকা নদিয়ার বাইরেও বিস্তৃত ছিল।

দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের রুখে দাঁড়াতে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে, কোম্পানির শাসনকে অস্বীকার করে, সমান্তরাল প্রশাসন কায়েম করে ব্রিটিশ ও তার সহযোগীদের ঠেলে দিয়েছিলেন কঠিন ত্রাস ও চ্যালেঞ্জের মুখে। তিতুমীরের সহিংস রুদ্রমূর্তির সামনে কর্তৃপক্ষশ্রেণী অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিতুর বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করা হয়, নিহত হন তিনি।

তিতুমীরের বিদ্রোহের একটি মৌল প্রেরণা ছিল ধর্ম—ধর্মপ্রচার ও সংস্কার। ধর্মীয় সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাঁর বিদ্রোহের সূচনা। তাঁর ইসলামীয় সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদাররাই প্রথম প্ররোচনার সৃষ্টি করেছিলেন (তাঁর অনুগামীদের দাড়ির উপর কর ধার্য করে, মসজিদ ধ্বংস করে)। প্রত্যাঘাত হানতে গিয়ে তিতুও হিন্দুধর্মবিরোধী কাজ করেছিলেন (মন্দিরের উপর আক্রমণ, গোহত্যা, গোরক্ত লেপন করে)। এ সত্ত্বেও তিতুমীরের বিদ্রোহকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। মহাজন-শোষকেরা তাঁর রোষ থেকে কখনও রেহাই পায়নি। ফলে তাঁর আন্দোলন এক ধরনের সমাজভিত্তি পেয়ে যায়।

৩.১

নীল আন্দোলন—সেই আন্দোলন, যা পুরোপুরি ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। ব্রিটিশের বাণিজ্য ও মুনাফার স্বার্থে নীলচাষের প্রসার ও নীলচাষের জন্য কৃষকদের উপর সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চাননির্বিশেষে সমগ্র সমাজের প্রতিবাদই এই আন্দোলনের চমৎকারিত্ব। নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে দেশীয় ধনাঢ্য ও জমিদারদের একাংশ নীলচাষকে সমর্থন করছিলেন, নীলচাষে ক্রমাগত লগ্নি বাড়িয়ে চলছিলেন। অন্যদিকে নীলকরদের লাগামছাড়া লোভ অন্য একশ্রেণীর জমিদারের সঙ্গে নীলকরদের দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছিল। যে-সমস্ত জমিদার ও তালুকদার নীলকরদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের বৃহদংশ নীল আন্দোলনকে সমর্থন করছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, নীলকরদের অত্যাচার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক-প্রজাদের সম্মিলিত প্রতিরোধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। নীল আন্দোলন এমন এক প্রবল সামাজিক সংক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা না করেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণে' নীলকরদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের প্রক্ষোভকে যে পাশাপাশি বিন্যস্ত করেছেন, তা আদৌ প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জিত নয়।

এমন কি নীলকরদের হাতে চাষীদের অত্যাচারিত হতে দেখে নদিয়ায় প্রটেস্টান্ট মিশানারিরাও চাষীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, বিশেষত কৃষ্ণনগর ধর্মমণ্ডলীর মিশনারিরা। নদিয়ার চার্চ মিশনারি সোসাইটির তিনজন—জে জি লিংকে, ফ্রেডারিক সুর ও বমভাইটস নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে আবার রেভারেন্ড বমভাইটস (১৮১৯—১৯০৫) সর্বাধিক উচ্চার্য নাম। উৎপীড়িত কৃষকদের সমর্থন করায় একদা তিনি নীলকর ও তাদের বন্ধুদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়েন। রেভারেন্ড বমভাইটস ও অন্যান্য মিশনারিদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়াও একটা বড় অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা খ্রিস্টপ্রেমের বাণী প্রচারের কর্তব্য ভুলে গিয়ে সক্রিয়ভাবে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

নীল আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি নদিয়ায় বিদ্রোহের এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রায় সমকালীন উদারনৈতিক বিশ্বাসপন্থার সহযাত্রী। এখানেও নীল আন্দোলন সামাজিক চরিত্রপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতাদের শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ বহুসংখ্যক মুসলমান মেনে নিলেও বিশ্বাসপন্থায় আশ্রিত মুসলিমেরা তা মেনে নেননি। জেলায় নীল আন্দোলন তার উত্তাপ সংবরণ করার পরেও উদারপথের পথিক নদিয়ার কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারকে আমরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেখতে পাই।

সুতরাং নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সমাজমানসের প্রসারণ ও মানব-দূরত্বের সঙ্কোচন লক্ষণীয়মাত্রায় ধরা পড়েছিল।

নীল আন্দোলনকে 'মহাবিপ্লব' বা স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বরূপ অথবা আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আখ্যা দেওয়ার যাথার্থ্য এখানেই যে, এই আন্দোলনই নিচের তলা-উপর তলা—সমাজের উভয় স্তরের সমর্থন পেয়েছিল। বিদ্রোহের সংবেদনও তাই সমাজমানসে তীব্রভাবেই অনুভূত হয়েছিল। অন্য কোনও কৃষক আন্দোলন সমাজমানসের স্তরে-স্তরান্তরে এত প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারেনি। যেমন :

পরবর্তীকালে সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ।

নীলবিদ্রোহের মতো সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহও সহিংস হয়ে উঠেছিল। অথচ একদা নীল আন্দোলনের সমর্থনকারী সংবাদপত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাও সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের বিরোধিতা করে অশান্তির জন্য কৃষকদেরই দায়ী করেছিলেন। অবশ্য তখনও নদিয়ার অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রজাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

৪. ব্রাহ্মপর্ব : উনিশ শতক

কেবলমাত্র ধর্মীয় আবেগ বা ঈশ্বরানুসন্ধান থেকে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয়নি। প্রথমে আত্মীয়সভা (১৮১৫), পরে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) স্থাপিত হয়। 'সভা', 'সমাজ' থেকেই বোঝা যায় রামমোহন রায়ের নিহিত উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার (১৮৩৯) অনেক পরে বন্ধুবর্গসহ দীক্ষা নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্মের সূচনা করেন : 'অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।'[৪]

একেশ্বরবাদী হিসেবে ব্রাহ্মসমাজ যতটা আক্রান্ত হয়েছিল, তার থেকে ঢের বেশি নিন্দিত ছিল 'সহমরণ নিবারণের দল' হিসেবে। রক্ষণশীল ও গড়পরতা হিন্দুসমাজ ১৮৩০ কিংবা তারও পরে ব্রাহ্মসমাজকে 'কেহ বলিতেন তথায় 'নাচ-তামাশা'—নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, এবং বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহারদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল।'[৫]

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিক্রিয়ায় রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুসংগঠন 'ধর্মসভা' গঠিত হল (১৮৩০)।

শুধুমাত্র একেশ্বরবাদ বা সহমরণ নয়, ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রত্যয়গুলি ছিল বহুমুখী : জাতিভেদহীনতা, উদারনীতি ও সম্প্রদায়ের জয়, চিন্তা ও কাজ, চরিত্রগঠন, সাধারণ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বহুমুখী জনকল্যাণ ও আর্তত্রাণ, সামাজিক সংস্কার দূরীকরণে দায়িত্ব, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি। রামমোহনের সময় থেকেই হিন্দু মুসলনমান খ্রিশ্চান ইহুদি—সব ধর্মের লোকই সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন।

তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়েছিলেন সে যুগের মনস্বীরা। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু ধনাঢ্য, পণ্ডিত, কৃতবিদ্য, প্রতিষ্ঠাপন্ন ও পেশাসফল ব্যক্তির কর্ম-যোগাযোগ ঘটেছিল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে।

৪.১

কলকাতাকে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনের মস্তিষ্করূপে গড়ে তোলার আগেই 'বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ববর্তী কেন্দ্রভূমি ছিল নদিয়া। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে নদিয়া থেকেই ধর্মশাসন যেত সমগ্র বঙ্গসমাজে। কিন্তু ইংরেজ শাসনে কলকাতা থেকেই নব্যভাবধারা ও নব্যচেতনা আসতে লাগল নদিয়ার মতো সমৃদ্ধ জনপদগুলিতে। এই জনপদগুলি (যেমন : কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ) কিছু নাগরিক সুবিধাযুক্ত হলেও ছিল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন।

যে-অর্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভ্রান্তির কারণে নতুন যুগ ব্যাহত-বিকশিত ও বিকলাঙ্গ, যুক্তি ও বুদ্ধিচর্চার ইতিবাচক সংগ্রাম ও নেতিবাচক স্থিতি—সেই অর্থেই নদিয়াতেও এই সময়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সীমায়িত।

৪.২

একদিন নদিয়ার রাজপরিবারের হাতেই দলিত হয়েছিল সামাজিক অধিকার, একদা নদিয়ারাজের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কলমের মুখেই সূচিত হয়েছিল মধ্যযুগের অবসান, আবার কৃষ্ণনগর-রাজপরিবারের হাতেই নদিয়ায় নব্যবঙ্গের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হল। ঊনবিংশ শতকের চারের দশকের প্রথমেই রাজা শ্রীশচন্দ্র এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীশচন্দ্র সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছিলেন কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। সৎ যুক্তিবাদী পণ্ডিত ও সংগীতজ্ঞ কার্তিকেয়চন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিয়ান রামতনু লাহিড়ীর নিকটাত্মীয় ছিলেন। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি মিত্রতা লাভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের। সমবয়সী কার্তিকেয়র (১৮২০—১৮৮৫) সঙ্গে রাজা শ্রীশচন্দ্রের (১৮২০—১৮৫৮) যোগাযোগে শ্রীশচন্দ্র হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা ও দেশজ কদাচারসমূহের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। 'বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহের চলন, বেদরহিত ধর্মের পুনঃস্থাপন ইত্যাদি স্বদেশ হিতজনক বিষয়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় হইল।'[৬]

১৮৪৩-৪৪ সাল নাগাদ শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী আনিয়ে তাতে কার্তিকেয়চন্দ্র, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি গড়গড়ির স্বাক্ষর করালেন। নিরাকার উপাসনা প্রচারের জন্য কার্তিকেয়কে তিনি বর্ধমানরাজের কাছে পাঠালেন।

এর পরই শহরে সংস্কার আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠল বলা যায়। উৎসাহীদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্ণনাগরিকগণ : ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, কার্তিকেয়চন্দ্র ও তাঁদের আত্মীয়-বান্ধবশ্রেণী। এঁদের প্রথম কাজ হল : শিক্ষাবিস্তার, দ্বিতীয়কাজ হল : বিধবার পুনর্বিবাহের উদ্যোগ সহ সামাজিক সংস্কার নিরাকরণ।

ইংরেজি ভাবাভিজ্ঞ রামতনু-অগ্রজ কেশবচন্দ্রের আগ্রহে অন্য ভ্রাতা—(রামতনু, শ্রীপ্রসাদ, রাধাবিলাস, কালীচরণ) কলকাতায় গিয়ে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতা প্রত্যাগত শ্রীপ্রসাদ একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। রামতনু কৃষ্ণনগরে এসে স্কুলের ছাত্রদের ধর্ম-সমাজ-ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়াও হিন্দু কলেজের ছাত্র ও রামতনুমিত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক নদিয়ার কালেক্টর থাকাকালীন এই বিদ্যালয়কে সাহায্য করতেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নব্যশিক্ষার ফলে স্বদেশীয় ধর্ম ও রীতিনীতি বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয়। সাকার উপাসনার অলীকতা ও প্রচলিত আচারের দোষগুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়।[৭]

শহরে একটিমাত্র মিশনারি স্কুল ছিল। ব্রাহ্মসমাজের অস্থায়ী উপাচার্য ব্রজনাথ ওই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এক ছাত্রকে অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়াই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রতিবাদে স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এজন্য ব্রজনাথকে দায়ী করায় ব্রজনাথ মিশনারি কার্যকলাপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে প্রথমে একটি পাঠশালা স্থাপন করলেন ও পরে সেটিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করলেন।

এই সময় কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হওয়ায় শ্রীশচন্দ্র কলেজ কমিটির সভ্য হলেন ও রাজপরিবারের নিয়মের অবসান ঘটিয়ে স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে রামতনু লাহিড়ী কাজে যোগ দিলে নব্যবাদীদের শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা নতুন মাত্রা লাভ করে।

ইতিপূর্বেই রাজা শ্রীশচন্দ্রের উদ্যোগে ও ব্রাহ্মভাবাপন্নদের উৎসাহে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। রাজা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছ থেকে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থাপত্র লাভ করার চেষ্টা করছিলেন। রাজার ব্যক্তিগত উৎসাহে ভাঁটা পড়লেও নব্যদলে এ নিয়ে উৎসাহ অব্যাহত ছিল। এ নিয়ে তাঁরা কৃষ্ণনগর কলেজগৃহে একটি সভা করলেন। সভায় দেশীয় 'রীতিনীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ' ও বিধবাবিবাহের অঙ্গীকার করা হল। রামতনু লাহিড়ীর শিক্ষকতায় ছাত্রদের মধ্যে আগেই নব্যভাব ও তর্কবিতর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই সভা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল। বিরুদ্ধবাদীরা নব্যপন্থীদের বিরুদ্ধে গোহত্যা, গোমাংস ভোজন ও মদ্যপানের অপবাদ রটনা করে দিলেন। রক্ষণশীলেরা তো বটেই, সাধারণ গৃহস্থেরাও নিজেদের ছেলেদের কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। নদিয়ায় ব্রাহ্মদের ও নব্যপন্থীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কিত রক্ষণশীলেরা উলা বা বীরনগর নিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও রাধাকান্ত দেবের অনুসরণে ধর্মসভা স্থাপন করলেন।

অন্যদিকে নীতিবাদী ব্রাহ্মরা শহরের কলুষিত পরিবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছিলেন। এখন সেই কলুষতার জন্য দায়ী ব্যক্তিরাই (কার্তিকেয়চন্দ্র যাদের 'বেশ্যাসক্ত প্রবঞ্চনা-ব্যবসায়ী' আখ্যা দিয়েছেন) অপপ্রচারে বেশি অংশ নিলেন।

অপবাদ ও উত্তেজনা চূড়ান্ত আকার ধারণ করলে কলেজের জনপ্রিয়তম শিক্ষক রামতনু বদলি প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন ও বর্ধমানে বদলি নিয়ে চলে গেলেন। এই ঘটনায় তখনকার মতো বিধবাবিবাহ প্রস্তাব রহিত হয়ে গেলেও ব্রাহ্ম কার্যকলাপ কিংবা সামাজিক উদ্যোগ থেমে থাকল না। ব্রজনাথ সহ অন্যরা বিধবার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করে যেতে লাগলেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে আগে থেকেই এই দুই অঞ্চলের তরুণসমাজ সভাসমিতি গঠন করে বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।[৮]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে কৃষ্ণনগরের ২৬ জন সম্ভ্রান্ত মানুষ একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন, এঁদের মধ্যে রাজা শ্রীশচন্দ্রও ছিলেন।[৯] এ ছাড়াও শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ১২৯ জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি পৃথক আবেদনপত্র প্রেরিত হয় (১৮৫৫)। কৃষ্ণনগরে একটি বিধবাবিবাহে সম্ভবত কেশবচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন, এ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি।

রামতনু ও ব্রজনাথ কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন সকলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও শহরে ব্রাহ্মমতানুসারী যুবকের সংখ্যা কম ছিল না। ব্রাহ্মভাবধারাও শেষ হয়ে যায়নি। কৃষ্ণনগর কলেজে যাঁরা শিক্ষক হয়ে আসতেন, তাঁদের অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন।[১০] ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মধারার প্রসারের এটাও একটা কারণ। তখনও ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হত, কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মভাব প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন।

১৮৮৮ সালে বিধবার সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মামলার রায়কে কেন্দ্র করে হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্ক চরমে ওঠে, জড়িয়ে পড়ে সমগ্র বঙ্গদেশ। কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ ও সুপরিচিত ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণ সেন (সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি কামিনী রায়ের পিতা, ১৮৪৫—১৯০৬) ওই মামলার রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করলেন যে, হিন্দু বিধবাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই অসতী। একে এই একপেশে মন্তব্য, তার উপর মন্তব্যকারী ব্রাহ্ম। সুতরাং চণ্ডীচরণকে দারুণ সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হল। কৃষ্ণনগরে চণ্ডীচরণকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজও তখন স্তিমিত।

৪.৩

নদিয়ার চাকদহে ১৮৪৫ সাল নাগাদ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত আচার্য রামমোহন-সুহৃদ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ চাকদহের অন্তর্গত পালপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর অগ্রজ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী (নামান্তরে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার কুলাবধূত, আনু. ১৭৬২—১৮৩২) রামমোহন রায়ের সন্ন্যাসীবন্ধু ও তন্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬—১৮৪৫) ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রামমোহন বিলাত যাওয়ার পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় এক দশককাল অত্যন্ত দুর্দিনে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে তিনিই টিকিয়ে রেখেছিলেন। রামচন্দ্রের কাছে দেবেন্দ্রনাথ সহ একুশ জন প্রথম ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন (১৮৪৩)। বিদ্যাসাগরের আগেই রামচন্দ্র বিধবাবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। বহু বিবাহেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। অবশ্য রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলনের সপক্ষতা তিনি করেননি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদিয়ার চার সমাজের একটি ছিল পালপাড়া, টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র। চাকদহ অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। এখানে ব্রাহ্মদের উদ্যোগে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আজীবন দরিদ্র পণ্ডিতের জীবনযাপন করলেও মৃত্যুকালে সঞ্চিত অর্থ (পাঁচশত টাকা) ব্রাহ্মসমাজকে দান করে যান।

৪.৪

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১—১৮৯৯) নিজে বৈষ্ণব বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায়

সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত পাঠের ফলে আচারনিষ্ঠ পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে তাঁর অনাস্থা জন্মায়। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে জাতিভেদের তীব্র বিরোধী বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রচারক।

শান্তিপুরে ক্রমেই ব্রাহ্মধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। কৃতবিদ্য ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যমে এখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। প্রথম পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপাসনায় যোগ দিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অঘোরনাথ গুপ্ত, ভুবনমোহন গুপ্ত, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর ডাঃ অভয়াচরণ বাগচী শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। প্রথম আচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেন সুবিখ্যাত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পরে সমাজে যোগ দেন বীরেশ্বর প্রামাণিক, হরেন্দ্রনাথ মৈত্র, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, প্রাণনাথ মল্লিক, যোগানন্দ প্রামাণিক প্রমুখ।

শান্তিপুরে ব্রাহ্মবাদী আন্দোলন ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমাজের উপাসনায় যোগ দেবার জন্য শিক্ষিত হিন্দুরা প্রায়শই স্বজন-পরিবারবর্গের দ্বারা নির্যাতিত হতেন।[১১] পত্র-পত্রিকায় কুৎসাও চলছিল।

এ সময় শান্তিপুরের সমাজজীবন অত্যধিক কলুষিত ছিল, অশ্লীলতা ও সামাজিক ঘোঁটে সে-জীবন ছিল দীর্ণ। পত্র-পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজবিরোধী কুৎসা ও সে-নিয়ে মামলা-মকদ্দমাও অব্যাহত ছিল।

এদিকে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সেরা তাত্ত্বিক ও প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ বন্ধু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে উপবীত ত্যাগ করলেন।[১২] ইতিপূর্বে রামতনু লাহিড়ীও উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। উপবীত ত্যাগের ফলে বর্ধমানে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে রামতনুকে সামাজিকভাবে বর্জন করা হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে তাঁর উপবীত ত্যাগের কথা প্রচারিত হলে তাঁকে হাতের কাছে না পেয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতার উপরই হিন্দুসমাজ বহু অত্যাচার ও নির্যাতন করেছিল। এবার বিজয়কৃষ্ণের উপবীত ত্যাগে ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে-বাইরে ঘোরতর আন্দোলন দেখা দিল। 'পথে বেরুলে কেউ গাল দেয়, কেউ ধুলো দেয়, কেউ বা একেবারে মারমুখো হয়ে ওঠে।[১৩] উপবীত ত্যাগের আন্দোলন বস্তুত ব্রাহ্মসমাজকে ভেঙে দু'টুকরো করে।

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের বৈষ্ণবীয় কীর্তনের ঘরানায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কীর্তন ও সংকীর্তনের প্রচলন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের একদল কেশবচন্দ্রকে দেবতাজ্ঞানে অবতার বলে পূজা শুরু করলে বিজয়কৃষ্ণ তার প্রতিবাদ করেন। কেননা, অবতারপূজা ব্রাহ্মধর্ম ও আদর্শের পরিপন্থী। বারংবার ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ স্ববিরোধী আচরণে বিজয়কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীস্টান সকল ধর্মের সেবক বলে ঘোষণা করেন। তিনি ফিরে যান বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মে।

শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয় থাকাকালে অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়, শিক্ষাবিস্তারের কাজও চলে। ব্রাহ্মমিশন বিদ্যালয়, আনন্দ ভুবিনি ইনস্টিটিউশন (পরে শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমি), শান্তিপুর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, আত্মোৎকর্ষ বিধায়িনী সভা, বাল বিদ্যোৎসাহিনী সভা ইত্যাদির সঙ্গে সমকালীন সমাজনেতাদের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে অনাথাশ্রম সহ ব্রাহ্মদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নানান অপবাদ ও অপপ্রচারে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শান্তিপুর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে শান্তিপুর থেকে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল ৫৩১। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করলেও শান্তিপুরের জনসমাজের তৃণমূলে এই আন্দোলনের আহ্বান গিয়ে পৌঁছেছিল—এটা অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গানটি বয়ন করে বিদ্যাসাগর-বন্দনা করেছিলেন।

ধর্মধ্বজীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও শান্তিপুরে বেশ কয়েকটি বিধবাবিবাহ সমকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমকালীন পত্রিকার পাতাতেও শান্তিপুর থেকেই বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতার অবতারণা করা হয়েছিল।

৪.৫

অবিভক্ত নদিয়ার কুমারখালিতে ব্রাহ্মসমাজ বেশ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। কুমারখালি ঠাকুর পরিবারের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানেই বাস করতেন সে যুগের বিশিষ্ট সাংবাদিক-সম্পাদক (গ্রামবার্তা প্রকাশিকা), সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সাধক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সর্বার্থে জাগ্রত পুরুষ হরিনাথ মজুমদার। আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও হরিনাথ সোৎসাহে সমাজের অধিবেশনে যোগ দিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কুমারখালিতে এলে হরিনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ঘটে। বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে হরিনাথ ঢাকা, রাজশাহী ও কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। ন্যায়-সত্য-ধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে হরিনাথ বারবার আক্রান্ত হয়েছেন জমিদার ও অভিজাতদের দ্বারা। শিক্ষাব্রত থেকে শুরু করে উদারতাভিত্তিক ধর্মবোধ—সবেতেই তাঁর অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের আদত প্রত্যয়গুলির প্রেরণা নিঃসন্দেহে কাজ করছিল, যদিও বিজয়কৃষ্ণের মতোই ব্রাহ্মসমাজের স্ববিরোধিতা আর সামাজিক বিষয়ে মতভেদ থাকায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন। অবশ্য এর পরেও সামাজিক দলাদলি, হিন্দু-ব্রাহ্ম কোন্দল নিরসনে তিনি সক্রিয় থেকেছেন। অবিচল থেকেছেন উদারতা ও ধর্মবিষয়ে সামাজিক সহিষ্ণুতার আদর্শে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে : সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে তিনি বরাবর ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

৪.৬.

ব্রাহ্ম আন্দোলনের এইসব কেন্দ্র ছাড়া নদিয়ার অন্যত্রও ব্রাহ্মভাবধারা প্রভাব দেখা যায়। একবার ব্রাহ্ম প্রচারক দল (কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল, সুন্দরীমোহন দাস ও অশ্বিনীকুমার গুহ) শিবনিবাস গ্রামে গিয়ে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে

একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সভায় উপাসনা ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল।

নদিয়ার মামজোয়ান নিবাসী শ্যামাচরণ সরকার (১৮১৪—১৮৮২) কলকাতায় রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে থেকে বিদ্যাশিক্ষার সূত্রে নব্যভাব ও নব্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। বহু ভাষাবিদ ও সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ নানা উচ্চপদে চাকরি করে বহু অর্থোপার্জন করেছিলেন। নিজ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের কূপ খনন, দুস্থ বিধবাদের অর্থদানে তিনি বহু ব্যয় করেন। ব্রাহ্মভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শ্যামাচরণ ধর্ম ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থান দিতেন জনকল্যাণকে।

এছাড়া নদিয়ার অন্যান্য স্থানেও যুবকদের মধ্যে ব্রাহ্মভাবধারার প্রসারে সামাজিক সুনীতিচর্চা বর্ধিত হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে, কৃষ্ণনগরের যুবসমাজ একদা স্বাধীনভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই বিচার প্রবণতায় সামন্ত-সংস্কৃতিশাসিত নদিয়ার জনপদগুলিতে বিপুল অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মধর্মান্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তার, বিধবাবিবাহ, সামাজিক সংস্কার নিরাকরণে কিংবা জনসেবাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খেউড় ও মদ্যপ্লাবিত নদিয়ায় সামাজিক সুনীতির চর্চায় এই আন্দোলন এবং আন্দোলনলগ্ন মানুষজনের বড় ভূমিকা লক্ষ্য করার বিষয়।

দীনেন্দ্রকুমার রায় মেহেরপুরের জমিদারের দ্বারা প্রবর্তিত বাসন্তীমেলার বিবরণ দিতে গিয়ে জনিয়েছেন : মেলার মুখ্য আকর্ষণ ছিল দুটি—জুয়া আর পতিতারা; সঙ্গে ছিল খেমটা, বাঈজী নাচ ও অপরিমিত সুরার স্রোত। এর বিরুদ্ধে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ জানান সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠকালে তিনি ব্রাহ্মসংস্পর্শে এসেছিলেন, পরে হয়েছিলেন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। যুবকদের প্রতিবাদে বাসন্তীমেলা উঠে যায়।

শান্তিপুরের বিখ্যাত রাসমেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল অশ্লীল খেউড় গান, আদিরসের ছড়াছড়ি ও তৎকালীন বঙ্গের মসীলিপ্ত নাগরিক জীবনের অন্যান্য দোষ। এই মেলার বিবরণ দিতে গিয়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকা লিখেছিল যে, শান্তিপুরে যদি একটি করে ইংরেজি ও বাংলা বিদ্যালয় এবং একটি ব্রাহ্মসমাজ না থাকত তবে শান্তিপুর শ্রীকৃষ্ণের অকূল সাগরে ভেসে যেত। বাস্তবিকই শান্তিপুরে ব্রাহ্মবন্ধুরা সামাজিক সুনীতির চর্চায় ব্যাপৃত না থাকলে শুধুমাত্র অদ্বৈতাচার্যের পুণ্যস্মৃতি শান্তিপুরকে রক্ষা করতে পারত না।

কুমারখালিতে যুবকেরা যখন জুয়া খেলে, আড্ডা দিয়ে, অসৎসঙ্গে কালাতিপাত করছিল, তখন হরিনাথ মজুমদার যুবকদের স্খলন থেকে রক্ষা করার জন্য গীতাভিনয়ের দল খুলেছিলেন।

এতসব সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মধ্বজীদের তীব্র অপপ্রচার এবং আক্রমণ ছাড়াও অন্যান্য কারণে (ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মত-পথ-ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, অন্তর্বিরোধ, এই আন্দোলনের সত্যিকার গণভিত্তির অভাব, ব্রাহ্মনেতাদের কথা ও কাজের বিরোধ, বহুবিধ স্ববিরোধিতা) ব্রাহ্মসমাজ তার প্রভাব দীর্ঘকাল বজায় রাখতে পারেনি। গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রবল চাপের কাছে জেলার ব্রাহ্মপরিমণ্ডল অবনত হয়ে পড়ে।

৫। পরবর্তী পর্ব

উনিশ শতকীয় নব্য ভাবধারা ও ব্রাহ্মাবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে হয়ে পড়ল অবসাদগ্রস্ত। সামাজিক আন্দোলনের পরিবর্তে উনিশ শতকের শেষপর্ব থেকে ব্যাপকতা ও গুরুত্ব লাভ করল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। কিন্তু সামাজিক বিষয়গুলি? আইন বিধবাবিবাহের প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ, বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ চলছেই, শিক্ষাবিস্তারের স্বপ্নও অসফল।

এই রকম সময়ে নদিয়ায় গ্রামীণ তথা ধারাবাহিক এক সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দেন নীল আন্দোলনের খ্যাতকীর্তি দিগম্বর বিশ্বাসের দৌহিত্র বসন্তকুমার সরকার (১৮৭৬—১৯৭২)।[১৮]

তেহট্ট থানার বল্লিপুর ও তার চারপাশের গ্রামীণ জনপদকে বসন্তকুমার সামাজিক কর্মের দ্বারা সংগঠিত করেছিলেন। নিজে এন্ট্রান্সের পর প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেননি, সামান্য জমিজমার উপর নির্ভর করে চাকরিও নয়। দেশ ভ্রমণ করেছেন, করেছেন সাহিত্য ও সমাজচর্চা। তাঁর আজীবন কর্মোদ্যমের মধ্যে আছে : শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জাতিভেদ প্রথার অবসানের জন্য প্রচার, বিধবাবিবাহের জন্য আন্দোলন ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধের জন্য চেষ্টা, পণপ্রথা নিবারণে প্রচার, সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সকর্মক প্রচার ইত্যাদি।

বসন্তকুমার নিজ গ্রাম বল্লিপুরের জরাজীর্ণ পাঠশালার উন্নতিসাধন করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম কৃষ্ণনগরের পাঠশালাকে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। শ্যামনগর সিদ্ধেশ্বরীতলা ইনস্টিটিউশন নামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি গ্রামস্থ উৎসাহীদের সংগঠিত করেন, সরকারি ও বেসরকারি স্তরের সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কঠোর শ্রম করেন।

গ্রামীণ জীবনের অন্যতম অভিশাপ ভয়ানক জাতিভেদ প্রথার অবসানের জন্য বসন্তকুমার প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সামাজিক এই কুপ্রথা সম্পর্কে সহযোগীদের নিয়ে সভা-সমিতি করে বেড়াতেন। আর নিজে জল-অচল অস্পৃশ্য গ্রামবাসীদের গৃহে উপস্থিত হয়ে আতিথ্য ও আহার গ্রহণ করতেন। মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউড়ি—কোনও ভেদাভেদ মানতেন না বসন্তকুমার।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে, বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যও তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করতেন, সংগঠন করতেন। যশোদাকুমার দত্তকে সভাপতি করে এবং নিজে সম্পাদক হয়ে সিদ্ধেশ্বরীতলা বিধবাবিবাহ সহায়ক সভা স্থাপন করেন। এক বিস্তীর্ণ এলাকার প্রচুর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষ এই সভার কার্যকলাপকে সমর্থন করেছিলেন। জনমত গঠন ও বিধবার পুনর্বিবাহ দেওয়া ছিল এই সভার কাজ। এই সভা অনেকগুলি বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিল।

বাল্যবিবাহ দূরীকরণেও বসন্তকুমার সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে চাইতেন ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হোক। বিধবাবিবাহের সমর্থনে প্রচারের সময় অনিবার্যভাবে এসে পড়ত বাল্যবিবাহের কুফলের প্রসঙ্গ। ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় গৃহীত বাল্যবিবাহ নিবারণ আইনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বসন্তকুমার নিজের সংগ্রহে রেখেছিলেন।

বসন্তকুমার পণপ্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন। এর বিরুদ্ধেও তিনি প্রচার চালালেন। পণপ্রথা বিরোধিতা বসন্তকুমারের সহযোগী ও নিজ পরিবার-স্বজনদের দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এমন কি গঙ্গায় মৃতদেহ বিসর্জন ও গঙ্গাতীরে মৃতদেহ দাহকরণের মতো সামাজিক সংস্কারেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। বিশেষভাবে গঙ্গাদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের এই প্রথা পালনের জন্য শ্রম ও অর্থব্যয় হতো, বিপন্নতা দেখা দিত। গঙ্গাতীরে মৃতদেহ দাহকরণের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির বদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বসন্তকুমার কেবল প্রচারই করেননি—নিজ স্ত্রীর মৃতদেহ গ্রাম সংলগ্ন জলঙ্গী নদীর তীরে দাহ করেছিলেন। তাঁর নিজের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর দাহকর্মও জলঙ্গী তীরেই সম্পন্ন হয়।

মনে করার কোনও কারণ নেই নদিয়ার গ্রামাঞ্চলে বসে বসন্তকুমার এত সব কাজ বিনাবাধায় করে যেতে পেরেছিলেন। এ জন্য তাঁকে বিস্তর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সহ্য করতে হয়েছিল নানান কটূক্তি। এই জেলাতেই তো বিলাত যাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের জাত নিয়ে টানাটানি হয়েছিল। তাঁর বিবাহের সময়ও যথেষ্ট ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৯১০) সকন্যা বিধবার পাণিগ্রহণ করায় শহরে যথেষ্ট সমালোচনার ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নিগ্রহের আরও একটা কারণ হল, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুরমশায় প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রতাপ মজুমদার বালবিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। জেলার আর এক খ্যাতিমান ব্যক্তি বিল্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর-সুহৃদ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়ে সমাজে খুব স্বস্তি পাননি।

খ্যাতিমানদের এই বিপন্নতার পাশাপাশি ইত্যাকার আন্দোলনে বসন্তকুমার ছিলেন তুলনামূলকভাবে সফল। কেননা, তিনি প্রচার ও জনমত গঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁর প্রচার আঞ্চলিকতা ও জেলার সীমানা পেরিয়েছিল এবং সহযোগী অনুগামীদের নিয়ে একটি দলও তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি যথার্থেই তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

ক্রমেই সমগ্র বঙ্গদেশে সামাজিক আন্দোলনগুলির প্রেক্ষিতটি শিথিল হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত আন্দোলন লক্ষ্যগামী হতে পারেনি। তার মধ্যেও কখনও ব্রাহ্মণ বিধবাদের একাদশীতে নিরম্বু উপবাস রহিত করার উদ্যোগ (রজনীকান্ত মৈত্রের উদ্যোগে শান্তিপুরে), কখনও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ছাড়াও অন্যদের উপবীত গ্রহণের যজ্ঞ (রানাঘাটে ভারত বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ মহাসভার উদ্যোগে) চলতে থাকে। সামাজিক আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে উদারতা, মানবতা, জাতি-সম্প্রদায়ের বিভাজন-বিরোধিতা, সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্তির চেষ্টা—ইত্যাকার যে ঐতিহ্য বাঙালি ও বঙ্গদেশ অর্জন করে, তাতে নদিয়ার ভূমিকা ইতিবাচকতার প্রেক্ষিতেই বিচার্য।

সূত্র পরিচয় ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. রমাকান্ত চক্রবর্তী : চৈতন্যোত্তর ধর্মান্দোলন (প্র.), বারোমাস, এপ্রিল ১৯৮৬।

২. অজিত দাস : জাতবৈষ্ণব কথা, চারুবাক, কলকাতা-১৮।

৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী : বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ ১৯৯৬, পৃ. ৭৩-৭৪।

৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা-১৩৬০ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২২।

৫. তদেব, পৃ. ১৪।

৬. কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত, সম্পা. মোহিত রায়, প্রজ্ঞা, পৃ. ৫৬।

৭. কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত (উল্লেখ : শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বিশ্ববাণী সং ১৯৮৩, পৃ. ১৩১।

৮. বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৯৮৪, পৃ. ২৪৫।

৯. তদেব, পৃ. ২৬০-৬১।

১০. দীনেন্দ্রকুমার রায় : সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৪১, ৭৬-৭৭।

১১. কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : শান্তিপুর পরিচয়, নতুন সং ১৩৯৩, পৃ. ২৭৮।

১২. রাজলক্ষ্মী দেব্যা : ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব. রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৩৪৪, পৃ. ১৪-১৫।

১৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : জগৎগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ, ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৬৬।

১৪. শশাঙ্কভূষণ চৌধুরী : কর্মবীর বসন্তকুমার, মাঘ ১৩৮০, বসন্তকুমার সম্বন্ধে তথ্যাবলী এই গ্রন্থ থেকে।

অন্যান্য গ্রন্থ

১. দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৯ (২ খণ্ড)।

২. যোগানন্দ দাস : রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২য় সংস্করণ।

৩. বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় বিদ্যাভারতী সংস্করণ, ১৩৭৩।

৪. কুমুদনাথ মল্লিক : নদিয়া কাহিনী, সম্পা. মোহিত রায়, পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ১৯৮৬।

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, বিশ্ববাণী সংস্করণ ১৯৮৩।

৬. জলধর সেন : আত্মজীবনী (জলধর সেনের আত্মজীবনী), লিপিকার : নরেন্দ্রনাথ বসু, প্রবর্তক ১৯৫৬।

৭. স্বপন বসু : গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪।

৮. অলোককুমার চক্রবর্তী : মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১৯৮৯।

৯. প্রবীরকুমার দেবনাথ : প্রসঙ্গ কাঙাল হরিনাথ, মণ্ডল অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৯।

১০. স্বপনকুমার দাস : কাঁচরাপাড়া অতীত ও বর্তমান, সাধনকুমার দাস, ১৯৯৪।
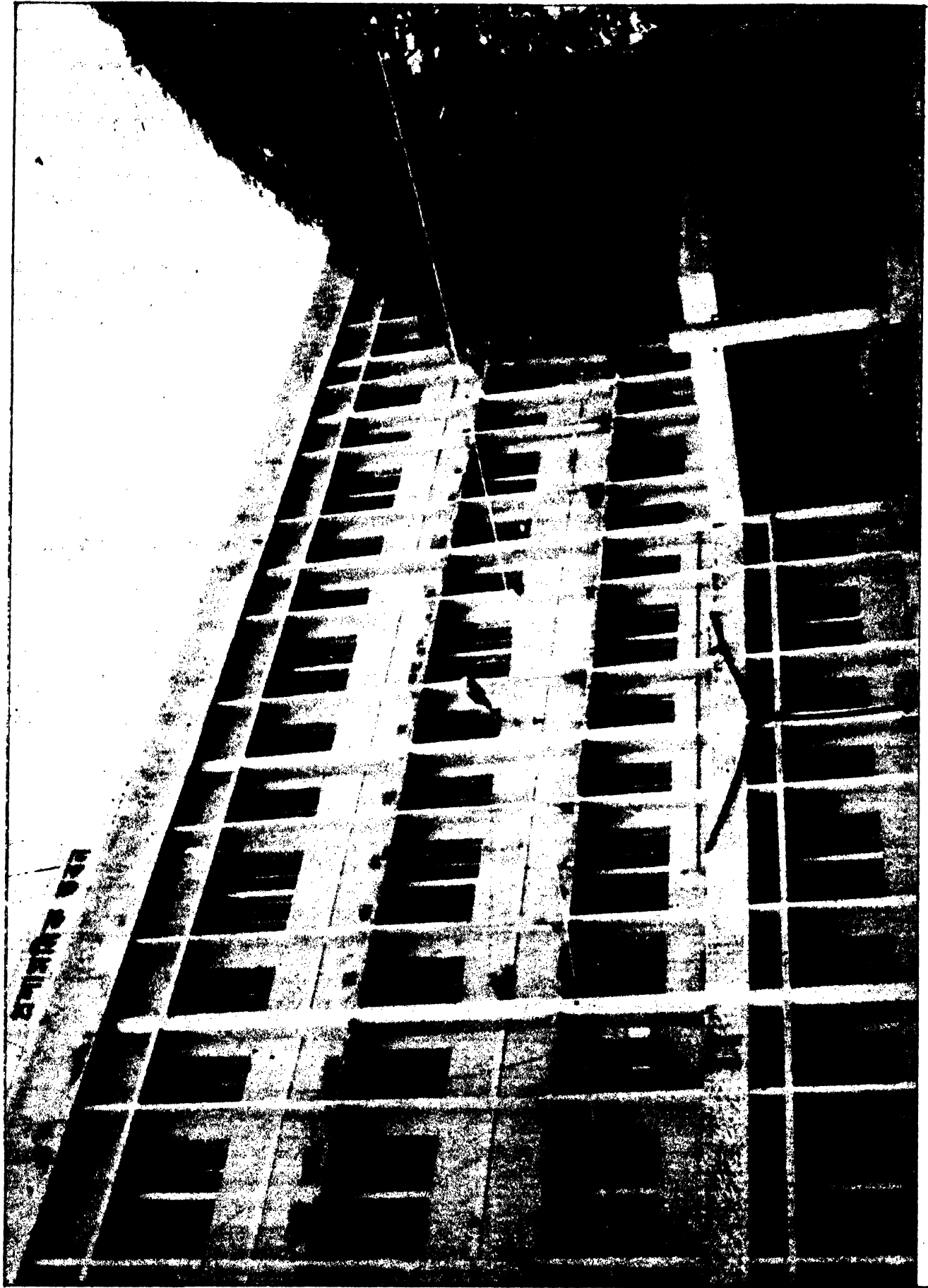
নদিয়া প্রশাসনিক ভবন

ছবি : সত্যেন মণ্ডল

নদিয়ার সাহিত্য সাধনা : প্রবণতা ও প্রেক্ষিত

(স্বাধীনতার সমকাল পর্যন্ত)

অজিত দাস

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জেলা একটি প্রশাসনিক সীমানা। সাহিত্য সেই সীমানা নির্ভর নয়। তার ভিতর সাহিত্যকে অবরুদ্ধ করা যায় না। তবু আলোচনার সুবিধার্থে সেই সীমানাকে মানতেই হয়। সে ক্ষেত্রে দুটি বিভাগকে মানা প্রয়োজন। একটি হচ্ছে—যে সব সাহিত্য-সাধক জেলার সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারপর সেই জেলাকেই তাঁর সাধনক্ষেত্র করেছেন, অথবা জেলার বাইরে গিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে পড়বেন তাঁরাই, যাঁরা বহিরাগত, জেলায় এসে সাহিত্যচর্চা করেছেন। দুই পক্ষকে নিয়েই জেলার সাহিত্য সাধনার ইতিহাস, তার পরিচয়।

নদিয়া জেলার কথা এলে নবদ্বীপকেই মনে পড়ে। নবদ্বীপ থেকেই নদিয়া শব্দটির উৎপত্তি। প্রথমে নদিয়া বলতে নবদ্বীপকেই বোঝাতো, এখন নদিয়া নামে একটি জেলা হয়েছে। এটা হয়েছে ইংরেজ শাসন শুরু হলে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জেলার সৃষ্টি। বঙ্গদেশে প্রথম জেলা এই নদিয়া। তখন যশোহরও ছিল এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। জেলার এই সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। যশোহর স্বতন্ত্র হয়ে গেল। ফরিদপুর, কুষ্টিয়াকে এনে যোগ করা হল নদিয়ার সঙ্গে। তখন ছিল মোট পাঁচটি মহকুমা। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত নদিয়া, আগের পাঁচটি মহকুমার থেকে আড়াইটি মহকুমা

নিয়ে গঠিত হয়েছে। বাকী আড়াইখানা এখন বাংলাদেশভুক্ত। নদিয়ার সাহিত্য সাধনার আলোচনা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গভুক্ত নদিয়ায় কেন্দ্রীভূত থাকলেও ইতিহাসের খাতিরে প্রশাসনিক বেড়া ভাঙারও প্রয়োজন। সাহিত্য-সংস্কৃতির বেড়া ভিন্নরকম বলেই।

নদিয়ার সাহিত্য সাধনা বলতে অবশ্যই তা সীমাবদ্ধ থাকবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ভিতর। কারণ, নদিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতির আর একটি বিশেষ পরিচয় আছে। সেটা হচ্ছে, সংস্কৃতি সাহিত্য ও ভাষাচর্চার পরিচয়। এখানে সে প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে না।

নদিয়া জেলায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যচর্চার আদিপুরুষ কৃত্তিবাস ওঝা। বঙ্গভাষায় রামায়ণ পাঁচালি রচনা করে তিনি বাঙালির ঘরে স্মরণীয় পুরুষ। কৃত্তিবাসের নিবাস ছিল শান্তিপুরের নিকটবর্তী পল্লী ফুলিয়াতে। তিনি কোনও সময়ে ছিলেন, সেই সময়কাল আজও বিতর্কিত। বাঙলার কোনও শাসকের আমলে ছিলেন তাও মীমাংসিত নয়। কৃত্তিবাস-এর আত্মপরিচয় বিবরণে নবদ্বীপের উল্লেখ নেই। তিনি বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে লেখাপড়া বা উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন। এই তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর কালে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বঙ্গদেশে আগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ বঙ্গভাষাকে অশ্রদ্ধেয় অর্বাচীন ভাষা মনে করতেন। সংস্কৃতিকে বলতেন দেবভাষা। সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত বা লিখিত হওয়ার তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী এবং প্রতিবাদী। কৃত্তিবাসকে এই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি এবং মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস—দুজনেই নিন্দিত ছিলেন। গুররাজ খাঁ, মালাধর বসু বঙ্গভাষায় ভাগবত পুরাণ রচনা করেন, কিন্তু তাঁর নামে কোনও নিন্দা রচিত হয়নি। এর থেকে অনুমিত হয় যে, কৃত্তিবাসরাই প্রথম এই কাজ শুরু করেন। তাঁরাই পথিকৃৎ। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকিকে বলা হয় আদিকবি। সেইমত কৃত্তিবাসও বাঙলার আদিকবি। নদিয়া জেলার আদি সাহিত্য সাধক তো বটেই। বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করা সহজ কাজ ছিল না। প্রবলপ্রতাপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ বিরুদ্ধবাদী। তিনি সেই কঠিন কাজই করেছিলেন। সেটা সম্ভব হওয়ার পিছনে দুটো কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, তাঁর পারিবারিক বা বংশগত শক্তি। তিনি ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। 'তৎকালীন বাংলার শাসকের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।' দ্বিতীয় কারণ একদল ব্রাহ্মণ তাঁর পক্ষে ছিলেন। তাঁর পরিবার যে ধনশালী ছিল তা একটি বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়। তিনি রাজদরবারে শ্লোক পাঠ করলেন। রাজার পারিষদবর্গ বললেন, রাজা খুব খুশি হয়েছেন শ্লোক শুনে। আপনি যা পুরস্কার চাইবেন, রাজা তাই দেবেন। এর উত্তরে কৃত্তিবাস বললেন, 'কারও কিছু নাহি লই, গৌরবমাত্র সার।' এই উক্তিই প্রমাণ করে যে তিনি সম্পদশালী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। এই দুই কারণেই প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কাশীরাম দাস ও তিনি, দুজনেই নিন্দিত ছিলেন। বিরোধী পক্ষের বাঙলা ভাষায় ছড়া হচ্ছে :

কাশীদাস কৃত্তিবেসে
আর যত বামুন ঘেঁষে
এ তিন সর্বনেশে।

এঁরা সর্বনাশা কারণ বাঙলা ভাষায় মহাভারত-রামায়ণ রচনা করেছেন। আর সর্বনাশা হলেন সেই সব ব্রাহ্মণ যাঁরা এঁদের সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক। সংস্কৃতি ভাষায় এঁদের অভিসম্পাত দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কাজ যারা করেছে তাদের রৌরব নামক নরক বাস হবে। এ থেকেই বোঝা যায় কবিকে সেদিন কেমন প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছিল। গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' পুস্তিকায় একটি সংবাদ দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, কৃত্তিবাসের কন্যা 'অদত্তা বহির্গতা ইতি হানি !' এ সংবাদ চমকে দেবার মতো। সেকালে কৃত্তিবাস-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির ও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা কুমারী অবস্থায় গৃহত্যাগ করল ? সেকি স্বেচ্ছায় নাকি অপহৃতা—গভীর চক্রান্তের ফল ? যদি চক্রান্ত হয়, তবে সে কি কবির বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনার কারণে—প্রতিশোধ গ্রহণমূলক ঘটনা। কৃত্তিবাস ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। আত্মপরিচয়ে তিনি কুলগৌরব কথা অনেক লিখেছেন। এখন কন্যার কারণে তিনি কুলচ্যুত, ভঙ্গ হয়ে গেলেন। এটা তখন ছিল মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কঠিন শাস্তি। কবি সেই শাস্তি ভোগ করেছিলেন কন্যার কারণে না বঙ্গভাষা চর্চার কারণে ? রামায়ণ পাঁচালি থেকে জানা যায় তিনি এই পাঁচালি রচনা করেছিলেন, লোক বুঝাইতে। অর্থাৎ, বঙ্গভাষী জনসাধারণের মঙ্গলার্থে। অর্থাৎ, এ রচনা উদ্দেশ্যমূলক। সে উদ্দেশ্য মানবমঙ্গল। ইনিই নদিয়ায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যচর্চার আদিপুরুষ, পথিকৃৎ।

অদ্বৈত ও চৈতন্য আবির্ভূত হলেন নদিয়ায়। শান্তিপুর নবদ্বীপে। শুরু হল ভক্তি আন্দোলন। সেও ছিল রক্ষণশীল, অনুদার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের মানসিকতা ও আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদী আন্দোলন। নব্যস্মৃতির অনুশাসন যখন মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়েছিল, তখনই তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। অপমানিত জনসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সংঘবদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে। তাতে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল। ফলে, কাব্যিক ভাষায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়'। কৃত্তিবাস কাশীরাম যেমন নিন্দিত হয়েছিলেন, এঁদের প্রতিও তেমনই নিন্দা বর্ষিত হয়েছিল। চৈতন্য ভাগবতে তার বিবরণ আছে। যেমন :

এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক না।
ইহা সবা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।

এর পর আছে কুৎসা। চৈতন্য ছিলেন আন্দোলনের নেতা। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের চক্রান্তে তাঁকে সন্ন্যাস নিতে হল। তিনি বাধ্য হলেন আন্দোলন ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে পুরীতে চলে যেতে। একে বাস্তব দৃষ্টিতে বলা যায়, নির্বাসিতের জীবন। স্বেচ্ছা নির্বাসন। কৃত্তিবাসকে মনে পড়ে। নিগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকট এখানে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ, স্মরণীয় ঘটনা এটা। এই মহাজীবনকে নিয়েই রচিত হল বঙ্গভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবত'। সেটা রচিত হল নবদ্বীপে। রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। বাঙলার বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি আকরগ্রন্থ। সাধারণ সামাজিক ইতিহাসেও এর মূল্য অপরিসীম।

নদিয়া রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ররায় তাঁর রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে,

নদিয়ায় বঙ্গভাষার চর্চা নেই। বাঙলা ভাষার মান এখানে অতি নিকৃষ্ট। এর একটা কারণও তিনি দেখিয়েছেন। নদিয়ার রাজারা সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও তার উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থদান করেছেন, পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার জন্য কিছুই করেননি কথা সত্য। তার কারণও আছে। এই রাজারা ছিলেন রক্ষণশীল। এঁরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কৃত্তিবাস-বিরোধী চৈতন্য-বিরোধী ব্রাহ্মণ সমাজের। স্বভাবতই বঙ্গভাষার প্রতি এঁদের ছিল বিমাতৃসুলভ আচরণ। 'ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত' থেকেই জানা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের সন্তানেরা বাড়িতেও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেছেন যে, ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে বঙ্গভাষা চর্চার প্রসার ঘটেছিল, সেখানে বঙ্গভাষা উন্নত হয়েছে। ভাগীরথীর পূর্বে নদিয়া অঞ্চলে বঙ্গভাষার কোনও উন্নতিই ঘটেনি। খুবই নিকৃষ্টাবস্থা। এই ঘটনারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে। জনসাধারণের উদ্দেশেই বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। তখন সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা ছিল পালি। বুদ্ধ তাই তাঁর ধর্মপ্রচারের ভাষা হিসাবে পালিকেই গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যের ভক্তি প্রচারও ছিল সাধারণের মধ্যে। জনসাধারণের ভাষা ছিল বাঙলা। তাই চৈতন্যবাদীরা বঙ্গভাষাকেই ব্যবহার করেছিলেন। ফলে বঙ্গভাষা চর্চার, বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনার জোয়ার এসেছিল। কিন্তু নদিয়ার রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী শাক্ত এবং চৈতন্যবিদ্বেষী, তাঁর আন্দোলনের বিরোধী। সে বিরোধিতা ছিল প্রত্যক্ষভাবেই। তাঁরা তাঁদের রাজ্য মধ্যে চৈতন্যধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন। চৈতন্যধর্মের প্রসার ঘটাতে দেননি। বিপরীতে সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। এর ফলেই ভাগীরথীর পূর্বতীরে নদিয়ায়, বঙ্গভাষা চর্চার সুযোগ ঘটেনি।

কিন্তু ঘটনাচক্র এমনই যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাকবি করলেন বঙ্গভাষা চর্চাকারী ভারতচন্দ্র রায়কে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গভাষা-বিরোধী ছিলেন একথা বলা যাবে না। তিনি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ভারতচন্দ্র নদিয়াবাসী নন। তিনি হুগলি, হাওড়া অঞ্চলের মানুষ। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সেখানেই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছিলেন, তাও নয়। এমন একটা যোগাযোগ ঘটেছিল, যার জন্য মহারাজা একজন শিক্ষিত বেকারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর প্রধান গুণ ছিল কাব্য প্রতিভা। মহারাজা তাই তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাসোহারা দিয়ে কাব্য রচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করেছিলেন। তাই বলা যায় এটা নিতান্তই যোগাযোগ, ঘটনাচক্র। হুগলির মানুষ ভারতচন্দ্র অসাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী হয়েও স্বভূমিতে এতকাল আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারেনি। জীবনের চল্লিশটা বছর ধরে ছুটে বেড়িয়েছেন বিপন্ন দশায়। বর্ধমান রাজের কারাগারে বন্দি হয়েছেন, কারাগার থেকে গোপনে পালিয়ে ওড়িশায় গিয়ে পরানুগ্রহে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী জীবন কাটিয়েছেন দীর্ঘকাল। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। সংসার করা যায়নি। ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ শিক্ষিত হয়েও বেকারত্ব ঘোচেনি। শেষে নদিয়ায় আশ্রয় পেলেন। কৃষ্ণনগরে বসে রচনা করলেন বাঙলা ভাষার নিদর্শনস্বরূপ কাব্য—অমর

লালন বেদী ॥ কদমখালি ছবি : প্রকাশ চক্রবর্তী

সৃষ্টি। কবির রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' জনপ্রিয় হয়েছিল বেশি। তার কারণ ভিন্ন। সে রচনা রসোত্তীর্ণ হলেও। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। বাঙলার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য পর্যায়ের শেষ গ্রন্থ এই অন্নদামঙ্গলকাব্য। যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণাক্রান্ত। ভাষা, বিষয়, চরিত্র-বিন্যাস-রচনাভঙ্গি—সর্বত্রই নাগরিকতার পরিচয়। মঙ্গলকাব্যের সেই ধর্মীয় বিশ্বাসও এখানে শিথিল। অথচ মঙ্গলকাব্য। সেই রীতিতে রচিত। কবিমনের আবেগহীন বিদগ্ধতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই কাব্য। তাই কবি ভারতচন্দ্রই মধ্যযুগের সীমানায় দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবি। তাই তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসাবে চিহ্নিত।

এই সময়েই হালিশহরের সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হালিশহর তখন নদিয়ারাজের অধিকারে। হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটা আজও নদিয়া জেলাভুক্ত। রামপ্রসাদ কালীসাধক, শাক্ত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাই। মহারাজা রামপ্রসাদকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তাঁর সভাসদ হতে। রামপ্রসাদ ওই সব বন্ধনের মধ্যে থাকার মানুষ ছিলেন না। তিনি সম্মত হননি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নদিয়া ছিল বঙ্গদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। চৈতন্য আমলেও তাই ছিল। নবদ্বীপের জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের প্রভাব থেকে জনগণকে সরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়েছিল চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন। ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত করতে চেয়েছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদিয়া সংস্কৃতি আবার জ্ঞানবাদের ধ্বজা উড়িয়েছিল। সেই সঙ্গে বৈষ্ণবতার পরিবর্তে শাক্তাচারের হাওয়া বইছে। তখন শাক্ত চিন্তাই প্রধান। বুঝি সেই যুগ প্রভাবেই রামপ্রসাদের আবির্ভাব। কিন্তু

মজার কথা, তিনি জ্ঞানবাদী নন। চৈতন্যের মতো ভক্তি পথেরই মানুষ। সেই ভাবাবেগ মত্ততা তাঁর গানে সেই আবেগময় ভক্তির প্রকাশ। যে সংগীত আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত। বাংলার শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভক্তি রসাপ্লুত রামপ্রসাদ বাস্তব সচেতনতার যে প্রমাণ রেখেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। 'মা আমায় ঘুরাবি কত

কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত'

কিংবা 'মানবজনম রইল পতিত

আবাদ করলে ফলত সোনা।'

এই সব পংক্তির তাৎপর্য দূরপ্রসারী। চোখ বাঁধা বলদের মতো ঘুরপাক খাওয়া ভক্ত, অভক্ত—সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। গতানুগতিক জীবনধারার গ্লানিময় ব্যর্থতার কথা। এর হাত থেকে উত্তরণ চাওয়া মানবসভ্যতারই বাসনা। 'চরৈবেতি' সূত্রের সঙ্গে যুক্ত। অথচ কবি কতো সহজভাবে এ কথা বলেছেন। এই রকমই 'মানবজনম রইল পতিত'। অসামান্য এই বক্তব্য। এমন কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে। রামপ্রসাদের আবির্ভাব যেন রামকৃষ্ণের আগমনবার্তা বা প্রস্তুতি পর্ব। ভাববাদী বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্য আর ভাববাদী শাক্ত ভক্ত রামপ্রসাদ। ভাববাদ নদিয়া সংস্কৃতিতে এক আশ্চর্য মিলনের বাতাবরণের স্রষ্টা। ভক্তি ও ভক্তই প্রধান। নদিয়ার সাহিত্য ভাণ্ডারে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে যুক্ত হল রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত।

পলাশীর যুদ্ধ হল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। সেও হল এই নদিয়ার সীমানাতেই। অবশ্য এ যুদ্ধ ছিল নদিয়ার সঙ্গে সংস্রবহীন। তবু এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। বখতিয়ারের আক্রমণও ঘটেছিল এই নদিয়ায়। বখতিয়ারের আক্রমণের ফলে পাঠান শাসন এসেছিল বঙ্গদেশে। পলাশীর যুদ্ধের পর এল ইংরেজ শাসন। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। তেমনই বাঙলার সাহিত্য সাধনারও মোড় ফেরে।

এ থেকেই বলা যায়, নদিয়া বঙ্গ জনসমাজে যেমন সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলেছে, তেমনই বঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও ঘটিয়েছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে তার দ্বারা।

এবার শিক্ষা-সংস্কৃতি এমনকি ধর্ম আন্দোলনেরও কেন্দ্র হল কলকাতা। বঙ্গ ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায়ে সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নদিয়ার কোন ভূমিকা দাঁড়াল, সেটাই আলোচ্য।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিও শিক্ষার সংস্পর্শে আসা কলকাতার বাঙালি সমাজ যেন নতুনভাবে মাথা তুলল। শুরু হল নব্য ভঙ্গি ও চরিত্রের সাহিত্য চর্চা। সাংবাদিকতায় অনুপ্রবেশ ঘটল। নানা পত্র-পত্রিকা জন্ম নিল। তার ভিতর, বাঙলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে বিশেষভাবে 'পরিচিত সংবাদ প্রভাকর', সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৈতৃক নিবাস ছিল নদিয়ার কাঞ্চনপল্লী। কিন্তু বাস করেছেন নদিয়ার বাইরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁর নাম আসবেই। তিনি শুধু লেখক সাংবাদিকই ছিলেন না। তিনি ভবিষ্যতের অনেক সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুই ভাবশিষ্য হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এরা প্রথম জীবনে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখে হাত মক্সো করেছিলেন। এঁদের ভিতর দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন নদিয়াবাসী। তাঁর বাড়ি ছিল বনগাঁর কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে। তখন যশোহর ছিল নদিয়াভুক্ত।

শান্তিপুরের নিকটবর্তী গ্রাম বাগআঁচড়া। তখন সমৃদ্ধ পল্লী। বহু শিক্ষিতজনের বাস। অনেক কৃতিব্যক্তির জন্ম বা পৈতৃক নিবাস এখানে। বিশিষ্ট অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরির বাড়ি এখানে। অহীন্দ্র চৌধুরি সাহিত্যসেবাও করেছেন। সুভাষচন্দ্রের সুহৃদ, একদা রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক হেমন্তকুমার সরকারের পৈতৃক বাসভূমি এই পল্লী। এই পল্লীরই মানুষ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁর রচিত সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। তখনও বঙ্কিমের উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তাই বাঙলা সাহিত্যের গবেষক পণ্ডিতদের মতে 'স্বর্ণলতা'-ই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা শুরু করলেন। সেজন্য তিনি নিজে গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন সহপাঠী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি শিশুপাঠ্য পদ্য রচনা করতে লাগলেন। তাঁর রচিত পদ্য :

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।'

একদা এই পদ্য সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মদনমোহনের বাড়ি ছিল নদিয়ায়, কৃষ্ণনগরের কাছে 'বিল্ব গ্রাম' পল্লীতে। বিদ্যাসাগর সেখানে একটি পাঠশালাও স্থাপন করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ ঘনিষ্ঠজন ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। এই রামতনু লাহিড়ী উনিশ শতকের বাঙলার স্মরণীয় পুরুষ। নদিয়ারাজের দেওয়ান রাধাকান্ত রায়-এর দৌহিত্র। নিবাস কৃষ্ণনগর। এঁর মামাতো ভাই কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। ইনিও রাজার দেওয়ান হয়েছিলেন। ইনি কলকাতায় কিছুকাল পড়েছিলেন। সে সময় রামতনুর বাসায় থাকতেন। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু। রামতনুর প্রভাবেই তিনি হয়েছিলন আধুনিক মনের মানুষ। কৃষ্ণনগরের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এঁর অবদান অনেক। ইনিই লিখেছেন, নদিয়ায় বঙ্গভাষার নিকৃষ্টাবস্থা। এরপর তিনি নিজেই বাঙলা ভাষার চর্চা শুরু করেন। ইনি মূলত ছিলেন উন্নতমানের গায়ক এবং কিন্নর কণ্ঠ। তাঁর গান শোনার জন্য কৃষ্ণনগর আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন। তখন বঙ্গভাষায় রুচিসম্মত গানের অভাব ছিল। তাই তিনি নিজেই গীত রচনা করে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গদ্য রচনাও ছিল চমৎকার। তাঁর রচিত দুখানি গদ্যগ্রন্থ—'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত এবং দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত' জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। তিনি মূলত সঙ্গীত সাধক। তাঁর এই সঙ্গীত প্রেম বুঝি রক্তধারায় মিশেছিল। তাই পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও পৌত্র দিলীপকুমার রায়ের ভিতর দিয়ে বুঝি একটি ঘরানা গড়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকী কলকাতায় যখন নানা ধর্মান্দোলন চলছে, কৃষ্ণনগরে যখন কার্তিকেয়চন্দ্র রায় আধুনিককালের যোগ্য রুচিসম্মত বাঙলা গান রচনায় রত, নদিয়া জেলায় গ্রামাঞ্চল তখন

গুণগ্রাহীদের সঙ্গে বিভূতিভূষণ। কৃষ্ণনগর — তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

নতুন ধারার বাংলা গানে গানে মুখরিত। ভাবে ভাষায় সুরে—অনন্য সে গীতধারা। সে গানের ভিতর দিয়ে আকাশে-বাতাসে মাঠে-ঘাটে, পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের প্রাণের আকুতি—'কোথায় পাব তারে—আমার মনের মানুষ যে রে'। সবই ভাবের গান। মানুষের মনকে আলোকিত করার মতো গান। একটি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এই সব গানের উদ্ভব। লালন শাহী, বলরামী, সাহেব ধনী, খুশি বিশ্বাসী ইত্যাদি গৌণধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত গীতিকার এ গায়কদের গান এসব। এটা নদিয়া জনসমাজের আর এক প্রতিবাদী সংস্কৃতির কথা। চৈতন্যের ভক্তিবাদী আন্দোলনের মানবতাবাদী উদারতায় এঁরা আকৃষ্ট ও আশান্বিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থার নিপীড়ন থেকে এবার বুঝি নিষ্কৃতি মিলবে। তা মেলেনি। চৈতন্য ব্যর্থ হয়েছেন। নবদ্বীপ ছেড়ে, আন্দোলন ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। বিরোধী শক্তি সে আন্দোলনকে রুখে দিয়েছে। ওঁরা আশাহত হয়ে নিরুপায় অসহায় জীবন নিয়ে মরমে মরে ছিলেন। সুযোগ এসে গেল ইংরেজ শক্তি আসায়। নদিয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা শক্তিহারা, নবাবের পরাজয়ে মুসলমান মৌলবীরা দিশাহারা। এই দুই মৌলবাদী শক্তির সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে নিম্নবর্গীয় নিপীড়িত দুর্বল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে সংঘ গড়ে তাঁদের মনের কথা মুখ ফুটে বলতে শুরু করেছেন ওই সব গানের ভিতর দিয়ে। এঁদের শাস্ত্র ছিল না। গান ছিল। গানই শাস্ত্র। এঁদের অনেকে চৈতন্যকেই মনের মানুষ ভাবতেন, গানে তার ইঙ্গিত মেলে।

> "সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে
> নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে
> করলেন এক চেটে—
> সে এক মানলাম না।
> তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু
> জেনেও বিশ্বাস করলাম না।"

কুবির গোঁসাই 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' গ্রন্থে এই উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক সুধীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন। "শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে বড় উপহার এই ব্রাত্য ধর্মের জাগরণী।" (পৃ. ৫৮)

এই সম্প্রদায়গুলির গান বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে আছে গান-পদ। যাকে আজ বলা হয় পদাবলী সাহিত্য। এ গানও তেমনই বাঙলা সাহিত্যের মূল্যবান অংশ। এই সঙ্গীতধারার কথা উল্লেখ না করলে নদিয়ার সাহিত্য সাধনার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সব অগণিত অনেকে আজও অখ্যাত অথচ বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী কবি গীতিকারদের কথা স্মরণ করতেই হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদের মতোই এঁরাও সাধক কবি। সর্বাধিক প্রচারিত নাম লালন শাহ, আর গগন হরকরা। সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট গীতিকার সাধক কুবির গোঁসাই এবং তাঁর শিষ্য জাদুবিন্দু। বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই সম্প্রদায়গুলির অবদানের কথা আজ নতুনভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজন। 'পায়খানায় যাবার পথ' বলে পিছন ফিরে থাকলে সেটা হয়ে থাকবে জাতীয় ক্ষতি। কলকাতায় যখন উনিশ শতকী নানা আন্দোলন চলেছে, কৃষ্ণনগরে রামতনু লাহিড়ী বিধবা বিবাহ আন্দোলন, কুসংস্কার দূরীকরণ ও আধুনিক বা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন নিয়ে ব্যস্ত, দেওয়ান কার্তিকেয় সঙ্গীত সাধনায় রত, তখন নদিয়া যশোহর অঞ্চলের গ্রাম সমাজের মানুষের ঘরে আগুন জ্বলছে। কৃষি বিপন্ন, কৃষক বিপন্ন, কৃষক পরিবার—নারী-পুরুষ-শিশু—অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত। সেখানে বুভুক্ষা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, মৃত্যু—নিত্য ঘটনা। নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় অত্যাচার চলেছে অবাধে। কৃষক কারারুদ্ধ হচ্ছে দলে দলে—কেউ সাহেবদের বশ্যতা স্বীকার না করায়—কেউ সাহেবদের নানা চক্রান্তের শিকার হয়ে। শহর সভ্যতা প্রায় মুখ ফিরিয়ে উদাসীন ছিল। এতো বড় সর্বনাশা ঘটনা সেখানে তেমন আলোড়ন তোলেনি। সে আলোড়ন উঠল

আঠারশ' ষাট সালের পর, যখন নিপীড়িত গ্রামবাসী-কৃষক সমাজের বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে মরণপণ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সাহেবদের পর্যুদস্ত করে ফেললেন আর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক রচিত হয়ে কলকাতার মঞ্চে অভিনীত হতে থাকল এবং 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক হিসাবে রেভারেন্ড জেমস লং-এর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আদালতে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। তখন শহরে ছড়া প্রকাশ পেল :

নীলবাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ ম'লো লঙের হল কারাগার

এর আগে কলকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় কিছু তরুণ এবং সহৃদয় ব্যক্তির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ নির্ভর হয়ে একাই লড়ে যাচ্ছিলেন নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর কবি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর লেখনী শানাচ্ছিলেন। তিনি তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন। ডাকঘরের কর্মী-ইন্সপেক্টর পদে।

চাকরি সূত্রে তাঁকে নদিয়া যশোহরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হত। ফলে কৃষকদের ওপর নীলকরের অত্যাচার তাঁর কাছে আর শোনা কথা ছিল না। তাঁর বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে অত্যাচারী নীলকরদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করে। বঙ্কিম এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করেননি। দীনবন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। প্রত্যক্ষ প্রতিবিধানের সাধ্য তাঁর ছিল না। তিনি লেখনী ধারণ করলেন। আঠারোশ' ষাট সালে নীল বিদ্রোহ ঘটল। সেই বছরেই দীনবন্ধু এক বছরের জন্য ঢাকায় বদলি হলেন। আর সেখানে গিয়ে ছাপা হল তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক। কাহিনীর পটভূমি এই নদিয়া। তার কৃষক সমাজ। সমগ্র বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী পল্লী চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস আর পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস।

দীনবন্ধুর নাটকের কুশীলব বাস্তব চরিত্রেরই রকমফের। এমনকি যে 'ক্ষেত্রমণি' নাটকের বিশিষ্ট চরিত্র—যার ওপর নীলকরের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে কলকাতার দর্শক উত্তেজিত হয়েছিলেন—সেই ক্ষেত্রমণিকেও বাস্তব থেকে নেওয়া। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের গৃহবধূ। মাধুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ, প্রকৃত নাম হরমণি কিংবা হারামণি। কুঠিয়ালরা তাঁকে অপহরণ করেছিল। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে কৃষ্ণনগরের আদালতে হাজির করেছিল। নদিয়ার সাহিত্য সাধনার এটা বোধহয় একটা বিশেষ দিক। এখানে সমাজ ও সাহিত্য প্রায়শঃই একাকার। সাহিত্য সমাজের দর্পণ—কথাটা এখানে যেন বড়ই প্রকট। বহিরাগত কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও পাঠান যুগ, মোগল যুগ, নবাব যুগের নদিয়ার নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা আশ্রয়প্রাপ্ত।

'নীলদর্পণ' বাংলার নাট্য সাহিত্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত নাটক। নীলকরই তো কৃষকের একমাত্র শত্রু নয়। প্রধান এবং স্থায়ী শত্রু জমিদার। এই জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল এবার। কুষ্টিয়া তখন নদিয়া জেলাভুক্ত। সেখানে কুমারখালি একটি সমৃদ্ধ পল্লী, একটি বাণিজ্য কেন্দ্র তখন। সেখানকার মানুষ হরিনাথ কুমার মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটি স্মরণীয় নাম। নদিয়ার সাহিত্য সাধনায় বলা যায়, তিনি নিজেই একটি অধ্যায়। তিনি কর্মী, সাংবাদিক, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সাহিত্য সাধক, গীতিকার এবং নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। স্বশিক্ষিত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন শুরু। তবু জীবনপথে নির্ভীক যাত্রী। বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা এক বিশিষ্ট পত্রিকা হিসাবে পরিচিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর-এ যেমন বঙ্কিম, দীনবন্ধুর সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি, 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়' তেমনই মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্য সাধকরা প্রথম জীবনে লিখতেন। এঁরা সকলেই হরিনাথ কুমার-এর ভাবশিষ্য। সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ও হরিনাথের ভাবশিষ্য বলে দাবি করতেন, হরিনাথ ছিলেন কৃষকপ্রেমী। জমিদারকে শোষক বলেই মনে করতেন, জীবনের অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই। জমিদারের সেই অত্যাচারের কথা তিনি তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করতেন। হরিনাথ দরিদ্র সাধারণ মানুষ। জমিদার সর্বদাই প্রবল প্রতাপশালী। তাঁর অঞ্চলের জমিদার তখন ঠাকুর পরিবার। অর্থাৎ, রবীন্দ্র পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সে সূত্রে শিলাইদহে ছিলেন। যেই ঠাকুর জমিদারের বিরুদ্ধেই প্রজাপীড়নের অভিযোগ। সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। হরিনাথ মজুমদারের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল। জমিদারের অবাঙালি লাঠিয়াল আক্রমণ করবে। সেই দুঃসময়ে হরিনাথের পাশে ধনী শিক্ষিতজন কেউ দাঁড়াননি সেদিন তাঁর পাশে এসে লাঠি হাতে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বাঙলার আর-এক স্মরণীয় কবি। তিনি লালন শাহ। লালন কবির এবং তাঁর কৃষিজীবী শিষ্যবর্গ। তাঁরা হরিনাথকে লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে রেখেছিলেন। আজকের দিনে যাঁরা একতারা হাতে লালন ফকিরকে জানেন, তাঁদের কাছে এটা অবশ্যই চমকপ্রদ সংবাদ। কিন্তু বাস্তব ঘটনা। এই শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে, জীবনে জীবন যোগ করে তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তা 'শৌখিন মজদুরি' নয় বলে আজও গুরুত্বসহকারে আলোচনার যোগ্য। তবে সকল সৃষ্টিই যে রসোত্তীর্ণ হবে, এমন কথা বলা যায় না, ইতিহাস হয় অবশ্যই। হরিনাথের ভাবশিষ্য মীর মশাররফ হোসেন। খানদানী মুসলমান জমিদার পরিবারের সন্তান। বংশে তিনিই প্রথম বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন এবং সেই ভাষারই সেবা করেন। অনেক গ্রন্থই রচনা করেছেন। আত্মজীবনীও আছে। তাঁর 'বিবাদ সিন্ধু' একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রচনা করেছিলেন নাটক। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ-এর অনুকরণে গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'জমিদার দর্পণ'। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইতিহাস কেন্দ্রিক কাহিনী নাটক রচনা করেছেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' সৃষ্টি তাঁর বিশেষ কীর্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত সাময়িক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন জলধর সেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর বাড়ি মেহেরপুর। তিনি মাসিক 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসাবে খ্যাতি পেলেও, তাঁর মৌলিক রচনা বিশেষত প্রবন্ধ সাহিত্য বিশেষ মূল্যবান।

উনিশ শতকের নদিয়ায় অনেক সাহিত্যসাধকই ছিলেন। তার ভিতর সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কৃষ্ণনগরে জন্ম। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্র। তিনি লালিত হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। কিন্তু সাহিত্যসাধক ক্ষেত্র কৃষ্ণনগর বা নদিয়া নয়। কর্মসূত্রে তাঁকে বাইরে কাটাতে হয়েছে। শেষ জীবন কেটেছে কলকাতায়। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তিনি পুনর্বিবাহিতা বালবিধবার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, এই অপরাধে কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত বা এক ঘরে করেছিল। তিনিও কৃষ্ণনগর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে শ্লেষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার ভিতর দিয়ে তাঁর বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ। দেশে তখন জাতীয়তাবাদের হাওয়া। তাঁর সাহিত্যে সেই জাতীয়তাবাদী ভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর গানে, তাঁর নাটকে তারই প্রকাশ। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করলেও তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, পিতার প্রভাব সাহিত্য সাধনার পথে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত সংগীত রচনার ক্ষেত্রে। তিনিও সুগায়ক ছিলেন। তিনি বিলাত ফেরত। বিলাতে তিনি সে দেশের গানের সুর এবং নাট্যচিন্তা বিষয়ে ধারণা অর্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে, তিনি বাংলা গান রচনা করেন—যা আজ দ্বিজেন্দ্রসংগীত নামে পরিচিত। নাটকেও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। নাটক এবং সংগীতে জাতীয় গৌরব কথা তুলে ধরতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উনিশ'শ পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতাকে গানে গানে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। দুজনেই পথে নেমে স্বরচিত গান গেয়ে জনমানসকে আন্দোলনের পক্ষে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবেই গৃহীত। জাতীয়তাবাদী কবি হিসাবে নজরুল ইসলামও চিহ্নিত।

উনিশ'শ ছাব্বিশ সালে তিনি কৃষ্ণনগরে এলেন বাস করতে। শহরবাসী এবং যুবকবৃন্দ তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তিনবছর ছিলেন কৃষ্ণনগরে। যখন এলেন, তখন তাঁর পরিচয় বিদ্রোহী কবি। যখন গেলেন, তখন মরমী কবি। এ শহরে অবস্থানকালে তিনি রচনা করেছেন কাণ্ডারি হুঁশিয়ার বিখ্যাত সংগীত, 'দারিদ্র্য' কবিতা। তারপর আশ্চর্যজনকভাবে তিনি নদিয়ার সাহিত্যসাধনার যে ধারা দেখানো হয়েছে এতক্ষণ—সেই ধারাতেই জনজীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। শহরের একটি ক্ষুদ্র অবহেলিত সমস্যাজর্জর পল্লীর জনজীবনকে অবলম্বন করে রচনা করলেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে কাহিনীতে। এই সঙ্গে স্থান পেয়েছে কৃষ্ণনগর তথা নদিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা ইত্যাদি ঠাঁই পেয়েছে সেখানে। এর পর তিনি লিখতে থাকলেন বাংলা ভাষায় গজল গান। এর ভিতর দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন মরমী কবি।

নদিয়ায় এই জাতীয়তাবাদী ধারার শেষ কবি সম্ভবত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক পত্রিকা সম্পাদক, সেই সঙ্গে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী, সংগঠক এবং কারাবরণকারী। এক সময়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরে একাধিক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে প্রথম দিকের

দিলীপকুমার রায়

আলোচকদের ভিতর তিনি একজন। তাঁর সমালোচনা পড়ে খুশি হওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক পত্রে তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি বিদ্যালয়, পাঠাগার স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় কবি—চারণকবি। তিনি চারণের দল গড়েছিলেন। স্বরচিত গান গেয়ে দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, জনজাগরণ ঘটাতে। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভিতর 'সবহারাদের গান' সুপরিচিত। শেষ জীবনে তিনি বড় বান্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন। পরলোক গমন করেছেন স্বাধীনোত্তরকালে।

নদিয়া জেলার সাহিত্য সাধনার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারার কথা আলোচিত হল। এটাই সব নয়।

॥ ২ ॥

নদিয়ার সকলপ্রান্তেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছে সেই উনিশ শতকেই। নানাভাবে, নানা বিষয়ে সৃষ্টির ঢল নেমেছিল। লেখক পঞ্জিতে তার হদিস ও প্রমাণ মেলে।

কলকাতায় একদা 'সাহিত্য' নামক পত্রিকার খ্যাতি ছিল। তার সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র। তাঁর বাড়ি ছিল রানাঘাটের কাছে আঁইশতলা গ্রামে। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন চন্দ্রশেখর কর। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণী পল্লীতে। পেশায় তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। কুমারখালির হরিনাথকুমার মজুমদারের তিনিও একজন ভাবশিষ্য ছিলেন। তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতেন।

ওই সাহিত্য পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যাতায়াত করতেন চন্দ্রশেখর করের বাড়িতে। সে বাড়িতে এখন শহরের দমকল দপ্তর।

কলকাতার কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল। পত্রিকাটির নাম 'সবুজপত্র'। তাঁর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ চৌধুরী। বঙ্গসাহিত্যে তিনি 'বীরবল' নামে পরিচিত। এঁর স্কুল জীবন কেটেছিল কৃষ্ণনগরে। এঁর বড়দাদা আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু। পরে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শেষে দাদার জামাই। প্রমথনাথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন। এই প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন যে কৃষ্ণনগর তাঁর মুখে ভাষা দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে যে ভাষা এবং ভাষার যে চাল—তার জন্য তিনি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। অর্থাৎ একালের সাহিত্যের যে ভাষা—তা কৃষ্ণনগর শান্তিপুরের ভাষা থেকেই এসেছে। এই প্রমথ চৌধুরীর ভাগ্নী কবি প্রিয়ংবদা দেবী। কৃষ্ণনগরেই তার প্রাথমিক শিক্ষালাভ। বিয়ে হয়েছিল নদিয়ার মুড়াগাছায়। সেকালের আর-একজন কবি কামিনী রায় ও কৃষ্ণনগরে ছিলেন অনেককাল। কামিনী রায়ের বিয়েও হয়েছিল এই শহরে থাকতেই। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ। তাঁর নাম চণ্ডীচরণ সেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। গল্প-উপন্যাস লিখতেন। কৃষ্ণনগরে থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী। তিনি একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, হিন্দুবিধবার নিরানব্বইজন অসতী। এতে সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন আর একজন বাকি থাকল কেন ? কৃষ্ণনগরে তখন ব্রাহ্মসমাজের রমরমা। চণ্ডীচরণ সেন, নিশ্চিত মনে সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' নদিয়ার একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এই লেখকের নাম রাজশেখর বসু। ছদ্মনাম 'পরশুরাম'। বাঙলা সাহিত্যে পরশুরাম-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এর বাড়ি রানাঘাটের কাছে বীরনগর (উলা) শহরে। শহর এই কারণে যে এখানে পুরসভা আছে। এঁর দাদা গিরীন্দ্রশেখর বসু। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের ভিতর দুজন ছিলেন নদিয়াবাসী। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী। করুণানিধানের বাড়ি শান্তিপুর, যতীন্দ্রমোহনের বাড়ি বাগচী সমশেরপুর। যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় বাস করতেন। কিন্তু পল্লীর প্রতি ছিল তাঁর নিবিড় মমতা। তাঁর কাব্যে পল্লী যেন জীবন্ত। তাঁর অতি জনপ্রিয় কবিতা—'কাজলা দিদি'। দেশের স্বাধীনতা লাভের সামান্য আগে তিনি পরলোক গমন করেন।

করুণানিধান চাকরি সূত্রে কলকাতায় থাকতেন। শেষজীবনে শান্তিপুরে থাকতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী, শান্তরসের কবি। তাঁর কাব্যসংকলনের নাম 'শতনরী'। স্বাধীনোত্তরকালে তিনি পরলোক গমন করেন।

ওই সময়েরই নদিয়ার আর এক কবির নাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শান্তিপুরের পাশে হরিপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের কালে জন্মেও তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত কবি। বস্তুবাদী কবি হিসাবে বঙ্গ সাহিত্যে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। তিনি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম জীবনে তিনি নদিয়া জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন। সেই সময়েই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন :

"মরীচিকা চাহি জীবন জুড়াব
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখি"

কাব্যগ্রন্থ তাঁকে নিজের খরচেই ছাপতে হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হেমন্তকুমার সরকার। এই কালে ফুলিয়াতে কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। তার আবরণ উন্মোচন করেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাইকেলে কৃষ্ণনগর থেকে ফুলিয়া গিয়েছিলেন। সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র রাজনৈতিক নেতা হয়েছিলেন। একটি কন্যার মৃত্যু হলে যতীন্দ্রনাথ এই চাকরি ছেড়ে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করেন। পরে বহরমপুরবাসী হন। বস্তুবাদী এই কবি মানুষের সমাজ সংসার ও জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন তার কাব্যে। ভাবের ঘোরে নয়, বাস্তব দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গে শরৎ' কবিতার প্যারোডি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎকালের বঙ্গপল্লীর একটি মধুর স্বপ্নরঙিন রূপ এঁকেছেন। লিখেইছেন, 'আজি কি তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে।' যতীন্দ্রনাথ সেখানে 'মধু'র স্থানে 'বিধুর' মূর্তি দেখছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে কবির চোখে ধরা পড়ছে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট অসহায় পল্লীর রূপ। দেখছেন, ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মানুষ মারা যাচ্ছে গ্রাম জনশূন্য হচ্ছে। তাই তিনি লিখেছেন—'পেটে পেটে পিলে ধরে না'ক আর, বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।' তাই রবীন্দ্র সেখানে লিখেছেন, 'এখানে কোয়েল ডাকিছে দোয়েল তোমার কানন সভাতে"। যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এখানে শেয়াল গাহিছে খেয়াল তোমার বিজন সভাতে" মানুষের সংসারে একদিকে ধনৈশ্বর্য অন্যদিকে নিঃসীম দারিদ্র্য। ঈশ্বর কি পক্ষপাতহীন, কবি লিখেছেন : "চেরাপুঞ্জী থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পা'র গোবি সাহারার বুকে।" মানুষের চরম বিপন্নতার রূপ কতো সুন্দর কাব্যময় হয়ে উঠেছে কবির হাতে। "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে সূর্য রক্তবমন করে।" চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন থেকে কবি যতীন্দ্রনাথের এই কাব্যচিন্তা পর্যন্ত লক্ষ করলে নদিয়া সাহিত্য ধারা কীভাবে বহে চলেছে তা অনুধাবন করা সহজ হয়। নদিয়ায় কবি আরও অনেকজনই ছিলেন। এই কালেই ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ি ছিল চুয়াডাঙা মহকুমায় দর্শনার নিকটবর্তী গ্রাম 'লোকনাথপুর'-এ।

একালের বর্ষীয়ান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িও ওইখানে। লোকনাথপুর ও জয়রামপুর সংলগ্ন গ্রাম। ওই জয়রামপুর গ্রামের জানকী ঘোষালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর। ওঁদের কন্যা সরলাদেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'য় পাওয়া যাবে জয়রামপুরের কথা। জয়রামপুরের খেজুর গুড়, তাঁদের বাগানের কাঁঠাল আর পিতামহ

সাজাহান

(নাটক)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসর্গ

মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল

জয়রামপুরবাসী জয়নারায়ণ ঘোষালের কথা কত গভীর মমতার সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের বড়দিদির বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের কাছে দিগনগর গ্রামে। তাঁদের ছেলে সত্যপ্রসাদ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন ক্ষুদে মামা বলে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এঁর অবদান কম নয়। ইনিই রবীন্দ্রনাথকে পদ্য লেখার প্রাথমিক কৌশল শিখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নৌকাযোগে এই দিদির বাড়ি আসার কালেই শান্তিপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে তার বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, বঙ্গ সাহিত্যে বিশ্বকবির শিলাইদহ পর্ব বহু আলোচিত। কবি সেখান থেকে 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ফসল তুলেছেন তাঁর 'সোনার তরীতে'। কলকাতায় কল্লোল গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কবি হয়ে উঠেছিলেন হেমচন্দ্র বাগচী। তাঁর বাড়ি ছিল নদিয়ার গ্রামে। তিনি কলকাতার পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শেষ জীবনে কৃষ্ণনগরের ঘূর্নি পল্লীতে থাকতেন। কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেকালের সুপরিচিত সাহিত্য সাধক শান্তিপুরের নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এই শান্তিপুরে বহু সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। বঙ্কিমের কালে দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি অনেকটা বঙ্কিমকে ভাঙিয়েই কাহিনী রচনা করতেন। যেমন তাঁর গ্রন্থের নাম—মৃন্ময়ী, বিমলা। বিষবৃক্ষের স্থলে বিষবিবাহ ইত্যাদি। শান্তিপুরের কিছু বিশিষ্ট সাহিত্য সাধকের নাম হচ্ছে : মোহারাম শিরোরত্ন, চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনোয়ারিলাল গোস্বামী, নলিনীমোহন সান্যাল, বিনায়ক সান্যাল, মোজাম্মেল হক, ভোলানাথ বাণী কণ্ঠ, জয়গোপাল গোস্বামী, ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রানাঘাটের কথায় প্রথমেই মনে আসে কুমুদনাথ মল্লিক-এর নাম। তাঁর গ্রন্থ 'নদীয়া কাহিনী'। আজও নদিয়ার ইতিহাস গ্রন্থ বলতে ওই একখানি গ্রন্থই সম্বল। শ্রম, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন এই গ্রন্থ। এ ছাড়া ছিলেন, কালীময় ঘটক, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গোবিন্দ চক্রবর্তী, নাট্য সাহিত্য রচনায় বিশিষ্টজন দেবনারায়ণ গুপ্ত। রানাঘাটে একদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। যুবক রবীন্দ্রনাথ রানাঘাটে এসেছিলেন তাঁর কাছে। নবীন সেন রানাঘাটে অবস্থানকালে সক্রিয় সাহিত্যসাধক ছিলেন।

নবদ্বীপ মূলত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতজনদের বাসভূমি। বাংলা সাহিত্যচর্চা সেখানেও অনেক হয়েছে। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অজিতকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মতিলাল রায়ের নাম করতেই হবে। যাত্রাপালার রচয়িতা হিসাবে তাঁর পরিচয় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর একজন হচ্ছেন নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি চাকদহ।

কাচকুলি গ্রামের ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্য সাধক।

বিশ শতকের চার-এর দশকে কৃষ্ণনগরে যাঁরা সাহিত্য সাধনা করতেন, তাঁদের ভিতর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ননীগোপাল চক্রবর্তী। তিনি শিশুসাহিত্যিক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। কলকাতার পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অনেক গ্রন্থের লেখক। বীরেন্দ্রমোহন আচার্য প্রধানত রস রচনার লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অরসিকেষু'। আরও অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ছিলেন গবেষক পণ্ডিত। অমিয়নাথ সান্যাল ছিলেন সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত। সুলেখকও ছিলেন। সংগীত বিষয়ে

এবং স্মৃতিকথা নিয়ে তাঁর খান-কয় গ্রন্থ আছে—যা বিশেষ মূল্যবান।

এই সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায় নদিয়ার জজ হয়ে কৃষ্ণনগরে আসেন। আগে একবার তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। এবারের আগমন ও বিদায় কথা তাঁর ছড়া সাহিত্যে স্মরণীয় আছে। তাঁর পরিচিত ছড়া :

'মশায় দেশান্তরি করল আমায়
কেষ নগরের মশায়।'

এ ছাড়াও 'জাপানীরা যদি আসে'র মতো অনেক ছড়াই তিনি কৃষ্ণনগর বাসকালে রচনা করেছিলেন। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' ছড়াগ্রন্থে সেগুলো সন্নিবেশিত আছে।

দেশের স্বাধীনতালাভ হল উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে। নদিয়া জেলা বিভক্ত হয়ে অর্ধেক হয়ে গেল। উদ্বাস্তুর ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত নদিয়ায়। সে সময় ওপার বাংলার কত সাহিত্য প্রতিভাধর ব্যক্তি এই জেলায় এসেছিলেন আজ তার হিসাব মেলা কঠিন। মাঝে মাঝে দু-একটি সন্ধান মিলে যায়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' আজ বঙ্গসমাজে সুপরিচিত গ্রন্থ। তার লেখক অদ্বৈতমল্ল বর্মণ সপরিবারে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন নবদ্বীপে। তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা আজও এখানকারই অধিবাসী। কৃষ্ণনগরে গড়ে উঠেছে শক্তিনগর পল্লী। সেখানকার বাসিন্দা হয়েছিলেন কবি পরেশনাথ সান্যাল। কৃষ্ণনগরেই তাঁর শেষজীবন কেটেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সেকালের বিশিষ্ট কর্মী মন্মথনাথ সান্যাল ছিলেন পরেশনাথের অগ্রজ। উদ্বাস্তু না হয়েও আর একজন কৃষ্ণনগরে এসে বাসিন্দা হয়েছেন। তিনি বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক জ্ঞানতাপস ক্ষুদিরাম দাস। আদিতে তিনি বাঁকুড়ার মানুষ। এখন নদিয়াবাসী।

স্বাধীনোত্তর কালে নদিয়ার সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে বড় ঘটনা ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র-এর আবির্ভাব। বর্তমানে নদিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি সীমান্ত অঞ্চল মাজদিয়ার নিকটবর্তী 'ফতেপুর' পল্লীর মানুষ বিমল মিত্র। ফতেপুর, গাজনা পাশাপাশি গ্রাম। বিমল মিত্র-এর 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা এই ফতেপুর গাজনার কথা দিয়েই। বাঙলার এই বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তাঁর সাহিত্যে যেমন নিজ গ্রামকে, নদিয়া জেলাকে তুলে ধরতে ভোলেননি, তেমনই ব্যক্তিজীবনেও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর ফতেপুর গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। সেই গ্রামের উন্নতির জন্য সেখানে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি কলকাতায় বসে যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনই গ্রামে এসে গ্রামবাসীর সঙ্গেও মিলিতভাবে কাজ করেছেন। নদিয়ার একজন বিশিষ্ট কথা- সাহিত্যিকের এমন ভূমিকার কথা ভাবলে মন গৌরবে ভরে ওঠে।

বাংলার আর-একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কথা বলতে হয়। তিনি 'জাগরী' ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসের লেখক সতীনাথ ভাদুড়ি। তিনি বিহারের পূর্ণিয়াবাসী ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টান ছিল। কৃষ্ণনগরের চৌধুরী পাড়ার সম্ভ্রান্ত ভাদুরি বংশেরই একটি শাখা বা শরিক ছিলেন তাঁরা। তিনিও কৃষ্ণনগরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তৎকালীন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সতীনাথ ভাদুরি তাঁর 'জাগরী' উপন্যাস স্বহস্তে উপহার দিয়েছিলেন তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফতেপুর গাজনার পাশেই 'ভাজনঘাট' পল্লী নদিয়ার বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এই পল্লী। এখানে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী কৃষ্ণকমল গোস্বামী। একালের সুপরিচিত সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তও ছিলেন এই গ্রাম নিবাসী বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনাকারী হিসাবে খ্যাত জগদানন্দ রায়-এর বাড়ি কৃষ্ণনগর। থাকতেন শান্তিনিকেতনে। জেলায় এখন সাহিত্য কবিতা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা অনেকই আছে। কিন্তু পাঁচের দশকে কৃষ্ণনগরে কালীপ্রসাদ বসু প্রতিষ্ঠিত 'হোমশিখা' মাসিক সাহিত্য পত্রিকা যে ভূমিকা পালন করেছিল, নদিয়া জেলার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তার তুল্য পত্রিকা আর হয়নি। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁদের ভিতর কেউ কেউ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ জীবনে, নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যায়। 'হোমশিখা'র ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। সেদিন যাঁরা এই পত্রিকাগোষ্ঠিভুক্ত ছিলেন এবং এই পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তাঁদের ভিতর কয়েকজন আজ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) তখন নদিয়ার জেল সুপার। তিনি কৃষ্ণনগরে থাকতেন এবং 'হোমশিখা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় লিখতেন। সন্ধ্যায় পত্রিকা গোষ্ঠির আড্ডায় আসতেন মাঝে মাঝে। এই সময়েই তিনি তাঁর 'লৌহকপাট' কাহিনীর পাণ্ডুলিপি রচনা সমাপ্ত করেন। 'হোমশিখা'-তেই লেখাটি প্রকাশের কথা হয়েছিল। কিন্তু 'হোমশিখা' সম্পাদক ননীগোপাল চক্রবর্তী, অধিক প্রচার পাবে বলে দেশ পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ায় লেখাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখক খ্যাতিও লাভ করেন তাতে। এই সময়েই 'হোমশিখা' পত্রিকাগোষ্ঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নারায়ণ সান্যাল এবং সুধীর চক্রবর্তী। সুধীর চক্রবর্তী তো পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'হোমশিখা'-তেই এঁদের লেখালেখি শুরু হয়। আজ নারায়ণ সান্যাল বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক, ঔপন্যাসিক। সুধীর চক্রবর্তী বিশিষ্ট গবেষক, সাহিত্যিক। নারায়ণ সান্যালের বাড়ি কৃষ্ণনগর। এই শহরের প্রায় আদিবাসিন্দা ওঁদের পরিবার। এখন তিনি কলকাতাবাসী। সুধীর চক্রবর্তীর আদি নিবাস 'দিগনগর' পল্লী। এখন তিনি কৃষ্ণনগরবাসী।

একটি অসমাপ্ত লেখক পঞ্জিতে (পাণ্ডুলিপি) দেখা যাচ্ছে, নদিয়ার সাহিত্যসাধকের সংখ্যা সহস্রাধিক। গ্রন্থ সংখ্যা অগণিত। স্বাভাবিক কারণেই এই স্বল্প পরিসরে সকলের কথা বলা যায় না। বলা গেলও না। একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া গেল মাত্র। তা বলে অনুল্লেখিতরা গুরুত্বহীন, তা নয়। অনেকেই সাধনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র। নদিয়া তথা বঙ্গসাহিত্য অবশ্যই তাঁদের কাছে ঋণী।

স্বাধীনোত্তর কালের নদিয়ায় সাহিত্যচর্চার বেগ কমেনি, বেড়েছে। বহু সাধক সাহিত্যের নানা বিভাগে কাজ করে চলেছেন। এঁদের কাজের মূল্যায়ন করবে ভাবীকাল।

বি : দ্র : রচনায় সাহায্য করেছেন শতঞ্জীব রাহা ও রবি বিশ্বাস।

নাট্যচর্চা : নদিয়া

প্রসূন মুখোপাধ্যায়

নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় নদিয়া জেলা বরাবর অগ্রণী। ঠিক কবে এই ভূখণ্ডে নাট্যচর্চার সূত্রপাত তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে তুর্কী আক্রমণের আগে থেকেই অবিভক্ত নদিয়ার ২৮৪১ বর্গমাইলের মধ্যে নাট্যের বীজ ছিল। এইখানেই বাঙালির নাট্য-ভবিতব্য গড়ে উঠেছিল।

নদিয়ার লোকায়ত জীবন-ছন্দের মধ্যে বরাবর নাটকের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। নদিয়ার পুরাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের গ্রন্থাদি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়, এই জনপদের মানুষের যাপনে, লোকক্রীড়ায়, লোক উৎসবে, মেলা বা 'দোল'-এ চোখে পড়ে নাটকীয় কৃত্য। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে এই রকমের অভিজ্ঞতাই তো নিবেদন করেছেন।

নদিয়ার ভূভাগ আকারে খুব বড় না হলেও সেই তুর্কী আক্রমণ থেকে নানা সামাজিক উত্থান-পতন, আলোড়ন-বিলোড়নের সাক্ষী। শ্রীচৈতন্যের কালে এই নদিয়ায় ঘটেছিল স্বর্ণযুগের সম্পাত। কৃতজ্ঞ নদিয়াবাসী সোনার গৌরাঙ্গ তৈরি করে অমিয় নিমাইয়ের প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেনি, সাংস্কৃতিক গৌরবও প্রচার করেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে শুধু রেবতী বা রেউই-এর বুকে বর্ণময় ইতিহাস তৈরি হয়নি, সে-সময় নদিয়া হয়ে

উঠেছিল বঙ্গ সংস্কৃতির সেরা পীঠ। বর্গী আক্রমণ, জলপথে মগ ফিরিঙ্গির আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পলাশীর যুদ্ধ, কৃষ্ণচন্দ্রের কারাবাস—এইসব জায়মান সত্য নিয়েও নদিয়া অষ্টাদশ শতকের শিরোনাম। ১৭৮৭-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন কালেক্টরের পদসৃষ্টি করে ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করতে শুরু করেন তখন—"নদীয়াতেই সর্বপ্রথম জেলা স্থাপন করিয়া ইংরেজ কালেক্টরের অধীন করিলেন।"

নদিয়াতে ইংরেজ রাজপুরুষদের যখন পদপাত ঘটে তখন গঞ্জ এলাকায় 'কোর্ট কালচার' বর্তমান। আর তেপান্তরের মাঠের পারে কৃষিপল্লীতে তখন চলছে অর্ধাহার, অনাহার। মূঢ় মূক ম্লান মানুষ তখন আপন ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে অথবা কর্তার দোহাই পাড়ছে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা এই সাংস্কৃতিক দূরত্বকে মূলধন করে, হিসেব কষে শুরু করলেন জমি কেড়ে নেবার ব্যবসা ; নীল চাষের ফলাও কারবার জমিয়ে তুললেন। অচিরেই শুরু হল 'নীল-আন্দোলন'। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র সেই আন্দোলনের দ্রষ্টা হয়ে রচনা করেছিলেন 'নীলদর্পণ'। উত্তরকালে মীর মশার্‌রফ হোসেন লেখেন 'জমিদার দর্পণ'।

নদিয়ার ইতিহাস থেকে গণ-আন্দোলনকে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে, খাদ্য আন্দালনকে পৃথক করা যায় না। ১৯ শতকের মধ্যভাগে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল কৃষিপল্লীতে ; বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে দেখি নদিয়ার গণ-আন্দোলন জনপথ মাড়িয়ে রাজপথের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর আন্দোলনের কেতন হয়ে দেখা দিয়েছে নদিয়ার গণনাট্য। গণনাট্য আন্দোলনেও নদিয়ার একটা বড় ভূমিকা ছিল, আছে—ইতিহাস নিশ্চয়ই এ-কথা অস্বীকার করবে না।

লাহিনী পাড়া থেকে কৃষ্ণনগরে পা দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মীর মশার্‌রফ হোসেন। মশার্‌রফ সম্ভবত নবদ্বীপ ধামও পরিক্রমা করেছিলেন। উত্তরকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> 'এই সেই কৃষ্ণনগর যেখানে বাঙ্গলা ভাষার জন্ম। অধিবাসীগণ উৎকৃষ্ট বাংলা কথাবার্তা কহিয়া থাকে, একথা ভারতবিখ্যাত। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা তেমনি লালিত্যপূর্ণ। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি রসপোরা—এই কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর নিম্ন হইয়া পবিত্র গঙ্গার শাখানদী খড়ে নবদ্বীপের পাদধৌত করিয়া পূর্ব দক্ষিণ বহিয়া গিয়াছে।
>
> জগৎবিখ্যাত পবিত্র নাম নবদ্বীপ। সরস্বতীর কমলাসনে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের মহা পবিত্র গৌরব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত রহিবে। বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার আদিগুরু স্থান নবদ্বীপ। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ প্রভু মহোদয়ের জন্মস্থান লীলা স্থান। ওই নবদ্বীপে জগাই মাধাই ডাকাতের সর্দারদ্বয়কে শুধু প্রেম অস্ত্রে সোহাগের ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া গৌরাঙ্গদেব মহাকীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ কুসংস্কার মূলচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।'

পুরোনো ইতিহাসের পর্যালোচনা, লোকজীবন চর্যা, গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতার দিকে তর্জনী সংকেত করে, মান্যজনের স্মৃতিকথা আহরণ করে শুধু এইটুকু নিবেদন করতে চেয়েছি যে বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত বরাবর নদিয়ার নাট্যচর্চার সহায় হয়েছে। কালে-কালোত্তরে বাঙালির নাট্যসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে নদীমেরা নদিয়া।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে নৃত্যছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়—

> কাহ্নাঞি মোরে নাহি ছো।
> তিরি বাধিয়া কাহ্নাঞিল
> কাহ্নাঞি মোরে নাহি ছো॥
> মোরে না ছো কাহ্নাঞি বারাণসি যা।
> অঘোর পাপে তোর বেআপিল গা॥

গবেষকের অনুমান, নদিয়ার যাত্রাকারেরা ছিলেন এই নৃত্যছন্দের ধারক ও বাহক। এ প্রসঙ্গে যাত্রাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। শুধু এই একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, শ্রীচৈতন্যের দিব্য আবির্ভাবের বহু আগেই নদিয়ায় নাটপালা-ঝুমুর—এইসব ছিল। ১৯ শতকের মনীষীরা নদিয়া গবেষণা করতে গিয়ে ইত্যাকার অভিজ্ঞতা ও অনুমান দাখিল করেছেন। এঁদের অভিজ্ঞতা ও অনুমানকে মূলধন করে বলা যেতে পারে শ্রীচৈতন্য একটা তৈরি জমিতে দাঁড়িয়েই নদিয়াবাসীর সামনে কাঙ্ক্ষিত নাটপালা নিবেদন করেছিলেন। বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসকার রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন যে, "সঙ্গীত ও নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের তথা বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়"—কথাটি যথার্থ।

শ্রীচৈতন্য ও নদিয়ার নাট্য

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে (আনুমানিক ১৫০৮-৯) শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিষ্যদের সভাস্থলে কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের পরিকল্পনা করেন।

> একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
> আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে॥
> সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
> বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জা কর গিয়া॥

গৌরাঙ্গের আদেশে সদাশিব যে আন্তরিক আয়োজন করেছিলেন তা শ্রীচৈতন্যের পরিকরবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দর্শকদের মধ্যে গৌরাঙ্গের জননী শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

> কীর্তনের শুভারম্ভ করিলেন মুকুন্দ।
> রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥
> প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভু হরিদাস।
> মহামুই গোঁপ করি বদন বিলাস॥

শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতেও কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের কথা আছে। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহাঙ্গনে শ্রীরাধার বেশে অভিনয় করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। অভিনয় করতে করতে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন

হলে নাটক মাঝপথে থেমে যায়। কৃষ্ণলীলার এই বিবরণ দৃষ্টে বুঝতে পারা যায় চৈতন্য-পরিকরেরা এই জাতীয় নাট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ কৃষ্ণদাস নিবেদন করেছেন—শ্রীবাস আচার্যের গৃহে প্রভু কৃষ্ণলীলার আয়োজন করেছিলেন।

একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে 'দানলীলা' অভিনয় করেছিলেন। সহচর ছিলেন নিত্যানন্দ ও শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈত। এই অভিনয়টি ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত। রাধিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য। অদ্বৈত মঙ্গলে এর বিবরণ আছে।

অদ্বৈত প্রভু হইল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।
মহাপ্রভু হইলা রাধিকার রূপ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে করিলা বড়াই বুড়ি।
শ্রীবাস আদি সখী এ হইলা বড়ী॥
সখা হইলা কমলাকান্ত আর কতজন।
গৌরীদাস নরহরি সুবল মধুমঙ্গল॥

'চৈতন্যভাগবত'-এ উল্লেখিত আছে যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গদাধরদাসের মন্দিরে গিয়ে বালগোপালের মূর্তি দেখে দানখণ্ড নৃত্য করেছিলেন। কবি কর্ণপুর তাঁর চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে মহাপ্রভুর অভিনয়লীলা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্য যে একজন বড়মাপের অভিনেতা ছিলেন আমাদের প্রতিপাদ্য বলা বাহুল্য তা নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের সংহত নিবেদন এই যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগেই, আবির্ভাবের সময়ে এবং উত্তরকালে নদিয়ার নাট্যচর্চার ধারাটি অম্লান ও অব্যাহত ছিল।

অব্যাহত নাট্য : যাত্রালোক

শ্রীচৈতন্যের কালে যে নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটল তার সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই নদিয়ার লোকনাট্যে, শীলিত যাত্রাপালায়। নদিয়ার প্রাচীন লোকনাট্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষ্ণলীলার বিবর্তন। এমনকি বিদ্যাসুন্দর পালা অভিনয়ের সময়েও কৃষ্ণকথার প্রবর্তনা ঘটেছে বলে গবেষকেরা মনে করেন। লোকনাট্যের এলাকা থেকে সরে এসে আমরা যদি যাত্রাগানের কথা বলি তাহলে দেখব—'বৈষ্ণব যাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বিশেষভাবে নদিয়া জেলার দান।' ১৯ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে, বৈষ্ণবের বিশ্বাস ও ধর্ম আন্দোলনের দলিল তৈরি করতে গিয়ে ডঃ সুশীলকুমার দে সঠিকভাবেই যাত্রাগানের উৎসমূলে বৈষ্ণব সমাজের দানের কথা বলেছেন।

বৈষ্ণবীয় প্রেরণাতেই নদিয়ায় কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়, রচিত হয় 'কালিয়দমন পালা', 'নন্দ বিদায় পালা', 'ব্রজলীলা',

'মথুরা বর্জন', 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা'। নদিয়ার বিশিষ্ট পালাকার হিসেবে আমরা পাই কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে। ১৮১০-এ ভাজনঘাট গ্রামে তাঁর জন্ম। নবদ্বীপে ব্রজবিদ্যারত্নের টোলে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। আর এইখানেই তিনি রচনা করেন 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রাপালা। কৃষ্ণকমলের সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা 'রাই উন্মাদিনী'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস' পালার প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

ঠিক পালাকার না হলেও কাঙাল হরিনাথ নাট্যবিষয়ে যত্নবান ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গীতাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। এর প্রমাণ 'অক্রুর সংবাদের নান্দী অংশ'—

শুন ওরে ভ্রান্তমন, সত্যপথে কর ভ্রমণ,
ষড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ॥

বিশিষ্ট যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায় ১৮৪৩-এ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক তিরিশ বছর বয়সে তিনি নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় তৈরি করেন। সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন মতিলাল। লিখেছেন অসংখ্য যাত্রাপালা। রামায়ণ-মহাভারত থেকে কাহিনী চয়ন করে মতিলাল নদিয়ার সংস্কৃতি তথা বঙ্গসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

মতিলালের পুত্র ধর্মদাস রায় বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় পিতার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে যাত্রাপালার রুচি-বিকৃতি ও স্বভাববিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

নদিয়ার শখের যাত্রাদলের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন নীলকণ্ঠ দত্ত। নীলকণ্ঠ মতিলাল রায়ের দলে যোগ দিয়ে আমৃত্যু নাট্যসাধনা করেছেন। মতিলাল রায়ের দলে হাতেখড়ি হয়েছিল ব্রজলাল রায়ের। ইনি পরে নিজেই একটি দল করেছিলেন। তাঁর দলের 'কাশীখণ্ড' ও 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

নবদ্বীপের ব্যবসায়ী নীলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী মুক্তামণি দেবী একদা নদিয়ার যাত্রাজগতে খ্যাতিসম্পন্না হয়েছিলেন 'বৌকুণ্ডু' নামে। কথিত আছে, প্রচুর অর্থব্যয় করে তিনি ভাঙিয়ে এনেছিলেন মদন মাস্টারের দলের লোক, মতি রায়ের দল ভাঙিয়ে গড়েছিলেন একটি যাত্রাদল। দলটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

কেউ কেউ বলেছেন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী নদিয়ার জাঙ্গীপাড়া গ্রামের মানুষ। কিন্তু জাঙ্গীপাড়া হুগলি জেলাতে অবস্থিত, নদিয়ায় নয়। আমাদের অনুমান, নদিয়ার মানুষ গোবিন্দ অধিকারীকে তাঁদের নিজের লোক বলে মনে করতেন। নদিয়ায় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল।

নাট্যালোক : উনিশ শতক

বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা নবযুগকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কলকাতায় মধুসূদন সান্যালের বাটিতে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কম করে দু-আড়াই বছর আগে, ১৭ জুলাই ১৮৭০-এ কৃষ্ণনগর কলেজগৃহে ছাত্রেরা দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'-র অভিনয় করেন। কলেজের পুরোন নথি ঘেঁটে গবেষক মোহিত রায় আমাদের জানিয়ে দেন, এই অভিনয়-রিপোর্ট লিখিত আছে এইভাবে—

'On the night of 17th July 1870, the play of 'নবীন তপস্বিনী' by Babu Dinabandhu Mitra was staged in the College with the actors being mainly students. It was organised through the efforts of a band of enterprising young men of the college who had formed a local Dramatic Society and was attended by the elite of the town including the well-known public man of Krishnagar, Babu Ramtanu Lahiri.'

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের এই অভিনয় প্রয়াস সেদিনের বিচারে এক বাস্তবিক মহৎ প্রয়াস ; আজকের বিচারে এ প্রয়াস ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে সংঘটিত এক সাংস্কৃতিক প্রয়াস। বাংলাভাষায় লেখা বাঙালির নাটক এই প্রথম অভিনীত হয়েছিল কৃষ্ণনগর কলেজে। এর আগে কলেজের ছেলেরা 'সাহিত্য সংসৎ' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। সেই সভার জন্মদিনে অভিনীত হয়েছিল এডিসনের 'কেটো', শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'। সাহিত্য সংসৎ-এর দেখাদেখি গড়ে ওঠে 'গোয়াড়ি বঙ্গ নাট্যাভিনয় সভা'। মূলত এঁদেরই উদ্যোগে কলেজের অভিনয় সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য দীনবন্ধু মিত্র ২০০ টাকা সাহায্য করেছিলেন।

১৮৭০ সালে দীনবন্ধু পি এম জি হয়ে কলকাতায় চলে এলেও আমরা ইতিহাস অনুসন্ধানে জানতে পারি তদানীন্তন নদিয়ার মহেশপুরে ১৮৭১-এ দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'র অভিনয় হয়। অনেক পরে ১৮৭৮-এ দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়েছিল শারদীয়া পূজা উপলক্ষে। অভিনীত হয়েছিল 'কুলীন কন্যা কমলিনী'। নদিয়ার এই মহেশপুরেই যে নটী বিনোদিনী অভিনয় করতে এসেছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নটী বিনোদিনীর 'আমার কথা' থেকে জানা যায়, সম্ভবত বেঙ্গল থিয়েটারের দলের সঙ্গে বিনোদিনী এসেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাটিতে 'মেঘনাদ বধ'-এর অভিনয়ের জন্য। প্রমীলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। অভিনয় করতে গিয়ে মাটির প্ল্যাটফর্ম ভেঙে বিনোদিনী আহত হয়েছিলেন, আহত অবস্থায় অভিনয় করে গিয়েছিলেন—একথাও বলেছেন বিনোদিনী।

বিনোদিনী যখন কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন, সেই সময়টা একটি ধর্মীয় ভাব আন্দোলনের সময় ; যুক্তির জায়গায় তখন স্থান নিয়েছে ভক্তি। বাঙালির নাট্যঅঙ্গনে তখন 'গিরিশের কাল'। গিরিশের থিয়েটার দেখতে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখে অভিভূত শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—'তোর চৈতন্য হোক'। নবদ্বীপের মথুরানাথ পদরত্ন বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 'চৈতন্যলীলা' রচনার জন্য গিরিশচন্দ্রকে সাধুবাদ জানান 'গুরুভ্রাতা' শ্রীবিবেকানন্দ। কথিত আছে, বিবেকানন্দ সিমলার বাড়ির ছাদে পায়চারি করতে করতে গাইতেন—

'জুড়াইতে চাই কোথা হে জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই—'

অহীন্দ্র চৌধুরীর বাগানবাড়ি ।। বাগআঁচড়া   ছবি : দিলীপকুমার পাল

অনুমান, ১৯ শতকের ভক্তি আন্দোলন নদিয়াকে নতুন করে প্লাবিত করেছিল বলেই নদিয়ার সম্পন্ন জমিদারেরা বিনোদিনীর দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সূত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, ১৯ শতক থেকে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে নদিয়ার নাট্য আন্দোলনের সংযুক্তি ঘটেছিল। সে সংযোগ আজও ছিন্ন হয়নি।

১৯ শতকের শেষ দিকে নবদ্বীপে গড়ে উঠেছিল 'আর্য থিয়েটার', 'চৈতন্য থিয়েটার' (১৮৭৭-'৮৬)। বৌকুণ্ডুর জামাতা রজনীকান্ত কুণ্ডু নবদ্বীপে প্রথম স্টেজ বেঁধে অভিনয় করান এবং স্ত্রীলোকের অভিনয় স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। নবদ্বীপে সে-সময় লেখা হয়েছিল কিছু মৌলিক নাটক। যেমন—'নল দময়ন্তী', 'বিল্বমঙ্গল', 'ল-বাবু' প্রভৃতি।

শান্তিপুরে ১৮৮৮-তে 'ন্যাশনাল ক্লাব', ১৮৯৪-তে টাউন ক্লাব ও ১৮৯৯-এ শান্তিপুর করোনেশন স্থাপিত হয়।

রানাঘাটে পালচৌধুরীরা নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ১৮৬৯-এ রানাঘাটে গঠিত হয়েছিল 'বাসন্তী ক্লাব'। কথিত আছে, দলটি দীর্ঘকাল গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অভিনয় করেন। (স্মরণীয়, বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্যসঞ্চালক দেবনারায়ণ গুপ্ত রানাঘাটেরই সন্তান। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনিও লেখাপড়া করেন রানাঘাটের পালচৌধুরীর স্কুলে।)

ধনীর প্রাসাদ থেকে নাটক যখন একটু একটু করে মধ্যবিত্তের অঙ্গনে নাট্যরূপে দেখা দিল তখন বিশিষ্ট নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর ইহজগতে নেই। গিরিশচন্দ্রের দেহান্ত হওয়ার আগে কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয় 'শান্তিক্লাব', 'ওরিয়েন্টাল ক্লাব', 'ঘূর্ণীক্লাব', 'ডি এম ক্লাব'। ১৯০২-এ ভালুকার মুখুজ্জে বাড়িতে অভিনীত হয় 'সিরাজদ্দৌলা'। ঘূর্ণীক্লাবই প্রকৃত অর্থে কৃষ্ণনগরের প্রথম নাট্যদল। আর ডি এম ক্লাবকে বলা যেতে পারে প্রথম সর্বজনীন নাট্যদল। এই প্রসঙ্গে টাউন ক্লাবের কথাও উল্লেখ করতে হবে। টাউন ক্লাবের নাট্যাভিনয়ের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন বলাই চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল নজরুল কৃষ্ণনগরে বসবাস করে গোবিন্দ সড়ক সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তুকার এবং কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কৃষ্ণনগরের বুকে 'সাজাহানে'র অভিনয় করেছিলেন।

১৯০৫-এ রানাঘাটের 'বাসন্তী ক্লাব' হ্যাপি ক্লাবে পরিণত হয়। কথিত আছে, এই ক্লাবটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের যোগাযোগ ছিল। এই হ্যাপি ক্লাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণীর অভিনয় হয়। রানাঘাটের মডেল মিউজিক ক্লাব এবং মেরি ক্লাবের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। মেরি ক্লাব ছিল 'নদীয়া কাহিনী' প্রণেতা কুমুদনাথ মল্লিকের দল।

১৯০৭-১০-এর মধ্যে নবদ্বীপের 'বিজয়া নাট্যসমাজ'-এর জন্ম হয়েছিল। বান্ধব নাট্যসমাজ মতিলাল রায়ের গীতাভিনয়ের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছিল। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের হিসেবমত নবদ্বীপের বৈদেহী নাট্যপরিষদ, অবসর নাট্য পরিষদ, আনন্দ পরিষদ ও নাট্যশ্রী দলের কথা উল্লেখ করা যায়। 'বন্ধুমহল' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে নবনাট্যধারার জন্ম হয়।

শতাব্দীর শুরুতেই শান্তিপুরে স্থাপিত হয় 'বেজপাড়া ক্লাব'। বেজপাড়া ক্লাব যাত্রাও করত। করোনেশন ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯০৩ সালে। রামনগর ড্রামাটিক ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯০৫-এ। ১৯১৩-১৪ সালের সূত্রাগড় ড্রামাটিক ক্লাবের জন্ম। ১৯২০-২৬-এর মধ্যে শান্তিপুর টাউন ক্লাব, কুটিরপাড়া প্রামাণিক ক্লাব স্থাপিত হয়। টাউন ক্লাবে অভিনয় করেছিলেন বিশিষ্ট নট নির্মলেন্দু লাহিড়ী। শান্তিপুরে মুসলমান সম্প্রদায় ১৯০৩ সালে স্থাপন করেন মুসলমান ড্রামাটিক ক্লাব। পরে এই ক্লাবের নাম হয় 'হামিদিয়া ক্লাব'। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে শান্তিপুরে গড়ে ওঠে 'মিলন মন্দির', 'কালিকা অপেরা পার্টি'। লক্ষণীয়, শান্তিপুরে থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রার অভিনয়ও হত। আজও যাত্রার জগতে শান্তিপুরের একটা কর্তৃত্ব থেকেই গেছে।

চাকদহ অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজার সময় যাত্রানুষ্ঠান হত। যাত্রাদলের প্রভাবেই জন্ম নিয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গ নাট্যসমিতি। চাকদহের যশড়ায় 'ব্রাদার্স হ্যাপি ইউনিয়ন ক্লাব' স্থাপিত হয়। চাকদহের কাঁঠালপুলিতে গৌরাঙ্গ নাট্যসমিতি ভেঙে 'নবগৌরাঙ্গ নাট্যসমিতি'-র জন্ম হয়েছিল। স্মরণীয় চারণ কবি মুকুন্দদাস তাঁর স্বদেশিযাত্রা নিয়ে একদা চাকদহ ও সন্নিহিত অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন।

চাকদহের মতো মেহেরপুরে যাত্রার চল ছিল। বিশ শতকের তিনের দশকে ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন, মেহেরপুর নাট্যসমাজ, অরোরা ক্লাব তৈরি হয়।

আড়ংঘাটার ইতিহাসও প্রায় সমতল রকমের সদৃশ। এখানে সুপ্রচল ছিল যাত্রাগান ও যাত্রাপালা। আড়ংঘাটায় বাউলদের মেলা বসত, কীর্তনগান হত, জাগের গানের সন্ধানও পাওয়া যায়। থিয়েটারের চর্চা শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে।

গণনাট্যের চর্চা : নদিয়া

'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন' (১৮৬০-১৯৪৪) অনেক দুরের পথ হলেও অনুপ্রাসের খাতিরে নয়, ইতিহাসের দাবিতেই 'নবান্ন' প্রসঙ্গে 'নীলদর্পণের' কথা যেমন আবশ্যিক হয়ে ওঠে তেমনই গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে নদিয়া জেলার প্রাসঙ্গিকতা জরুরি হয়ে পড়ে। নদিয়ার গণনাট্য আন্দোলনের যৌবনজলতরঙ্গ লক্ষ করা যায় পাঁচের দশকে। প্রায় দেড় দশক ধরে এই জেলার গণনাট্য আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। মূল গণনাট্য আন্দোলনের শুরু থেকেই নদিয়ার নাট্যকর্মীরা অভিকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। নীল আন্দোলন ও মহাবিদ্রোহের ইতিহাসকার পণ্ডিতপ্রবর প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন 'নদিয়া-কলকাতা' সংযোগের সেতু। "সুধী প্রধান কলকাতার প্রাণবান ধারাটির সঙ্গে নদিয়ার প্রগতিপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের যোগাযোগে সহায়তা করতেন।" ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতি সচেতন ছাত্ররা।

সম্মেলক সংগীতে সে-সময় অগ্রণী ছিলেন, দিলীপ সেনগুপ্ত, দিলীপ দত্ত, রনজিৎ শিকদার, নির্মাল্য ভট্টাচার্য (মজনু), নারায়ণ দাস প্রমুখেরা। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণনাট্যের ছায়াছত্রতলে সমবেত হয়েছিলেন কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, নৃসিংহানন্দ দত্ত, সুজিৎ চৌধুরী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, দেবু গুপ্ত।

এই সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কৃষ্ণনগরে দেবনাথ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেন। 'বিসর্জন' পরিচালনা করেন ঋত্বিক ঘটক। অভিনয় করতে এসেছিলেন উৎপল দত্ত, শোভা সেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই 'বিসর্জন'-এর অভিনয় দেখে তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মীরা উজ্জীবিত হন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন এই সময় নদিয়া জেলার ইতিহাসে সাংস্কৃতিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কৃষ্ণনগরের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের (১৯৬৬) সঙ্গে সামিল হতে আমরা দেখেছি।

ইতিহাস বলছে, কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি সংসদ গণনাট্যের কার্যক্রম অনুযায়ী নাট্যচর্চায় ব্রতী হলেও পলাশীপাড়ার 'অগ্রণী সুভাষ সংঘ' প্রথম (১৯৫২) গণনাট্যের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সুভাষ সংঘের নিজস্ব বাড়ি ও মহলা কক্ষ ছিল। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি অভিনয় করে সংঘের খুব নাম হয়। সুভাষ সংঘের একটি গানের দল ছিল। মাঝারি মাপের একটি পাঠাগারও ছিল। ছয়ের দশকে সুভাষ সংঘ 'নীলদর্পণ' ও 'চোর' নাটকের অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ওঁরা পলাশীপাড়ায় নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। স্থানীয় মানুষের মধ্যে এই দলের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত।

সংস্কৃতি সংসদ সবচেয়ে বড় দল, সবচেয়ে বড় গণনাট্যের শাখা তখন। ১৯৫১ সালে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবত ১৯৫৪ সাল নাগাদ দলটি গণনাট্যের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। গণনাট্যের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর কৃষ্ণনগরে প্রকৃত সৎ তরতাজা তরুণেরা, সংস্কৃতি-কর্মীরা প্রায় সকলেই এগিয়ে আসেন সংস্কৃতি সংসদের পক্ষপুটে। দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৭ সালে সম্পাদক পদে বৃত হন দেবু গুপ্ত। সাংগঠনিক দিকগুলি অবশ্য পরিচালিত হত যৌথ নেতৃত্বে।

গণনাট্যের শাখা হিসেবে সংস্কৃতি সংসদের প্রথম প্রযোজনা 'নাগপাশ' (মতান্তরে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল')। এরপর মঞ্চস্থ হয় 'চোর', 'সংক্রান্তি', 'বিসর্জন', 'নীলদর্পণ', 'বাস্তুভিটে', 'কেরানীর জীবন', 'এমনও দিন আসতে পারে', 'স্বার্থপর দৈত্য',

অগ্নিগর্ভ লেনা

'দাম্পত্য কলহে চৈব' প্রভৃতি। সংসদের গানের দলটি ছিল বেশ বড় এবং শক্তিশালী। এ দলে ছিলেন রেণু ভট্টাচার্য, দিলীপ বাগচি, সুরেশ রায়, কালী দে, প্রসাদ সেন ; দিলীপ সেনগুপ্ত আসতেন কলকাতা থেকে। আসতেন নবদ্বীপের নৃত্যশিল্পীরা। প্রগতি পরিষদের সদস্য কার্তিক সাহার তত্ত্বাবধানে একটি নাচের দলও তৈরি হয়েছিল।

নবদ্বীপে 'প্রগতি পরিষদ' সংঘের শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার আগেই সংস্কৃতির প্রগতিকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল। শহরে প্রগতিশীল তরুণদের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল এই সংস্থা। প্রগতি পরিষদের ভাড়া বাড়ি ছিল, পাঠাগার ছিল, মহলা কক্ষ ছিল, নাচের দলও ছিল একটি। ডাক্তার কৃষ্ণদাস মুখোটি, অমল ভট্টাচার্য, গুরুদাস রায়, বাবু ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীর সাহা প্রমুখ পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; নৃত্যের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কার্তিক সাহা।

শান্তিপুরের গণনাট্য শাখার শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মূলত রাজনীতি সচেতন তরুণেরা। প্রথমে সাহা পাড়ায় গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী গানের দল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন কালাচাঁদ দালাল, দেবু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে অজয় ভট্টাচার্য দলের নেতৃত্ব দেন ; এ ছাড়া ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, কানাই বঙ্গ, মান্তু ভট্টাচার্য, বীরেন দাস, পুলক গোস্বামী। শান্তিপুর শাখার প্রযোজনা 'আজকাল', 'শান্তি', 'নীলদর্পণ', 'অঙ্গার', 'ঝড়', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'রাতের কলকাতা' প্রভৃতি। ছয়ের দশকের শেষদিকে গণনাট্যের ব্যবস্থাপনায় উৎপল দত্ত শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে অভিনয় করে যান।

সংস্কৃতি সংসদের প্রভাবে সে-সময় জেলার আরও কয়েকটি গণনাট্য শাখার জন্ম হয়। যেমন, 'মাজদিয়ার শিল্পী পরিষদ', 'স্বরূপ গঞ্জের গণনাট্য শাখা', চাকদহের শাখা প্রভৃতি। ১৯৫৪ সালের ২৮ আগস্ট ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সাব কমিটির নিবেদন থেকে জানা যায় জেলায় শান্তিপুর, বেতাই, কৃষ্ণনগর, হাঁসপুকুরিয়া, পলাশী, হরিপুর—এই রকমের ছয়টি শাখা বর্তমান ছিল। ওই রিপোর্টে পলাশীপাড়ার নাম পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা পলাশী আর পলাশীপাড়া রিপোর্টে একাকার হয়ে গেছে।

ছয়ের দশকে গণনাট্য আন্দোলনে নবপ্রাণ প্রবাহ সঞ্চালন করেন রানাঘাটের মঞ্চনাট্যম। মঞ্চনাট্যম একদা পশ্চিমবঙ্গ দাপিয়ে বেড়িয়েছিল। ওঁরা শুরু করেছিলেন গণনাট্য অভিযান। নাট্যকর্মীদের সঙ্গে জনগণের মেলবন্ধই ছিল ওঁদের লক্ষ্য। আর লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা। নাট্য-উপস্থাপনার ক্ষেত্রে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতেন নিজেরা।

মঞ্চনাট্যমের দেখাদেখি গয়েশপুরে গড়ে ওঠে সুকুমার স্মৃতি সংস্থা। এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে ১৯৫৭-৫৮ সালে দিল্লির রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনে নদিয়া জেলার প্রতিনিধিরাও যোগদান করেছিলেন। নদিয়ার নানা প্রান্তে সংঘের মূল সঞ্চালকেরা অভিনয় করেছেন, সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেছেন। ভারতীয়

গণনাট্য সংঘের প্রথম নদিয়া জেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তুলসী লাহিড়ী।

সাম্প্রতিক : একটি সমীক্ষা

গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে একদা যাঁরা সামিল হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরাই হয়ে উঠলেন ছোট-বড় গ্রুপ থিয়েটারের সঞ্চালক অথবা পৃষ্ঠপোষক। গণনাট্যের মূলধারাটি বা অনুমোদিত শাখাগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই গ্রুপ থিয়েটার সংগঠিত হতে দেখছি। গ্রুপ থিয়েটার আছে নদিয়াতে। সংখ্যা বিচারে তার পরিমাণ খুব কম নয়।

কৃষ্ণনগর

অ-আ-ই : কিশোর-তরুণদের সাংস্কৃতিক সংগঠন। নাট্যকার ও সঞ্চালক তরুণকান্তি সান্যাল। সাম্প্রতিক প্রযোজনা যন্ত্রযন্ত্রণা।

অগ্রগামী নাট্যসংস্থা : পার্থ শিকদার পরিচালক ও অন্যতম অভিনেতা। এঁদের নাটক 'দখল', 'যদি আমরা সবাই'।

অনামী : পুরনো গ্রুপ থিয়েটার। অনিল চক্রবর্তী, প্রসূন লাহিড়ী, গায়ত্রী লাহিড়ী, নবকুমার বিশ্বাস, অমর রায় এই দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন বিভিন্ন সময়ে। এঁরা নতুন-পুরনো সব নাটকের অভিনয় করেছেন।

অঙ্গন নাট্য প্রয়াস : মূল ব্যক্তিত্ব ভাস্কর সেনগুপ্ত। অভিনয় ছাড়াও এই দল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। সম্প্রতি নাম বদল করে এই দলের নাম হয়েছে 'থিয়েটার অঙ্গন'।

অন্য মুখ : দক্ষিণ কৃষ্ণনগরের নবীন নাট্যদল। পরিচালক কাজল বিশ্বাস। প্রযোজনা 'মরা মানুষ কথা বলে', 'বাজনা বাজায়'।

ইঙ্গিত গোষ্ঠী : বিভিন্ন সময়ে পরিচালকের নাম বদলেছে। মধ্য কৃষ্ণনগরের দল। দলের নিজস্ব নাট্যকার রত্নেশ্বর সরকার।

কৃষ্টি সংসদ : ১৯৯৩-এ রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। 'নীচের মহল' থেকে 'নরক গুলজার', 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে 'রাম শ্যাম যদু', পুরনো নতুন সব নাটকের অভিনয় এঁরা করেছেন।

গণনাট্যের অভিনয়

জলসা খুশী : নাট্যকার ও পরিচালক পার্থসখা অধিকারী। প্রযোজনা 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মাটির কান্না', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'একের ভিতর ছয়'।

'নগেন্দ্রনগর সাংস্কৃতিক চক্র' : দলের পরিচালক কল্যাণ সরকার। নাট্যকার কিশোর বিশ্বাস দলে নিয়মিত অভিনয় করেন।

নাট্যচক্র : কৃষ্ণনগরের নামকরা নাট্যদল। সর্বভারতীয় স্বীকৃতি এঁরা লাভ করেছেন। এই দলের একদা সঞ্চালক ছিলেন গৌরাঙ্গ দে। বর্তমানে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় দলটি দেখাশোনা করেন। এই দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন—সুবীর সিংহ রায়, অসিতানন্দ রায়, মানিক কর, মঞ্জুশ্রী দে, শিখা সান্যাল প্রমুখেরা।

নাট্যম্ : দলের প্রাণপুরুষ দেবমাল্য ঘোষ। প্রযোজনা— 'লালকমল নীলকমল', 'মনসামঙ্গল', 'সত্যি ভূতের গল্প'।

পদাতিক : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রধান শাখা। প্রযোজনা—'দুধের দাম', 'তোতা কাহিনী', 'কালের যাত্রা', 'কিনু কাহারের থেটার', 'হল্লাবোল', 'কোন এক গাঁয়ের বধূ'। ভাস্কর বিশ্বাস, তুহিন দে, সুদীপ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বি থিয়েটার : প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বপন বিশ্বাস ও অজয় বিশ্বাস। প্রযোজনা —'আন্তিগোনে', 'তৃতীয় কণ্ঠ', 'গঙ্গা তুমি বইছ কেন'।

মিলিত কণ্ঠ : গণনাট্যের অন্যতম একটি শাখা। সম্পাদক—বিশ্বনাথ সাহা। পরিচালক হিসেবে শতঞ্জীব রাহা, কাজল বিশ্বাস, কিশোর সেনগুপ্ত অবিস্মরণীয় নাম।

সৃজা : ঘূর্ণী অঞ্চলের নাট্যগোষ্ঠী। প্রযোজিত নাটক 'সংকেত', 'মেম্বার বলছি'।

সেতু : দলের কাণ্ডারী তপন ভট্টাচার্য। সফল প্রযোজনা 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'তৃতীয় পাশা'। নাট্যকার অশোক ভাদুড়ী দলকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

সংলাপ : পরিচালক তুহিন দত্ত। সভাপতি নির্মলচন্দ্র দত্ত। সম্পাদক শ্যামল ব্যানার্জি। কৃষ্ণনগরের এই দলটির পঁচিশ পার হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তুহিন দত্ত জরুরি অবস্থার সময়ে 'মারীচ সংবাদ' অভিনয় করে নদিয়ার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন। এই দলের স্বপন বিশ্বাস, কিশোর বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস, শ্যামল ব্যানার্জি, রত্না দত্ত আজ পশ্চিমবঙ্গে আলোচিত নাম।

নবদ্বীপ

জেলার সদর শহর না হলেও নাট্যচর্চার দিক থেকে নবদ্বীপ অনেকটা এগিয়ে আছে। সম্প্রতি জানা গেল, নবদ্বীপের নাট্যপ্রেমিক মানুষেরা সম্মিলিতভাবে প্রগতি পরিষদের অঙ্গনে জমায়েত হয়েছেন। সমবেত নাট্যপ্রয়াস ওঁদের লক্ষ্য। নবদ্বীপেই জন্ম নিয়েছে নাট্য উন্নয়ন পরিষদ। নানা সময়ে তাঁরা নাট্য সম্মেলন করে থাকেন।

বিগত তিন-চার দশকের মধ্যে নবদ্বীপে জন্ম নিয়েছে অন্তত ১৩০টির মতো নাট্যদল।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম—

(১) অনামী, (২) উন্মেষ, (৩) চেতনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, (৪) ছন্দনীড়, (৫) থিয়েটার ফ্রন্ট, (৬) নবদ্বীপ টাউন ক্লাব, (৭) প্রতিভাস, (৮) প্রগতি পরিষদ, (৯) পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, (১০) সংকেত, (১১) গণশিল্পী, (১২) সায়ক, (১৩) সুরছন্দম, (১৪) সংস্কৃতি সংঘ। এই তালিকায় 'আদর্শ পাঠাগারে'র নামও যুক্ত হবে।

শান্তিপুর

দৃশ্যত শান্তিপুরের জীবনযাত্রাকে মন্থর ও নিস্তরঙ্গ মনে হলেও নাট্যচর্চা মোটামুটি এখানে নিয়মিত। নবদ্বীপের মতো শান্তিপুরের মানুষও নাট্যবিষয়ে উৎসাহী। কম-বেশি ১৪-১৫টি দল শান্তিপুরে কাজ করে চলেছে।

(১) শিল্পী মহল
(২) একতা থিয়েটার গ্রুপ
(৩) লোকগীতি নাট্যম
(৪) সরল স্মৃতি সংঘ
(৫) শান্তিপুর যুব নাট্যসংঘ
(৬) আমরা সবাই
(৭) নবারুণ
(৮) পদাতিক
(৯) প্রতিবাদী পদাতিক
(১০) সাংস্কৃতিক
(১১) সাংস্কৃতিক রেপার্টারি
—সুখ্যাত নাট্যদল।

বেথুয়াডহরি ও তৎসংলগ্ন

আপনজন গোষ্ঠি, গণসংস্কৃতি, সংসদ, দেবগ্রাম শিল্পী সংসদ, ধুবুলিয়া ঐকতান, প্রান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা, বলাকা, যুবাগ্নি, রূপসঞ্চারী, সংগঠন, সুকান্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা, ধুবুলিয়া শিল্পীচক্র—জেলায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রানাঘাট শহর

অগ্রগামী, নবীন নাট্যগোষ্ঠী, অক্ষয় কলামণ্ডলম, অভিমন্যু, কোয়েল, ঝংকার, প্রান্তিক, রূপকার, রেনেসাঁ, সুহৃদ সংঘ, নবাঙ্কুর, হ্যাপি ক্লাব, থিয়েটার ইউনিট, রানাঘাট কলাকেন্দ্র। পুরনো নাট্যদলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় রূপকগোষ্ঠী, নবীনদের মধ্যে অভিমন্যু নাট্যদল।

আড়ংঘাটা

এই অঞ্চলে আছে আড়ংঘাটা ক্লাব। আছে নাট্যরূপা, মহুয়া নাট্যম্, রুদ্রবীণা, রূপক, জাগৃতি। এই অঞ্চলের খ্যাতিমান নাট্যব্যক্তিত্ব সুশান্ত বিশ্বাস।

চাকদহ

গ্রুপ থিয়েটার বলতে যা বোঝায় জেলার মধ্যে চাকদহেই তা নিজস্ব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হতে পেরেছে। নাট্যদলের সংখ্যা কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপের তুলনায় কম হলেও ধারাবাহিকতা নির্মাণে ও উৎকর্ষের বিচারে চাকদহ শুধু নদিয়া জেলায় নয় পশ্চিমবঙ্গের নাট্য মানচিত্রের একটি পরিচিত এলাকা।

এখানে আছে

- অভ্যুদয় যুব নাট্যগোষ্ঠী
- অরুণাভ নাট্যসংস্থা
- ইছাপুর যুব নাট্যগোষ্ঠী
- জাতীয় সংঘ
- টাউন ক্লাব
- ডমরু
- ধনিচা তরুণ সংঘ
- নাটুকে দল
- নাট্যভারতী
- নাট্যসংসদ
- নে না স
- প্রগতি নাট্যসংঘ
- বিবাদি নাট্যসংস্থা
- শিল্পীচক্র
- হযবরল
- হিনাস—প্রভৃতি নাট্যদল।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডমরু—ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি শাখা।

হিনাস খুব সযত্ন করছে নদিয়ার থিয়েটার। 'হযবরল'কে এখন পশ্চিমবঙ্গেরই একটি নাট্যদল বলতে হবে।

কল্যাণী

এই অঞ্চলে আছে (১) অ্যানোনিমাস, (২) কল্যাণী ইয়ুথ ফোরাম, (৩) কল্যাণী কলাসঙ্গম, (৪) কল্যাণী কোরাস, (৫) কল্যাণী টাউন ক্লাব, (৬) থিয়েটার মেকার্স, (৭) নান্দনিক, (৮) প্রতিবিম্ব, (৯) রঙ্গাজীব, (১০) রূপক, (১১) ওনলি থিয়েটার, (১২) থিয়েটার ওয়েভ।

১৯৮১ ও '৮২ সালে কল্যাণীতে সংঘটিত হয় গণনাট্য মেলা ও গ্রুপ থিয়েটার উৎসব। কল্যাণীতে আছে বিভিন্ন অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং বিভিন্ন পেশাগত সংস্থা থেকেও নাটক মঞ্চস্থ করার নজির।

অধুনা সজীব গণনাট্যের শাখা

- বহ্নি [কাটাগঞ্জ]-'হাজার হাতের গল্প' ওদের সফল প্রযোজনা।
- সুকুমার স্মৃতি [গয়েশপুর]-জেলার সুখ্যাত নাট্যদল
- ডমরু [চাকদহ]-সফল প্রযোজনা আজও ইতিহাস 'হল্লাবোল'।

ছবি : সত্যেন মণ্ডল

- অভীক [মদনপুর]
- স্ফুলিঙ্গ [সগুনা]
- অগ্নিবীণা [চাকদহ]
- কোরাস [মাজদিয়া]
- চাঁদের ঘাট শাখা [চাঁদের ঘাট]
- মডেনা [কৃষ্ণনগর]
- মিলিত কণ্ঠ [কৃষ্ণনগর]
- পদাতিক [কৃষ্ণনগর]
- গণ সংস্কৃতি [বেথুয়াডহরি]
- দিশারী [শিমুলতলা]-উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'থিয়েটারের বিড়ম্বনা'।

গ্রুপ থিয়েটারের আদি ও অনাদি সমস্যা যা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দেখা যায় তা নদিয়া জেলাতেও আছে। কৃষিনির্ভর এই জেলায় আছে হাজারো সমস্যা। সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় অন্য রকমের সমস্যাও আছে এখানে। এই জেলায় মাঝে মাঝে সমবেত নাট্যপ্রয়াস দেখা গেলেও আবেগকে ধরে রাখার মতো সাংগঠনিক শক্তির দেখা মেলে না। তবু এইটাই ঘটনা, নদিয়া জেলাতেই বারবার নাট্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। নিয়মিতভাবে না হলেও এই জেলার নানা প্রান্তে লেখকশিল্পীর সমাবেশ ঘটে, নাট্যচক্র তৈরি হয়, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের পদার্পণ ঘটেছে বারে বারে। এই জেলা উপহার দিয়েছে বিশিষ্ট নট, নাট্যকার, নাট্য গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাঁদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এই জেলার জন্য ওয়ার্কশপ করেছেন অন্তত দু-বার। আকাদেমির 'বলিদান' প্রদর্শিত হয়েছে কৃষ্ণনগরে। সফদার হাসমির স্মরণসভা হয়েছে নদিয়ায় ; 'হল্লাবোলের' অভিনয় হয়েছে। কৃষ্ণনগরে, নবদ্বীপে অভিনয় করে গেছেন ভারতীয় নাট্যজগতের গৌরব হাবিব তানবির। 'অপুর সংসার' ছবিটি তুলতে এসে অভিভূত হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় ; গণনাট্যের শিল্পীরা তরুণ পরিচালক সত্যজিৎকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন স্মৃতিচারণার সূত্রে নির্মাল্য আচার্য বলেছেন,—'তা ভোলবার নয়'।

উল্লেখপঞ্জী

(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাণখণ্ড
(২) চৈতন্যভাগবত - বৃন্দাবনদাস
(৩) চৈতন্য চরিতামৃত - কৃষ্ণদাস কবিরাজ
(৪) চৈতন্যমঙ্গল - লোচন দাস
(৫) চৈতন্যমঙ্গল - হরিচরণ দাস
(৬) জাতিবৈষ্ণব কথা - অজিত দাস
(৭) নদীয়া কাহিনী - কুমুদনাথ মল্লিক
(৮) ভারতকোষ, তিন
(৯) মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য - আবুল আহসান চৌধুরী
(১০) আমার কথা ও অন্যান্য - নটী বিনোদিনী
(১১) নদিয়া উনিশ শতক - মোহিত রায়
(১২) যাত্রাগানে মতিলাল রায় - হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
(১৩) বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস - অজিত ঘোষ
(১৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ - সুধীর চক্রবর্তী
(১৫) সংলাপ (কৃষ্ণনগর) ২৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা
(১৬) নদিয়ার থিয়েটার - অরুণ ভট্টাচার্য
(১৭) বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার (১) - প্রসূন মুখোপাধ্যায়
(১৮) গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, গণনাট্য সঙ্ঘ।

স্বীকৃতি

ভূতনাথ পাল, বিশ্বেন্দু রায়, শতঞ্জীব রাহা, বাসুদেব মণ্ডল, অম্বুজ মৌলিক, রঘুবীর নারায়ণ দে, সত্যেন মণ্ডল, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যুত হালদার, অনিরুদ্ধ মোদক, বিভাস চক্রবর্তী, দেবাশিস ঘোষ, পরিমল ঘোষ, বিশ্বনাথ সাহা, জেলা তথ্য আধিকারিক।

নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা: উন্মেষ-বিকাশ-প্রত্যাশা-প্রাপ্তি

কিশোর সেনগুপ্ত

কথারম্ভ

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন :

> 'কৃষ্ণনগর এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত, যাকে একই সঙ্গে বাঙলার হৃদয় ও মস্তিষ্ক বলা চলে। ...কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি অবস্থিত স্থানগুলি, যেমন নবদ্বীপ, উলা, বীরনগরের বাংলা সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক, জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তির এবং মননের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ...ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কয়েকটি প্রজন্ম ধরে নদিয়ার শান্তিপুরের বাচনভঙ্গিকে বাংলাভাষায় বাচন-সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। তার কারণ, এখানে বিকশিত হয়েছেন বহু প্রতিভাবান লেখক।'[১]

নদিয়া জেলার প্রাণকেন্দ্র কৃষ্ণনগর সম্পর্কে সুনীতিকুমারের এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে এই জেলার বিবিধ সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে। সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, সর্বোপরি সমাজমুখী কৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকার গুরুত্বও অপরিসীম। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার উন্মেষ হয়েছে এই জেলায়। সেগুলোর অধিকাংশই ক্ষণজন্মা ; অর্থাভাব এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আজ অবলুপ্ত। কিন্তু

এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, আজও, নতুন নতুন প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির ঘোষণা করে নতুন নতুন পত্রিকার জন্ম হয়ে চলেছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট বা কল্যাণীকেন্দ্রিক নয়, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় ও তার সযত্ন লালনে উদ্যোগী হয়েছেন আসাননগর, বীরনগর, তেহট্ট, বেথুয়াডহরি, পলাশী, বাদকুল্লা বা আড়ংঘাটার মতো গ্রাম এলাকার মানুষজনও। গত দু'দশক ধরে এই উদ্যোগ-আয়োজনের আন্তরিকতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় ক্ষমতাসীন জনমুখী সরকারের সর্বস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলপ্রসূ রূপটি। পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সংগঠিত প্রচেষ্টার নেপথ্যে চেতনাবিকাশ ও শিক্ষা প্রসারের একটা ভূমিকা, অপ্রত্যক্ষ হলেও আছে।

ঐতিহ্যবাহী নদিয়া জেলার অতীত ও বর্তমান পত্র-পত্রিকার সামগ্রিক ইতিহাস রচনার কাজ এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্যক্তিগত ভালবাসা ও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার তাগিদে কেউ কেউ এ কাজে এগিয়ে এলেও, উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং পরিশ্রমী অনুসন্ধানের অভাবে তাঁদের উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। নদিয়া জেলার মতো একটি প্রাচীন, ঘটনাবহুল ও ঐতিহ্যবাহী জনাঞ্চলে এ যাবৎ প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজটি দুরূহ—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘ গবেষণা, প্রকৃত দায়বদ্ধতা এবং এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল মানুষের সঙ্গে মিলিতভাবে পরিকল্পনা করে এগোতে পারলে, নিষ্ঠাবান কোনও গবেষক এ কাজ করতে পারবেন বলেই মনে হয়। বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সেগুলোর সন্ধান করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা গেলে শুধু পত্র-পত্রিকার ইতিহাসই নয়, উদঘাটিত হবে নদিয়া জেলার সামগ্রিক গৌরবোজ্জ্বল অতীত এবং বর্তমানের নানাবিধ অভিজ্ঞতা।

ইতিহাস রচনার কাজ একেবারেই হয়নি এরকম কথা বলা ঠিক হবে না। নদিয়া জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির তালিকা প্রণয়ন, প্রদর্শনী, আলোচনাসভা সংগঠিত করার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। কৃষ্ণনগরের একটি প্রকাশিত সংস্থা 'সুপ্রকাশ' থেকে ১৯৯৪-এ প্রকাশিত হয়েছে জয়ন্ত দালাল লিখিত *নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা*। জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে তা পূর্ণাঙ্গ না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৭ সালে জেলার প্রবীণ সাংবাদিক কালীপ্রসাদ বসু এবং ১৯৮৮ সালে স্বরাজ রায় কৃত পত্র-পত্রিকার তালিকাদু'টিও উল্লেখযোগ্য কাজ। এ ছাড়াও চাকদহের 'বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারে'র পরিচালনায় পাঠাগার সংলগ্ন পাঠকক্ষে, ১৯৮৭'-র ডিসেম্বর মাসে 'নদিয়া জেলা পত্র-পত্রিকা পরিষদের' উদ্যোগে চাকদহে, ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কল্যাণী বইমেলা প্রাঙ্গণে বিশেষ 'নদিয়া প্যাভিলিয়নে' নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন বিভিন্ন সময়ে মাজদিয়া, নবদ্বীপ, বড় আন্দুলিয়া, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি অঞ্চলে স্থানীয় সংস্কৃতিবান উৎসাহীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রদর্শনীগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রদর্শন সেগুলোতে হয়েছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

সুনীতিকুমারের কথার সূত্র ধরে এগোতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কথা। প্রতিভাবান ও কৃতবিদ্য এই মানুষটি বিকশিত হয়েছেন নদিয়া জেলাতেই। ঈশ্বর গুপ্ত নদিয়ার কাঞ্চনপল্লীর (বর্তমান গ্রাম কাঁচরাপাড়া অঞ্চল) বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরই সম্পাদনায় ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ কলকাতা থেকে
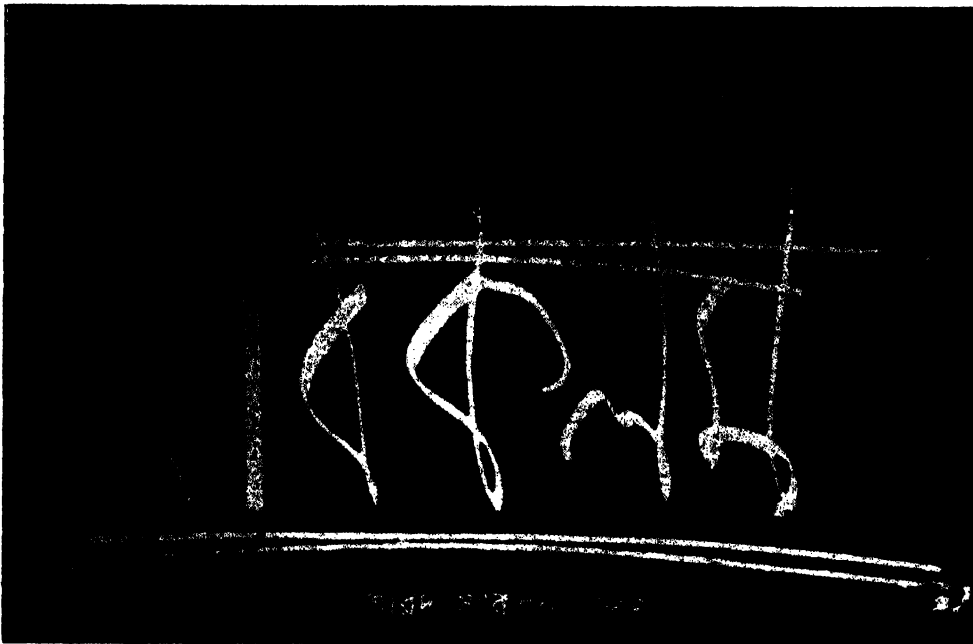
আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক *সংবাদ প্রভাকর*। কয়েক বছর সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে তা পরিণত হয় দৈনিক পত্রিকায়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা এই *সংবাদ প্রভাকর*। ১৮৪৭-এর আগস্ট মাসে তাঁর সম্পাদনায় আর একটি সাপ্তাহিক *সংবাদ সাধুরঞ্জন* প্রকাশিত হয়। কাঞ্চনপল্লীরই প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক *সম্বাদ সুধাকর* প্রকাশিত হয় ১৮৩১-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি। *সর্ব্বশুভকরী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা নদিয়ার বিল্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় আগস্ট ১৯৫০-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত সবক'টি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক নদিয়াবাসী হলেও প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে।

নদিয়া জেলার হরিণঘাটা থানা এলাকার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষীসভা'-র পক্ষ থেকে ১৮৫৩-র এপ্রিল মাসে *ছোট জাগুলীয়া হিতৈষীসভার বক্তৃতা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে তার নতুন নাম হয় *ছোট জাগুলীয়া হিতৈষী মাসিক পত্রিকা*। পত্রিকাটি ছাপা হত কলকাতা থেকে। নদিয়ার কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ১৮৬৩-র এপ্রিল মাসে প্রকাশ করেন মাসিক *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*। প্রথমাবস্থায় এটিও ছাপা হত কলকাতায়। পরে ১৮৭৩-এ নিজগ্রাম কুমারখালিতে তিনি 'মথুরানাথ যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে মুদ্রিত হয়ে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। হরিনাথ মজুমদার তাঁর দিনপঞ্জিতে পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় সম্পর্কে বলেছেন :

> 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া... গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকার কার্য আরম্ভ করিলাম।' নির্ভীক সাংবাদিকতার আদর্শ এই পত্রিকায় তৎকালীন নীলকর ও জমিদারদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর প্রকাশিত হত।

ভৌগোলিকতার নিরিখে যদুনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত *ভারত পরিদর্শন* এই জেলার প্রথম পত্রিকা। সাপ্তাহিক *ভারত পরিদর্শন* শান্তিপুরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে হরলাল মৈত্র প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা 'কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র' থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৫ জুন ১৮৬৩-তে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫-তে ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রঙ্গভূমি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে রামলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৮৭৪-এ প্রকাশিত হয় *সরোজিনী* মাসিক পত্রিকা এবং ১৮৮৩-তে স্থাপিত 'হিতকারী যন্ত্র' নামের ছাপাখানা থেকে ছেপে ওই বছরই শ্যামাচরণ সান্যাল সম্পাদিত *ভারতভূমি* ও মাসিক *মুদ্গর* প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের এই পর্বের ইতিহাসে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে নতুন নতুন মুদ্রণালয় স্থাপনের নিবিড় যোগটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত *আজিজন নেহার* ১৮৭০ এবং পাক্ষিক *'হিতকারী* ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত নদিয়ার কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। নদিয়া জেলার উল্লেখযোগ্য অতীত
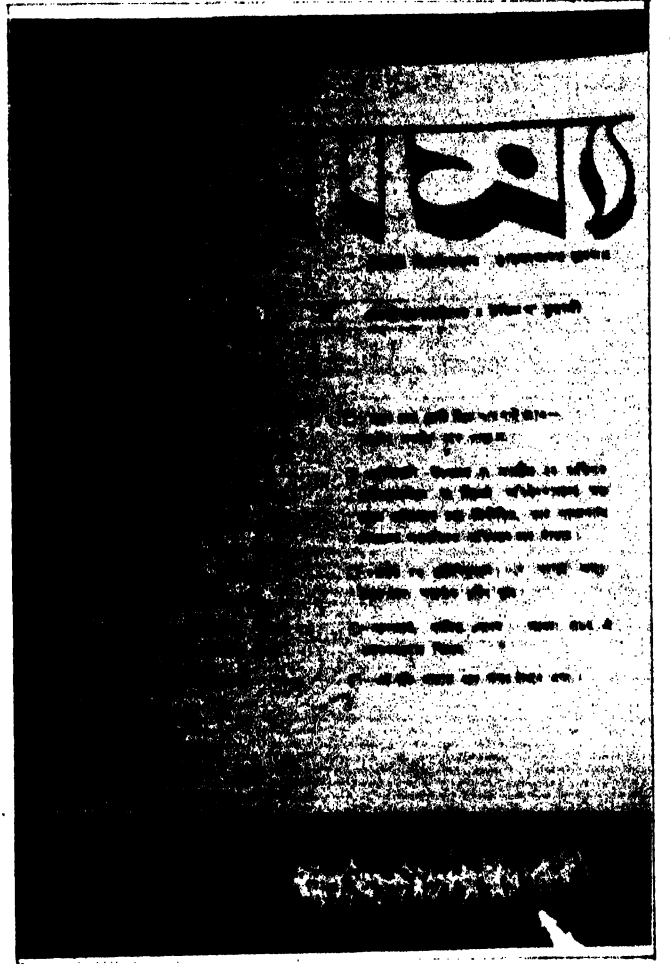
পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ছিল না বলেই মনে হয়। মশাররফ হোসেন সম্পাদিত *হিতকরী* পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিনাথ মজুমদার। আবার কুমারখালিতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রেস 'মথুরানাথ যন্ত্র' থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৮৯৮-এ প্রকাশিত হয় রওশন আলি চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র *কোহিনুর*। রাধাবিনোদ সাহা সম্পাদিত *বঙ্গীয় তিলিসমাজ* পত্রিকাটিও মুদ্রিত হয় একই ছাপাখানায়।

১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুর ও নবদ্বীপ থেকে *যুবক* ও *নিত্যধর্ম্ম* নামে দু'টি মাসিক ধর্মীয় পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে শান্তিপুরে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত মাসিক *লহরী* প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ১৯০৩-এ শান্তিপুরে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *বঙ্গলক্ষ্মী*; সম্পাদক ছিলেন মন্মথনাথ দাস। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সাপ্তাহিক *বাঙ্গালা* ১৯০৫-এ হরেন্দ্রনাথ মৈত্রর সম্পাদনায় শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়।

রানাঘাটের 'চৈতন্য প্রেস' থেকে মুদ্রিত ও ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মাসিক *পল্লীচিত্র* সে সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

বিধুভূষণ বসু ছিলেন এটির সম্পাদক। তাঁর কথায় :

'পল্লীবাসীর অভাব-অভিযোগ দুঃখদুর্দশার বিবরণ প্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রকাশ।'

জাতীয়তাবাদী রচনাদি প্রকাশের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি রাজরোষের শিকার হয়। সম্পাদক বিধুভূষণ গ্রেপ্তার হন। ১৯০৯ সালে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯১১ থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে *পল্লীচিত্র* পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে।

নদিয়ার অতীত ও বর্তমানের সংযোগসাধনকারী প্রতিনিধিস্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা *বঙ্গরত্ন*। কানাইলাল দাস প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটি ১৯০৭-এর ১ জানুয়ারি কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়ে বর্তমানেও অনবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ১৯০৯-এ রানাঘাটে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *বার্তাবহ*। এই পত্রিকাটিও অদ্যাবধি তার ধারাবাহিক প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের এই দুরন্ত স্ফুরণের সময়েও মফস্বল অঞ্চলের দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শতাব্দী অতিক্রম করতে চলেছে—এ এক বিরল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

নদিয়া জেলার প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক *মাহিষ্য মহিলা* প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। সম্পাদনা করেন কৃষ্ণভাবিণী দাসী। 'নদিয়া সাহিত্য সম্মিলনী'-র মুখপত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা *সাধক* সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় দারিয়ারপুর থেকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে অনধিক দু'বছর ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অবিভক্ত নদিয়ার কুষ্টিয়া থেকে ১৯২১-এ জননেতা হেমন্তকুমার সরকারের সম্পাদনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্রর সহ-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *জাগরণ*। ১৯৬৫-তে তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন আয়ুব নেতৃত্বের সমালোচনার জন্য সরকারি কোপানলে পড়ে *জাগরণ* নিষিদ্ধ হয়। সে সময় সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশীদ চৌধুরী। কফিলুদ্দিন আহ্মদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক *আজাদ* কুষ্টিয়া থেকে ১৯২১-এ প্রকাশিত হয়।

মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে 'নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস মুদ্রণালয়' স্থাপিত হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮-এ প্রকাশিত হয় ধর্মীয় দৈনিক *নদীয়া প্রকাশ*। ধর্মীয় পত্রিকা হলেও *নদীয়া প্রকাশের* ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এটিই নদিয়া জেলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদনা করতেন প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *বিশ্ববাণী*। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সমর্থন প্রকাশের কারণে শাসক ইংরেজ সরকার *বিশ্ববাণী* প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করে। অদম্য দেবেন্দ্রনাথ এই নিষিদ্ধকরণে এতটুকু বিচলিত না হয়ে ১৯৩২-এ প্রকাশ করেন পাক্ষিক *দীপিকা*। ২৫ বছর ধরে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ওই একই বছরে ধর্মদহ থেকে উপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধাংশুকুমার বসুর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *দীপশিখা*। মোহম্মদ আবুবকর সম্পাদিত পাক্ষিক *সন্ধানী* কুষ্টিয়া থেকে ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হয়। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পত্রিকাটি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অল্পবয়সীদের জন্য প্রথম পত্রিকা *কচিকথা* ১৯৩৭-এ অনিলকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত রানাঘাট থেকে ১৯৩৫-এ প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক *নদীয়ার বাণী*। কবি হেমচন্দ্র বাগচী ১৯৪১-এ প্রকাশ করেন মাসিক *বৈশ্বানর*। নিয়মিতভাবে মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪২-এ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক *কালের ভেরী* প্রকাশিত হয় নবদ্বীপ থেকে। তৎকালীন 'নদীয়া জেলা বোর্ডে'-র পক্ষ থেকে ১৯৪৪-এ খানবাহাদুর শামসুজ্জোহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *নদীয়া জেলা বোর্ড*। সঠিক সূচনাবর্ষ জানা না গেলেও ওই চারের দশকেই প্রগতিশীল একদল ছাত্র ও তরুণ মিলিত উদ্যোগে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশ করেন *অভিযান* ও *সংগ্রাম*। প্রথমটি স্বল্পায়ু হলেও *সংগ্রাম* প্রায় দু'বছর চলে। উল্লেখ্য যে, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হলেও পত্রিকা প্রকাশের কোনও উদ্যোগ গৃহীত হয়নি দীর্ঘকাল। ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে হেমন্তকুমার সরকারের সম্পাদনায় *কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা* প্রথম প্রকাশিত হয়। ঠিক ১ বছর আগেই, ১৯১৪-তে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকা।
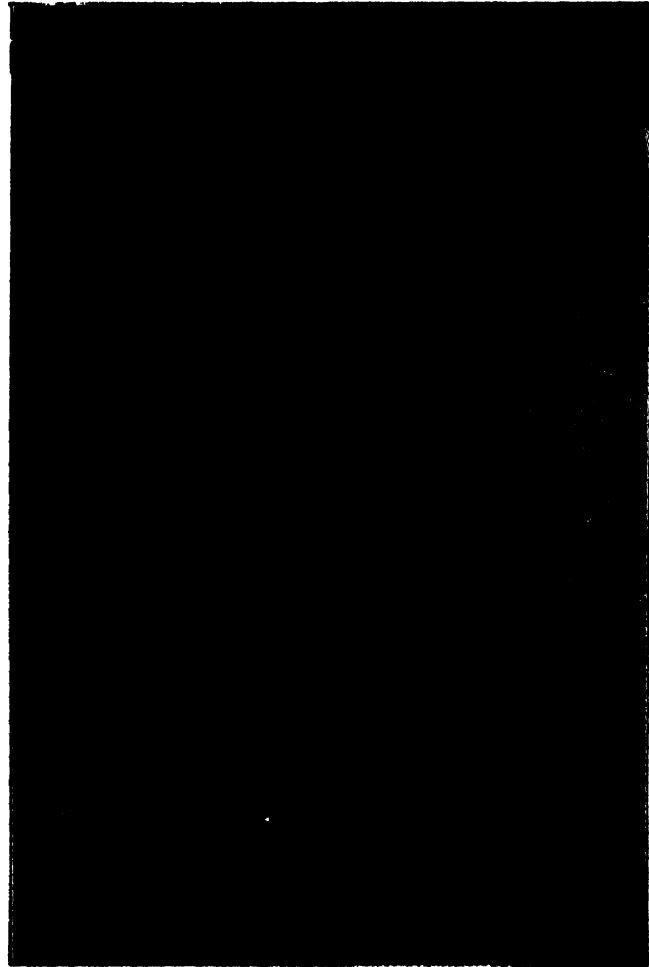
স্বাধীনোত্তর সময়

পত্র-পত্রিকা প্রকাশের এই বহতা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার জন্ম নদিয়া জেলাতে হয়েছে। তাদের উদ্ভব ও বিকাশ মিলিতভাবে অগণন সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে এক বিরাট প্রত্যাশার জন্ম দিলেও তা পূরণ করতে সমর্থ হয়নি। একথা স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই যে, এইসব পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই দৃষ্টিনন্দন তো নয়ই, এমন কি প্রকাশিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধগুলিও নিম্নমানের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি দায়সারা গোছের, বাজারি ছাঁচে ঢালা। প্রুফ রিডিং-এর ক্ষেত্রে অসতর্কতার কারণে অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ রসাস্বাদনে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এদের অভীষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধোঁয়াশা থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো নদিয়া জেলাতেও নানা পর্যায়ে নানাবিধ রাজনৈতিক ঘাত- প্রতিঘাত দেখা গিয়েছে। সীমান্ত জেলা হওয়ার কারণে অনুপ্রবেশ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। নীল বিদ্রোহের পীঠস্থান নদিয়া জেলা এই সেদিন অনুরণিত হয়েছে খাদ্য আন্দোলন বা তথাকথিত 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার' ফাঁপা স্লোগানে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট শাসনক্ষমতায় আসার পর দু'বছর যেতে না যেতেই জাতিদাঙ্গার ব্যর্থ চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিল কিছু মানুষ, কয়েকটি অঞ্চল। সামন্তপন্থী ধ্যানধারণার বেশ কিছু উচ্ছিষ্ট এখনও এই জেলার পুরনো শহরগুলোতে উগ্রভাবে বিদ্যমান। নদিয়ায় প্রকাশিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোতে এইসব সমস্যা এবং বিষয়কে উপজীব্য করে সচেতন চর্চার ইচ্ছে প্রকাশ পেলেও তা যথেষ্ট গবেষণা এবং গুরুত্বের অভাবে কার্যত উদ্দেশ্যবিহীন পথাভিমুখী হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জেলায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু, লেখক নির্বাচন থেকে শুরু করে 'টোটাল গেট আপ'-এর প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য প্রথম সারির ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার পাশে অনায়াসে জায়গা করে নিতে পেরেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব সিরিয়াস পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই হয় বিলুপ্ত অথবা ধারাবাহিকতার অনিয়মজনিত কারণে মুমূর্ষু। পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অবলুপ্তির নেপথ্যে একাধিক কারণ আছে, যা উপেক্ষণীয় নয় একেবারেই। সুতরাং, ঐতিহাসিকতার বিচারে পত্র-পত্রিকাগুলোকে তাদের প্রাপ্য গুরুত্ব দিতেই হবে, কেননা, অপরিকল্পিত হলেও যে-কোনও পত্রিকা প্রকাশের পিছনে আছে পরিশ্রম আর ত্যাগস্বীকারের অজানা ইতিহাস।

১৯৪৬ এবং '৪৭ সালে *অভিযান* ও *অভিযাত্রী* নামে দু'টি পত্রিকা কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়। *অভিযানের* যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন ফণী রায় এবং বিভূপদ বিশ্বাস। *অভিযাত্রী* ছিল কিশোর পত্রিকা। ১৯৫০-এ নবপর্যায়ে মোহিত রায়ের সম্পাদনায় *অভিযাত্রী* পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা *লেখা ও রেখা*। একটি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে পত্রিকাটি বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। ২০ বছর ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে *লেখা ও রেখা* বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণনগরে শমীরেন্দ্র সিংহরায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক *নদীয়া মুকুর* ১৯৫৭-তে প্রকাশ হয়ে এখনও অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। নদিয়া জেলার খেলা ও তৎসম্পর্কিত খবরাখবর সংবলিত পাক্ষিক District Sports News ১৯৬৮-তে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণনগর থেকে। সম্পাদক ছিলেন বদরুদ্দিন আহমেদ। এখনও সেটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে; বর্তমান সম্পাদক গোবিন্দ দত্ত। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পাক্ষিক *মুক্তিযুগ* প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও সেটি প্রকাশিত
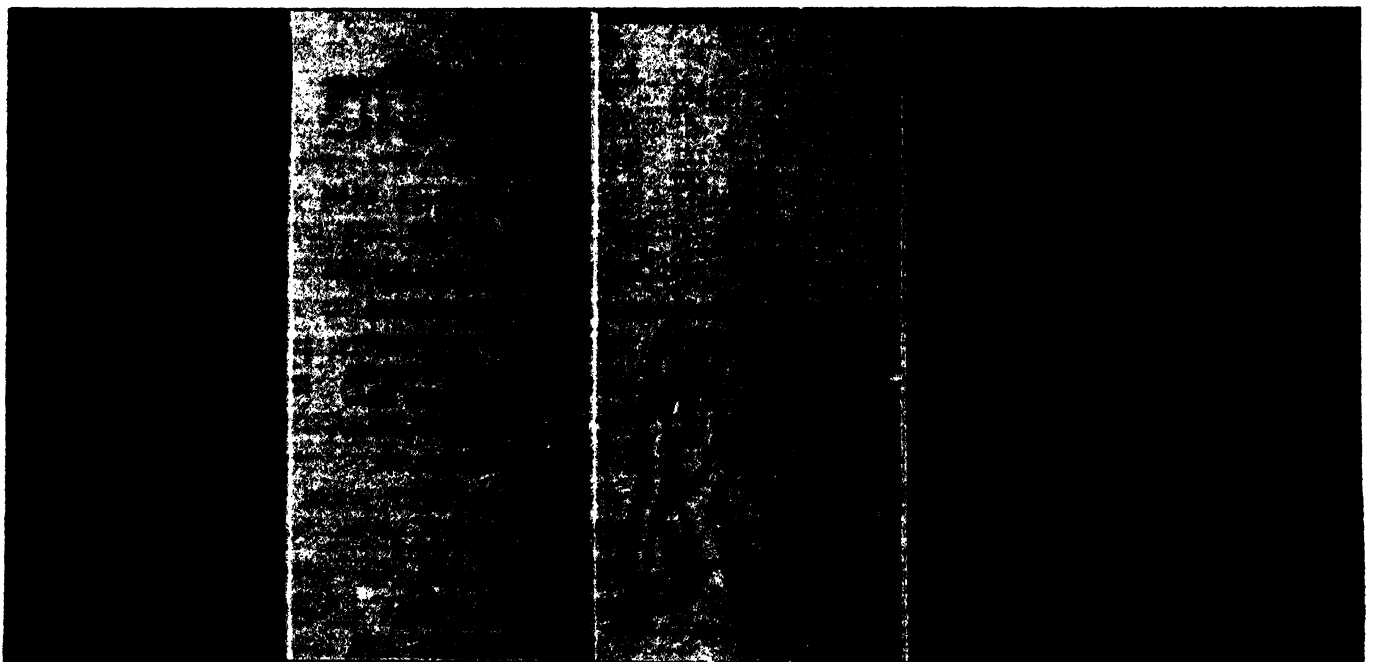
হচ্ছে ত্রৈমাসিক হিসেবে। নদিয়া জেলায় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক *গ্রাম গ্রামান্তর* শতঞ্জীব রাহার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমানেও এর প্রকাশ অব্যাহত। এখন সম্পাদনা করেন চন্দনকান্তি সান্যাল। গ্রামীণ খবরাখবর, তদন্তমূলক রিপোর্টিং প্রকাশের ক্ষেত্রে *গ্রাম গ্রামান্তরের* যত্নবান প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পশ্চিমবাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা নদিয়ার করিমপুর। করিমপুরে ১৯৮০ সালে তমেশ পালের সম্পাদনায় পাক্ষিক পত্রিকা *পল্লীর কণ্ঠস্বর* প্রকাশিত হয়ে এখনও ধারাবাহিকভাবে চলছে। অমলকুমার সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক *চাষীভাই* প্রকাশিত হয় ১৯৭৬-এ পত্রিকাটি এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে অজয়কুমার সরকারের সম্পাদনায়।

রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *জল সারেঙ* ১৯৫৬-তে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়ে পরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, শান্তিপুর শাখা ওই একই বছরে *অরণি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে।

পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নবদ্বীপও পিছিয়ে ছিল না। অসংখ্য ধর্মীয় পত্রিকার জন্ম হয়েছে এই শহরে। ১৯৫৬-তে

প্রকাশিত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *বোধন* নবদ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডুর সম্পাদনায় সংবাদ সাপ্তাহিক *নবদ্বীপ বার্তা* এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়াও অরুণ বসু সম্পাদিত *অমর দশক* প্রকাশিত হয় ১৯৬৬-তে ; ১৯৬৯-এ *তর্জনী* প্রকাশিত হয় জয়দেব পাণ্ডের সম্পাদনায় ; ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় *তিমিরারি*, সম্পাদক ছিলেন তপন ভট্টাচার্য। *তর্জনী* নবদ্বীপ থেকে আজও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৮৩ সালে জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পসমৃদ্ধ সীমান্ত শহর কল্যাণী থেকে প্রকাশিত হয় সুশীলকান্ত কোনার সম্পাদিত পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইংরেজি পত্রিকা *Environment and Ecology.* এই পত্রিকার প্রকাশ বর্তমানে বন্ধ। সুশীলকান্ত কোনার সম্পাদিত আর একটি পত্রিকা *মাছ* ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়ে এখনও নিয়মিত চলছে। সুপ্রভাত সিদ্ধান্ত সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা *কল্যাণী বার্তা* প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। বেশ কয়েক বছর নিয়মিতভাবে চলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সগুনা থেকে সীতাংশু গোস্বামী সম্পাদিত ও ১৯৮৪-তে প্রকাশিত পাক্ষিক *প্রতিকৃতি* বর্তমানে বন্ধ। প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে কল্যাণী থেকে ১৯৮২-তে প্রকাশিত হতে থাকে 'সংস্কৃতি সংগ্রামের' প্রতি দায়বদ্ধ ত্রৈমাসিক *প্রতিভাস*। সম্পাদক ছিলেন শতঞ্জীব রাহা। তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *১৪০০ সাল* ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয়ে নিয়মিতভাবে চারটি সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ১৯৭৭-এ অমূল্য মণ্ডল সম্পাদিত *প্রগতি বার্তা* প্রকাশিত হয় কল্যাণী থেকে। এই পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত। কল্যাণী পৌরসভা এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কল্যাণী কমিটির উদ্যোগে গঠিত 'কল্যাণী নাট্যোৎসব কমিটি'র বার্ষিক পত্রিকা *নাট্যমনন*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন নাট্যকার সমীর দাশগুপ্ত।

চাকদহ থেকে সুবোধ বসুর সম্পাদনায় ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় *নূতন প্রভাত*। প্রবোধচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা *উদয়ন* প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। সাপ্তাহিক পত্রিকা *চাকদহ বার্তা* প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে ; যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন তপন দত্ত ও স্বপন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৬-এ সুকান্ত ঘোষ চৌধুরী ও সরোজমোহন চক্রবর্তীর যুগ্ম সম্পাদনায় মাসিক *কুরুক্ষেত্র* এবং ১৯৭৭-এ তিপু দাস সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *সন্নত* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাদু'টি এখন অবলুপ্ত। চন্দন সেন সম্পাদিত *শাণিত সায়ক* প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। তপনকুমার দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *সুখচ্ছায়া* ১৯৮৩-তে প্রথম প্রকাশিত হয়ে এখনও অব্যাহত। সুনীলচন্দ্র দাস সম্পাদিত *নবপ্রবাহ* প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। বর্তমানে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে *লঘুছন্দা*। এই পত্রিকাটির প্রকাশ নিয়মিত।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রানাঘাট শহরের। বিভিন্ন প্রকাশ-পর্যায়ের একগুচ্ছ সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় এই শহর থেকে। জেলার অন্য কোনও অঞ্চল থেকে সম্ভবত এতগুলো সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক প্রকাশিত হয় না। কালিকা বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক *ফ্লাশ* ১৯৭৮-এ রানাঘাটে প্রকাশিত হয়ে
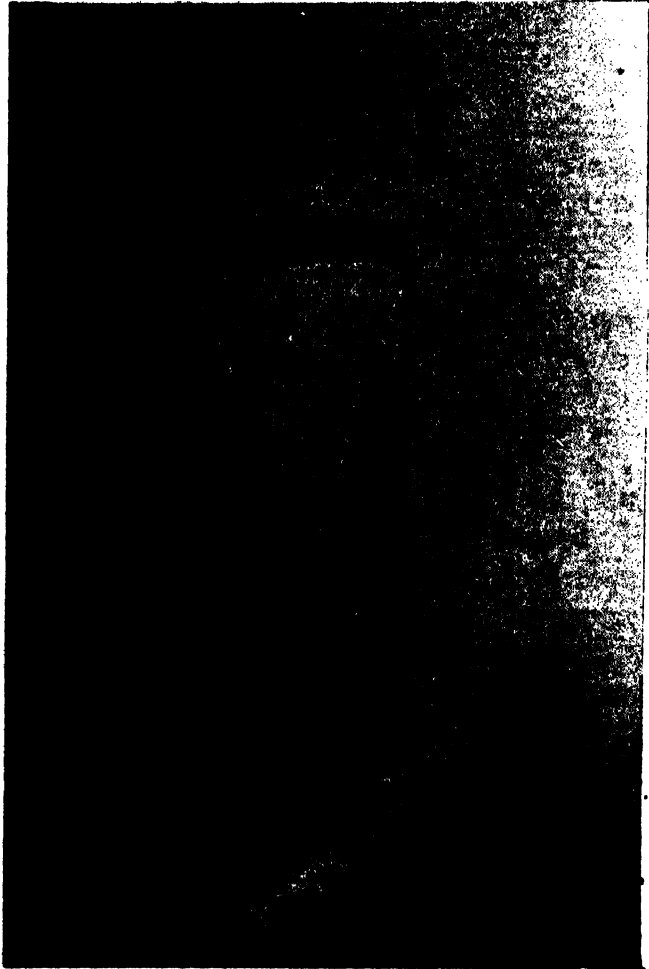
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১৭ বছর চলেছিল। নিয়মিতভাবে বর্তমানেও রানাঘাট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল—ঈশান দে এবং সুধাময় দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৭৬-এ প্রকাশিত *জীবনের উৎস*; শতদল দত্ত, প্রদীপ চক্রবর্তী এবং নির্মলেন্দু সিমলাই সম্পাদিত ১৯৭৬-এ প্রকাশিত সাপ্তাহিক *চ্যালেঞ্জ*; কানাই মিত্র সম্পাদিত ১৯৭৭-এ প্রকাশিত পাক্ষিক *সবুজ সোনা*; প্রদীপ চৌধুরী সম্পাদিত ১৯৮২-তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *চূর্ণী*; অশোক দত্ত সম্পাদিত ১৯৮৫-তে প্রকাশিত পাক্ষিক *স্রোতস্বণী*; তরুণকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ১৯৮৮-তে প্রকাশিত পাক্ষিক *আলোকবর্ষ* এবং ওই একই বছরে প্রকাশিত রূপম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *নির্জন*।

ঐতিহ্যবাহী শান্তিপুর শহরে পত্র-পত্রিকার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। নদিয়ার প্রথম পত্রিকা *ভারত পরিদর্শন* শান্তিপুর থেকেই প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরে ১৮৬৩ সালে হরলাল মৈত্র প্রতিষ্ঠিত প্রেস 'কাব্য প্রকাশ যন্ত্র' থেকে তা ছাপা হয়েছিল। অতীত ঐতিহ্যের পথ ধরে বর্তমানেও এই শহরে সাময়িক ও ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার আন্দোলন অব্যাহত। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক *জনতার মুখ।* প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের জন্য সংগ্রাম, নির্ভীক সাংবাদিকতা এবং সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা একদিকে যেমন এর জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি স্বৈরাচারীদের করে তোলে আতঙ্কগ্রস্ত। আলোক-বিরোধী কিছু গুণ্ডার আক্রমণে ১৯৭৩ থেকে বন্ধ হয়ে যায় *জনতার মুখ।* এর পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী, জিতেন মৈত্র, মিহির খাঁ, ধীরানন্দ রায় প্রমুখের মতো কৃতবিদ্য মানুষরা। সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত জীবনমুখী পত্রিকা *নতুনের সন্ধান* নিয়মিতভাবে ১৯৮৭ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিপুরের নিকটবর্তী বর্ধিষ্ণু গঞ্জ এলাকা ফুলিয়া। কবি কৃত্তিবাস স্মৃতিবিজরিত ফুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক পত্র-পত্রিকা। ১৯৯৪ সাল থেকে বিকাশ বিশ্বাস সম্পাদিত পাক্ষিক *নদিয়ার প্রতিনিধি* প্রকাশিত হচ্ছে এই শহর থেকে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ হস্তশিল্প তাঁতশিল্প। তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-শ্রমিকদের একান্ত নিজস্ব দ্বিমাসিক *টানাপোড়েন* ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে প্রায় ১২ বছর নিয়মিতভাবে চলে। যৌথ সম্পাদনায় ছিলেন হরিপদ বসাক এবং বলরাম বসাক। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের সমস্যাবলীকে উপজীব্য করে প্রবন্ধ-আলোচনা এই পত্রিকার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলাভাষায় *টানাপোড়েনের* মতো পত্রিকার দৃষ্টান্ত বিরল।

☐ কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (এলাকাভিত্তিক)

কৃষ্ণনগর

নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর থেকে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস এম শরিফের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৭১-এ প্রকাশিত হয় মাসিক *অনুস্বর-বিসর্গ*। 'তথাকথিত এসট্যাবলিশ্ডদের' 'একহাত' চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'তরুণদের' পত্রিকা *অনুস্বর-বিসর্গ* বেশিদিন না চললেও প্রকাশিত সংখ্যাগুলির বেশ কিছু গল্প-কবিতায় মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। মজনু মোস্তাফা, আবুল আহ্সান চৌধুরী, দেবদাস আচার্য প্রমুখ কৃতবিদ্য কবি-প্রাবন্ধিকের লেখায় সংখ্যাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ত্রৈমাসিক *উত্তরণ* অনিল দাসের সম্পাদনায় ১৯৮২-তে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে কবিতা। উদ্যমী অনিল দাসের সম্পাদনায় আর একটি ত্রৈমাসিক *লেখক বাংলো* ১৯৮৪-তে প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েকটি সুখপাঠ্য কবিতা এবং গল্প প্রকাশিত হয়েছে সংখ্যাগুলিতে।

কৃষ্ণনগর শহরে প্রকাশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য মাসিক হল *প্রসব*। স্বপনবরণ আচার্য সম্পাদিত এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে *প্রসবের* বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সংখ্যাগুলির অপ্রচলিত আকারের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। কবিতা সংখ্যা,সত্যজিৎ রায় সংখ্যা সহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি গবেষণাধর্মী ও তথ্যনিষ্ঠ।

কৃষ্ণনগর থেকে গদাধর সরকারের সম্পাদনায় *ছড়াপাখী* প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। প্রথমাবস্থায় পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে হাতে লেখা ও চিত্রাঙ্কিত। কেবলমাত্র ছড়ার পত্রিকা *ছড়াপাখী* পরবর্তীতে চিত্রসমৃদ্ধ ও মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। আজকের নীতিবোধ-বিবর্জিত পারিপার্শ্বিকতায় *ছড়াপাখী* বাচ্চাদের উপযোগী ছড়া প্রকাশে ব্রতী হয়ে জেলার সংস্কৃতিচর্চায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পেরেছে। স্থানীয় ছড়াকাররা ছাড়াও কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রীতিভূষণ চাকী, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখের ছড়াও প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির সংখ্যাগুলিতে। *ছড়াপাখী* ১৪০০ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত এমন একটি ছড়া হল—

'ছড়াপাখী শুনবে নাকি
এই শহরের ছড়া ?
গাড়ি ঘোড়ায় বদ্ধ জীবন
ভাবনাটি মনগড়া।

সুদুর গাঁয়ে উড়াল দিয়ে
শহর ঘুরে যেও,
দেখতে পাবে মুখোশ সাঁটা
শহুরে সব গেঁও।'

গদাধর সরকার সম্পাদিত আর একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা *জলঙ্গী* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। ছড়া ও কবিতা পত্রিকা পরিচালনা এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে গদাধরের নৈপুণ্য ও মুনশিয়ানা প্রশংসনীয়। উল্লিখিত দু'টি পত্রিকারই প্রকাশিকা শীলা ভট্টাচার্য ; তাঁর অবদানও কম নয়।

কৃষ্ণনগরে রতন চক্রবর্তী সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *সাহিত্য দর্পণ* প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। শুধু কবিতাই নয়, প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই পত্রিকাটির আন্তরিকতা স্পষ্ট। *সাহিত্য দর্পণের* তৃতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যায় একই প্রবন্ধকারের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া একদিকে যেমন বিস্ময়কর, তেমনই অন্যদিকে প্রবন্ধ না-পাওয়ার সঙ্কটটিকেই বুঝিয়ে দেয়।

নবদ্বীপ

সুজিত সেন সম্পাদিত *হাওয়া* নবদ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রৈমাসিক। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। প্রবন্ধ প্রকাশে *হাওয়ার* উৎসাহ প্রতীয়মান। কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিতও হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার পরিচালনায় ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় বার্ষিক *গুব্ধি*। ১৪০১ বঙ্গাব্দের শারদ সংকলনে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে একটি নাটকও প্রকাশিত হয়।

চাপড়া

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে চাপড়া থেকে ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *আনন্দম্*। নিয়মিত প্রকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় আনন্দম্ সবসময় সচেষ্ট থেকেছে। এ পর্যন্ত পত্রিকাটির মোট বিয়াল্লিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪০৩ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখে ৪১তম *আনন্দম্* নব আঙ্গিকে অফসেটে ছেপে প্রকাশিত হয়। ৪২তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বাইশে শ্রাবণ। কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চাই নয়, *আনন্দম্*-কে কেন্দ্র করে চাপড়াতে গড়ে উঠেছে সাহিত্যানুরাগী মানুষের এক সম্মিলিত উদ্যোগ, যা লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে সমৃদ্ধতর করছে। ইতিমধ্যেই পত্রিকাটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে শতাধিক সাহিত্যসভা। ১৯৯৪ সালের ৬ মার্চ স্থাপিত হয়েছে 'আনন্দম্ লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি'। কবিতা প্রকাশ এবং গ্রন্থ-আলোচনা *আনন্দমের* প্রতিটি সংখ্যারই বৈশিষ্ট্য।

বাদকুল্লা

১৯৭৮ সালে প্রাণেশ সরকার সম্পাদিত মাসিক *কবিকলম* প্রকাশিত হয় বাদকুল্লা থেকে। পত্রিকাটি বর্তমানে চালু নেই। *কবিকলমের* প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যাই সযত্ন-সম্পাদিত। এ সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামী একসময় নিয়মিত এই পত্রিকায় লিখেছেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবান পুরনো রচনাও *কবিকলমের* শারদ সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সাহিত্যের এই তিনটি ধারাই সমান গুরুত্ব পেয়েছে *কবিকলমের* সংকলনগুলিতে।

বেথুয়াডহরি

বেথুয়াডহরিতে দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত *বনামী* প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক হলেও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। নদিয়া বইমেলা উপলক্ষে *বনামী*-র একাধিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প, কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধও স্থান করে নিয়েছে এই পত্রিকাটিতে।

কল্যাণী

সিরিয়াস পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা আছে নদিয়ার সীমান্ত শহর কল্যাণীর। ১৯৮৪ সালে এই শহর থেকে প্রকাশিত হয় সুপ্রভাত সিদ্ধান্ত সম্পাদিত *কল্যাণী বার্তা*। পত্রিকাটির বেশ কয়েকটি নজরকাড়া শারদ সংকলন এবং বিশেষ সংখ্যা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। অনিল বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় ঘোষ, তপোবিজয় ঘোষ, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, শতঞ্জীব রাহা প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধ করেছেন সংখ্যাগুলিকে। *কল্যাণী বার্তার* বিশেষ 'কার্ল মার্কস' ও 'ডিরোজিও' সংখ্যাটি অনন্য। দুঃখের বিষয় বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয় শতঞ্জীব রাহা সম্পাদিত *প্রতিভাস* ত্রৈমাসিক। এ যাবৎ প্রকাশিত এই পত্রিকার একটি বাদে সবক'টি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছে কল্যাণী থেকে। শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অসিতকুমার দে-র সম্পাদনায় দুর্গাপুর থেকে। লিখনশৈলী, বিষয়বস্তু নির্বাচন, আলোচনার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় এই শেষ সংখ্যাটি *প্রতিভাসের* অনন্য ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে

উপস্থিত করতে পারেনি। পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় (প্রথম বর্ষ : প্রথম ও বিশেষ গল্প সংখ্যা) স্পষ্ট সম্পাদকীয় ঘোষণা ছিল :

> 'সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যই, বা সাহিত্যচর্চা কেবলমাত্র আত্মপ্রকাশের বাসনাকেই চরিতার্থ করে, আমরা একথা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, সাহিত্যের যেমনই নিজস্ব মাত্রা আছে, তেমনই আছে সামাজিক দায়। সর্বকালের মহৎ সকল সাহিত্যেই এই সামাজিক দায়ের সুষ্ঠু রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। আজকের পৃথিবীতে এর বিরুদ্ধে কলাবাদীদের জেহাদ হাস্যকরভাবে তাদের প্রগতিবিরোধী অবস্থানকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজবীক্ষার জন্য এতাবৎকালে প্রাপ্ত পদ্ধতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মার্কসবাদ। লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর হাতে মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ আরও বিস্তার পেয়েছে। আমরাও মনে করি বর্তমানের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মার্কসীয় নন্দনপদ্ধতি ছাড়া সাহিত্যকে বোঝার বিকল্প পথ নেই। এই পত্রিকা নন্দনতত্ত্বের এই সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক দিকেরই পৃষ্ঠপোষণা করবে।'

এই ঘোষণা থেকে *প্রতিভাস* সরে আসে আসেনি কখনও। জেলার প্রতিশ্রুতিবান গল্পকারদের গল্প প্রকাশ থেকে শুরু করে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ও সেই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকর্ম বিষয়ক একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ, 'নদিয়ার নাট্যচর্চা' শীর্ষক প্রথম এই জেলার নাট্য বিষয়ক দলিল তৈরি, মার্কসবাদ-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ—এরকম নানা বিষয়ে *প্রতিভাসের* উদ্যোগ ব্যাপৃত ছিল। পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়াতে পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলায় 'সিরিয়াস' সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য।

১৯৯২ সালে কল্যাণী থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আর একটি ত্রৈমাসিক *১৪০০ সাল*। সম্পাদনা করেন তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটির মোট চারটি সংখ্যা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। *১৪০০ সালের* 'সম্পাদকের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়গুলি উল্লেখযোগ্য। নিছক সম্পাদকীয় নয়, চারটি সংখ্যাতেই সম্পাদকের বয়ানে প্রকাশিত হয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ মতামত সংবলিত চারটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। উল্লেখ্য, এই পত্রিকাটি মূলত প্রাধান্য দিয়েছে গবেষণামূলক সিরিয়াস প্রবন্ধ প্রকাশে। কোনও সংখ্যাতেই কোনও গল্প বা কবিতা প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকাটির আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর সাক্ষাৎকার ও ক্রোড়পত্র বিভাগটি। প্রথম তিনটি সংখ্যায় নাট্যবিশেষজ্ঞ ও

অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতি আন্দোলন সংগঠন সুধী প্রধান, প্রাবন্ধিক ও অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রম্যরচনাকার হীরেন্দ্রনাথ দত্তর দীর্ঘ মূল্যবান সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক দত্তর সাক্ষাৎকারটি সম্ভবত তাঁর দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার। কেননা, এটি প্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রয়াত হন। প্রথম সংখ্যাটিকে একটু অগোছাল মনে হয়েছে মনোযোগী পাঠকের। এর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকের কথায় :

> 'প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্য ছিল না। সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা দূষণীয় নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যোগসূত্রের অভাবে অসংলগ্নতা আসে, এবং পাঠান্তে উৎসাহীর মনে ধাঁধা লাগে, কেউ তাকে অনির্দেশ্য উন্মার্গে চালনা করেছে কিনা। এ কথা মনে রেখে বর্তমান সংখ্যা নদিয়া জেলাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে ; যেহেতু নদিয়া জেলাতেই *১৪০০ সাল* জন্মেছে।'

পত্রিকাটির এই বিশেষ নদিয়া জেলা বিষয়ক সংখ্যাটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। 'মধ্যযুগের বাংলায় নগরায়ণ' শীর্ষক অনিরুদ্ধ রায় লিখিত ইতিহাস অনুসন্ধান বিষয়ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ দু'টি পর্বে পত্রিকাটির দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর যে বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে মানুষ শিহরিত হন, সেই ঘটনার প্রতিবাদে *১৪০০ সালের* তরফে 'কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ' শিরোনামে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী উদ্ধৃতি সংগ্রহ প্রকাশ করে প্রচার করা হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক আনিসুজ্জামান এবং আবুল আহ্‌সান চৌধুরীর লেখাও প্রকাশিত হয়েছে *১৪০০ সালের* দ্বিতীয় সংখ্যায়। প্রাবন্ধিক সুবীর রায়চৌধুরীর শেষ লেখাটিও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায়। পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ না হয়ে গেলেও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে মূলত অর্থ এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে।

১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'কল্যাণী নাট্যোৎসব কমিটি' (কল্যাণী পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কল্যাণীর যৌথ উদ্যোগ) প্রকাশ করেন বার্ষিক *নাট্যমনন*-এর প্রথম সংখ্যা। সমীর দাশগুপ্ত সম্পাদিত সিল্ক স্ক্রিন প্রচ্ছদ ও সম্পূর্ণ অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা এই পত্রিকাটি নাট্যসাহিত্যপ্রেমীদের মনে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। গেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদফকৃত প্রথম বাংলা নাটক *সংবদল* সহ নাট্যবিষয়ক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন বিভাস চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতবিদ্য মানুষজন। শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং উৎপল দত্তর দু'টি মূল্যবান প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সংখ্যাটিতে।

১৯৮০ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ জ্যোতির্ময় ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশ করে *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*। সম্পাদক পরিষদে ওই বিভাগের তৎকালীন পূর্ণ সময়ের শিক্ষকেরা সকলেই ছিলেন। পত্রিকাটিতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রবীন্দ্র অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্যতত্ত্বের রূপরেখা' ; শচীনাথ ভট্টাচার্যের 'ব্যক্তিবাদ' ; পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারতে শব্দচর্চা অধ্যয়ন' ইত্যাদি। বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষক রামেশ্বর শ ও দর্শন চৌধুরীর লেখাও ওই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পত্রিকাটির আরও একটি কৃশকায় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ অর্থাভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় অচিরেই থেমে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ যাবৎ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনও বিভাগই কোনও বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করার কোনও উদ্যোগ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগকে বাদ দিয়ে কল্যাণী থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৬৯ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (কলা বিভাগ) বলাই সামন্ত সম্পাদিত বার্ষিক *পদধ্বনি* প্রকাশ করে। স্মর্তব্য যে, সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্টের শাসনাধীন। অল্প কিছুদিন পরে যুক্তফ্রন্ট শাসকশ্রেণীর চক্রান্তের বলি হলে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অনুপ্রবিষ্ট হয়। পত্রিকা প্রকাশের মতো সৎ ও নান্দনিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রশ্নটি সে সময়ে 'ছাত্রস্বার্থবাহী' দাদাজাতীয়দের কাছে অবান্তর ছিল। ফলে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়টিও ছিল অনুজ্জ্বল। নবপর্যায়ে ও নবকলেবরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* নামে বার্ষিক সংকলন প্রকাশ করে ১৯৮০ সালে। সংকলনটির যৌথ সম্পাদনায় ছিলেন শতঞ্জীব রাহা ও জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বার্ষিক পত্রিকা হিসেবে *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। '৮৭-র পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও পত্রিকা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের তরফে প্রকাশিত হয়নি। এই ঘটনা বিস্ময়কর।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র *সাম্য* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ছয়ের দশকের শেষে। পরে ১৯৮২ থেকে নিয়মিতভাবে *সাম্য*-র ৫/৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে সংখ্যাগুলি সম্পাদনা করেছেন অশোক কুণ্ডু, মিলি হীরা প্রমুখ।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদ সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয় অঙ্গন। ২টি শারদ সংখ্যা সহ মোট ৫টি সংখ্যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সৌম্যকান্তি জানা, নির্মলেন্দু দাস, সুব্রত মজুমদার, শান্তনু মাইতি, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস প্রমুখকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী *অঙ্গন* পরিচালনা করতেন।

নদিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা বিষয়ক এই রচনা পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বতো তথ্যনিষ্ঠ—এমন দাবি করা যথার্থ হবে না। তবে সামগ্রিকভাবে নদিয়া জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত তুলে ধরার সামান্য এই প্রয়াস উৎসাহী পাঠকমহলে কৌতূহলের জন্ম দেবে, এ ধারণা করাও নেহাতই অমূলক হবে না। সেই কৌতূহলই এই জেলার পত্র-পত্রিকা চর্চার পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

নদিয়া জেলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সূচনাবর্ষানুক্রমিক তালিকা

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
১	১৮৬৩	ভারত পরিদর্শন	মাসিক	যদুনাথ তর্কভূষণ	শান্তিপুর
২	১৮৬৩	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	মাসিক	হরিনাথ মজুমদার	কুমারখালি
৩	১৮৬৫	রঙ্গভূমি	মাসিক	ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৪	১৮৬৫	পরিদর্শক	মাসিক	হরলাল মৈত্র	শান্তিপুর
৫	১৮৭৩	ছোট জাগুলিয়া হিতৈষী	মাসিক	সম্পাদকমণ্ডলী	ছোট জাগুলিয়া
৬	১৮৭৪	সরোজিনী	মাসিক	রামলাল চক্রবর্তী	শান্তিপুর
৭	১৮৮৩	ভারতভূমি	সাপ্তাহিক	শ্যামাচরণ সান্যাল	শান্তিপুর
৮	১৮৮৩	মুদ্গর	মাসিক	শ্যামাচরণ সান্যাল	শান্তিপুর
৯	১৮৮৪	পরিণাম	মাসিক	কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	জয়রামপুর
১০	১৮৮৮	আজিজন নেহার	মাসিক	মীর মশাররফ হোসেন	কুষ্টিয়া
১১	১৮৯০	হিতকরী	পাক্ষিক	মীর মশাররফ হোসেন	কুষ্টিয়া
১২	১৮৯৬	শৈবী	মাসিক	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	কুমারখালি
১৩	১৮৯৮	যুবক	মাসিক	যোগানন্দ ব্রহ্মচারী	রানাঘাট
১৪	১৮৯৮	কোহিনূর	মাসিক	রওশন আলী চৌধুরী	কুমারখালি
১৫	১৮৯৯	নিত্যধর্ম্ম	সাপ্তাহিক	সম্পাদকমণ্ডলী	নবদ্বীপ
১৬	১৯০০	লহরী	মাসিক	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
১৭	১৯০০	বঙ্গীয় তিলি সমাজ	মাসিক	রাধাবিনোদ সাহা	কুমারখালি
১৮	১৯০১	যুবক	মাসিক	ননীগোপাল লাহিড়ী	শান্তিপুর
১৯	১৯০৩	বঙ্গলক্ষ্মী	সাপ্তাহিক	মন্মথনাথ দাস	শান্তিপুর
২০	১৯০৫	সমাজ ও সাহিত্য	মাসিক	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	রানাঘাট
২১	১৯০৫	বাঙ্গালা	মাসিক	হরেন্দ্রনাথ মৈত্র	রানাঘাট
২২	১৯০৭	বঙ্গরত্ন	সাপ্তাহিক	কানাইলাল দাস	কৃষ্ণনগর
২৩	১৯০৭	পল্লীচিত্র	মাসিক	বিধুভূষণ বসু	রানাঘাট
২৪	১৯০৯	বার্ত্তাবহ	সাপ্তাহিক	গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	রানাঘাট
২৫	১৯১১	মাহিষ্য মহিলা	মাসিক	কৃষ্ণভাবিণী দাসী	কৃষ্ণনগর
২৬	১৯১২	ব্রাহ্মণসমাজ	মাসিক	বসন্তকুমার তর্কনিধি	নবদ্বীপ
২৭	১৯১২	কল্পনা	মাসিক	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	আন্দুলবেড়িয়া
২৮	১৯১৩	সাধক	মাসিক	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	দারিয়ারপুর
২৯	১৯১৬	কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা	বার্ষিক	হেমন্তকুমার সরকার	কৃষ্ণনগর
৩০	১৯১৯	হোমশিখা	পাক্ষিক	কালীপ্রসাদ বসু	কৃষ্ণনগর
৩১	১৯২১	জাগরণ	সাপ্তাহিক	হেমন্তকুমার সরকার	কুষ্টিয়া
৩২	১৯২১	আজাদ	সাপ্তাহিক	কফিলুদ্দিন আহ্মদ	কুষ্টিয়া
৩৩	১৯২২	শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া	মাসিক	হরিদাস গোস্বামী	নবদ্বীপ
৩৪	১৯২২	ভালবাসা	মাসিক	অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়	নবদ্বীপ
৩৫	১৯২৪	বনশ্রী	মাসিক	নীহাররঞ্জন সিংহ	কৃষ্ণনগর
৩৬	১৯২৮	নবদ্বীপ	মাসিক	গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ	নবদ্বীপ
৩৭	১৯২৮	নদীয়া প্রকাশ	দৈনিক	সম্পাদকমণ্ডলী	মায়াপুর
৩৮	১৯৩০	বিশ্ববাণী	মাসিক	দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কুষ্টিয়া
৩৯	১৯৩২	দীপিকা	পাক্ষিক	দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কুষ্টিয়া
৪০	১৯৩২	দীপশিখা	মাসিক	উপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	ধর্মদহ
৪১	১৯২৯	শান্তিপুর	মাসিক	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৪২	১৯৩২	অগ্নিশিখা	মাসিক	অজ্ঞাত	কৃষ্ণনগর
৪৩	১৯৩৩	পল্লীশ্রী	মাসিক	অমরেন্দ্রনাথ বসু	মেহেরপুর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৪৪	১৯৩৪	সাহিত্যবার্ষিকী	বার্ষিক	প্রভাস রায়	শান্তিপুর
৪৫	১৯৩৫	নদীয়ার বাণী	সাপ্তাহিক	দেবনারায়ণ গুপ্ত	রানাঘাট
৪৬	১৯৩৫	সন্ধানী	মাসিক	মহম্মদ আবুবকর	কুষ্টিয়া
৪৭	১৯৩৫	যুগের আলো	মাসিক	হারিসউদ্দীন	কুষ্টিয়া
৪৮	১৯৩৭	কচিকথা	মাসিক	অনিলকুমার চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৪৯	১৯৩৯	বলাকা	মাসিক	ননীগোপাল চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৫০	১৯৪০	সপ্তর্ষি	মাসিক	ধীরানন্দ রায়	শান্তিপুর
৫১	১৯৪০	প্রাতিকা	মাসিক	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৫২	১৯৪১	বৈশ্বানর	মাসিক	হেমচন্দ্র বাগচী	কৃষ্ণনগর
৫৩	১৯৪১	শিক্ষকবার্তা	মাসিক	গোপীবল্লভ বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৫৪	১৯৪২	কালের ভেড়ি	মাসিক	অমৃতলাল ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ
৫৫	১৯৪২	মুক্তির ডাক	মাসিক	অজ্ঞাত	কৃষ্ণনগর
৫৬	১৯৪৪	সত্তয	মাসিক	বাদল চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৫৭	১৯৪৪	শ্রীসুদর্শন	ত্রৈমাসিক	দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	কল্যাণী (?)
৫৮	১৯৪৪	নদীয়া জেলা বোর্ড	সাপ্তাহিক	খান বাহাদুর সামসুজ্জোহা	কৃষ্ণনগর
৫৯	১৯৪৬	অভিযান	মাসিক	ফণী রায়	কৃষ্ণনগর
৬০	১৯৪৬	সংগ্রাম	মাসিক	অতুল্য মহলানবীশ	কৃষ্ণনগর
৬১	১৯৪৭	অভিযাত্রী	মাসিক	অজ্ঞাত	কৃষ্ণনগর
৬২	১৯৪৮	বাঁশরী	মাসিক	নীহাররঞ্জন সিংহ	কৃষ্ণনগর
৬৩	১৯৪৮	প্রাচী	মাসিক	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৬৪	১৯৪৮	নূতন প্রভাত	মাসিক	সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	চাকদহ
৬৫	১৯৪৯	সন্ধ্যাবাণী	ত্রৈমাসিক	অজিত স্মৃতিরত্ন	শান্তিপুর
৬৬	১৯৪৯	নদীয়ার কথা	পাক্ষিক	স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৬৭	১৯৪৯	সংগ্রাম	মাসিক	অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৬৮	১৯৪৯	সন্ধ্যাতারা	ত্রৈমাসিক	শিবচন্দ্র মিস্ত্রি	করিমপুর
৬৯	১৯৫০	সীমান্ত	মাসিক	সনৎ চৌধুরী	চাকদহ
৭০	১৯৫০	সেবা	ত্রৈমাসিক	দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৭১	১৯৫১	চাষীমজদুর	সাপ্তাহিক	শৈলেন ঘোষ	কৃষ্ণনগর
৭২	১৯৫১	সীমান্ত	সাপ্তাহিক	মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়	রানাঘাট
৭৩	১৯৫১	দেবদূত	ত্রৈমাসিক	জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস	মাজদিয়া
৭৪	১৯৫২	প্রহরী	ত্রৈমাসিক	বিভাস মিত্র	কৃষ্ণনগর
৭৫	১৯৫২	ঘোষণা	মাসিক	কুবের গুহ	কৃষ্ণনগর
৭৬	১৯৫৩	প্রগতি	মাসিক	প্রফুল্ল সাহা	কৃষ্ণনগর
৭৭	১৯৫৩	নবদ্বীপ বার্তা	সাপ্তাহিক	গৌরাঙ্গ কুণ্ডু	নবদ্বীপ
৭৮	১৯৫৪	উদয়ন	মাসিক	প্রবোধ মিত্র	চাকদহ
৭৯	১৯৫৪	সঞ্চয়ন	মাসিক	গৌরাঙ্গ কুণ্ডু	নবদ্বীপ
৮০	১৯৫৪	সাহিত্য সঞ্চয়ন	মাসিক	এন চৌধুরী	নবদ্বীপ
৮১	১৯৫৫	কচিপাতা	মাসিক	স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়	শিবনিবাস
৮২	১৯৫৫	অভ্যুদয়	মাসিক	হরেন পাল	নবদ্বীপ
৮৩	১৯৫৫	দিশারী	মাসিক	ধীরানন্দ রায়	শান্তিপুর
৮৪	১৯৫৫	জেনারেল	মাসিক	ডি ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
৮৫	১৯৫৫	জাগরী	বার্ষিক	দেবব্রত ভট্টাচার্য	কল্যাণী
৮৬	১৯৫৬	বোধন	মাসিক	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়	নবদ্বীপ
৮৭	১৯৫৬	আরক্ষী	মাসিক	ডি চট্টোপাধ্যায়	শান্তিপুর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৮৮	১৯৫৬	লেখা ও রেখা	ত্রৈমাসিক	ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৮৯	১৯৫৬	জলসারেঙ	ত্রৈমাসিক	রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৯০	১৯৫৬	লোকরাজ	মাসিক	দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৯১	১৯৫৬	অরণী	মাসিক	আই পি টি এ, শান্তিপুর	শান্তিপুর
৯২	১৯৫৬	সমতা	মাসিক	কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	নবদ্বীপ
৯৩	১৯৫৭	সঙ্গম	মাসিক	পূর্ণেন্দু সেন	নবদ্বীপ
৯৪	১৯৫৭	গৌড়ীয়	ত্রৈমাসিক	ভক্তিপ্রাজ্ঞন জ্যোতি মহারাজ	মায়াপুর
৯৫	১৯৫৭	নদীয়া মুকুর	সাপ্তাহিক	সমীরেন্দ্র সিংহরায়	কৃষ্ণনগর
৯৬	১৯৫৭	মুখপত্র	ত্রৈমাসিক	বাদল চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৯৭	১৯৫৭	মিতালী	মাসিক	মোহিত রায়	কৃষ্ণনগর
৯৮	১৯৫৭	বিদ্যুৎ	পাক্ষিক	রামরঞ্জন মৈত্র	কৃষ্ণনগর
৯৯	১৯৫৯	নদীয়া সমাচার	পাক্ষিক	এস এম বদরুদ্দিন	কৃষ্ণনগর
১০০	১৯৫৯	ধূমকেতু	সাপ্তাহিক	মোহনকালী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
১০১	১৯৫৭	প্রতীতি	ত্রৈমাসিক	শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	বানপুর
১০২	১৯৬০	সংস্কৃতি	ত্রৈমাসিক	সত্যেন হোম	কৃষ্ণনগর
১০৩	১৯৬০	সাগ্নিক	পাক্ষিক	অনিল ভট্টাচার্য	চাকদহ
১০৪	১৯৬০	সাধনা	মাসিক	নগেন তালুকদার	নবদ্বীপ
১০৫	১৯৬০	শুক্তি	মাসিক	অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
১০৬	১৯৬০	অঞ্জলি	ত্রৈমাসিক	সত্যেন হোম	কৃষ্ণনগর
১০৭	১৯৬০	হ্যানিম্যানের কথা	মাসিক	প্রাণগোবিন্দ গোস্বামী	নবদ্বীপ
১০৮	১৯৬১	পথ ও প্রান্তর	মাসিক	বিপুল সরকার	চাকদহ
১০৯	১৯৬১	অগ্নিযুগ	ত্রৈমাসিক	ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার	কৃষ্ণনগর
১১০	১৯৬১	শ্রীনবদ্বীপ	মাসিক	ভগবান দাস বাবাজী	নবদ্বীপ
১১১	১৯৬১	কাকলী	মাসিক	প্রদীপ ঘোষ	রানাঘাট
১১২	১৯৬২	ভগবত দর্শন	মাসিক	ভক্তি চারুস্বামী	মায়াপুর
১১৩	১৯৬২	শ্রমিক ও সমাজ	পাক্ষিক	রাধারমণ দেবনাথ	চাকদহ
১১৪	১৯৬২	অভ্যুদয়	ষান্মাসিক	কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
১১৫	১৯৫৯	নদীয়া সুন্দর	সাপ্তাহিক	নারায়ণ দাস মোহান্ত	কৃষ্ণনগর
১১৬	১৯৬৩	জনস্বার্থ	মাসিক	মনোরঞ্জন সেন	কৃষ্ণনগর
১১৭	১৯৬৪	সম্ভব	মাসিক	দিলীপ কর্মকার	নবদ্বীপ
১১৮	১৯৬৪	পলাশ	মাসিক	মনোজ ঘোষ	রানাঘাট
১১৯	১৯৬৫	জাগৃহি	ত্রৈমাসিক	অজিত গোস্বামী	কৃষ্ণনগর
১২০	১৯৬৫	সীমান্ত সাহিত্য	ত্রৈমাসিক	কার্তিক মোদক	রানাঘাট
১২১	১৯৬৫	সাহিত্য সঞ্চয়ন	মাসিক	গৌরাঙ্গ কুণ্ডু	নবদ্বীপ
১২২	১৯৬৬	প্রপন্ন	মাসিক	প্রপন্ন আশ্রম	নবদ্বীপ
১২৩	১৯৬৬	অমর দশক	মাসিক	অরুণ বসু	নবদ্বীপ
১২৪	১৯৬৬	জয়ন্তী	মাসিক	রামকৃষ্ণ দে	বড় আন্দুলিয়া
১২৫	১৯৬৬	রবিবাসরৎ	ত্রৈমাসিক	বৃন্দাবন গোস্বামী	কৃষ্ণনগর
১২৬	১৯৬৭	জনগণতন্ত্র	মাসিক	কানাই পাল	শান্তিপুর
১২৭	১৯৬৭	পৌরকল্যাণ	বার্ষিক	অজ্ঞাত	কৃষ্ণনগর
১২৮	১৯৬৭	বঙ্গতীর্থ	মাসিক	দীনেশ রায়	চাকদহ
১২৯	১৯৬৭	হিতবাদী	ত্রৈমাসিক	রবীন্দ্রকুমার রায়	চাকদহ
১৩০	১৯৬৭	তিমিরারী	ত্রৈমাসিক	তপন ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ
১৩১	১৯৬৭	নবদিগন্ত	দ্বিমাসিক	কিশোরী শাস্ত্রী	শান্তিপুর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
১৩৩	১৯৬৮	অর্যথা	বার্ষিক	স্বপন সাহা	কৃষ্ণনগর
১৩৪	১৯৬৮	প্রদোষ	মাসিক	মনোরঞ্জন সেন	কৃষ্ণনগর
১৩৫	১৯৬৮	নদিয়া জেলা স্পোর্টস নিউজ	পাক্ষিক	বদরুদ্দিন আহ্‌মদ	কৃষ্ণনগর
১৩৬	১৯৬৮	রূপসী	মাসিক	পরিমল দাস	কৃষ্ণনগর
১৩৭	১৯৬৯	প্রচারপত্র	মাসিক	সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
১৩৮	১৯৬৯	তর্জনী	সাপ্তাহিক	জয়দেব পাণ্ডে	নবদ্বীপ
১৩৯	১৯৬৯	অভিযাত্রী	মাসিক	জগবন্ধু দেবনাথ	চাকদহ
১৪০	১৯৬৯	আশীর্বাদ	মাসিক	অসিত দে	চাকদহ
১৪১	১৯৬৯	আজকাল	ত্রৈমাসিক	সন্তোষ কুণ্ডু	কৃষ্ণনগর
১৪২	১৯৬৯	স্বকাল	মাসিক	তিপু দাস	চাকদহ
১৪৩	১৯৬৯	সৌররথ	সাপ্তাহিক	দীপ্তেশ্বরানন্দ	কৃষ্ণনগর
১৪৪	১৯৬৯	পদধ্বনি	বার্ষিক	বলাই সামন্ত	কল্যাণী
১৪৫	১৯৭০	অজ্ঞাতবাস	ত্রৈমাসিক	অরুণ বসু	নবদ্বীপ
১৪৬	১৯৭০	কাবেরী	মাসিক	শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
১৪৭	১৯৭০	চঞ্চল	মাসিক	জগবন্ধু দেবনাথ	চাকদহ
১৪৮	১৯৭০	বিবর্তন	ত্রৈমাসিক	শশাঙ্ক দাস বৈরাগ্য	কৃষ্ণনগর
১৪৯	১৯৭০	রেনেসাঁস	ত্রৈমাসিক	হরিপদ দে	কৃষ্ণনগর
১৫০	১৯৭০	সমাজ ও সাহিত্য	মাসিক	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	রানাঘাট
১৫১	১৯৭১	মুক্তিযুগ	ত্রৈমাসিক	বিশ্বতোষ মুখার্জি	কৃষ্ণনগর
১৫২	১৯৭১	সমস্বর	মাসিক	সুশান্ত হালদার	কৃষ্ণনগর
১৫৩	১৯৭১	সংস্কৃতি	ত্রৈমাসিক	মনুজ সিংহ	কৃষ্ণনগর
১৫৪	১৯৭১	নবদিশারী	ত্রৈমাসিক	লক্ষ্মণচন্দ্র মল্লিক	রানাঘাট
১৫৫	১৯৭১	নূপুর	ত্রৈমাসিক	সুবীর ভৌমিক	কৃষ্ণনগর
১৫৬	১৯৭১	যারা মেরুদণ্ড	ত্রৈমাসিক	সুকুমার পুতুতুণ্ড	কৃষ্ণনগর
১৫৭	১৯৭১	রঙ ও তুলি	মাসিক	কমলেশ চক্রবর্তী	করিমপুর
১৫৮	১৯৭১	ফল্গু	ত্রৈমাসিক	বিমান দত্ত	মাজদিয়া
১৫৯	১৯৭১	বন্ধুবার্তা	বার্ষিক	গৌরাঙ্গ দাস	বেদীভবন
১৬০	১৯৭১	চৈতন্যভারতী	সাপ্তাহিক	বিমল ভারতী	ধুবুলিয়া
১৬১	১৯৭১	জনতার মুখ	পাক্ষিক	শুভঙ্কর চক্রবর্তী	শান্তিপুর
১৬২	১৯৭২	নদীয়া প্রকাশ	পাক্ষিক	পাঁচুগোপাল ঘোষ	কৃষ্ণনগর
১৬৩	১৯৭২	নববিহঙ্গ	ষান্মাসিক	জাবের আলী	বড় আন্দুলিয়া
১৬৪	১৯৭২	শান্তিপুর দর্শন	বার্ষিক	সুবলচন্দ্র মৈত্র	শান্তিপুর
১৬৫	১৯৭২	অঙ্গীকার	ত্রৈমাসিক	অমল গুহ	চাকদহ
১৬৬	১৯৭২	অণুক্ষণ	ত্রৈমাসিক	রথীন ভৌমিক	কৃষ্ণনগর
১৬৭	১৯৭২	অস্ত্রিক	মাসিক	বাবলু বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
১৬৮	১৯৭২	অর্ঘ্য	ত্রৈমাসিক	মিহির দাস	কৃষ্ণনগর
১৬৯	১৯৭২	আজকের সাহিত্য	মাসিক	সদানন্দ সিকদার	ফুলিয়া
১৭০	১৯৭২	আমরা	দ্বিমাসিক	কিশোরী শাস্ত্রী	শান্তিপুর
১৭১	১৯৭২	গ্রামীক	মাসিক	প্রীতিরঞ্জন আচার্য	বাদকুল্লা
১৭২	১৯৭২	জলঙ্গী	সাপ্তাহিক	মোহনকালী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
১৭৩	১৯৭২	বাজপাখী	মাসিক	শচীন বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
১৭৪	১৯৭২	মনন	ত্রৈমাসিক	কুমার শঙ্কর রায়শর্মা	কল্যাণী
১৭৫	১৯৭২	মৈত্রী	ত্রৈমাসিক	নিতাই কৃষ্ণ দে	বড় আন্দুলিয়া
১৭৬	১৯৭২	রোয়াক	মাসিক	সুজয় দত্ত	নবদ্বীপ

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
১৭৭	১৯৭২	সবুজ নক্ষত্র	ত্রৈমাসিক	তিপু দাস	চাকদহ
১৭৮	১৯৭২	স্বদেশ	মাসিক	শঙ্করী প্রসাদ	শান্তিপুর
১৭৯	১৯৭২	স্মরণিকা	ত্রৈমাসিক	সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	ফুলিয়া
১৮০	১৯৭২	আনন্দম	পাক্ষিক	রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	চাপড়া
১৮১	১৯৭৩	আজকের জনমুখ	পাক্ষিক	শ্যামল মণ্ডল	ফুলিয়া
১৮২	১৯৭৩	কাঁচামাটি	মাসিক	বিকাশ মৈত্র	বাদকুল্লা
১৮৩	১৯৭৩	শ্রমিক	মাসিক	প্রীতিরঞ্জন আচার্য	বাদকুল্লা
১[illegible]	১৯৭৩	সংকর	বার্ষিক	অজয় নন্দী	চাকদহ
১৮৫	১৯৭৩	সেতু	মাসিক	রথীন সরকার	কৃষ্ণনগর
১৮৬	১৯৭৩	পদক্ষেপ	মাসিক	অসমঞ্জ দে	শান্তিপুর
১৮৭	১৯৭৩	ন্যাট	সাপ্তাহিক	মনোজ ঘোষ	রানাঘাট
১৮৮	১৯৭৪	ক্লিক	পাক্ষিক	তপনদেব গোস্বামী	রানাঘাট
১৮৯	১৯৭৪	জলঙ্গী	মাসিক	চিন্ময় দত্তবিশ্বাস	পলাশীপাড়া
১৯০	১৯৭৪	বেদুইন	মাসিক	শশাঙ্ক দাসবৈরাগ্য	কৃষ্ণনগর
১৯১	১৯৭৪	শঙ্খ	মাসিক	দিলীপ কর্মকার	নবদ্বীপ
১৯২	১৯৭৪	সীমান্ত বাণী	মাসিক	আশিস চক্রবর্তী	চাকদহ
১৯৩	১৯৭৪	হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন	মাসিক	মায়াপুরচন্দ্র দাসাধিকারী	মায়াপুর
১৯৪	১৯৭৪	দ্বন্দ্ব	মাসিক	শতদল দত্ত	রানাঘাট
১৯৫	১৯৭৫	আওয়াজ	মাসিক	সুকুমার দাস	কৃষ্ণনগর
১৯[illegible]	১৯৭৫	কৃষ্ণনগর সমাচার	পাক্ষিক	তপনদেব গোস্বামী	কৃষ্ণনগর
[illegible]	১[illegible]৫	বাংলা বাজার	দৈনিক	জীবন ভট্টাচার্য	রানাঘাট
[illegible]৮	১৯৭৫	শুভেচ্ছা	মাসিক	স্বপন ভৌমিক	মাজদিয়া
[illegible]৯৯	১৯৭৫	কৃষি সাহিত্য	পাক্ষিক	স্বপন ভৌমিক	মাজদিয়া
[illegible]০০	১৯৭৫	দিব্যলোক	ত্রৈমাসিক	রবীন্দ্রনাথ সমাজদার	কৃষ্ণনগর
২০১	১৯৭৫	দ্বৈরথ	মাসিক	রঞ্জন গোলদার	চাকদহ
২০২	১৯৭৫	নয়াপথ	মাসিক	অনিল দেবনাথ	রানাঘাট
২০৩	১৯৭৫	পরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক	অনিল ঘড়াই	কালীগঞ্জ
২০৪	১৯৭৫	পল্লীদর্পণ	ত্রৈমাসিক	সুধাংশুশেখর সরকার	বাদকুল্লা
২০৫	১৯৭৫	প্রবাহ	মাসিক	সুনীলচন্দ্র দাস	চাপড়া
২০৬	১৯৭৬	নবপ্রবাহ	ত্রৈমাসিক	সুনীল দাস	চাকদহ
২০৭	১৯৭৬	নবজাতক	ত্রৈমাসিক	গৌতম ধনী	কৃষ্ণনগর
২০৮	১৯৭৬	জীবনের উৎস	মাসিক	ঈশান দে	রানাঘাট
২০৯	১৯৭৬	সবুজসোনা	পাক্ষিক	কানাই মিত্র	রানাঘাট
২১০	১৯৭৬	প্রগতি বার্তা	পাক্ষিক	অমূল্য মণ্ডল	কল্যাণী
২১১	১৯৭৬	নদীয়া বাজার	সাপ্তাহিক	সুখেন্দু ধর	কৃষ্ণনগর
২১২	১৯৭৬	গাঁদাফুল	ত্রৈমাসিক	অনিল দাস	রানাঘাট
২১৩	১৯৭৬	চ্যালেঞ্জ	পাক্ষিক	হরেন পালিত	রানাঘাট
২১৪	১৯৭৬	হোমাগ্নি	মাসিক	সুভাষ সরকার	বেথুয়াডহরি
২১৫	১৯৭৬	শুভবার্তা	মাসিক	শান্তনু কুণ্ডু	শান্তিপুর
২১৬	১৯৭৬	ভাইরাস	মাসিক	দেবদাস আচার্য	কৃষ্ণনগর
২১৭	১৯৭৬	রেডিয়াম	ত্রৈমাসিক	নিখিল সরকার	নাজিরপুর
২১৮	১৯৭৬	বোধন	মাসিক	শশাঙ্ক দাসবৈরাগ্য	কৃষ্ণনগর
২১৯	১৯৭৬	কুরুক্ষেত্র	মাসিক	সুকান্ত ঘোষচৌধুরী	চাকদহ
২২০	১৯৭৬	জনশক্তি	মাসিক	সমর চক্রবর্তী	চাকদহ

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
২২১	১৯৭৬	ক্রমশ	ত্রৈমাসিক	মনুজেন্দ্র সিংহ	কৃষ্ণনগর
২২২	১৯৭৬	চাষীভাই	সাপ্তাহিক	অজয় সরকার	করিমপুর
২২৩	১৯৭৭	গৌড়ীয় বৈষ্ণব	মাসিক	গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ
২২৪	১৯৭৭	জ্ঞানধারা	ত্রৈমাসিক	প্রশান্ত বাগচী	শান্তিপুর
২২৫	১৯৭৭	জীবন দেবতা	চতুর্মাসিক	সৌরেন ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ
২২৬	১৯৭৭	চাকদহ বার্তা	সাপ্তাহিক	তপন দত্ত	চাপদহ
২২৭	১৯৭৭	বাংলার নবচেতনা	পাক্ষিক	শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
২২৮	১৯৭৭	বিশ্ববন্ধু সেবাসঙ্ঘ	মাসিক	রণবীর বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
২২৯	১৯৭৭	মহালয়া	মাসিক	মোহন দত্ত	কৃষ্ণনগর
২৩০	১৯৭৭	মানবকল্যাণ জ্যোতিষ	মাসিক	মণিকাঞ্চন ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
২৩১	১৯৭৭	শঙ্কর মিশন	মাসিক	মোহনকালী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
২৩২	১৯৭৭	সন্নত	ত্রৈমাসিক	তিপু দাস	চাকদহ
২৩৩	১৯৭৭	সেতু	ত্রৈমাসিক	নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস	আসাননগর
২৩৪	১৯৭৭	গ্রাম গ্রামান্তর	সাপ্তাহিক	শতঞ্জীব রাহা	কৃষ্ণনগর
২৩৫	১৯৭৭	নদিয়া দর্পণ	পাক্ষিক	শিবু চৌধুরী	কৃষ্ণনগর
২৩৬	১৯৭৭	মুক্তিদূত	সাপ্তাহিক	হৃষীকেশ ভট্টাচার্য	নবদ্বীপ
২৩৭	১৯৭৭	লঘুছন্দা	ত্রৈমাসিক	সুনীলচন্দ্র দাস	চাকদহ
২৩৮	১৯৭৮	প্রতিবাদী চেতনা	পাক্ষিক	বিপ্লব দাশগুপ্ত	শান্তিপুর
২৩৯	১৯৭৮	পল্লী	মাসিক	গণেশ সাহা	কৃষ্ণনগর
২৪০	১৯৭৮	প্রান্তিক	মাসিক	স্নেহাশিস সুকুল	কৃষ্ণনগর
২৪১	১৯৭৮	পুরোধা	ত্রৈমাসিক	অবনী সিংহ	রানাঘাট
২৪২	১৯৭৮	প্রগতি	ত্রৈমাসিক	অনিল সিংহরায়	নবদ্বীপ
২৪৩	১৯৭৮	সমীক্ষা	মাসিক	মানিক সাহা	নবদ্বীপ
২৪৪	১৯৭৮	সঠিক	মাসিক	অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
২৪৫	১৯৭৮	ফ্লাশ	সাপ্তাহিক	কালিকা বসু	রানাঘাট
২৪৬	১৯৭৮	মতুয়া	ত্রৈমাসিক	অক্ষয় মৌলিক	মাজদিয়া
২৪৭	১৯৭৮	লিবিডো	ত্রৈমাসিক	সঞ্জীব প্রামাণিক	দৈয়েরবাজার
২৪৮	১৯৭৮	বাণীছন্দম	ত্রৈমাসিক	পারিজাত চক্রবর্তী	পায়রাডাঙা
২৪৯	১৯৭৮	উদাহরণ	ত্রৈমাসিক	বিষ্ণু পালচৌধুরী	কৃষ্ণনগর
২৫০	১৯৭৮	কবিকলম	মাসিক	প্রাণেশ সরকার	বাদকুল্লা
২৫১	১৯৭৮	কৃষ্ণনগর	মাসিক	দেবদাস আচার্য	কৃষ্ণনগর
২৫২	১৯৭৮	কৃষি ও বাণিজ্য	মাসিক	জগন্নাথ মজুমদার	কৃষ্ণনগর
২৫৩	১৯৭৮	অ আ ক খ	মাসিক	জগৎ রায়	কৃষ্ণনগর
২৫৪	১৯৭৮	অনুস্বর বিসর্গ	মাসিক	সুবীর সিংহরায়	কৃষ্ণনগর
২৫৫	১৯৭৮	আজ	মাসিক	মহাদেব সাহা	কৃষ্ণনগর
২৫৬	১৯৭৯	শ্রমশক্তি	পাক্ষিক	অরুণ ভট্টাচার্য	রানাঘাট
২৫৭	১৯৭৯	নদিয়া কৃষি বার্তা	ত্রৈমাসিক	আশিস রায়	নবদ্বীপ
২৫৮	১৯৭৯	আমাদের কবিতা	বার্ষিক	সুব্রত পাল	নবদ্বীপ
২৫৯	১৯৮০	শব্দযুগ	ত্রৈমাসিক	অনিল ঘড়াই	দেবগ্রাম
২৬০	১৯৮০	পল্লীর কণ্ঠস্বর	পাক্ষিক	তমেশ পাল	করিমপুর
২৬১	১৯৮০	পুষ্পরথ	পাক্ষিক	প্রভাতকুমার মণ্ডল	কৃষ্ণনগর
২৬২	১৯৮০	চেতনা	ষান্মাসিক	চপল বিশ্বাস	মুড়াগাছা
২৬৩	১৯৮০	টানাপোড়েন	দ্বিমাসিক	হরিপদ ও বলরাম বসাক	শান্তিপুর
২৬৪	১৯৮০	সংশপ্তক	ত্রৈমাসিক	বিপ্লব মৈত্র	শান্তিপুর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
২৬৫	১৯৮০	শিক্ষা পরিক্রমা	ত্রৈমাসিক	মৃণালকান্তি উকিল	চাকদহ
২৬৬	১৯৮০	সমবায় সংগ্রাম	মাসিক	গৌরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	রানাঘাট
২৬৭	১৯৮০	রানাঘাট বার্তা	পাক্ষিক	তপন মুখোপাধ্যায়	রানাঘাট
২৬৮	১৯৮০	রুচি	ত্রৈমাসিক	বাসন্তী হালদার	চাকদহ
২৬৯	১৯৮০	জয় প্রভাকর	মাসিক	শ্যামল কর্মকার	বড় আন্দুলিয়া
২৭০	১৯৮০	ঋত্বিক	ত্রৈমাসিক	দেবদাস আচার্য	কৃষ্ণনগর
২৭১	১৯৮০	কলিকাল	মাসিক	দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
২৭২	১৯৮০	অনুমান	মাসিক	ধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল	কৃষ্ণনগর
২৭৩	১৯৮০	অশ্বারোহী	মাসিক	রঞ্জন সরকার	কৃষ্ণনগর
২৭৪	১৯৮০	কল্যা. বিশ্ব: বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	ত্রৈমাসিক	জ্যোতির্ময় ঘোষ	কল্যাণী
২৭৫	১৯৮১	ন. জে. বিদ্যা. কর্মী পরিষদ	মাসিক	গোপেশ্বর মুখার্জি	কৃষ্ণনগর
২৭৬	১৯৮১	একাশি সাল	মাসিক	নূরউদ্দীন বিশ্বাস	চাপড়া
২৭৭	১৯৮১	কচিপাতা	মাসিক	উত্তম কুণ্ডু	চাপড়া
২৭৮	১৯৮১	খেলার সাথী	ত্রৈমাসিক	সমরেন্দ্র মণ্ডল	কল্যাণী
২৭৯	১৯৮১	জানালা	ত্রৈমাসিক	গৌতম অধিকারী	বগুলা
২৮০	১৯৮১	বন্ধবাণী	মাসিক	গৌরাঙ্গ দাস	বেতাই
২৮১	১৯৮১	বিবর্তন	ত্রৈমাসিক	সত্যনারায়ণ মজুমদার	আসাননগর
২৮২	১৯৮১	মাত্রা	মাসিক	অর্চনা ভৌমিক	ঠাকুরপাড়া
২৮৩	১৯৮১	যুবপ্রবাহ	মাসিক	বি. ফার্নান্দেজ	কৃষ্ণনগর
২৮৪	১৯৮১	রশ্মিবাংলা	মাসিক	সুধাংশুশেখর সরকার	বাদকুল্লা
২৮৫	১৯৮১	সাহিত্য সৈকত	ত্রৈমাসিক	মাধব ভট্টাচার্য	ফুলিয়া
২৮৬	১৯৮২	মাছ	মাসিক	সুশীলকান্ত কোনার	কল্যাণী
২৮৭	১৯৮২	প্রতিভাস	ত্রৈমাসিক	শতঞ্জীব রাহা	কৃষ্ণনগর
২৮৮	১৯৮২	বাঙ্ময়	মাসিক	জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়	রানাঘাট
২৮৯	১৯৮২	একালের বোধিসত্ত্ব	ত্রৈমাসিক	মন্দিরা রায়	চাকদহ
২৯০	১৯৮২	জ্ঞানমঞ্জরী	ত্রৈমাসিক	প্রভাত ঘোষ	করিমপুর
২৯১	১৯৮২	চূর্ণী	সাপ্তাহিক	প্রদীপ চৌধুরী	রানাঘাট
২৯২	১৯৮২	বর্ণায়ন	মাসিক	দেবাশিস ভট্টাচার্য	ধুবুলিয়া
২৯৩	১৯৮২	বার্তারাজ	পাক্ষিক	অনাদী দাস	নবদ্বীপ
২৯৪	১৯৮২	বাংলার পানসি	ত্রৈমাসিক	হজরত শেখ	কৃষ্ণনগর
২৯৫	১৯৮২	আনন্দম্	ত্রৈমাসিক	রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	চাপড়া
২৯৬	১৯৮২	গণসংহতি	ত্রৈমাসিক	স্বপন মজুমদার	রানাঘাট
২৯৭	১৯৮২	আটটা নটার সূর্য	ষাণ্মাসিক	অনুপ মণ্ডল	কৃষ্ণনগর
২৯৮	১৯৮২	অগ্রণী	ত্রৈমাসিক	নিতাই পোদ্দার	নবদ্বীপ
২৯৯	১৯৮২	উত্তরণ	ত্রৈমাসিক	অনিল দাস	কৃষ্ণনগর
৩০০	১৯৮২	অগ্নিবীণা	ত্রৈমাসিক	বিকাশ চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৩০১	১৯৮২	তৃতীয় কবিতা	ত্রৈমাসিক	সুবোধ সরকার	কৃষ্ণনগর
৩০২	১৯৮২	পরোয়ানা	বার্ষিক	জয়নাল আবেদিন	বার্ণিয়াঘাট
৩০৩	১৯৮২	নবীন কণ্ঠ	ত্রৈমাসিক	দীপককান্তি দত্ত	কৃষ্ণগঞ্জ
৩০৪	১৯৮২	পুরোধা	ত্রৈমাসিক	নীরদবরণ	রানাঘাট
৩০৫	১৯৮৩	দোলনচাঁপা	ত্রৈমাসিক	দেবব্রত পাল	বেথুয়াডহরি
৩০৬	১৯৮৩	পরশুরাম	দ্বিমাসিক	চম্পক গোস্বামী	বীরনগর
৩০৭	১৯৮৩	জীবনদীপ	পাক্ষিক	আমজাদ আলি হালসানা	শ্রীনগর
৩০৮	১৯৮৩	প্রহেলিকা	মাসিক	শ্যামল মিত্র	কৃষ্ণনগর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৩০৯	১৯৮৩	তরুণ	ত্রৈমাসিক	প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৩১০	১৯৮৩	সাম্য	ত্রৈমাসিক	—	কল্যাণী
৩১১	১৯৮৩	Environment & Ecology	ত্রৈমাসিক	সুশীলকান্ত কোনার	কল্যাণী
৩১২	১৯৮৩	কুশল	ত্রৈমাসিক	সত্যনারায়ণ মজুমদার	আসাননগর
৩১৩	১৯৮৩	ক্ষত্রিয়	ত্রৈমাসিক	হজরত আলি	বড় আন্দুলিয়া
৩১৪	১৯৮৩	রাখী	ত্রৈমাসিক	দেবপ্রসাদ সান্যাল	ধোঁড়াদহ
৩১৫	১৯৮৩	সম্যক্	ত্রৈমাসিক	রামপ্রসাদ মণ্ডল	কৃষ্ণনগর
৩১৬	১৯৮৩	সংভরণ	ত্রৈমাসিক	রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৩১৭	১৯৮৩	সীমান্ত	ত্রৈমাসিক	দয়াল শেখ	তেহট্ট
৩১৮	১৯৮৩	অন্বেষা	ত্রৈমাসিক	সঞ্জীব নাথ	কাটাগঞ্জ
৩১৯	১৯৮৩	সুখছায়া	ত্রৈমাসিক	তপনকুমার দত্ত	চাকদহ
৩২০	১৯৮৩	শ্রীচৈতন্য বিশ্ব সম্মিলনী	মাসিক	রাধারমণ দাস	রানাঘাট
৩২১	১৯৮৪	রণভূমি	ত্রৈমাসিক	সত্যনারায়ণ মজুমদার	আসাননগর
৩২২	১৯৮৪	রাহু	সাপ্তাহিক	প্রদীপ ঘোষ	রানাঘাট
৩২৩	১৯৮৪	সংহতি	মাসিক	শচীন বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৩২৪	১৯৮৪	লেখক বাংলো	ত্রৈমাসিক	অনিল দাস	কৃষ্ণনগর
৩২৫	১৯৮৪	বঙ্গদেশ	পাক্ষিক	নাড়ুগোপাল ঘোষ	কৃষ্ণনগর
৩২৬	১৯৮৪	বলাকা	ত্রৈমাসিক	অশোক দত্ত	রানাঘাট
৩২৭	১৯৮৪	এবং অন্যমুখ	পাক্ষিক	অমিতাভ মৈত্র	শান্তিপুর
৩২৮	১৯৮৪	কল্যাণী বার্তা	পাক্ষিক	সুপ্রভাত সিদ্ধান্ত	কল্যাণী
৩২৯	১৯৮৪	ক্রীড়াজগৎ	পাক্ষিক	সুকুমার পাত্র	রানাঘাট
৩৩০	১৯৮৪	ক্রীড়া প্রসঙ্গ	পাক্ষিক	স্বপন নন্দী	চাকদহ
৩৩১	১৯৮৪	অচিন পাখী	ত্রৈমাসিক	শঙ্কর সরকার	কৃষ্ণনগর
৩৩২	১৯৮৪	আস্পৃহা	ষাণ্মাসিক	জয়ভূষণ রায়	শান্তিনগর
৩৩৩	১৯৮৪	দৃষ্টি	পাক্ষিক	সমর চক্রবর্তী	চাকদহ
৩৩৪	১৯৮৪	নবীনের ডাক	ত্রৈমাসিক	কুঞ্জবন বিশ্বাস	বানপুর
৩৩৫	১৯৮৪	নিরীক্ষা	মাসিক	শেখ নজরুল ইসলাম	চিচুরিয়া
৩৩৬	১৯৮৪	নীহারিকা	ত্রৈমাসিক	বাণী হালদার	বীরনগর
৩৩৭	১৯৮৪	প্রতিকৃতি	মাসিক	সীতাংশু গোস্বামী	কল্যাণী
৩৩৮	১৯৮৪	প্রতিকৃতি	পাক্ষিক	মালা ঘোষ	কৃষ্ণনগর
৩৩৯	১৯৮৫	নদীয়াবাসী	মাসিক	সরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	অনন্তপুর
৩৪০	১৯৮৫	নিগ্রন	বার্ষিক	কিশলয় মিত্র	কৃষ্ণনগর
৩৪১	১৯৮৫	পদার্পণ	মাসিক	নিখিল তরফদার	রানাঘাট
৩৪২	১৯৮৫	ধী-দীপনা	ত্রৈমাসিক	দীনেশ মণ্ডল	ছোট চাঁদঘর
৩৪৩	১০৮৬	দীপ	ত্রৈমাসিক	স্বপ্না মণ্ডল	কল্যাণী
৩৪৪	১৯৮৪	অনুপ্রবেশ	ত্রৈমাসিক	নারায়ণ বৈরাগ্য	কৃষ্ণনগর
৩৪৫	১৯৮৪	শিশুক	মাসিক	শ্যাম বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৩৪৬	১৯৮৫	পাললিক	ত্রৈমাসিক	তপন ভট্টাচার্য	ফুলিয়া
৩৪৭	১৯৮৫	আহ্বান	মাসিক	প্রবীর চক্রবর্তী	শান্তিনগর
৩৪৮	১৯৮৫	গাণ্ডীব	মাসিক	সুখেন্দু রায়	নবদ্বীপ
৩৪৯	১৯৮৫	চোখ	মাসিক	আশিস ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
৩৫০	১৯৮৫	ভাস্বরবর্তিকা	পাক্ষিক	যূথিকা সরকার	কৃষ্ণনগর
৩৫১	১৯৮৫	মহাকাশ থেকে বলছি	পাক্ষিক	জয়ন্ত দালাল	শান্তিপুর
৩৫২	১৯৮৫	রতন	ত্রৈমাসিক	মানিকলাল দাস	বাদকুল্লা

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৩৫৩	১৯৮৫	শতদল	ত্রৈমাসিক	স্বপন সাহা	কৃষ্ণনগর
৩৫৪	১৯৮৫	শাণিত সায়ক	পাক্ষিক	চন্দন সেন	চাকদহ
৩৫৫	১৯৮৫	শিক্ষা	ত্রৈমাসিক	শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৩৫৬	১৯৮৫	স্বস্তিকা	মাসিক	বিজিত সাহা	কৃষ্ণনগর
৩৫৭	১৯৮৫	চিরন্তন ভাব ভাবনা	ত্রৈমাসিক	রাধারমণ সরকার	ফুলিয়া
৩৫৮	১৯৮৫	স্রোতস্বিনী	পাক্ষিক	অশোক দত্ত	রানাঘাট
৩৫৯	১৯৮৬	শঙ্খচিল	ত্রৈমাসিক	যতীন্দ্রনাথ রায়	বাহিরগাছি
৩৬০	১৯৮৬	সবিনয় নিবেদন	মাসিক	কিশোরী শাস্ত্রী	শান্তিপুর
৩৬১	১৯৮৬	সংবাদ ভারতী	পাক্ষিক	রতন ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
৩৬২	১৯৮৬	যত মত তত পথ	মাসিক	যোগানন্দ ব্রহ্মচারী	রানাঘাট
৩৬৩	১৯৮৬	বনামী	ত্রৈমাসিক	দিলীপ মজুমদার	বেথুয়াডহরি
৩৬৪	১৯৮৬	আর্যাবর্ত	মাসিক	সমীর সাহা	কৃষ্ণনগর
৩৬৫	১৯৮৬	উন্মীলন	ত্রৈমাসিক	মনোজ দে	ফুলিয়া
৩৬৬	১৯৮৬	কালকূট	ত্রৈমাসিক	তরুণ গোস্বামী	কৃষ্ণনগর
৩৬৭	১৯৮৬	কিশোর মঞ্জরী	মাসিক	রতন ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
৩৬৮	১৯৮৭	নতুনের সন্ধান	পাক্ষিক	সুবোধ চক্রবর্তী	শান্তিপুর
৩৬৯	১৯৮৭	অঙ্গন	মাসিক	সম্পাদকমণ্ডলী	কল্যাণী
৩৭০	১৯৮৭	বারোঘণ্টা	বার্ষিক	রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক	শান্তিপুর
৩৭১	১৯৮৭	মিলন বীথি	ত্রৈমাসিক	সমরেন্দ্র নরেন্দ্র বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৩৭২	১৯৮৭	রানার	মাসিক	সুশীল মজুমদার	হরিণঘাটা
৩৭৩	১৯৮৭	শ্রীলেখা	ত্রৈমাসিক	গীতাময় রায়	বানপুর
৩৭৪	১৯৮৭	সদাগর	পাক্ষিক	মহেশ সিংহানিয়া	কৃষ্ণনগর
৩৭৫	১৯৮৭	স্বস্তিদী	ত্রৈমাসিক	গৌরাঙ্গ দত্ত	মাজদিয়া
৩৭৬	১৯৮৭	অন্যপত্র	দ্বিমাসিক	অলোক বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৩৭৭	১৯৮৭	নদীয়া গৌরব	পাক্ষিক	তাপস ব্যানার্জি	রানাঘাট
৩৭৮	১৯৮৮	বাংলার কৃষি	পাক্ষিক	রবীন্দ্রনাথ সিংহরায়	কৃষ্ণনগর
৩৭৯	১৯৮৮	আলোকবর্ষ	পাক্ষিক	তরুণকান্তি ঘোষ	রানাঘাট
৩৮০	১৯৮৮	পর্ণ	ত্রৈমাসিক	বনলতা ভট্টাচার্য	চাকদহ
৩৮১	১৯৮৮	নবযুগ	মাসিক	কুসুমকান্তি বিশ্বাস	প্রতাপপুর
৩৮২	১৯৮৮	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বার্তা	বার্ষিক	হরেনচন্দ্র পাল	নবদ্বীপ
৩৮৩	১৯৮৮	শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান	মাসিক	সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার	নবদ্বীপ
৩৮৪	১৯৮৮	সকাল	মাসিক	প্রাণেশ সরকার	তাহেরপুর
৩৮৫	১৯৮৮	সন্নাহ	মাসিক	সমর চক্রবর্তী	চাকদহ
৩৮৬	১৯৮৮	জীবনের উৎস	মাসিক	ঈশানচন্দ্র পাল	কৃষ্ণনগর
৩৮৭	১৯৮৮	নদীয়া থেকে	পাক্ষিক	অশোক সরকার	করিমপুর
৩৮৮	১৯৮৮	মৈত্রী	ত্রৈমাসিক	নিতাইকৃষ্ণ দে	বড় আন্দুলিয়া
৩৮৯	১৯৮৯	মা জহুরা দিব্যলোক	মাসিক	স্বপ্না চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৩৯০	১৯৮৯	সাহিত্য বাসর	ত্রৈমাসিক	বিপুল ঘোষ	মাজদিয়া
৩৯১	১৯৮৯	শরব্য	ত্রৈমাসিক	তাপস চক্রবর্তী	শান্তিপুর
৩৯২	১৯৮৯	শতক্র	ত্রৈমাসিক	সুব্রত বেপারী	পাটিকাবাড়ি
৩৯৩	১৯৮৯	ভাবাসত্র	ষান্মাসিক	অজ্ঞাত	শান্তিপুর
৩৯৪	১৯৮৯	বিজ্ঞানলোক	মাসিক	পুলক গোস্বামী	চাকদহ
৩৯৫	১৯৮৯	কৌশিক	ত্রৈমাসিক	শীতল ঘোষ	বেথুয়াডহরি
৩৯৬	১৯৮৯	গাঙের বার্তা	ত্রৈমাসিক	উত্তম চক্রবর্তী	শান্তিপুর

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৩৯৭.	১৯৮৯	গোর্কি	ত্রৈমাসিক	শ্যামল রায়	নবদ্বীপ
৩৯৮	১৯৮৯	এবা	মাসিক	রাজা মজুমদার	চাকদহ
৩৯৯	১৯৮৯	কথা	ত্রৈমাসিক	তপন ভট্টাচার্য	মহিষবাথান
৪০০	১৯৮৯	পূর্বাভাস	মাসিক	রবীন পোদ্দার	চাপড়া
৪০১	১৯৮৯	পাবলিক লাইব্রেরি	সাপ্তাহিক	অপূর্ব দত্ত	তাহেরপুর
৪০২	১৯৯০	প্রতীক	মাসিক	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৪০৩	১৯৯০	ন্যাগ্রোধ	ত্রৈমাসিক	মহাদেব সাহা	বড় আন্দুলিয়া
৪০৪	১৯৯০	এ মাসের কবিতা	ত্রৈমাসিক	বিশ্বনাথ সাহা	কৃষ্ণনগর
৪০৫	১৯৯০	ঋতু	মাসিক	অসীম দেবনাথ	রানাঘাট
৪০৬	১৯৯০	খো খো জগৎ	পাক্ষিক	অলোক দাশগুপ্ত	চাকদহ
৪০৭	১৯৯০	বাঞ্ছারাম	ত্রৈমাসিক	ফল্গু বসু	শান্তিপুর
৪০৮	১৯৯০	বিজ্ঞান ও সমাজ	মাসিক	অসিত চক্রবর্তী	চাকদহ
৪০৯	১৯৯০	শিল্পীমুখ	বার্ষিক	সতীশ ভৌমিক	কালীরহাট
৪১০	১৯৯০	সাঁকো	ত্রৈমাসিক	নারায়ণ ঘোষ	মাজদিয়া
৪১১	১৯৯০	সোনালী জীবন	ত্রৈমাসিক	কালাচাঁদ রায়	চাপড়া
৪১২	১৯৯০	সোনার কৃষি	পাক্ষিক	মাধব রায়	রানাঘাট
৪১৩	১৯৯০	হাওয়া	ত্রৈমাসিক	সুজিৎ সেন	নবদ্বীপ
৪১৪	১৯৯০	অন্তর্দীপন	ত্রৈমাসিক	ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	রাধানগর
৪১৫	১৯৯০	ত্রিনেত্র	মাসিক	শুভ্রাংশু চক্রবর্তী	নবদ্বীপ
৪১৬	১৯৯০	মরমিয়া	ত্রৈমাসিক	রবীন্দ্রনাথ পাল	বগুলা
৪১৭	১৯৯১	প্রসব	ত্রৈমাসিক	স্বপনবরণ আচার্য	কৃষ্ণনগর
৪১৮	১৯৯১	জীবন সঞ্চয়	ত্রৈমাসিক	যতীন্দ্রমোহন দত্ত	কৃষ্ণনগর
৪১৯	১৯৯১	পথিকৃৎ	ত্রৈমাসিক	দিবাকুর শুকুল	কৃষ্ণনগর
৪২০	১৯৯১	সঞ্জীবন	ত্রৈমাসিক	ফাদার লুচানো কলুসসি	কৃষ্ণনগর
৪২১	১৯৯১	সাহিত্য দর্পণ	ত্রৈমাসিক	রতন চক্রবর্তী	কৃষ্ণনগর
৪২২	১৯৯১	রাজধানী থেকে গ্রাম	পাক্ষিক	মহাদেব দাস	রানাঘাট
৪২৩	১৯৯১	রুরাল নিউজ	পাক্ষিক	কবিতা রায়	চাকদহ
৪২৪	১৯৯১	বিকশিত	মাসিক	বিধান ঘোষ	শিমুরালি
৪২৫	১৯৯১	তীরন্দাজ	ত্রৈমাসিক	অপূর্ব সাহা	কৃষ্ণনগর
৪২৬	১৯৯১	স্পন্দন	ত্রৈমাসিক	অর্ঘ্য মজুমদার	মাজদিয়া
৪২৭	১৯৯১	আজকের প্রহরী	মাসিক	অরুণ ভট্টাচার্য	চাকদহ
৪২৮	১৯৯১	সমকাল	পাক্ষিক	নীতা অধিকারী	চাকদহ
৪২৯	১৯৯১	বিদ্যানন্দ	মাসিক	শ্যামাপদ বিশ্বাস	চাকদহ
৪৩০	১৯৯১	গণ জাগরণ	মাসিক	নিরঞ্জন মজুমদার	চাকদহ
৪৩১	১৯৯১	আকালিক	ত্রৈমাসিক	বিজয় বারুই	গাংনাপুর
৪৩২	১৯৯১	আনন্দধারা	ত্রৈমাসিক	পার্থ জোয়ারদার	ফুলিয়া
৪৩৩	১৯৯২	সাহিত্য মানস	ত্রৈমাসিক	জগবন্ধু দেবনাথ	চাকদহ
৪৩৪	১৯৯২	সঞ্জীবন	ত্রৈমাসিক	সমরেন্দ্র নরেন্দ্র বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৪৩৫	১৯৯২	মিতালী	ষান্মাসিক	তপন বিশ্বাস	তারকনগর
৪৩৬	১৯৯২	প্রাতিস্বিক	ত্রৈমাসিক	শিল্পী রায়	রানাঘাট
৪৩৭	১৯৯২	নবমালঞ্চ	পাক্ষিক	শক্তিপ্রসাদ সাহা	নবদ্বীপ
৪৩৮	১৯৯২	বসুন্ধরা	মাসিক	বিধানচন্দ্র ঘোষ	শিমুরালি
৪৩৯	১৯৯২	বৃষ্টিধারা	ত্রৈমাসিক	স্বপন সাহা	কৃষ্ণনগর
৪৪০	১৯৯২	রঞ্জিকা	পাক্ষিক	শ্যামল রঞ্জন সরকার	বাদকুল্লা

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৪৪১	১৯৯২	সংলাপী	পাক্ষিক	শান্তনু চৌধুরী	করিমপুর
৪৪২	১৯৯২	হোমিও শিখা	দ্বিমাসিক	এম এন দাস	চাকদহ
৪৪৩	১৯৯২	দীধিতী	দ্বিমাসিক	তপন শেঠ	শিমুরালি
৪৪৪	১৯৯২	বিরোধী পক্ষ	ত্রৈমাসিক	স্বপন মোদক	চাকদহ
৪৪৫	১৯৯২	রাখী	ত্রৈমাসিক	শ্যামলরঞ্জন সরকার	বাদকুল্লা
৪৪৬	১৯৯২	সাহিত্য সংলাপ	মাসিক	প্রবীর আচার্য	কৃষ্ণনগর
৪৪৭	১৯৯২	১৪০০ সাল	ত্রৈমাসিক	তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	কল্যাণী
৪৪৮	১৯৯৩	নির্মাণ	ত্রৈমাসিক	বাসুদেব ঘোষরায়	রানাঘাট
৪৪৯	১৯৯৩	হিমালয়	পাক্ষিক	শ্যামলকান্তি বিশ্বাস	বগুলা
৪৫০	১৯৯৩	সম্পর্ক	ত্রৈমাসিক	কুমারশঙ্কর রায়শর্মা	কল্যাণী
৪৫১	১৯৯৩	সবুজ কলম	—	সুব্রত বিশ্বাস	শান্তিপুর
৪৫২	১৯৯৩	সঙ্ঘবার্তা	পাক্ষিক	জয়ন্ত দালাল	শান্তিপুর
৪৫৩	১৯৯৩	সঙ্ঘবাণী	ত্রৈমাসিক	সুজিত তরফদার	মাজদিয়া
৪৫৪	১৯৯৩	স্লেট পেন্সিল	ত্রৈমাসিক	জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৪৫৫	১৯৯৩	সোনাই বার্তা	মাসিক	পার্থ চৌধুরী	কল্যাণী
৪৫৬	১৯৯৩	মিত্রমহল	পাক্ষিক	সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী	করিমপুর
৪৫৭	১৯৯৩	যুগধারা	ষাণ্মাসিক	নজরুল ইসলাম	চাপড়া
৪৫৮	১৯৯৩	শমী	—	স্বপন শর্মা	শিমুরালি
৪৫৯	১৯৯৩	শহর থেকে গ্রামে	সাপ্তাহিক	মানবকান্তি পাল	কল্যাণী
৪৬০	১৯৯৩	নির্মাণ	ত্রৈমাসিক	প্রীতম দে	রানাঘাট
৪৬১	১৯৯৩	পলিমাটি	ত্রৈমাসিক	মুকুল ঘোষাল	পলাশীপাড়া
৪৬২	১৯৯৩	প্রজন্ম	ত্রৈমাসিক	গোপাল নাথ	হবিবপুর
৪৬৩	১৯৯৩	ফিনিক্স	ত্রৈমাসিক	গৌতম সাহা	ধুবুলিয়া
৪৬৪	১৯৯৩	বঙ্গজনের কথা	পাক্ষিক	নির্মল দত্ত	কৃষ্ণনগর
৪৬৫	১৯৯৩	বাংলার চিঠি	পাক্ষিক	অমরেশ কর্মকার	করিমপুর
৪৬৬	১৯৯৩	বিষ	ত্রৈমাসিক	প্রতাপ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
৪৬৭	১৯৯৩	ঠিক সময়	পাক্ষিক	কাজল বিশ্বাস	রানাঘাট
৪৬৮	১৯৯৩	তিতলি	ত্রৈমাসিক	শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ	ধুবুলিয়া
৪৬৯	১৯৯৩	নদীয়া এক্সপ্রেস	ষাণ্মাসিক	অমৃত বিশ্বাস	হাতিশালা
৪৭০	১৯৯৩	নহন্যতে	ত্রৈমাসিক	সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়	চাকদহ
৪৭১	১৯৯৩	কালকূট	দ্বিমাসিক	মুরারীমোহন বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর
৪৭২	১৯৯৩	কৃষ্টি	ত্রৈমাসিক	শীতম ভট্টাচার্য	কৃষ্ণনগর
৪৭৩	১৯৯৩	খোলাচোখ	ত্রৈমাসিক	প্রকাশ চক্রবর্তী	বেথুয়াডহরি
৪৭৪	১৯৯৩	গাঁদাফুল	ত্রৈমাসিক	অনিল দাস	রানাঘাট
৪৭৫	১৯৯৩	জোয়ার	ত্রৈমাসিক	মুকুল চ্যাটার্জি	পলাশীপাড়া
৪৭৬	১৯৯৩	সুবর্ণ	মাসিক	সুধীরেন্দ্রনাথ পাত্র	কৃষ্ণনগর
৪৭৭	১৯৯৩	সেরা খবর	পাক্ষিক	কুসুমকান্ত বিশ্বাস	প্রতাপপুর
৪৭৮	১৯৯৩	অনিষ্ট	ত্রৈমাসিক	সুখেন্দু বিশ্বাস	বগুলা
৪৭৯	১৯৯৩	আঁকাবাঁকা	ত্রৈমাসিক	শিবশঙ্কর শীল	চাকদহ
৪৮০	১৯৯৩	সবলার প্রতিবেদন	পাক্ষিক	দেবযানী মুখার্জি	রানাঘাট
৪৮১	১৯৯৩	এবা	ত্রৈমাসিক	তপন ভট্টাচার্য	ধুবুলিয়া
৪৮২	১৯৯৩	মুখপত্র	মাসিক	বলাই চৌধুরী	শান্তিপুর
৪৮৩	১৯৯৩	অনুভব	ত্রৈমাসিক	শরিফুল ইসলাম	কৃষ্ণনগর
৪৮৪	১৯৯৪	পৃক্তি	বার্ষিক	সম্পাদকমণ্ডলী	নবদ্বীপ

ক্রমিক	সূচনাবর্ষ	পত্র-পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম	সূচনাস্থান
৪৮৫	১৯৯৪	ছড়াছন্দে	মাসিক	রতন ভট্টাচার্য	শান্তিপুর
৪৮৬	১৯৯৪	স্ব	ত্রৈমাসিক	অয়ন জোয়ারদার	কল্যাণী
৪৮৭	১৯৯৪	ইছামতী	মাসিক	বাণী সরস্বতী	দত্তফুলিয়া
৪৮৮	১৯৯৪	এপার বাংলা ওপার বাংলা	সাপ্তাহিক	অমিয়রাণী বিশ্বাস	পিপুলবাড়িয়া
৪৮৯	১৯৯৪	ছড়াপাখী	মাসিক	গদাধর সরকার	কৃষ্ণনগর
৪৯০	১৯৯৪	জনমুখ	পাক্ষিক	দেবু চট্টোপাধ্যায়	শান্তিপুর
৪৯১	১৯৯৪	জানালা	ত্রৈমাসিক	দীপক মিস্ত্রি	বগুলা
৪৯২	১৯৯৪	নবদিশারী	ত্রৈমাসিক	লক্ষ্মণচন্দ্র মল্লিক	রানাঘাট
৪৯৩	১৯৯৪	পাল্টাস্রোত	ত্রৈমাসিক	গোপাল ঘোষ	চাকদহ
৪৯৪	১৯৯৪	সংবাদ ভারতী	পাক্ষিক	জয়ন্ত দালাল	শান্তিপুর
৪৯৫	১৯৯৪	নবদ্বীপ দর্পণ	মাসিক	সীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়	নবদ্বীপ
৪৯৬	১৯৯৪	প্রয়াস	পাক্ষিক	তরুণ ঘোষ	শান্তিপুর
৪৯৭	১৯৯৪	নদীয়ার প্রতিনিধি	পাক্ষিক	বিকাশ বিশ্বাস	ফুলিয়া
৪৯৮	১৯৯৪	অন্যমুখ	ত্রৈমাসিক	সমর চক্রবর্তী	চাকদহ
৪৯৯	১৯৯৫	জলাঙ্গী	ত্রৈমাসিক	গদাধর সরকার	কৃষ্ণনগর
৫০০	১৯৯৬	নাট্যমনন	বার্ষিক	সমীর দাশগুপ্ত	কল্যাণী

☐ **সহায়ক গ্রন্থাবলী :**

১। কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী,* কলকাতা, ১৯৮৬ (৩য় সংস্করণ) (সম্পা) মোহিত রায়।

২। জয়ন্ত দালাল, *নদীয়া জেলার পত্র-পত্রিকা,* কৃষ্ণনগর, ১৯৯৪।

৩। একাধিক সাময়িক ও ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা

☐ পরামর্শ দিয়ে, তথ্য জুগিয়ে এবং পুরনো পত্র-পত্রিকা দেখতে দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন :

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, মোহিত রায়, শতঞ্জীব রাহা, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুপ্রভাত সিদ্ধান্ত, সুমিত দে, সমীর দাশগুপ্ত এবং কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি।

সূত্র :

১। ১৯৪৮ সালে পরেশনাথ ঘোষ এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল *কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ।* সুনীতিকুমারের একটি ইংরেজি রচনা ওই গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ; শিরোনাম ছিল : 'The Court of Raja Krishna Chandra of Krishnagar : A centre of Culture in the 18th. Century Bengal-এরই বঙ্গানুবাদ, 'কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা : অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র', প্রকাশিত হয়েছিল কল্যাণী থেকে প্রকাশিত তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *১৪০০ সাল* ত্রৈমাসিকের দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়। উদ্ধৃতিটি সেখান থেকে নেওয়া।

নদিয়ার ভাষা

দেবাশিস ভৌমিক

অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্বর আকার ধারণ করে। .... সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ্য থাকিলে আচারে ব্যবহারে, অঙ্গভঙ্গিতে ভাষায় কণ্ঠস্বরে সাজসজ্জায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযম আসিয়া পড়ে। .... এই অশিক্ষা ও অনাচারবশত আমাদের দৈনিক ভাষা ও কাজের মধ্যে একটি সুমার্জিত সুষমা একটি শ্রী লক্ষিত হয়না। আমরা কেমন যেন আট-পৌরে গায়েপড়া ফেলাছড়া ঢিলেঢালা নড়বড়ে রকমের জাত, পৃথিবীর কাজেও লাগি না, পৃথিবীর শোভাও সাধন করিনা।

বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধু বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষাতেই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ভাষাগত এই বৈচিত্র্যকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা আঞ্চলিক উপভাষা নামে চিহ্নিত করেছেন। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বাংলাভাষাকেও মোটামুটি পাঁচটি উপভাষায় সংহত করা হয়েছে। এগুলি হল রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী এবং কামরূপী। অবশ্য কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিক সিলেট-চট্টগ্রামের ভাষাকে স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে সনাক্ত করতে চাইছেন। উপভাষাগত এই শ্রেণীবিন্যাস কোন কোন জেলাকে ভিত্তি করে করা হয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রের উপর প্রথমেই চোখ রাখা যাক :

রাঢ়ী : মধ্য পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী—বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪-পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)

বঙ্গালী : পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণপূর্ববঙ্গ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম)

আলোচনার সংহতি রক্ষা করবার জন্য বাকি উপভাষাগত অঞ্চলগুলির পরিচয় দেওয়া থেকে বিরত থাকা যেতে পারে।

লক্ষ করা যাচ্ছে, নদিয়াকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা রাঢ়ী উপভাষা কেন্দ্রিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং, প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, নদিয়ার ভাষা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকেই মূলত ধারণ করে রেখেছে। উপভাষাগত এই নির্দিষ্ট মৌলিকত্বকে মাথায় রেখেই 'নদিয়ার ভাষা' সম্পর্কে আলোচনার পত্তন ঘটানো যেতে পারে।

'নদিয়ার ভাষা' রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েও কিন্তু কিছুটা স্বতন্ত্র। নদিয়ার ভাষাতে এই স্বাতন্ত্র্য কিভাবে এসেছে তা আমাদের যেমন দেখতে হবে, তেমনই বিশ্লেষণ করতে হবে উক্ত স্বাতন্ত্র্য অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। কথ্যভাষার কথা বলছি এই কারণে যে, ভাষাগত নানা বিবর্তন এই কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করেই গতিশীল হয়ে ওঠে। সুতরাং, আমাদের আলোচনার এলাকা মূলত নদিয়ার কথ্যভাষার উপর নির্ভর করেই পল্লবিত হবে। আলোচনার সুবিধার্থে লেখ্যভাষা সম্পর্কে হয়ত কিছুটা বলতে হবে।

নদিয়ার ভাষা সম্পর্কে মতামত দিতে হলে কিছুটা পিছন ফিরে তাকাতে হবে আমাদের। নদিয়ার ভাষা বলতে আমরা আজ যাকে আলোকিত করে তুলতে চাইছি তার একটা সুস্পষ্ট ইতিহাস রয়েছে। আলোচনার নান্দীতে সেটুকু না বললে অন্যায় হবে। নদিয়ার ভাষাগত শিকড়ের সন্ধানে পৌঁছতে হলে উনিশ শতক থেকেই তার মূলাগ্র বিবেচনা করতে হবে। কারণ তার আগের ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট। উনিশ শতকের নদিয়ায় ভাষা বলতে বাংলার অস্তিত্ব ছিল অতীব ক্ষীণ। তথ্যানুসন্ধানে জেনেছি, সে সময় নদিয়া বলতে বোঝাত মূলত নবদ্বীপকে (ন অ দ্দী অ)। নবদ্বীপই ছিল সে সময় সংস্কৃতিচর্চার মূল কেন্দ্র। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষেরা নবদ্বীপে 'সংস্কৃত, পারস্য এবং বঙ্গভাষার অনুশীলন' করতেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বৈদ্য, ঘটক, কুলজ্ঞ সন্তানেরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতি ভাষা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হতেন।

পাশাপাশি এও সত্য, সে সময় পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলবার কিংবা লেখার কোনও প্রথাই ছিল না। বেশিরভাগ কথার মধ্যে, লেখার মধ্যে তো বটেই পারস্য ও হিন্দি শব্দ ব্যবহৃত হত। রাজাধীন কর্মচারিরা প্রায় সকলেই সংস্কৃত জানতেন। কিন্তু চিঠিপত্র লেখার সময় তাঁরা 'অন্য' ভাষার দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হতেন। 'অন্য' ভাষা বলতে পারস্য ও হিন্দির কথাই বলতে চাইছি। কিছুটা উর্দুও থাকত। যদিও বিদগ্ধ পণ্ডিতমহল সংস্কৃতের সাহায্যেই ভাষাগত আদানপ্রদানের কাজটি করতেন। কথ্য সংস্কৃতের প্রতি এই মোহ ঘুচে যেত লেখার সময়; তখন হাতে উঠে আসত সংস্কৃতমিশ্রিত ভাষা।

তবে সংস্কৃত ভাষার প্রতি এই সময়মাফিক অবহেলা নবদ্বীপের রাজাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। সংস্কৃত ভাষার মানোন্নয়নে তাঁরা যে একাধিকবার সক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তেমন নজির পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, বাংলাভাষার প্রতি সামন্ত-প্রভুদের কখনই তেমন নেকনজর পড়েনি। ফলে, সে সময় নদিয়ার (বাংলা)ভাষা দুয়োরানীর মতো সৌভাগ্যের অপেক্ষার প্রহর যাপন করেছে।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, একদিকে বাংলাভাষার প্রতি যখন এই উপেক্ষা, সংস্কৃত ভাষার বিকৃত প্রয়োগ, পারস্য ও হিন্দি শব্দের সুবৃহৎ প্রভাব, তখন অন্যদিকে বঙ্গভাষার আলোকবর্তিকা নিয়ে নদিয়ায় আবির্ভূত হচ্ছেন কৃত্তিবাস ওঝা, কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভারতচন্দ্র, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস প্রমুখ। এঁদের ক্রমিক প্রয়াস বাংলাভাষার একটা উর্বর জমি তৈরি করে দিয়েছিল। পরবর্তীকাল তাকে সযত্নে লালন ও বর্ধন করেছে। ফলে, এই নবতর উর্মিসঞ্চার নদিয়ার ভাষাগত খানদানকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই দেখছি, বিচারালয়ের ভাষাই ছিল নদিয়ায় উচ্চকোটির ব্যবহার্য ভাষা। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, মাসিক পাঁচ-ছয় টাকার বিনিময়ে তখন শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের দশ-বারোটি বই মুখস্থ করাতেন। পঠিত বইগুলি কতকটা Word Book গোছের। আরবি, উর্দু ও পারস্য শব্দ এবং বাক্যগঠন শিক্ষাই ছিল তখন নদিয়ার মূল পঠিতব্য বিষয়। ভাষাশিক্ষার এই অচলায়তনটি আলোড়িত হল ১৮৩৭ সালে। ২৯ বিধি অনুসারে যখন বঙ্গদেশের সমস্ত জেলাতে পারস্য ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটল, তখন তার প্রভাব পড়ল নদিয়ার ভাষার উপরেও। ভাষাগত একটা বিবর্তন শুরু হয়ে গেল নদিয়ায়। নদিয়ার ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে এই ইতিহাসটুকু জানা জরুরি।

শুধু নদিয়া বলে নয়, ভাগীরথী-গঙ্গা তীরবর্তী প্রায় প্রতিটি জনপদেই উনিশ শতকের শেষ থেকে বাংলাভাষার সমৃদ্ধির সূত্রপাত ঘটেছে। নদিয়ার মুখ্যজনপদ হিসেবে ভাষাসচেতনতা লক্ষণীয় হল নবদ্বীপে, কৃষ্ণনগরে, শান্তিপুরে, রাণাঘাটে। ভাষাগত এই বিবর্তন শুধু কথ্যভাষার ক্ষেত্রেই নয়, তা সঞ্চারিত হল লেখার ভাষাতেও। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই লেখার ভাষার দু'একটি নজির উপস্থাপিত করতে চাই। উনিশ শতকের নদিয়ায় লেখ্য নিদর্শন খুব প্রচুর কিছু নয়। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে দিয়েই ভাষাগত বদলটা উপলব্ধি করা যাবে। বোঝা যাবে, বাংলা গদ্যসাহিত্য মুক্তির আকাশে ডানা মেলেছে, পারস্য ও হিন্দি শব্দের প্রভাব কমে আসছে অনেকটাই।

।১। ১৯.১.১২৫৮-তে লেখা এক নদিয়াবাসীর পত্র :

> কৃষ্ণনগর॥ ১৫ বৈশাখ..... এখানকার কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করাতে, অধুনা সেই পদ শূন্য হইয়াছে। ইহাতে প্রিন্সিপেল সাহেব নিম্নস্থ শিক্ষকদিগের এক এক পদ বৃদ্ধিকরণের অভিপ্রায়ে গত দিবসে এডুকেশন কৌন্সেলে পত্র লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষ সাহেবের এই অভিপ্রায়ে সদ্‌অভিপ্রায় কহিতে হইবেক।[১]

উক্ত পত্রে ভাষাগত যে সাবলীল ভঙ্গিটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা নদিয়ার কথ্য ভাষার একটা অস্পষ্ট রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহী করে তোলে, আমরা বুঝে নিই, লেখ্য ভাষার এই সহজ ভঙ্গির সমান্তরালে কথ্য ভাষাটিও খোলা হাওয়ার চলা পথে পা বাড়িয়েছে।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে ঘনঘোর তমসা নেমেছিল। তখন সাহিত্যের মলিন দীপখানি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন কবিওয়ালার দল। এঁদের লেখায় (খুবই কম) উঠে এসেছিল সমকালীন বাংলাদেশের নানা ছবি। তেমনই একটি ছবিতে লক্ষ করেছি, নদিয়ার মুখ। তার ভাষা সম্পর্কে ক্ষণিক মন্তব্য :

'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥'

সে সময় এর বিখ্যাত খেউড়গানের দলটি গড়ে উঠেছিল এই শান্তিপুরে। যে শান্তিপুরের ভাষা সম্পর্কে আজও 'মিঠে ভাষা'র জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য একতরফা প্রশংসা না করে একটি চিঠি তুলে ধরলে সে বদ্ধমূল ধারণা কিছুটা নড়ে উঠবে।

২৩.২.১২৫৪

।২। ''সম্পাদকীয়,

.....শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি বিয়ারিং পোস্টে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রে তত্রস্থ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গদ্যপদ্যে কতকগুলীন গালাগালি লেখা হইয়াছে, পাঠ করিবামাত্রই পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম। লাভের মধ্যে দণ্ডস্বরূপ দুই পয়সা মাশুল দিতে হইল। আমারদিগের এমত প্রার্থনা যে, জিলবাসী মহোদয়েরা সর্বদাই বিদ্যাবিষয়ের অনুশীলন করেন এবং ভাল ২ বিষয় রচনা করিয়া পাঠান।'' [২]

কবিওয়ালাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাশাপাশি এই চিঠিতে পত্রিকা সম্পাদকের মন্তব্যটি বিসদৃশ ঠেকে।

সে যাই হোক, সামগ্রিকভাবে নদিয়ার রাঢ়ী উপভাষার যে সফলতম প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় তাকে নিন্দা করবার কোনও কারণ নেই। মোট কথা 'নদিয়ার ভাষা' এমন একটি ভাষা যা শিষ্টজনের অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে সততই। প্রসঙ্গত মীর মশারফ হোসেনের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবনী'র বংশপুরাণ থেকে কিছুটা অংশ তুলছি :

।৩। ''নৌকা ভিড়িতেই গাড়োয়ান, মুটে, মজুর, সকলেই হাজির। আর তাহাদের কথাবার্তা এমনই সুন্দর যে পূর্বে কখনোই ওরূপ কথা কানে উঠে নাই। ....এই সেই কৃষ্ণনগর যেখানে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। অধিবাসীগণ উৎকৃষ্ট বাংলা কথাবার্তা কহিয়া থাকে, একথা ভারতবিখ্যাত। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা তেমনি লালিত্যপূর্ণ।'' [৩]

নদিয়ার ভাষা সম্পর্কে মশাররফ হোসেনের এই মন্তব্যকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েই নদিয়ার মুখ্য জনপদগুলির ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। উচ্চারণের সঠিক বর্ণনা দেবার জন্য I.P.A.-র সাহায্য নেওয়া হল।

নদিয়ার মুখ্যজনপদ হিসেবে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ইত্যাদি অঞ্চলের কথ্য ভাষায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত পরিলক্ষিত হয় তা রাঢ়ীরই অন্তর্ভুক্ত। রাঢ়ী উপভাষার মৌলিকত্ব অনুসারে এখানেও রয়েছে :

"নৌকা ভিড়িতেই গাড়োয়ান, মুটে, মজুর, সকলেই হাজির। আর তাহাদের কথাবার্তা এমনই সুন্দর যে পূর্বে কখনোই ওরূপ কথা কানে উঠে নাই। .... এই সেই কৃষ্ণনগর যেখানে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। অধিবাসীগণ উৎকৃষ্ট বাংলা কথাবার্তা কহিয়া থাকে, একথা ভারতবিখ্যাত। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা তেমনি লালিত্যপূর্ণ।"

ক॥ অভিশ্রুতির প্রভাব। মূলত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অভিশ্রুতির লক্ষণ দুর্লভ নয়। যেমন :

ধুবুলিয়া > ধুবুলে (ইয়া > এ)
এরকম, নদীয়া > নদে হাকানিয়া > হাফানে > হাপানে

খ॥ রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানেও রয়েছে স্বরসঙ্গতির বিস্তর উদাহরণ। যেমন :

পিষা > পেষা শিকল > শেকল > ছেকোল (নদীয়ায়)
মুড়াগাছা > মুড়োগাছা > মুড়োগাচা (ন)

গ॥ শব্দের শেষে মহাপ্রাণধ্বনির লঘুতা ভীষণভাবে দেখা যায়। যেমন :

দ্যাখা > দ্যাকা সুখ > সুক
বধ > বদ কথা > কতা

ঘ॥ শব্দের মধ্যেও মহাপ্রাণধ্বনির লঘুতা রয়েছে নদিয়ার ভাষায়। যেমন :

পাথর > পাতর > পাতোর লেখাপড়া > লেকাপড়া
(> ন্যাকাপড়া—ব্যাঙ্গার্থে)

এছাড়া নদিয়ায় মুখ্যজনপদগুলিতে রাঢ়ীর যে বৈচিত্র্যগুলি চোখে পড়ে তা কিছু কিছু এইরকম :

১. বহুবচন বোঝাতে 'খানা' শব্দের বহুল প্রচলন রয়েছে। যেমন :

হাতখানা বইখানা পরানখানা

২. 'দ'-র পরিবর্তে 'ন' ধ্বনির খুব ব্যবহার রয়েছে। যেমন :

ল্যাজ > ন্যাজ   লেবু > নেবু

৩. যখন তখন ধ্বনির নাসিক্যীভবন ঘটে নদিয়াবাসীর মুখে। যেমন :

আড়বান্দী > আড়বাঁদী

স্বতোনাসিক্যীভবন তো হামেশাই ঘটে। যেমন :

হাসি > হাঁসি   আয় (চলে) > আঁয়

৪. অতীত (নিত্যবৃত্ত) কালের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

গিয়েছি > গিছিচি   বলেছি > বলিচি

করেছি > করিচি

৫. ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে উত্তমপুরুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ব্যবহার :

দেব > দোব (নঃ)   নেব > নোবো (নঃ)

একইভাবে :

দেওয়া (যাবে না) > দোওয়া (যাবে না)

নেওয়া (যাক) > নেওয়া (যাক)

৬. সদ্যঘটিত ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

এসেছে > এয়েচে

৭. 'আ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হবার প্রবণতা চোখে পড়ে। যেমন :

ঝাঁটা > ঝ্যাঁটা (মুখে ঝ্যাঁটার বাড়ি)

ছানা > ছ্যানা (ছ্যানার মিষ্টি)

৮. প্রশ্নসূচক অব্যয় হিসেবে 'কেন' নদিয়ায় উচ্চারিত হয় 'ক্যানে'।

ক্যানো > ক্যানে

৯. ঘটমান বর্তমানকালের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের মৌলিকত্ব :

ছিটোচ্ছে > ছিটুচ্চে   কিলোচ্ছে > কিলুচ্চে

বেরোচ্ছে > বেরুচ্চে

১০. শব্দের মধ্যে দুটি স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি 'ম' লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটিকে অনুনাসিক করে দেয়। যেমন :

বামুন > বাঁউন   আমোন > আঁওন

শমন > শওঁন

১১. মূল রাঢ়ীর মতো এখানেও রয়েছে সমীভবন প্রবণতা। যেমন :

করছি > কচ্চি   ধরছে > ধোচ্চে

ঝরছে > ঝোচ্চে

১২. 'ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে প্রায়শই বদলে যায়। যেমন :

বোন > বুন   কোথায় > কুতায়

১৩. কথ্যভাষায় উপস্থাপনার মাত্রা হিসেবে :

তাই না ? > নায় ?

১৪. শব্দের শেষে 'জ্ঞ' ফলা থাকলে তা 'ই' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

যজ্ঞ > যোগ্‌গি   পথ্য > পোত্‌তি

এছাড়া নদিয়ার মুখ্যজনপদগুলিতে প্রচলিত রয়েছে অজস্র সমাসবদ্ধ শব্দ ; যে শব্দগুলি একান্তই নদিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। যেমন :

ক্ষীরখেজুর (একই সাথে রসিক ও ধূর্ত)

খিলেন মাল (সহজ পাত্র নয়)

আয়লো অলি কুসুম কলি (ন্যাকামো) ইত্যাদি।

তবে বর্তমানে এরকম সমাসবদ্ধ শব্দ কিংবা বিশেষার্থে প্রযুক্ত বাক্য সহজেই অঞ্চলের গণ্ডি অতিক্রম করছে। ফিরে আসছে নতুন শব্দ। নতুন বাক্য।

এতক্ষণ যা বলেছি তা নদিয়ার মুখ্যজনপদের ভাষা সম্পর্কে। এবারে আসা যাক সুবৃহৎ নদিয়ার ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে। তার আগে নদিয়ার যে সব অঞ্চলে কোনও একটি বিশেষ ধ্বনি বা কোনও ধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণ প্রচলিত সেইসব অঞ্চল রেখাঙ্কিত করে 'সমধ্বনি গণ্ডীরেখা' (Isophone) নির্মাণ করা যাক।

[মানচিত্রটি আলাদা পৃষ্ঠায় দেওয়া হল]

মূলত সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলির মানুষ রাঢ়ী উপভাষাতেই ভাবের আদানপ্রদান ঘটায়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে এইসব অঞ্চলের কথ্যভাষায়, উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে, বাক্যগঠনের style-এ নানা মৌলিকত্ব রয়েছে। কানে শুনে বোঝা যায় এদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যটি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানচিত্রে প্রদত্ত অঞ্চলগুলিতে যাঁরা এই স্বতন্ত্র ভাষাবৈশিষ্ট্যকে বহন করেন তাঁরা সমাজের কোন্ শ্রেণীতে অবস্থান করেন। বিষয়টি জানা এজন্য জরুরি যে, এই উপভাষাগত বিশ্লেষণ মূলত সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। তাই ব্লকভিত্তিকভাবে উপরিউক্ত অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের একটা অবস্থানগত পরিচিতি আগে দিতে হবে :

- কৃষ্ণনগর ১নং ও ২নং ব্লক : শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ সাক্ষর। শহর কৃষ্ণনগর ছাড়া অন্যত্র মানুষের জীবিকা কৃষিকাজ ও কায়িক শ্রমের দ্বারা উপার্জন।
- চাপড়া ব্লক : সাক্ষরতার হার কম। বাসিন্দারা অধিকাংশই কৃষিজীবী।
- কালীগঞ্জ ব্লক : কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশি।
- কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক : কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশি। ব্যবসায়ীও রয়েছেন।
- করিমপুর ১নং ও ২নং ব্লক : প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। সাক্ষরতার হার কম।
- তেহট্ট ব্লক : কৃষিজীবী মানুষ ক্রমশ সাক্ষর হয়ে উঠছেন।
- নাকাশিপাড়া ব্লক : কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার সময় থেকেই ওপার বাংলা থেকে অজস্র শরণার্থী চলে এসেছেন এই সীমান্তবর্তী নদিয়ায়। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, কিছুটা জীবনধারণের তাগিদেও বটে। নদিয়ার সীমান্তবর্তী

৩.২ নদিয়ার সুবৃহৎ এই অংশটিতে গড়ে উঠেছে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য-র চূড়ান্ত নিদর্শন। এখানে সমগণ্ডী রেখা দ্বারা সংকেতিত করছি :
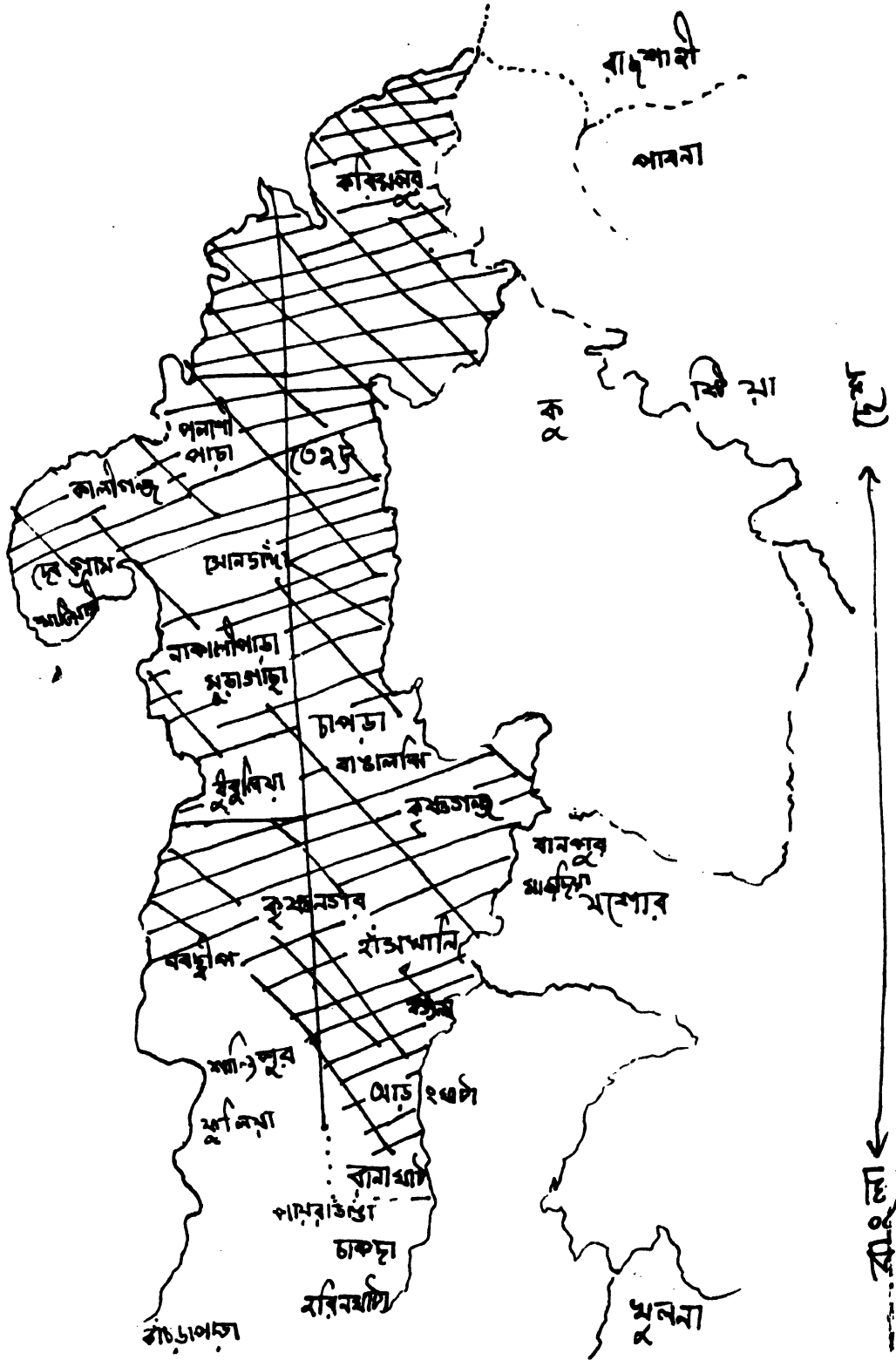
চিহ্নিত এলাকাকে নদিয়ার বিভাষাপ্রধান অঞ্চল হিসেবে ধরে নিচ্ছি

গ্রামগুলিকেই এরা সেদিন প্রাথমিক আশ্রয় করে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে আর্থিক স্বয়ংভর তারা শহরাভিমুখী হলেন। কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বারবার হেরে গেলেন। তাদের অস্থায়ী ডেরা অবশেষে স্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হল। মানচিত্রে প্রদত্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর, করিমপুর, তেহট্ট, কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, নাকাশিপাড়া ব্লক ইত্যাদি অঞ্চলে এঁরা নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজতে থাকেন। পেয়েও যান অনেকে। উদ্বাস্তু মানুষের বাসস্থানের এই সমস্যাটি তাদের কথ্য ভাষাকে প্রভাবিত করল। বিষয়টি আলোচনার অবকাশ রাখে।

ওপার বাংলা থেকে যাঁরা নদিয়াতে বসবাস শুরু করলেন তাঁরা চেতনায় বয়ে এনেছিলেন স্মৃতির স্বর্ণসঞ্চয়। কিন্তু জীবিকার তাগিদে তাদের সেই সুখস্মৃতি ক্রমশ লুপ্ত হতে চলল। বেঁচে থাকল শুধু তাদের মুখের ভাষা। একদা তাদের কথ্যভাষা ছিল বঙ্গালী উপভাষা। অথচ আজ তারা জীবনের তাগিদে রাঢ়ীর নিকটবর্তী হলেন। নানা কারণে, যেমন—শিক্ষার কারণে, জীবিকার কারণে, বাণিজ্যিক কারণে, বৈবাহিক কারণে রাঢ়ী উপভাষাটির প্রতি এবার তাদের যত্নশীলতা এল। অতঃপর তাদের কথ্য বঙ্গালী আর প্রয়োজনের রাঢ়ী মিলেমিশে জন্ম নিল এক স্বতন্ত্র ভাষাবৈশিষ্ট্য, নদিয়ার ভাষায় এই রাঢ়ী ও বঙ্গালীর মিশ্রিত ভাষা অত্যন্ত সুলভ।

তাছাড়া নদিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কিছু কিছু মৌলিক ধ্বনি, শব্দ, বাক্যগঠন বহমান ছিল। এগুলির উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস মেলে না। ওপার বাংলা থেকে আগত মানুষ নদিয়ার এই গ্রামীণ ভাষার সঙ্গেও পরিচিত হলেন। এ ভাষায় নিজেদের ভাব আদান-প্রদানের প্রয়াস গড়লেন। ফলে, সেই গ্রামীণ ভাষাবৈশিষ্ট্যও তাদের প্রভাবিত করল। এভাবেই ধীরে ধীরে নদিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম নিল এক স্বতন্ত্র ভাষাবৈশিষ্ট্য।

নদিয়ায় উচ্চারিত এই মিশ্র ভাষাটির প্রসঙ্গে বলতে গেলে ব্লুমফিল্ড প্রদত্ত একটি মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

> A group of people who use the same system of speech signals is a speech community.
>
> [Bloomfield Leonard : Language : P-29]

উপভাষা সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, এই উপভাষার অন্তর্গত আঞ্চলিক লক্ষণের প্রসঙ্গটি। উপভাষার অভ্যন্তরে যে আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে ওঠে, আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে ওঠে তাকে 'বিভাষা' নাম দেওয়া যায়। নদিয়ার এই সুবৃহৎ অঞ্চলটির ভাষাবৈশিষ্ট্যকে তাই আমরা 'নদিয়ার বিভাষা' নামে চিহ্নিত করতে চাই।

এবারে আসা যাক নদিয়ায় সুপ্রচলিত এই বিভাষা প্রসঙ্গে। পরিমিত অবয়বে নদিয়ার বিভাষার একটা রূপরেখা এখানে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা শব্দের মূল রূপটিকে রাখব, তারপর আসবে রাঢ়ীতে শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ, অবশেষে দেওয়া হবে নদিয়ার বিভাষিক রূপ।

।১। প্রথমে আসছি ক্রিয়াপদের প্রসঙ্গে। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে :

করিয়া > করে > কোইরে
বলিয়া > বলে > বোইলে
দেখিয়া > দেখে > দেইকে

অতীতরূপে :

করিয়াছে > কোরেছি > কোইরিচি
বলিয়াছি > বোলেছি > বোইলিচি
দেখিয়াছে > দেখেছে > দেইকিচে

গিয়েছিলাম > গিয়্যালাম্
বলেছিলাম > বোইলেলাম্
করেছিলাম > কোইরেলাম্

ঘটমান বর্তমানে :

করিতেছে > কোর্‌ছে > কোইচ্চে
বলিতেছে > বোল্‌ছে > বোইল্‌চে
দেখিতেছে > দেখ্‌ছে > দেইক্‌চে

এই প্রসঙ্গে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর মিশ্রণটি স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

রাঢ়ী	বঙ্গালী	নদিয়ার বিভাষা
কোরবে	কোরবা	কোইর্‌বা
দেবে	দিবা	দিবা
খেতে	খাইতে	খেইতে
দাও	দ্যাও	দ্যাও

ইত্যাদি।

ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ :

করিবে > কোরবে > কোইর্‌বে
বলিবে > বোল্‌বে > বোইল্‌বে
দেখিবে > দেখবে > দেইক্‌বে

উত্তমপুরুষ অতীতকালে যে ক্রিয়ারূপটি সাধারণত ব্যবহার করে :

গিয়েছিলাম > গিয়্যালাম্
বলেছিলাম > বোইলেলাম্
করেছিলাম > কোইরেলাম্

সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে :

দেখাইতেছে > দেখাচ্ছে > দ্যাকাইচে
পড়াইতেছে > পড়াচ্ছে > পড়াইচে

যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগটি লক্ষণীয় :

মারিতে লাগিয়াছে > মারতে লেগেছে > মাইত্তে নেইগিচে
করিতে লাগিল > করতে লাগল > কইত্তে নাইগ্‌লো

মূল বঙ্গালী উপভাষার মতো এখানেও :

দেবে (রা.) > দিবা (ব.) > দিবা (ন.বি)
যাবে (রা) > যাবা (ব) > যাবা (ন.বি.)

ক্রিয়ার আর একটি ব্যবহারিক অভিনবত্ব :

নিয়ে এস > নিঁই আনো

ক্রিয়ারূপের এত উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্য হল, মূলত নদিয়ার বিভাষাতে ক্রিয়ারূপের বিকৃতিই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

।২। এবারে আসা যাক অব্যয় ব্যবহারের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে। তবে এটা বলে রাখা ভাল এই মৌলিকত্ব প্রধানত্ব ধ্বনিতাত্ত্বিক।

মতো > মৎ   না হলে > নাইলে > নাইলি
বিনা > বিনি   তা হলে > তাইলে > তাইলি
ভিন্ন > ভেন   চেয়ে > চাইতি
যদি > য্যাৎ   যখন > য্যাকন

।৩। বিশেষণের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত তারতম্য :

ভালো > ভাল্ > বাল্
খুব > কোব্
বুদ্ধিমান > বুদিবান
তাড়াতাড়ি > তার্‌তারি
সামান্য > অ্যাৎটুকুন্
যতখানি > য্যাৎকানি
ততখানি > ত্যাৎকানি

।৪। ইংরেজি শব্দ উচ্চারণকালে শব্দের শুরুতে 'স' ধ্বনি পরিণত হয় 'ছ' ধ্বনিতে :

সিনেমা > ছিনেমা
সাইকেল > ছাইকেল

।৫। শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনির লোপ ঘটে প্রায়শই :

রসিক > ওসিক
রাম > আম্
রথ > অথ/অত্
রক্ত > অক্‌তো

।৬। ইংরেজি শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন পরিণত হয় একক ব্যঞ্জনে :

স্টেশন > টেশন
স্টেট > টেট্

।৭। 'য' ফলা যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে 'অ' ধ্বনির (ইয়্) পরিণতি ঘটছে ই-তে। যেমন :

যজ্ঞ > যজ্ঞি > যোগ্‌গি
পথ্য > পথ্যি > পোত্‌তি
রাজ্য > রাজ্‌জি

।৮। এখানে মিলবে ধ্বনি বিপর্যয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রিক্সা > এস্‌কা > এস্‌কো
বাতাসা > বাসাতা
ঝগড়া > ঝরগা

।৯। স্বরসংগতি রাঢ়ীর মতোই ; তবে উচ্চারণে কিছু তারতম্য রয়েছে :

মিথ্যা > মিত্‌তি
শিক্ষা > শিক্‌কি
ভিক্ষা > ভিক্‌কি

।১০। প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তন :

ওরকম কথা বলছো কেন > ওঁওনধারা বোইল্‌চো ক্যানে ?
কি রকম লোক তুমি ? > কিরোমধারা নোক তুমি ?

***মু**খ্যজনপদগুলির কথা বাদ দিলে, সুবৃহৎ নদিয়ায় সাতের দশক থেকে কথ্য ভাষার বড়রকমের প্রবর্তন ঘটেছে। পূর্ববর্তী বিবর্তনের তুলনায় এটা ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের সমস্যাকে এবং তার সমাধানকে অধিবাসীদের কাছে সহজ করে তুলেছেন।*

।১১। মূল রাঢ়ীর মতো এখানেও 'আ' ধ্বনির 'অ্যা' ধ্বনিতে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত মেলে।

টাকা > ট্যাকা
ঝাঁটা > ঝ্যাঁটা
কাঁথা > ক্যাঁতা

।১২। অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষাংশে মৌলিকত্ব রয়েছে।

দেখি > ছিনি

সম্ভবত : দেখিনি > দিখিনি > দিকিনি > ছিনি—এভাবে পরিবর্তনটা ঘটে।

।১৩। জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যে 'কে' পরিণত হয় 'কিডা'-তে। যেমন :

কিডা বোইলেচে ?

উল্লেখ্য, 'কিডা' শব্দটি বঙ্গালীতে (পাবনা অঞ্চলে) প্রচলিত রয়েছে।

।১৪। অশিক্ষিত মানুষের মুখে সম্বোধনের অসঙ্গতি লক্ষ করবার মতো। যেমন :

আব্‌নি (আপনি) কিছু বোইল্‌চো না ক্যানে ?
(আপনি কিছু বলছেন না কেন ?)

।১৫। সম্বোধনসূচক বাক্যের শেষে 'লা', 'গো', 'গা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন :

গা—চোইলি বাক্‌গা।
লা—মিন্‌সি কি বোইল্‌চে লা ? ইত্যাদি।

আলোচ্য বিভাষার সামগ্রিক রূপরেখাটি ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা কতকগুলি বাক্যের সাহায্য নিতে পারি।

ক। কোথায় যাচ্ছো > কমনে যাইচো ?
কোথায় > কমনে

খ। কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি > কুন্‌ব্যালা থেইকি ডেঁরিই রোইচি।

গ। দেড়টাকা করে কে.জি নিয়েছে > ডেড়্‌ডাগা কোইরি কে.জি নিইচে।

ঘ। দুপুর বেলা একটু শুয়ে নাও > দোপোর ব্যালা এট্টু আরাম কোইরি নাও।

ঙ। কত টাকায় রফা হলো > কং ট্যাকায় থাপিং হোইলো?

চ। আবোলতাবোল কথা বলছো কেন > হ্যাড়ডাব্যাড্‌ডা বোইলচো ক্যানে ?

ছ। বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে > দুর্বিষ্টি গোন্দো বেরুইচে।

জ। বস্তাটা ধরো তো > বোড়াডা ধরো দিনি।

ঝ। বাড়ী ফিরতে হবে > বাড়ী ঘুইত্তি হবে।

ঞ। লাঠিটা শক্ত করে ধরো > নোইরেডা কোইষে ধরো।

ট। আস্তে আস্তে চলো > এইস্তে এইস্তে চলো।

মহিলা এবং পুরুষের প্রতিশব্দ হিসেবে নদিয়ায় 'মাগী' ও 'মিন্‌সে' শব্দের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়।

নদিয়ার বিভাষায় দেখি নিজস্ব কিছু প্রবাদ প্রবচন। সংগৃহীত তালিকা থেকে দু-একটি তুলে ধরা যাক।

এক। অকর্মণ্য পুরুষের আস্ফালনকে বিদ্রূপ করে নারীর উক্তি :

ঘস মাজ চিরিক চিরিক পানি।
তুমি যা কোইর্‌বেন তা আমি জানি॥

দুই। বাক্‌পটু ক্ষৌরকারের সঙ্গে এখানে পুরুষটির তুলনা দেওয়া হচ্ছে।

হেঁটো জলে ডুইবি মরো।
তবু মাগীর ত্যানা না ধরো॥

তিন। পুরুষ যদি হও তবে নারীর ভরসা কোরো না।

ছেইলে হোইলো যুগ্‌গি।
বৌ হোইলো মাগ্‌গি॥

চার। ছেলেকে বেশি শিক্ষিত করে তুললে তার জন্য পাত্রী পাওয়া কঠিন হবে।

নাল চোকের মিন্‌সি ভালো,
যাাং না খায় ভাঙ্।
হেঁসকুইটে মাগী ভালো,
যাাং না থাকে নাঙ॥

অর্থাৎ, রক্তচক্ষু পুরুষই প্রকৃত সুন্দর পুরুষ, যদি না সে নেশা করে। আর হাসিখুশি নারীই প্রকৃত ভালো, যদি না তার অবৈধ প্রণয়ী থাকে।

পাঁচ। এছাড়া রয়েছে কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ, বাগ্‌ধারা। যেমন :

- আঁদারপানা (কালোমতো)।
- সুমুন্দির ছেইলে।
- মরণ গ্যালো যা ইত্যাদি

মুখ্যজনপদগুলির কথা বাদ দিলে, সুবৃহৎ নদিয়ায় সাতের দশক থেকে কথ্য ভাষার বড়রকমের প্রবর্তন ঘটেছে। পূর্ববর্তী বিবর্তনের তুলনায় এটা ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের সমস্যাকে এবং তার সমাধানকে অধিবাসীদের কাছে সহজ করে তুলেছেন। দরিদ্র নিরক্ষর মানুষ এর ফলে প্রশাসনিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। ভাষাগত অসংস্কৃতি একটু একটু করে তাদের কথ্যভাষা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। শিষ্ট চলিতভাষা শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই তাদের মনে আগ্রহ তৈরি করছে। এটা ভালো লক্ষণ।

দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো নদিয়াতেও চলছে সাক্ষরতা কর্মসূচি। সরকারি তৎপরতার সমান্তরাল বেসরকারি উদ্যোগও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সমবেত এই সাক্ষরতা অভিযান নিরক্ষর মানুষকে ক্রমশ তুলছে আলোকমুখী করে। নিরক্ষর পরিবেশে গড়ে উঠছে শিক্ষার পরিমণ্ডল। গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার কারণে আসছে শহরাঞ্চলে—কৃষ্ণনগরে, রাণাঘাটে, শান্তিপুরে। এখানে তাদের পরিচয় ঘটছে শিষ্ট চলিত ভাষার সঙ্গে। জীবনের তাগিদে ভাষার অসংস্কৃতি তারা মুছে ফেলতে উদ্যত আজ। শিক্ষার আলোকে নদিয়ার বিভাষা ক্রমশ মান্যচলিত ভাষা হয়ে উঠবে—তেমন অশনিসংকেত আজ সহজেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, মান্য চলিত ভাষাই এবার নদিয়ার একক ও সর্বসম্মত ভাষা হয়ে উঠছে। নদিয়ার ভাষায় শুনছি আমরা গতিশীল বিশ্বের চরণছন্দ। সামনে রয়েছে খোলা হাওয়া আর চলা পথ। ভাষার আকাশে এবার শুধু উদার মুক্তি।

উৎস নির্দেশ

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত—কৃষ্ণনগরের বন্ধুর লিখিত পত্র বন্ধুকে নদীয়া উনিশ শতক : মোহিত রায় : ১৫২ সংখ্যক পত্র : পৃঃ ১৫৯।

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়। নদীয়া উনিশ শতক : মোহিত রায় : ১৫০ সংখ্যক পত্র : পৃঃ ১৫৯।

(৩) মীর মোশারফ হোসেন : (বংশপুরাণ) : আমার জীবনী। নদীয়া উনিশ শতক : মোহিত রায় : পৃঃ ৬৭।

যাঁদের সাহায্য নিয়েছি :

১। সিলেবল্‌তত্ত্ব ও বাংলাভাষার সিলেবল্‌ সংগঠন : ডঃ পবিত্র সরকার

২। বাংলা উপভাষা : তত্ত্বপদ্ধতি সমীক্ষা : ডঃ রামেশ্বর শ

৩। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলাভাষা : ডঃ রামেশ্বর শ

৪। O.D.B.L. : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। নদীয়ার লোকভাষা প্রসঙ্গ : ডঃ স্বদেশরঞ্জন চৌধুরী

৬। নদীয়া উনিশ শতক : মোহিত রায়

৭। নদীয়া কাহিনী : মোহিত রায়

৮। (ক) ফুলিয়া কৃত্তিবাস লাইব্রেরি ও গ্রন্থাগারিক কেশবলাল চক্রবর্তী
(খ) নদিয়া জেলা গ্রন্থাগার
(গ) ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক আনন্দানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চৈতালী ভৌমিকের কাছে

৯। গবেষণাপত্র (এম ফিল)—একটি বিভাষা সমীক্ষা : নদীয়া জেলা : দেবাশিস ভৌমিক

১০। নদীয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ।

নদিয়ার খেলাধূলা—অতীত ও বর্তমান

এস এম বদরুদ্দীন

নদিয়ার খেলাধুলা—অতীত ও বর্তমান। অতীতের মধ্যে আমরা খুঁজি আমাদের ঐতিহ্য। তাই অতীতকে না জানলে বর্তমানের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পিতৃতর্পণ ব্যতীত কোনও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য নদিয়ার খেলাধুলার অতীতের কোনও ইতিবৃত্ত লেখা নেই, পরিপূর্ণভাবে তা উদ্ধারের চেষ্টাও হয়নি। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর পৌরসভার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'কৃষ্ণনগরের খেলাধুলা' সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই কৃষ্ণনগর শহরে ১৯২২ সালে আমার জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন, ছেলেবেলা থেকেই খেলার মাঠে যাতায়াত। সুতরাং গত প্রায় ৭০ বছর কৃষ্ণনগরের কত খেলাধুলা দেখেছি কিন্তু যা দেখেছি তার সবটুকু স্মৃতিপটে আঁকা আছে তেমন দাবি করা যায় না। সেই কারণে আমার নিজের স্মৃতিশক্তি ও তদানীন্তন প্রবীণজনদের মুখে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে পৌরসভার শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের খেলাধুলা প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। কিন্তু ওই প্রবন্ধের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল কৃষ্ণনগরের মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি 'নদিয়ার খেলাধুলা'। নদিয়ার খেলাধুলার ক্ষেত্রে নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং বিশেষ করে রানাঘাটের অবদান উল্লেখযোগ্য।

নির্মল চ্যাটার্জি ছিলেন প্রথম কীর্তিমান ফুটবল খেলোয়াড় যিনি অক্সফোর্ড ব্লু লাভ করে দেশে ও বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের বৈদ্যনাথ দাক্ষী মোহনবাগান ক্লাবে খেলতেন এবং ১৯০৫ সালে ট্রেডস কাপ বিজয়ী মোহনবাগান দলে খেলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দুজন কীর্তিমান খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭-০৮ সালে সে যুগের কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ক্লাব 'শোভাবাজারের' পক্ষে খেলেছিলেন কৃষ্ণনগরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি এবং ১৯০৮-০৯ সালে কালা ভট্টাচার্য, কালা বৈরাগ্য, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কোনও ক্লাবে খেলবার সুযোগ না লাভ করলেও কৃষ্ণনগরবাসীকে মুগ্ধ করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যাঁর খ্যাতি কৃষ্ণনগরের সীমা অতিক্রম করে সারা বাংলাকে উদ্বেলিত করেছিল। রূপচাঁদ দফাদার ১৯১৯ সালে এরিয়ান্স ক্লাবে যোগদান করেন। তারপর মোহনবাগান ক্লাবে দীর্ঘকাল অতি সুনামের সঙ্গে খেলেন, পরে পুনরায় এরিয়ান্স ক্লাবে ফিরে যান। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলতেন এবং সর্বোচ্চ গোলদাতার কৃতিত্ব অর্জন করেন। রূপচাঁদ দফাদার ফুটবলে সর্বাধিক খ্যাত হলেও ক্রিকেট, হকি, টেনিস ভাল খেলতেন এবং লং জাম্পে বাংলায় প্রথম হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক হিসাবে তাঁর অবদান ও খ্যাতি স্মরণীয়। অসংখ্য খেলোয়াড় তৈরি করেছিলেন। কৃষ্ণনগর লিগ কমিটির সম্পাদক এবং ১৯৫০ সালে নদিয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সংকটকালে অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমাকে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নির্বাচন করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া সংগঠনে আমার হাতেখড়ি। দ্বিতীয় দশকের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম মাদার মিঞা, ১৯১৬ সালে এরিয়ান্স ক্লাবে এবং ১৯২০ সালে ধীরা মিত্র এরিয়ান্স ক্লাবে খেলেছিলেন। এই যুগের অপর কীর্তিমান খেলোয়াড় সুধীন মৌলিক, জুয়েল বিশ্বাস, সত্য ব্যানার্জি, বসন্ত চৌধুরী, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন,—এরিয়ান্সে খেলতেন অশ্বিনী মৈত্র (১৯২২-২৪), গণেশ দাস, সুরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, নগেন ঘোষ (কালা), রবীন গুপ্ত, সুখদা চট্টোপাধ্যায়, ননী বাগচী, জ্ঞান সান্যাল, বলাই চ্যাটার্জি, ইস্টবেঙ্গলে রবীন ঘোষ (১৯২৭-৩২) জ্ঞানতোষ চ্যাটার্জি (মঙ্গলা), ভবানীপুরে ননী চ্যাটার্জি (১৯২৮-৩৫) জর্জ টেলিগ্রাফে প্রণয়কৃষ্ণ বিশ্বাস (১৯২৮-৩২), কালী মজুমদার (১৯২৮-৩৫) খেলেন এবং মণি গাঙ্গুলী (৩৮-৩৯) ভবানীপুরে খেলেছিলেন।

চতুর্থ দশকে নদিয়ার দুজন ফুটবল খেলোয়াড় কৃষ্ণনগরের সত্যেন গুঁই (মানা গুঁই) ও রানাঘাটের অজিত নন্দী সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। সত্যেন গুঁই ১৯২৭-৩৩ কলকাতার ভবানীপুর ক্লাবে, ১৯৩৪-৪২ মোহনবাগান ক্লাবে, মাঝে এক বছর ভবানীপুর ক্লাবে (১৯৩৮) খেলেন এবং উভয় ক্লাবের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৩৯ ও ৪০ সালে ইন্টারন্যাশনাল খেলায় ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে ভারতীয় হিন্দু দলের অধিনায়কত্ব করেন। ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৩২ সালে সিংহল ভ্রমণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় দলে নির্বাচিত হলেও দলের সঙ্গে যেতে পারেননি। ১৯৫৪ সালে দ্বিজেন সান্যাল মোহনবাগানে খেলেন, এই সময়ে রানাঘাটের ফুটবল খেলার মান ছিল খুবই উন্নত। রানাঘাটের নন্দী ব্রাদার্স ফুটবল ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। জ্যেষ্ঠ অজিত নন্দী ১৯৩৮ সালে ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন, দ্বিতীয় ভ্রাতা অনিল নন্দী ১৯৪৮ অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা নিখিল নন্দী ১৯৫৬ সালে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ বিজয়ী ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। নিখিল নন্দী ১৯৫২ সালে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নদিয়া দলে এবং পরে আরও কয়েকবার নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রাজিল থেকে কোচিং শিক্ষা নিয়ে কৃষ্ণনগরে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং শুরু করেন। চতুর্থ ভাই সুনীল নন্দী বাংলার হয়ে খেলেছেন। মাঝে ১৯৫২ সালে হেলিসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেন কৃষ্ণনগরের সুভাষ সর্বাধিকারী। সুভাষ যখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তেন তখন কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনগর ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করে। তিনি ১৯৫৩ সালে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপবিজয়ী নদিয়া দলের সেন্টার হাফে খেলেন। সুভাষের ভাই সুজয় সর্বাধিকারী ফুটবল ও হকিতে কলকাতার প্রথম ডিভিশনে খেলেছেন ও আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

৬০-এর দশকে রানাঘাটের অবনী বসু নদিয়ার এ যাবত সর্বাধিক পরিচিত গোলরক্ষক। তিনি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে সুনামের সঙ্গে খেলেছিলেন। বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ইস্টবেঙ্গলের এবং নদিয়া জেলা দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। রানাঘাটের (পায়রাডাঙ্গার) শ্যামল বসু (ইন্ডিয়ান নেভি দলের গোলরক্ষক) বাংলারও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাণাঘাটের মিথুন সরকারও ইন্ডিয়ান নেভি দলের গোলরক্ষক রূপে সুনাম অর্জন করেন। রানাঘাটের সুধাংশু পালিত (ঠাকুর) ছিলেন নিপুণ গোলরক্ষক।

কৃষ্ণনগরের প্রণব সরকার (পনা) নদিয়ার অন্যতম কৃতী খেলোয়াড়, তিনি এরিয়ান্স দলের অধিনায়কত্ব করেন। রানাঘাটের কৃষ্ণ মিত্র কলকাতার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে নিয়মিত খেলেছেন, কৃষ্ণনগরের শচীন বিশ্বাস কলকাতা পুলিশ ক্লাবের নিয়মিত গোলরক্ষক ছিলেন। রানাঘাটের সুধীর রায় এরিয়ান্সে কয়েক বছর খেলেছেন। বুদ্ধদেব সরকার (বাবাই) কয়েক বছর কলকাতার মহমেডান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন ও অধিনায়কত্ব করেন। নবদ্বীপের রণজিৎ মুখার্জি (বাদল) কলকাতার প্রথম ডিভিশনে দীর্ঘকাল খেলেছেন এবং নদিয়া জেলা দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। রাজস্থানের চিতোরে ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় গ্রামীণ ফুটবল প্রতিযোগিতায় শান্তিপুরের সুধীর বসাক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হন। নদিয়ার আরও অনেক কৃতী খেলোয়াড় নদিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁদের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় তবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন একাধিক খেলায় নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য চিরস্মরণীয়। নিশীথ বিশ্বাস
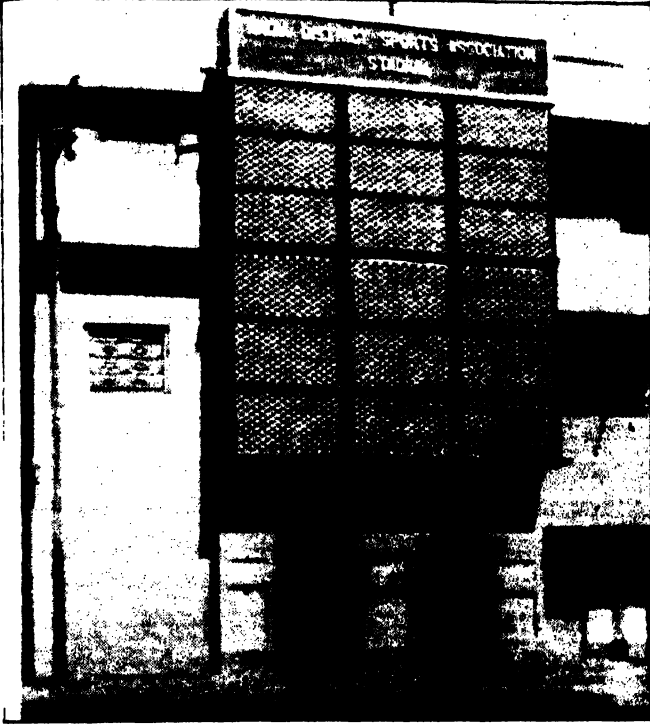
কলকাতার মাঠে হকি, ফুটবল ও ক্রিকেট সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। জ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস ফুটবল, হকিতে নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং জ্যাভেলিনে রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯৫৩ সালে)। তাঁর ভাই সুভাষ বিশ্বাস (সেনো) ফুটবল, ক্রিকেট, হকি তিনটি খেলাতেই নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং জ্যাভেলিন থ্রোতে রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রানাঘাটের কমল চ্যাটার্জি (নাটু) ফুটবল ও ক্রিকেটে নদিয়ার অধিনায়কত্ব করেন। এবং ভলিবলেও নদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কমল ফিজিক্যাল এডুকেশন ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে এখন বহরমপুর কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক। চল্লিশের দশকে কৃষ্ণনগরে হকি লিগ প্রচলিত হয়।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি ইস্টবেঙ্গল হকি দলের অধিনায়কত্ব করেন। শান্তিপুরেও আগে হকি খেলা হত। হকির যাদুকর—চিরস্মরণীয় ধ্যানচাঁদ একদিনের জন্য আসেন এবং রিভার্স স্টিকে কীভাবে গোল করতেন তা প্রদর্শন করেন। হকি খেলা এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে।

সি এম এস স্কুলের অধ্যক্ষ বীল সাহেব নিয়মিত ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল ও সি এম এস স্কুলে নিয়মিত ক্রিকেট খেলা হত। ১৯৩৯ সালে কৃষ্ণনগরের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত নদিয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে কলকাতা স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে পরাজিত হয়। ক্রিকেট এখনও নদিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। নদিয়ার গ্রাম অঞ্চলেও ক্রিকেট নিয়মিত খেলা হয়। নদিয়া জেলা দল আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কয়েকবার চাম্পিয়ানশিপ অর্জন করেছে। কৃষ্ণনগরের গৌতম মিত্র (কালী) রনজি ট্রফিতে পশ্চিমবাংলা দলে নির্বাচিত হন (১৯৮৫) সালে।

পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও কৃষ্ণনগর ক্লাবে টেনিস খেলার কোর্ট ছিল ও নিয়মিত খেলা হত। কৃষ্ণনগর ক্লাবের হার্ড কোর্ট এখনও আছে কিন্তু এখন আর খেলা হয় না। অন্য কোর্টগুলি বর্তমানে আর নেই। নদিয়া অসংখ্য কৃতী অ্যাথলেট সৃষ্টি করেছে। অতীতে রূপচাঁদ দফাদার লং জাম্পে, বিজয় ব্যানার্জি, নলিনী সান্যাল (১৯২১-২২), দূরপাল্লার দৌড়ে রানাঘাটের বিলে প্রামাণিক ও কৃষ্ণনগরের নবকুমার ঘোষ, শচীন মুখার্জি হাইজাম্পে, সমর মুখার্জি পোল ভল্টে, রানাঘাটের বিশ্বনাথ পাল স্বল্পপাল্লার দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণনগরের মেয়ে শিখাশ্যাম রায়চৌধুরী (বর্তমানে দাস) নিখিল ভারত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা (১৯৬৪) হাইজাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রানাঘাটের চন্দনা বিশ্বাস, বাদকুল্লার দেবিকা বিশ্বাস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বেথুয়াডহরীর দেবাশিস মণ্ডল ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাসটিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। শান্তিপুরের স্বদেশ ধর হপস্টেপ অ্যাণ্ড জাম্পে রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করেন। আজিজুল হক এবং গোপাল বিশ্বাস রাজ্যস্তরে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নদিয়ার সরস্বতী দে অনূর্ধ্ব ২২ বছর বিভাগে বাংলা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন। কালিগঞ্জ আঞ্চলিক সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক দেবগ্রাম নিবাসী শিক্ষক গুরুদাস শিকদারের কন্যা জ্যোতির্ময়ী শিকদার ১৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নদিয়ার গৌরব এই মেয়েটির কাছে সারা ভারত অধিকতর সাফল্য আশা করছে।

নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা নদিয়া জেলার খেলাধুলা পরিচালনা করে। সকল রাজ্য সংস্থার অনুমোদিত জেলা সংস্থা (সন্তরণ ব্যতীত)। ১৯৩৭ সালে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার জেলাতেই জেলাশাসককে সভাপতি করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থাপন করে। নদিয়াতেও নদিয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ মাঠে জেলা অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুরের একটি ছেলে (রুস্তম আলি) ৬ ফুট হাইজাম্পে লাফিয়ে সকলকে বিস্মিত করে। বর্তমানে যেখানে জেলা স্টেডিয়াম সেই মাঠটি নদিয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেয় কিন্তু ১৯৩৯ সালে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় নদিয়া স্পোর্টিংয়ের কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটে। মাঠটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে ১৯৪৮ সালে নদিয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন নামে পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৫৩ ও ৫৪ সালে অভ্যন্তরীণ বিবাদে সংস্থার কাজে পুনরায় ব্যাঘাত ঘটে, পরে ১৯৫৫ সালে বিবাদ মিটিয়ে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন নতুন নিয়মাবলী রচনা করে নতুন করে যাত্রা শুরু করে এবং তারপর থেকেই সর্বস্তরে দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এর গঠনতন্ত্রে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য। প্রতি দুবছর অন্তর

নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য জেলাশাসক একজন গেজেটেড অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করেন এবং অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং প্রতি দু-বছর অন্তর নির্বাচন হয়ে আসছে এবং কোনও ব্যক্তি সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান পদে তিনটি টার্মের (৬ বৎসরের) পর পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন না। নদিয়ার ১৯ ব্লকেই আঞ্চলিক সংস্থা (Zonal Association) গঠিত হয়েছে এবং তার সম্পাদকগণ পদাধিকারবলে জেলার গভর্নিং বডি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। আঞ্চলিক সংস্থার ক্লাবের মধ্যে বিরোধ হলে অর্থাৎ প্রটেষ্ট হলে তার সিদ্ধান্ত করবার জন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জোনাল ট্রাইবুনাল আছে এবং আঞ্চলিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবুনাল আছে। এমনকি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও জেলা ট্রাইবুনালে আপিল করার বিধান আছে। ১৯৬৮ সালের ১৫ আগস্ট নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজের প্রথম সংখ্যা রেজিস্টারড পাক্ষিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত তখন আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। সুতরাং আমাকেই পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সাহিত্য ও ক্রীড়ানুরাগী শ্রীনির্মল সান্যাল সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব সেই প্রথম সংখ্যা থেকে অদ্যাবধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন, মাঝে তাঁর অনুপস্থিতিতে দেবু গুপ্ত সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা তখন মফস্বলের প্রথম ও একমাত্র ক্রীড়া পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,—'নদীয়া জেলা স্পোর্টস নিউজ' নদিয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র। এই পত্রিকার জেলা অ্যাসোসিয়েশন, জোনাল অ্যাসোসিয়েশন, নদিয়া রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। জেলার সর্বত্র অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য ও জেলার সকল অঞ্চলের খেলাধুলার সংবাদ সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশের পর থেকে অদ্যাবধি জেলার সকল প্রান্তের খেলাধুলার বিবরণ এবং জেলার খেলাধুলার কার্যসূচিও ১৫ দিন অন্তর পৌঁছে যাচ্ছে জেলার সকল ক্লাবে এবং সংস্থায়। বর্তমানে জেলার ১৯টি ব্লকভিত্তিক আঞ্চলিক সংস্থার ৭২৫টি ক্লাবই এই পত্রিকার বাধ্যতামূলক গ্রাহক এবং প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকা জেলা সংস্থার সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্থা ও ক্লাবগুলির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যা কৃষ্ণনগরের জেলা স্টেডিয়ামে অবস্থিত ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি স্থাপিত স্পোর্টস লাইব্রেরিতে রাখা আছে। নদিয়া জেলার খেলাধুলার বিস্তারিত সংবাদ যাঁরা জানতে ইচ্ছুক তাঁরা লাইব্রেরি রক্ষিত স্পোর্টস নিউজে নদিয়ার খেলাধুলার সকল বিস্তৃত সংবাদ পাবেন।

জেলার প্রতিটি ক্লাবের স্বতন্ত্র অ্যালবাম আছে। এতে ওই ক্লাবের সকল খেলোয়াড়ের সচিত্র পরিচিতি রক্ষিত আছে এ যাবত যার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না। নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কৃতিত্ব যে কৃষ্ণনগর জেলাবাসীর সৌজন্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেডিয়াম নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। ১৯৩৭ সালে নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় নদিয়া রাজ এস্টেট থেকে পাঁচ বছরের জমি লিজ নেওয়া হয় কিন্তু লিজের মেয়াদ শেষ হলে তা নবীকরণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, ক্রমান্বয়ে মাঠটি কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের দখলে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে আমি নদিয়া জেলার ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক পদ লাভ করি। ফলে টাউন ক্লাবের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল এবং তাঁরা এই মাঠ নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে লিজ দিতে সম্মত হয়। ফলে নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাদের পুরনো মাঠের দখল ফিরে পায় কিন্তু লিজের স্বত্বে। ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তারপর নদিয়াবাসীর আনুকূল্যে এই স্টেডিয়াম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেডিয়ামের পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করেছে। সংলগ্ন জমি কিনে আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। যার ফলে রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা কলকাতার বাইরে এই স্টেডিয়ামে প্রথম ১৯৮১ সালে বাংলা বনাম আসাম, ১৯৮২ সালে বাংলা বনাম বিহার এবং ১৯৯৬ সালে বাংলা বনাম আসামের খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রথম খেলায় (১৯৮১) মাঠে উপস্থিত ছিলেন পঙ্কজ রায়, চুনী গোস্বামী, বিশ্বনাথ দত্ত, জগমোহন ডালমিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

নিখিল ভারত আন্তঃরাজ্য জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা বা (বি সি রায় কাপ) ১৯৭৪ সালে নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়—অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ কেরল ও ত্রিপুরা। ফাইনাল খেলায় ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক দলের পাঁচজন খেলোয়াড় এ টি রহমান, বলরাম, জুলফিকার, অধিনায়ক বদরু ব্যানার্জি, নিখিল নন্দী মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৮ সালে নিখিল ভারত গ্রামীণ স্পোর্টসে ফুটবল, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীটি এন সিং এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

কলকাতার বাইরে আই এফ এ শিল্ডের খেলা ১৯৭৩ সালে কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে জেলা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বছর সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন খেলার ধারাবিবরণী রেডিওতে প্রচারিত হয়। বিখ্যাত ভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য, পুষ্পেন সরকার, অজয় বসু, পি কে ব্যানার্জি, রূপক সাহা, রথীন মিত্র ধারাবিবরণী দিয়েছেন। আই এফ এ শিল্ডে বাংলাদেশের দুই বিখ্যাত ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্র (১৯৭৩) এবং ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৯৮৪) এই স্টেডিয়ামে খেলেছে। ইন্দোনেশিয়া একাদশ আই এফ এ একাদশের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই খেলায় তিরিশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হয়, যা সে সময় মফস্বলে অভাবিত ছিল।

২৪. ৭. ১৯৭১ তারিখে বাংলা মহিলা একাদশ ও ভারতীয় মহিলা একাদশ একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলার মান ছিল উন্নত এবং প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এই সংস্থা আর একটি ঐতিহাসিক ফুটবল খেলার আয়োজন করে ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ফুটবল

ফেডারেশন গঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ফুটবল একাদশের জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ এই স্টেডিয়ামে, সেই দিনই প্রথম খেলার মাঠে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয় এবং পতাকার স্মারক এখনও জেলা স্টেডিয়ামে রক্ষিত আছে।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকায় ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্পোর্টস কনট্রোল বোর্ড ওই প্রতিযোগিতায় নদিয়া জেলা ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ জানায়। নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ফুটবল দল পাঠায়। ফুটবল দলের সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত কোচ ল্যাংচা মিত্র। এই দলের মুখ্য পরিচালক হিসাবে ঢাকা যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নদিয়া জেলা দল ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যাত্রা করে এবং ঢাকা ফুটবল লিগ চাম্পিয়ান বি আই ডি সি-র সঙ্গে দুদিন ড্র করার পর তৃতীয় দিনে পরাজিত হয়। বাংলাদেশ স্পোর্টস কনট্রোল বোর্ড নদিয়া জেলা দলকে সরকারিভাবে সংবর্ধনা জানায় এবং একটি রুপোর নৌকো স্মারক হিসাবে উপহার দেয়। ওই স্মারক নৌকোটি এখনও কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে রক্ষিত আছে। আমাদের তরফ থেকে মুজিবের একটি মৃন্ময় মূর্তি উপহার দেওয়া হয়। ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট (কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান) এস এম জহুরুদ্দিন নদিয়া দলকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। একটি বিদেশি রাষ্ট্র থেকে সরকারিভাবে একটি জেলা দলকে আমন্ত্রণের কোনও দ্বিতীয় নজির নেই। নদিয়ার খেলা ঢাকা টি ভি-তে প্রদর্শিত হয়।

কলকাতা প্রথম বিভাগের সকল ফুটবল দল (তিন প্রধান-সহ) কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে খেলেছেন। সিওলগামী ভারতীয় ফুটবল দলের এবং মার্ডেকাগামী ভারতীয় দলের নির্বাচনী খেলা এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার পূর্বে কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। ভারতের প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের চরণস্পর্শে এই জেলা স্টেডিয়াম ধন্য।

নদিয়ার সকল খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পূর্ণ একক কর্তৃত্বাধীন কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়াম। কিন্তু নদিয়া জেলা সংস্থার কার্যক্ষেত্র সমগ্র নদিয়া জেলা। সুতরাং অনুরূপ স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রচেষ্টা জেলা সংস্থা অন্য স্থানেও করেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে স্টেডিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রানাঘাট পৌরসভার কাছ থেকে জেলা সংস্থা আনুলিয়াতে একটি মাঠ লিজ নেয় এবং সংলগ্ন আরও জমি কিনে একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামের কাজ শুরু করে। দুদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয় কিন্তু অর্থাভাবে নির্মাণকাজ আর অগ্রসর হয়নি, পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দপ্তর একটি কমিটি গঠন করে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। কিন্তু কাজের অগ্রসর সামান্য হয়েছে। রাণাঘাটের স্বাস্থ্যোন্নতি ক্লাবের নিকট থেকে ওই একই সময়ে (১৯৭৮) স্বাস্থ্যোন্নতি ক্লাবের মাঠ নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা লিজ নেয় এবং মাঠটি পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়, কিন্তু কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।

নবদ্বীপেও স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়, জমিও নির্বাচন করা হয়। কিন্তু স্টেডিয়াম নির্মাণ করা জেলা সংস্থার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা শান্তিপুরে স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৩৪নং জাতীয় সড়কের ও শান্তিপুর স্টেশনের অনতিদূরে শান্তিপুর হাসপাতালের পাশে স্টেডিয়ামের উপযুক্ত জমি জেলা ক্রীড়া সংস্থা শান্তিপুর পৌরসভার অর্থানুকূল্যে খরিদ করে কিন্তু অর্থাভাবে কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় মাঠটি শান্তিপুর পৌরসভাকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয় অবশ্য জেলা সংস্থার খেলাধুলার অগ্রাধিকার বজায় রেখে। শান্তিপুর পৌরসভা মাঠটি বেশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ইতিমধ্যে ঘিরেছে, খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম এবং গ্যালারির একাংশের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শান্তিপুর আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা তাদের খেলাধুলার জন্য সর্বতোভাবে এই মাঠ ব্যবহার করছে। আশা করা যায় ওই শান্তিপুর স্টেডিয়াম অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে এবং জেলার সর্বোৎকৃষ্ট স্টেডিয়ামরূপে গণ্য হবে। শান্তিপুর পৌরসভা ও শান্তিপুর আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। শান্তিপুরের ক্রীড়া সংগঠন ধীরেন চ্যাটার্জি, আব্দুল খালেক, পঞ্চানন ইন্দ্র, প্রদ্যুৎ বসুর প্রচেষ্টার সাফল্য আমরা কামনা করি।

নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন একটি স্বতন্ত্র ক্রীড়া সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা অমিত চক্রবর্তী (খোকন) কৃষ্ণনগরের পৌরসভার প্রদত্ত জমিতে এবং সরকারের অর্থানুকূল্যে কৃষ্ণনগর একটি সুন্দর সুইমিং পুল ও ড্রেসিং রুম নির্মিত হয়েছে এবং এখানে সাঁতারের শিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভাল খেলোয়াড় পেতে আধুনিক পদ্ধতিতে ফুটবল কোচিং শুরু হয়। স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিলের সৌজন্যে অচ্যুত ব্যানার্জি, ল্যাংচা মিত্র, অশোক নাগ, ফুটবলে এবং হকিতে ইন্দ্রজিৎ সিং, অমল চক্রবর্তী ঠাকুর অ্যাথলেটিক্সে, সমর মুখার্জি নদিয়া জেলা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় নদিয়ার খেলোয়াড়দের কোচিং করেন। নদিয়ার জেলা ফুটবল দলের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় ধীরেন দাস ও পৃথ্বীশ মুখার্জি ধারাবাহিক কোচিং করে আসছেন। টেবিল টেনিসে দীপক ঘোষ, ক্রিকেটে হেমু অধিকারী, শ্যামসুন্দর মিত্র, মন্টু সেন, সুবোধ ভট্টাচার্য, শ্যামল মুখার্জি, পঙ্কজ রায় জেলার খেলোয়াড়দের কোচিং দিয়েছেন। কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা সংস্থা অব্যাহত রেখেছে। ক্রিকেটে কোচিংয়ের জন্য সি এ বি-র সৌজন্যে ইন্ডোর কোচিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে। অবশ্য নিয়মিত ব্যবহারের ও মেরামতের অভাবে ইন্ডোর কোচিং ক্রমান্বয়ে দীন দশায় পরিণত হচ্ছে।

খেলোয়াড় কোচিংয়ের পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার জন্য রেফারি আম্পায়ার ক্রীড়া সংস্থা করেছে। নদিয়া জেলার সমস্ত প্রতিযোগিতায় নদিয়া রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় সংস্থা রেফারি আম্পায়ার পোস্টিং করে। সুতরাং রেফারি ও আম্পায়ার প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে ক্রীড়া সংস্থা। ক্রিকেটে নদিয়ার ক্রিকেট আম্পায়ারদের ক্রিকেট আইন সম্পর্কে সারাদিনব্যাপী আলোচনা করেন টেস্ট আম্পায়ার শ্রীমুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে রাজস্থান হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি) ও শ্রীরথীন মিত্র। জেলার ফুটবল রেফারিদের কোচিং দেবার জন্য অনেক খ্যাতনামা রেফারি এসেছেন,—সর্বশ্রী রাসবিহারী চক্রবর্তী, শশাঙ্ক সরকার, সন্তোষ সেন, রবি চক্রবর্তী, সি আর দাশগুপ্ত। রেফারিদের প্রায় প্রতি

বছরই পরীক্ষা হয় এবং পাশ করলে তবেই রেফারি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অ্যাথলেটিক্স অফিসিয়ালদেরও প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিবদাস রায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ও পরীক্ষা দিয়েই আন্তর্জাতিক বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং এশিয়াড এবং সাফ গেমস প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অফিসিয়ালের কাজ করেছেন। শান্তিপুরের সমর চক্রবর্তী ও পরে আন্তর্জাতিক বিচারকের কৃতিত্ব লাভ করেছেন। ১৯৭৫ সালে টেবিল টেনিস আম্পায়ার ছদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেন অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস আম্পায়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শিবনাথ মুখার্জি এবং পরে পরীক্ষা গ্রহণ করেন, ২২ জুন পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হন ও বি টি টি এ-এর আম্পায়ার হিসাবে স্বীকৃতি পান। উক্ত শিক্ষণ শিবিরে তিনজন মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন তার মধ্যে কৃষ্ণনগরের ড. রীণা আহমেদ রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অফিসিয়ালের কাজ করেছেন। অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আম্পায়ারিং করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং ১৯৮৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় আম্পায়ারের কাজ করেছেন। নদিয়ার ক্রিকেট আম্পায়ারদের মধ্যে ফ্রান্সিস গোমেস এখন টেস্ট আম্পায়ারের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

খেলোয়াড় গঠন ও প্রতিযোগিতার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সুযোগ্য সংগঠক প্রয়োজন। নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা অন্য সকল জেলাকে টেক্কা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া পর্ষদ ১৯৮৬ থেকে বিশিষ্ট খেলোয়াড়, কোচ ও ক্রীড়া সংগঠকদের সম্মানিত ও পুরস্কারের প্রথা প্রচলন করে এবং প্রথম বছর (১৯৮৬) এই জেলা সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক (বিভিন্ন দফায় ১১ বছর) এই লেখককে বিশিষ্ট সংগঠক হিসাবে নির্বাচন করেন ও সম্মানপত্র ও পুরস্কার প্রদান করে। পরের বছর (১৯৮৭) গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত, ১৯৮৯ সালে নবদ্বীপের শঙ্করীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ১৯৯১ সালে চাকদহের পূর্ণচন্দ্র বাগচীকে বিশিষ্ট সংগঠক হিসাবে পুরস্কৃত করেন। এই সম্মান প্রকৃতপক্ষে কোনও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও সম্মান নয়। রামকৃষ্ণ মোদক বর্তমানে জেলা সংস্থার কার্যকমিটির চেয়ারম্যান। নদিয়া জেলার বেশ কয়েকজন নিরলস স্বেচ্ছাকর্মী আছেন যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নদিয়া জেলা সংস্থাকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠনে পরিণত করেছে। এইভাবে সারা জেলায় খেলাধুলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিস্তার ও অনুষ্ঠান করে উপযুক্ত খেলোয়াড় নির্বাচন করে জেলার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়।

পরিশেষে বিশ্বের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠকরূপে স্বীকৃত শ্রীজগমোহন ডালমিয়া ১৯৮১ সালে মন্তব্য করেন সাংগঠনিক দক্ষতায় নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা অন্যান্য জেলার পথিকৃত। বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীমতি নন্দী আনন্দবাজারে লেখেন নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সাংগঠনিক দক্ষতায় অন্যান্য জেলাগুলিকে টেক্কা দিয়েছে নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে আর এক বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব 'পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলায় নদিয়া অনেক বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকায়' শীর্ষক প্রতিবেদনে লেখেন 'দেখেছিলাম খেলোয়াড় তৈরিতে এদের আন্তরিকতা। তখনই ওরা যে মানসিকতা দেখান, তা আজও অব্যাহত। এমনকী রাজ্যের কম জেলাতেই হয়ে থাকে। অর্থ, আধুনিক জ্ঞান ইত্যাদি পেলে নদিয়া যে আরও এগোবে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।'

নদিয়ার খেলাধুলার মাঠে নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের দেশীয় খেলা কবাডি শহরাঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত না হলেও গ্রামাঞ্চলে এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। নদিয়ার ছেলে ইনসান আলি ভারতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। কবাডি অ্যাসোসিয়েশন কোনও রকমে খেলাটি চালু রেখেছে।

শরীরচর্চার অন্যতম অংশ হিসাবে বডিবিল্ডিং ও জিমন্যাস্টিক্স স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। আশানন্দ ঢেকী একটি স্মরণীয় নাম। কৃষ্ণনগরের (ঘূর্ণীর) জগদীশ বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে অগ্রণী প্রশিক্ষকের কাজ করে আসছেন। তাঁর ছাত্র আলম সেখ দেহসৌষ্ঠব জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক অর্জন করেছেন। শক্তিনগরের অমিত সাহা কয়েকবছর অনেকগুলি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সংগঠকের মধ্যে ঐক্য না থাকায় অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

লাঠি খেলা নদিয়ার অন্যতম প্রাচীন খেলা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহরম উপলক্ষে লাঠি খেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও সংগঠিত সংস্থা নেই, বোধহয় লাঠির যুগ শেষ হয়ে গেছে। তবে নদিয়া জেলা স্টেডিয়ামে একটি লাঠি খেলা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এখনও বিচ্ছিন্নভাবে লাঠি খেলা নদিয়ার কোনও কোনও গ্রামে টিকে আছে।

নদিয়ার খেলাধুলার ক্ষেত্রে আর একটি ক্রীড়া সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। নদিয়া জেলা প্রাথমিক স্কুল ক্রীড়া সংস্থা নিয়মিত আঞ্চলিক ও জেলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে আসছে। জেলা প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীঅজিত সান্যাল এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং নদিয়ার প্রাথমিক স্কুল থেকে বেশ কয়েকজন অ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতা মারফত আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। নদিয়ার গৌরব পশ্চিমবাংলার গৌরব জ্যোতির্ময়ী শিকদার এই প্রাথমিক স্কুল প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জ্যোতির্ময়ী কালিগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষক ও নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আঞ্চলিক সংস্থা কালিগঞ্জ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীগুরুদাস শিকদারের কন্যা জ্যোতির্ময়ী বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ আটলান্টা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় অ্যাথলেট দলে নির্বাচিত। নদিয়া জেলার একটি গ্রামে জ্যোতির্ময়ীর জন্ম, প্রাথমিক শিক্ষা ও কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ নদিয়া জেলার সাম্প্রতিক খেলাধুলার উজ্জ্বলতম ঘটনা।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের কথা
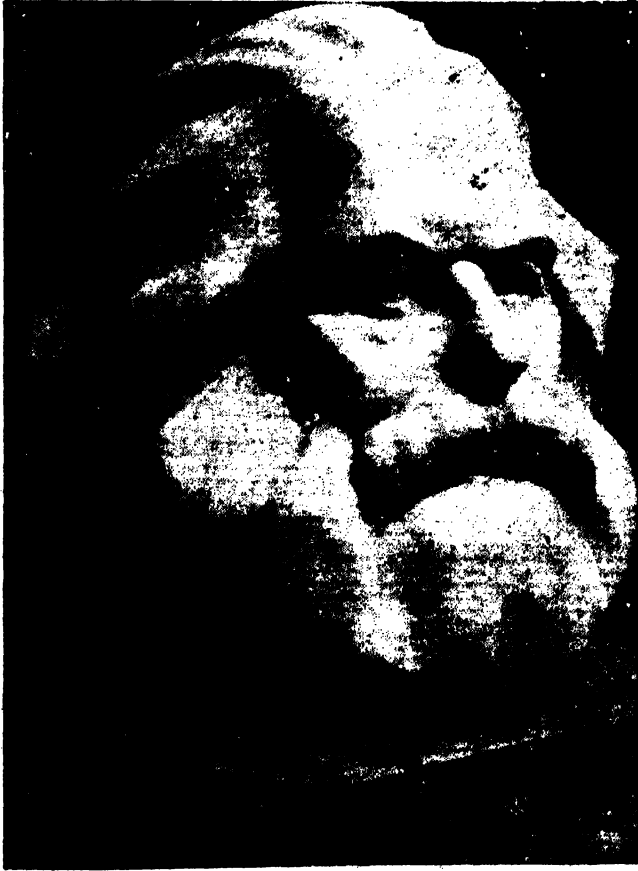
গৌতম পাল

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সুপ্রাচীন। একটি পরম্পরাগত শিল্প ধারা গড়ে উঠতে অনেক বছর কেটে যায়। বলা হয়ে থাকে, নদিয়ারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কাল থেকে এই শিল্পধারার প্রচলন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় অর্থাৎ লর্ড ক্লাইভের ভারতে আগমনের সময়কাল। কথিত আছে, মহারাজার পূজার প্রতিমা নির্মাণের জন্য নাটোর রাজশাহী থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট মৃৎশিল্পীকে কৃষ্ণনগরে আনেন।

তখনকার দিনের কৃষ্ণনগরের প্রাচীন প্রতিমা-শিল্পীরা এবং নাটোর থেকে আগত শিল্পীরা মিলিতভাবে এই মৃৎশিল্পের প্রবর্তন করেন।

আমার ধারণা, পূজা অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বে প্রতিমা গঠন হয়ে থাকে। কিন্তু সারা বছর প্রতিমা নির্মাণ করা হয় না। এমত সময় আরও কিছু তৈরি করার মনের তাগিদে নতুন কিছু সৃষ্টি করা শুরু হয়।

এমনই একটা সময় যখন বিলিতি সাহেবরা এদেশে আসেন এবং বিদেশের realistic কাজের প্রভাব এখানের শিল্পীদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে বিদেশি বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মের প্রভাব অন্যদিকে এদেশের মানুষের অবস্থা ও রূপ বর্ণনা করা—এই দুই চিন্তার সংমিশ্রণের ফলে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প গড়ে ওঠে। রাজা-মহারাজারা এবং সাহেবরা সকলেই এই নতুন ধারার শিল্পকর্মের

কার্ল মার্কস ॥ পাথর ॥ শিল্পী : গৌতম পাল

প্রশংসা করতে থাকেন এবং ধারাটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পোড়ামাটির মূর্তি বেশি বড় করার অসুবিধা, এক স্থান থেকে এক স্থানে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা এবং প্রদর্শনেরও অসুবিধা থাকায় miniature form-এ কৃষক, কামার, ধোপা, নাপিত, পুরোহিত ইত্যাদি বা গ্রামবাংলার নিপুণ দৃশ্য রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই এই শিল্প কর্মের প্রকাশ। এই ধারাকে বাস্তবমুখী না বলে প্রকৃতিমুখী (Naturalistic) বলাই শ্রেয়। কারণ বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। চুলের বদলে চুল লাগানো, গায়ের রং মানুষের গায়ের রঙের মতো, কাপড় আসল কাপড় দিয়ে তৈরি করা এই হল এই কাজের বিশেষত্ব।

সাধারণভাবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের নানা স্থানের মতো এখানেও প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল। সে মূর্তির গঠন অন্যরূপ। মানুষের মতো দেবদেবীর চেহারা নয়। সেখানে চোখগুলো টানা-টানা, নাক উঁচু, ঠোঁট ছোট ইত্যাদি। এই প্রতিমা শিল্পের ধারা বাংলার লোকশিল্পের অন্তর্গত। কিন্তু এমন পরিমণ্ডলের ভেতরে থেকেও কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা বাস্তবমুখী শিল্পের জন্ম দেন। এই ধারার কাজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। এইভাবেই এই ধারা মানুষের মনে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এবং বিশেষত্বের দাবি নিয়ে সকলের মনে স্থান করে নেয়।

যাঁরা সে যুগে প্রথম এই ধরনের কাজ করেন তাঁদের শিল্পপ্রতিভার প্রশংসা করতেই হয়। সে যুগে ব্যক্তিবিশেষের থেকে সমষ্টিগতভাবেই শিল্পধারাকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তাই এইসব শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে বেশ কিছু কাল ধরে ওই সকল শিল্পী পরিবারের উত্তরসূরীরা ওই কাজ করে অর্থ, মান, যশ অর্জন করতে থাকেন এবং শিল্পের বাস্তবানুগ রূপ মার্জিত হতে থাকে।

ব্রিটিশ রাজত্বে বেশ কিছু ব্রিটিশ শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তি কর্মসূত্রে ভারতে আসেন এবং এই শিল্পধারাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করানোর চেষ্টা করেন। চার্লস আর্চর নামক একজন ইংরাজ প্রশাসক কৃষ্ণনগরের এই মৃৎশিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাঠান। ১৮৫১ সালে লন্ডনে 'এক্সিবিশন অফ দি ওয়ার্কস অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ অল নেশনস্' প্রদর্শনীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীরাম পালের তৈরি মৃৎশিল্পকর্ম স্থান পায়। শ্রীরাম পালই সম্ভবত প্রথম মৃৎশিল্পে আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক অর্জন করেন। এরপর ১৮৫৫ সালে প্যারিসে 'এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস' প্রদর্শনীতেও শ্রীরাম পালের মৃৎশিল্প স্থান পায়। আবার ১৮৬৭ সালে শ্রীরাম পাল ও যদুনাথ পালের মৃৎশিল্পকর্ম প্যারিসের প্রদর্শনীতে স্থান পায়। ক্রমে শ্রীরাম পাল, যদুনাথ পাল, চন্দ্রভূষণ পাল, রাখালদাস পাল, বক্রেশ্বর পাল, চারুচন্দ্র পাল, কৃষ্ণনগরকে বিখ্যাত করেন। যদিও miniature form-এ এই কাজের সমাদর বেশি তবুও কিছু কাজ পূর্ণাবয়ব (life size)-এও নির্মাণ করেন। শিল্পীরা প্রতিমা নির্মাণের পদ্ধতিতে খড় বেঁধে তার ওপর এক-মাটি, দো-মাটি করে মূর্তি নির্মাণ করেন। মানুষের মতো হুবহু রং করে পোশাক পরিয়ে চমক এনে দেন এই মৃৎশিল্প কর্মের মাধ্যমে। আমেরিকার Peabody Museum-এ এইরকম কাজ সংগৃহীত আছে আজও।

শহিদ ক্ষুদিরাম শিল্পী : গৌতম পাল

এর পরবর্তী যুগে আর এক বংশধারায় বিখ্যাত হন গোপেশ্বর পাল (১৮৯৪-১৯৪৪)। ১৯২৪ সালে ত্রিশ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের ওয়েমব্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। পরে কলকাতার studio গড়েন। তাঁর পরবর্তী যুগে পরাণচন্দ্র পালের পৌত্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র পালের পুত্র কার্তিকচন্দ্র পাল ১৯৪০ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তাঁর সামনে বসে তৈরি করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কবিগুরুর ভাষায় "কৃষ্ণনগরের মূর্তিশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাঁহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ইউরোপ আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছেন ইহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই।" পরাণচন্দ্র পালের পৌত্র সতীশচন্দ্র পালের পুত্র সুধীরকৃষ্ণ পাল, গোপেশ্বর পালের নিকট শিক্ষালাভ করেন ও এই ধারায় কাজ করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তবে কর্মস্থল কলকাতায় (কুমারটুলির সন্নিকটে) হওয়ায় কৃষ্ণনগর থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সতীশচন্দ্র পালের পুত্র নির্মল পালের দুই পুত্র মুক্তি পাল ও শম্ভু পাল এর পরবর্তী যুগে বিখ্যাত হন। ইতালির পোপ পলের কাছ থেকে বিশেষ পদক লাভ করেন। অন্য এক বংশধারার বক্রেশ্বর পালের (১৮৭৫-১৯২৪) পুত্র নরেন পাল খ্রিস্টীয় মডেল তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র বীরেন পাল ও গণেশ পাল রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র পালের সময় থেকেই শিল্পকর্মে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দেশে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কারণেও শিল্পীদের

বেঁচে থাকার তাগিদে সূক্ষ্ম কাজের সমাদর থাকলেও ছাঁচে তৈরি সহজলভ্য মৃৎশিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর উদ্ভব শুরু হয়।

একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরের সূক্ষ্ম হাতের কাজ (কৃষ্ণনগরের প্রাচীন মৃৎশিল্পের ধারা) চলতে থাকে, অন্যদিকে সস্তায় সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ছাঁচের কাজ চলতে থাকে। অন্যদিকে লোকের মূর্তি তৈরির কাজও চলতে থাকে।

যদিও গোপেশ্বর পাল পাথরের মূর্তি তৈরি করে বিখ্যাত হন, তবে তাঁর কর্মস্থল কলকাতায় ছিল। কিন্তু কার্তিকচন্দ্র পালই প্রথম কৃষ্ণনগরে পাথরের তৈরি মূর্তি গড়া শুরু করেন। মুক্তি পালও এই পথের পথিক হন। বীরেন পাল, শম্ভু পাল, গণেশ পাল সকলেই কৃষ্ণনগরের প্রাচীন ধারার পথিক।

এই সমস্তই বিশেষত ঘূর্ণী অঞ্চলেই হয়ে থাকে। কিন্তু এ ছাড়াও রাজবাড়ির কাছে, নতুন বাজার অঞ্চলে ও ষষ্ঠীতলা কুমোরপাড়া অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা নির্মাণে লোকশিল্পের ধারা আজও বজায় রেখে চলেছেন। এর মধ্যে এখন সুবল পাল, নিমাই পাল বিখ্যাত।

এর পর আসে আমার কথা। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে কাজ করার ইচ্ছা হত। বাবা কার্তিকচন্দ্র পালকে দেখতাম কত তাড়াতাড়ি ছবি দেখে মূর্তি তৈরি করে ফেলতেন। আর ঠাকুরদাদা ক্ষিতীশচন্দ্র পালের কাছে বসেই কৃষ্ণনগরের traditional পদ্ধতিতে কাজ করতে শিখি। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে শিল্পী বীরেন পাল এবং শম্ভু পালের হাতে তৈরি নানান মৃৎশিল্প প্রেরণা জোগাত। তবে ভূগোলের বইয়ে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফায়েল প্রভৃতির বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্যের কথা, চিত্রশিল্পের কথা পড়ে নিজেকে অনেক বড় করে তোলবার প্রেরণা জন্মায়। মনে হতে থাকে সুদূর ইতালিতে গেলে সেইসব ভাস্কর্য দেখলে, সেখান থেকে কাজ শিখলে আরও ভাল কাজ করতে পারব।

Tradition—একটা রক্তের ধারা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ও দক্ষতা আয়ত্ত করার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু একটা নতুন কিছু সৃষ্টির মধ্যেই প্রকৃত শিল্পের ও শিল্পীর প্রকাশ। স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করে তাই ভর্তি হলাম কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টে। প্রিন্সিপাল চিন্তামণি কর ও প্রফেসর সুনীল পালের কাছে শিখলাম ভাস্কর্যের নতুন ভাবনা। ভাবতে শিখলাম বস্তু-নিরপেক্ষ ভাস্কর্য কাকে বলে। ভাস্কর্যের আয়তন, ভাস্কর্যের—texture ইত্যাদি নানা গুণাগুণ। ভাস্কর্য হল অন্তরাত্মার প্রকাশ শুধু বাইরের রূপ নয়। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছিল না। সেই ইতালি আমায় টানছিল। তাই আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর চলে গেলাম ইতালির মিলান শহরে accademia di belle Arti di Brera-তে। Prof. Luciano Minguzzi-র কাছে ইউরোপীয়

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প : শিল্পী বীরেন পাল *ছবি : সত্যেন মণ্ডল*

কলসি নিয়ে নারী ॥ ব্রোঞ্জ ॥ শিল্পী : গৌতম পাল

ভাস্কর্যের কথা জানলাম শিখলাম। আর ভাস্কর্যকে Mr. Mario Valcamonica-র ব্রোঞ্জ কাস্টিং ফাউন্ড্রিতে। আরও পড়াশুনোর ইচ্ছা ছিল U. S. A. Pinnselvania University-তে ; কিন্তু শেষে দেশে ফিরে আসার ফলে আর যাওয়া হল না।

কৃষ্ণনগরেই নতুন কিছু করার ইচ্ছা থেকে এক শিল্প-উদ্যান করার পরিকল্পনা চলল এবং গড়লাম।

কৃষ্ণনগরে এখন চার ধারার কাজ পাশাপাশি চলছে।

(১) Traditional Figurative clay models,—যা নামমাত্র কয়েকজন করে থাকেন। বীরেন পাল ও তাঁর পুত্র সুবীর পাল, গণেশ পাল ও তাঁর পুত্র তড়িৎ পাল, পশুপতি পাল ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণ পাল, করুণাপ্রসাদ পাল ও তাঁর পুত্র অমল পাল, শ্রীনির্মল পাল।

(২) ছাঁচের তৈরি সস্তার মাটির ও প্লাস্টারের ছোট ছোট মূর্তি ও পুতুল—এ কাজে শহরের অনেক অনেক লোক কাজ করেন। এমনকি বাড়ির মেয়েরাও এ কাজ করে থাকেন। কেউ কেউ আবার প্রজাপতিও বানিয়ে সংসার চালান। এক-একজন এক-এক ধরনের পুতুল তৈরি করেন। এই দিকটাই সর্বসাধারণের সুবিধার দিক এবং ক্ষুদ্রশিল্পের আকার ধারণ করেছে।

(৩) ব্যক্তির আবক্ষ মূর্তি বা পূর্ণাবয়ব মূর্তি—মাটি, প্লাস্টার, সিমেন্ট, পাথর, ব্রোঞ্জ সবরকম মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ পথে কার্তিকচন্দ্র পাল ও তাঁর পুত্র গৌতম পাল এবং আরও কয়েকজন চেষ্টা করে থাকেন।

(৪) সৃষ্টিধর্মী ভাস্কর্য—যে পথে কাজ করা আমার দ্বারাই শুরু হয় কৃষ্ণনগরে। ট্র্যাডিশনের গণ্ডি কাটিয়ে আর্ট কলেজের শিক্ষালাভের ফলে এই পথ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হই।

আমার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সুবীর পাল ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অতি অল্পবয়সে ট্রাডিশনাল কাজের জন্য ভারতমেলায় যোগদান করেন ও সুনাম অর্জন করেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি বদলায় শিল্পের ধারাও বদলে যায়। একযুগে যা সুন্দর পরবর্তী যুগে সেটি পুরনো দিনের স্মৃতির জিনিস হয়ে যায়। সব মানুষের মন সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে না বা করতে পারে না—কারণ তাতে নতুনের আনন্দ থাকে না। সেজন্য এই শিল্পকলারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এবং আশা করি, নতুন প্রজন্ম নতুনভাবে পড়াশুনো করে নতুন কিছু গড়ে দেশকে নতুন ধারা উপহার দেবে। তবেই কৃষ্ণনগর আবার তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে। তা না হলে পতন অনিবার্য।

পরবর্তী প্রজন্ম যদি শুধু এই কারিগরি দক্ষতা নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে ভাল শিল্পী হবে না ও ভাল শিল্পও সৃষ্টি হবে না। তাই নতুন প্রজন্মকে ভাবতে হবে, নতুন কিছু করার ভাবনা থেকে এবং ট্রাডিশনগত দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করতে হবে নতুন শিল্প—তা হলেই কৃষ্ণনগর আবার তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
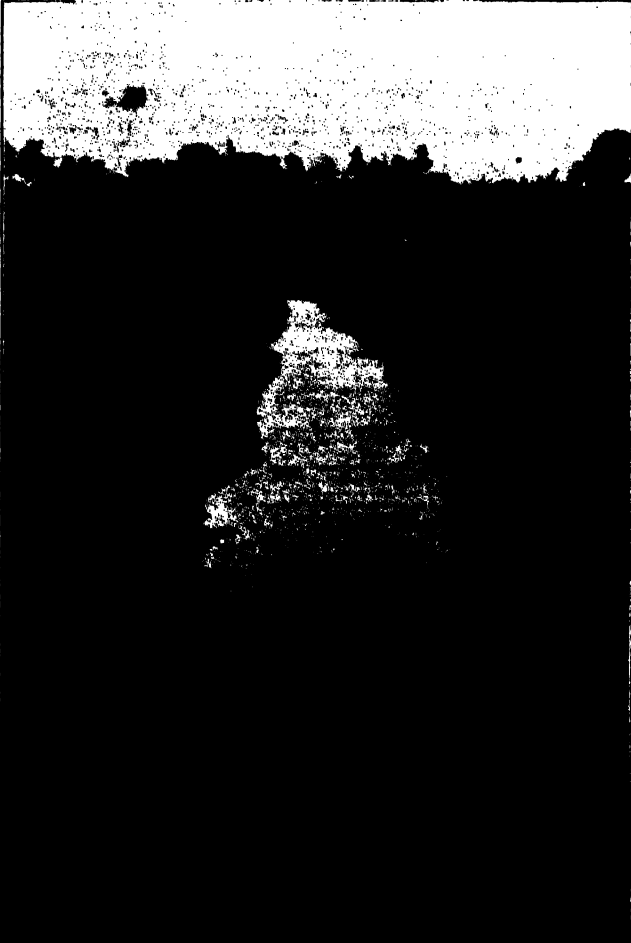
ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সমাজব্যবস্থার ভিত্তি-মূলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানের গ্রামীণ সমাজের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা বুঝতে গেলে আমাদের সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হবে। ঐতিহাসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রাচীন গ্রামীণ সমাজ অপ্রতিহত গতিবেগ নিয়ে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান স্তরে উন্নীত হয়েছে—এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। অন্যথায় পঞ্চায়েতীরাজ বিকাশের এবং অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা জানতে পারব গ্রামীণ সমাজের বিকাশ বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে। আদিতে কৃষি ও পশুপালন ছিল তৎকালীন সমাজজীবনের অর্থনীতি। কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের স্থিতিশীল অবস্থার উত্তরণ ঘটে এবং জমি ও সম্পত্তির মালিকানা বৃদ্ধি পায়। একে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে অসাম্য দেখা দেয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতি হচ্ছে—সমাজের কিছু ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং কালক্রমে এরা সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

বৈদিক যুগে আর্যসমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং তাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল।

বৈদিক সমাজে মানুষ সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন 'গণ'এ। 'গণ'গুলি শাসন করত বিভিন্ন গণপতিরা এবং পূর্ণ অধিকার নিয়ে সদস্যগণ তাঁদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মীমাংসা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত। 'বিদথ', 'সভা' ও 'সমিতি'তে মিলিত হয়ে গ্রামীণ সমাজে পাঁচজন মিলিত হত এবং এই পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গ্রামের ভাল-মন্দ দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পঞ্চায়েতের জন্ম। একটি সাধারণ জায়গাতে সদস্যগণ সমবেত হয়ে শাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধান করতেন। গ্রামগুলির প্রধানরা নির্বাচিত হতেন সকল সদস্যদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। যে গ্রামীণ সমাজগুলি স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে সেগুলি তাদের মর্যাদা হারায় এবং ধীরে ধীরে হীনবল ও নিস্তেজ হয়ে যায়। মধ্যযুগেও গ্রামীণ সমাজ শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা ছাড়াও তারা রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমাজগুলিও হীনবল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজগুলি স্বায়ত্ত শাসন হারাতে থাকে এবং সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ কোম্পানির শাসনকাল (১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭) এবং ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল—এই দুইটি ঔপনিবেশিক যুগ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করার অপকৌশল গ্রহণ করে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে জীবিত রাখার জন্য এবং তাদের নিজের দেশের শিল্পের স্বার্থে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প এবং কার্পাস বস্ত্রশিল্প সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায়—কারিগর শ্রেণীদের এক বিপুল অংশ কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। অভিশপ্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সামন্ত প্রভুগণ গ্রামীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান—গ্রামীণ সমাজের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

ইংরেজ শাসনের প্রথম একশো বছর গ্রামের মানুষের জন্য কোনও কল্যাণকর কাজকর্ম হয়নি। এটা উল্লেখ্য ইংরেজ শাসনের ১৮৫৮-৫৯ সালে সারা দেশে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য—(গ্রামীণ সমাজসহ) আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার মাত্র ১ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউন্ড ব্যয় করেছিলেন। শুধু বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ পাউণ্ড। এই তথ্য প্রমাণ করে সারা দেশ ব্রিটিশ শাসনে এক সীমাহীন বর্বর অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে গ্রামীণ সংগঠনগুলি তাদের স্বায়ত্তশাসন হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার গ্রামীণ সংগঠনগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন। ১৮৭০ সালে "বেঙ্গল চৌকিদারী আইন" প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন। জেলাশাসক গ্রামের জমিদার-জোতদারদের মধ্য থেকে কাউকে মনোনীত করে দফাদার, চৌকিদারদের গ্রাম পরিচালনা করবার দায়িত্ব তুলে দেন মনোনীত সদস্যের নেতৃত্বে এবং প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য গ্রামবাসীদের উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করে। ১৮৮৫ সালে "Bengal Local Self-Government Act" প্রণীত হল। এই আইনে জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হল।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে নতুন করে কিছু কিছু শিল্পের বিকাশ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে এক অভিনব যুগের সূত্রপাত হল। তৎকালীন ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী মানুষের একটা বড় অংশের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের একটা অশুভ প্রবণতা দেখা যায়। তাই প্রশাসনিক স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে কারোর চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান উদীয়মান জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল কিছু কিছু ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে। তারই ফলশ্রুতি ১৯১৯ সালের "গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন"। সেদিন প্রথাগত পঞ্চায়েতের পরিবর্তে এক নতুন পদ্ধতিতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি জন্মলাভ করেছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশের মন্ত্রিসভায় অংশ নেন। কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা বা উদ্যোগ সেই সময় লক্ষ করা যায়নি।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান রচিত হল। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪০নং ধারায় প্রতি রাজ্যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়। উক্ত ধারাতে বলা আছে—রাষ্ট্রকে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনে সচেষ্ট হতে হবে এবং সেগুলি যাতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা অংশে পরিণত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে। এই নির্দেশ অনুসারে এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে "মেহতা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন ও দায়িত্ব গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৭ থেকে শম্বুকগতিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রবর্তন শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সালে তা শেষ করা হয়। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষোভের বিষয় প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য—আধুনিককালে তার রূপায়ণের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তৎকালীন কংগ্রেস সরকার করেননি।

১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনের দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনে ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ায়—এদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। এমনও দেখা গেছে জেলা পরিষদ কোনও আঞ্চলিক পরিষদের এলাকার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদের উপর কোনও দায়িত্ব না দিয়ে কন্ট্রাক্টরের সাহায্য নিয়েছে। সব জেলা পরিষদ পুরনো জেলাবোর্ডগুলির মতো কাজ করত। আর অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি পুরাতন ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যা করত, তাই করেছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির কিছু উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির

তাও ছিল না। অপরদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর গ্রামের উন্নয়নমূলক সব কাজের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তা নামেমাত্র টিকে ছিল। অর্থাভাবে পঙ্গু হয়ে শুধু দিন কাটিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়—১৯৫৭ সাল ও ১৯৬৩ সালের আইন দুটি যথেষ্ট ছিল না এবং নিঃসন্দেহে গ্রামের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি এবং এই দুটি আইনের রূপায়ণের ব্যাপারে তারা নিদারুণভাবে হতাশ হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে "অশোক মেহতা কমিটি" তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—উত্থান, অচলাবস্থা ও পতন। বিগত দিনগুলিতে পঞ্চায়েতী রাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব মানুষকে উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং সুফল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যাদের জন্য পরিকল্পনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণ তাদের অংশগ্রহণের কোনও অধিকার ছিল না। এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে গোড়া থেকেই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুকূলে অতিকেন্দ্রিকতার ঝোঁক ছিল এবং সেটা ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল। "আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও"—এই নীতি অনুসারে প্রথমে কেন্দ্র থেকে রাজ্যে এবং পরে রাজ্য থেকে নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মুখে বারবার তৃণমূল স্তরে জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান হল বটে। আদতে ঘটনা প্রবাহ উল্টো খাতে বইতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম হল না।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন এবং ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন হল। প্রত্যক্ষ নির্বাচন হল কেবলমাত্র নিম্নতম স্তরগুলিতে। চার স্তরের পঞ্চায়েত গঠিত হতে সময় লাগল প্রায় পাঁচ বছর (১৯৫৮-১৯৬৩) এতে থাকল গ্রামস্তরে গ্রামপঞ্চায়েত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ। রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকায় গোড়া থেকেই নিচের দুই স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি মৃতপ্রায় হয়ে থাকল এবং উপরের দুই স্তরকেও শীঘ্র ক্ষমতাচ্যুত করা হল। সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কোনও পঞ্চায়েত নির্বাচন হল না। কেবলমাত্র নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

বিগত জনতা সরকারের আমলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে সরকারিভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা হয়। পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার হন "সিংভি কমিটি"। মূলত এই কমিটির পরামর্শে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে পঞ্চায়েত। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের ফলে বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সংবিধানের কার্যকরী অংশে স্থান পেয়েছে। এর আগে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর ছিল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। সুতরাং সংবিধান সংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বলা হচ্ছে এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।
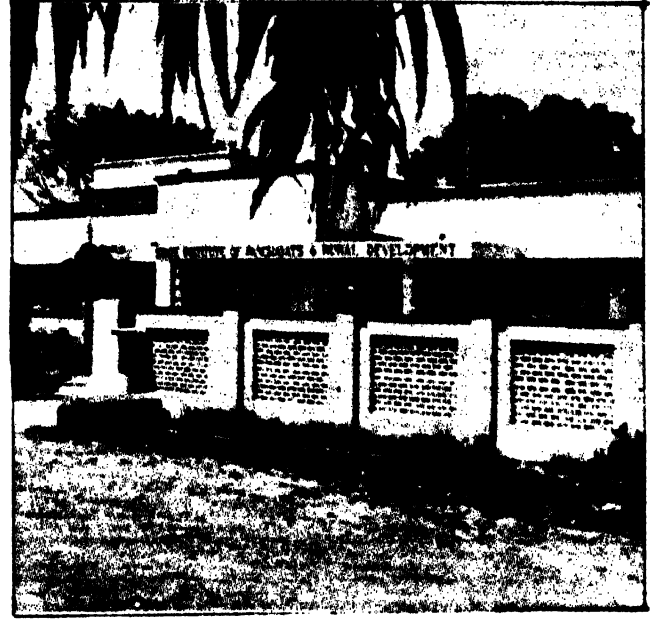
এটা সত্য সংবিধান সংশোধনের ফলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কাজ এক ধাপ এগিয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সংশোধনী গ্রামে পুরোদস্তুর পঞ্চায়েত সরকার গঠন করতে পারবে না। সরকার গঠনের সমস্ত উপাদান এতে নেই। তবে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার জন্ম-মৃত্যু এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করবে না। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের আন্দোলন জোরদার করার কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। লক্ষ রাখতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা যেন কোনও ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। সে রকম কিছু হলে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে।

আমাদের রাজ্য সরকার সংবিধান সংশোধনকে মাথায় রেখে সম্প্রতি পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করেছিল। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের বিধানের বাইরে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজ্য আইনে সংযোজিত হয়েছে—যেমন গ্রাম সংসদ গঠন, জেলা কাউন্সিল গঠন, এবং দলত্যাগবিরোধী ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যে এই সব ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে প্রথম। এছাড়াও সংবিধান সংশোধনের অনেক আগে এই রাজ্যে মহিলা/তফসিলি জাতি/উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ, গ্রামসভা গঠন এবং অর্থ কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল। নির্বাচন হয়েছে এ সবের ভিত্তিতে। রাজ্যের আইনে পঞ্চায়েতকে কয়েকটি বিষয়ে "উপবিধি" রচনার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এর ফলে জনগণের অংশগ্রহণ সহজতর হবে। এই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের ভিতকে আরও মজবুত করবে।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পঞ্চায়েতী রাজের রাহুমুক্তি ঘটে। ১৯৭৩ সালের

আইনের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে এবং ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সুসংহত বিকাশ ঘটায়। বাস্তবমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের কল্যাণমুখী কাজে ব্রতী হয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করে গ্রামবাংলার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমলাতন্ত্রের একচেটিয়া আধিপত্য থেকে পঞ্চায়েত রাজকে রাহুমুক্ত করে জনগণের সেবায় আরও বেশি বেশি করে নিয়োজিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন। রাজ্য সরকারের প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে পঞ্চায়েতকে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্প্রসারিত করেছেন। স্থানীয় সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার জোরকদমে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্জিত সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মধ্যে যথার্থ ও আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে মনে রাখা দরকার, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা যায় না তবুও এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে কার্যকরী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে—দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের মূল শর্ত—আমূল ভূমিসংস্কার। আমাদের দেশে সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা চলছে—এর ফলে বিগত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছেন। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও এবং "মেহতা কমিশনের" বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ থাকলেও কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণী তা বাস্তবায়িত করেনি।

পশ্চিমবঙ্গই ভারতের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত গঠন করে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। এই অভিনবত্ব মূলত নতুন প্রজন্মের কাছে প্রথম রাজনৈতিক পঞ্চায়েত উপহার দেওয়া এবং পর পর চারটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এর গতিধারাকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখা। প্রায় দু দশক ধরে এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সাফল্যগুলি—বিশেষ করে ভূমিসংস্কার ও গ্রামোন্নয়নের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল ও প্রতিভাত হয়ে আছে। তার চেয়েও বড় কথা—এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে এবং একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত নতুন নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এর ফলে গণতন্ত্রের ভিত আরও শক্তিশালী হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে একটি পর্যালোচনা রিপোর্টে। (New Horizon for West Bengal Panchayets)—শীর্ষক এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন সচিব শ্রীনির্মল মুখার্জি ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন সচিব ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর শ্রীডি. বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রিপোর্ট তারা রাজ্য সরকারের কাছে পেশও করেছেন। এই রিপোর্টে পঞ্চায়েত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে সাফল্যগুলি ও ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘাটতিগুলি পূরণ করে সাফল্যের নতুন স্তরে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

এটা সত্য যে বর্তমানের পঞ্চায়েত জহর রোজগার যোজনা এবং এই ধরনের কিছু প্রকল্পের গতানুগতিক কাজে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় পঞ্চায়েত যে একটি স্বশাসিত সংস্থা—এই ধারণার ব্যাপ্তি ঘটেনি। তেমনি কর্মসূচির দিক থেকে ভূমিসংস্কারের কাজে ততটা অগ্রাধিকার না থাকায় এটা মনে করা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতের আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই। সুতরাং কর্মসূচি ছাড়া পঞ্চায়েত অর্থহীন ও নীতিহীন সরকারের মতো মারাত্মক হয়ে উঠবে। মানুষের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণে, বিশেষ করে ভূমিসংস্কারকে পঞ্চায়েতের কর্মসূচির অগ্রাধিকার হিসেবে জোর দিতে হবে।

ভূমিসংস্কারের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও দীর্ঘ বৎসর এই কাজ বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে। ভূমিসংস্কারের পর পশ্চিমবঙ্গে কৃষি কাঠামো বিন্যস্ত হবে ক্ষুদ্র জমির মালিক, পাট্টা হোল্ডার ও নথিভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে। এরাই প্রকৃত চাষী এবং এদের দক্ষতা দেশের যে কোনও রাজ্যের মানুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু ক্ষুদ্র আকারের জমি থাকার ফলে, তাদের দক্ষতার সুফল মিলছে না। তাই প্রকৃত চাষীদের জমিকে যুক্ত করে সুসংহত করার একটা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এটা হবে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির পরবর্তী কর্মসূচি (এ কাজের পাশাপাশি একেবারে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে—যেখানে উৎপাদকদের যুক্ত করতে হবে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত পঞ্চায়েত কমিটিতে বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার দরকার। বাড়াতে হবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজ।

পরিশেষে বলতে চাই বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সার্থক প্রয়োগ, গ্রামীণ উন্নয়নে জনমুখী ভূমিকা এবং জনগণের সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের সার্বিক চেতনার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাবে। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েতের শক্তি এক নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মহিলা, তফসিলি জাতি ও উপজাতি নিয়ে আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪৫ শতাংশ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। মহিলা ও গরিব মানুষের মধ্যে এক স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে—নতুন প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের সংযোজন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আশা করা যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এই শক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

নদিয়ার তাঁতশিল্প

হরিপদ বসাক

লাটাইতে সুতো কাটা ছবি : তাকেশি সুজুকি (জাপান)

নদে-শান্তিপুর

“শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।” এককালে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত হরিনাম গানে (মতান্তরে প্রথম' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বানে) নবদ্বীপের সঙ্গে শান্তিপুরও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। নৈদে-শান্তিপুর বলে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধি আছে। নদিয়ার কথা উঠলে শান্তিপুরের নাম উচ্চারিত হয়ই। অর্থাৎ শান্তিপুরকে বাদ দিয়ে নদিয়ার কথা ভাবা যায় না। আর নদিয়ার তাঁতশিল্প নিয়ে বলতে গেলে তো শান্তিপুরকে সর্বাগ্রে স্থান না দিয়ে গত্যন্তর নেই। কে না-শুনেছে শান্তিপুরি শাড়ির কথা, তার গুণমান সুনামের কথা ! আর ধুতি ! এক সময় আরগু ধোলাই করা শান্তিপুরি কাচি ধুতি তো ছিল বাবু-ফ্যাশনের প্রধান অঙ্গ।

কতকাল আগে শান্তিপুরের তাঁতের সূচনা তার সন তারিখ বের করতে গেলে বিস্তর গবেষণা গ্রন্থের পাতা উল্টাতে হবে। সে-শ্রমে অপারগ হয়েও এটুকু বলা যায়, চৈতন্যদেবের বহু আগেই শান্তিপুরে বয়ন শুরু হয়েছিল। সম্ভবত সুলতানি যুগের সূচনা থেকেই। তখনও শান্তিপুরের কাপড় ‘শান্তিপুরি’ হয়ে ওঠেনি। প্রধানত মোটা সুতায় কাপড় বোনা হত সে সময়। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত ‘শান্তিপুর পরিচয়’ গ্রন্থে পাওয়া যায়— “ঢাকার ধামরাই হইতে লক্ষ্মণ সেনের সময়, প্রধানত তাঁহারই আগ্রহে বয়নক্ষম ও সূক্ষ্মতন্তু-শিল্পনিপুণ কয়েক

ঘর তন্তুবায় এবং তাহার সঙ্গে কয়েক ঘর হিন্দু দরজি বা ওস্তাগর শান্তিপুরে আসে, তৎপূর্বে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ মোটা সুতার বস্ত্র বয়ন করিত। উক্ত ওস্তাগরদিগের কার্য ছিল বস্ত্র রিপু করা, কাঁটা দিয়া ধৌত বস্ত্রসূত্র সমীকরণ করা ও কালি দ্বারা পাড় রঞ্জিত করা। ক্রমে ঢাকা অঞ্চল হইতে বহু তন্তুবায় শান্তিপুরে আসে। তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্মলাভের জন্যও আসিত। এই সব তন্তুবায়গণ ভক্ত, কীর্তনীয়া ও গায়ক ছিল।

'শান্তিপুরবাসী যত তন্তুবায়গণ।
আইলা প্রভুর গৃহে করিতে কীর্তন॥"

এই প্রসঙ্গের সমর্থনে একটি অন্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এই গ্রন্থেই। "পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই গল্প সাহিত্যে তাঁতিকে 'বোকা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ তুলা হইতে সুতা কাটিয়া এবং সেই সুতা হইতে কাপড় বুনিয়া তন্তুবায় যে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির অভাব হইল কোথায় বুঝিতে পারি না।... শান্তিপুরে একটি তন্তুবায় বংশ প্রকৃতই 'বোকা' নামে অভিহিত হয়। এই বংশের আদি পুরুষ .শিবরাম শ্রীচৈতন্যের সময় ধামরাই (ঢাকা) হইতে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শান্তিপুরে গমন করিতে আদেশ করেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য সমীপে গমন করেন। শান্তিপুরের শাক্ত ব্রাহ্মণেরা সে সময় অদ্বৈতাচার্যের উপর জাত ক্রোধ থাকায় শিবরাম 'বোকা' আখ্যা লাভ করেন।"

তখন থেকেই সম্ভবত শান্তিপুরে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের সূচনা। ধামরাইয়ের তাঁতিরা প্রধানত মসলিনেরই তাঁতি, শান্তিপুরে এসে তাঁরা মসলিন বয়নই শুরু করেন যা অনেক পরে নক্‌শাদার পাড়ের শাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে 'শান্তিপুরি' নামে খ্যাত হয়। মসলিন থানের পাড়ে কালি করে হয় ধুতি। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, শান্তিপুরে দীর্ঘদিন ধরে মসলিন উৎপন্ন হত এবং কোম্পানির আমল পর্যন্ত তা চলেছিল। এই মসলিনের ইউরোপীয় খ্যাতিও ছিল। 'শান্তিপুর পরিচয়' গ্রন্থে "উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ই আই কোম্পানির প্রতিনিধি এখান হইতে বাৎসরিক ১,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের মসলিন খরিদ করিতেন" বলে উল্লেখ রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শান্তিপুরে কুঠি স্থাপন করে তাদের গোমস্তা কর্মচারী দ্বারা দাদন প্রথায় কাপড় উৎপাদন করাত। এই গোমস্তা কর্মচারীরা অত্যাচারও করত তন্তুবায়দের উপর।

প্রকৃত শান্তিপুরি শাড়ি বয়ন সম্পর্কে 'শান্তিপুর পরিচয়' জানাচ্ছে "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুঠি স্থাপনের পর শান্তিপুরে সূক্ষ্মবস্ত্র বয়ন করিবার তাঁত প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বে কটক অঞ্চলের জনৈক তন্তুবায় শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিলে তাঁহার নিকট অন্য তন্তুবায়গণ নক্‌শা পাড় বুনিতে শিখে।" (এই মতে শান্তিপুরের কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে কটক থেকে জনৈক তন্তুবায় শাড়িতে কটকির ব্যবহার যুক্ত করেন। তাতে শান্তিপুরি শাড়ির নক্‌শার উন্নতি হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু তার আগেই সূচে ও ঝাঁপের নক্‌শার উদ্ভাবন হয়েছিল। উদ্ভাবন করেছিল শান্তিপুরের তাঁতিরাই।)

প্রারম্ভে সূচে নক্‌শা তোলা হত পাড়ে, পরে জালা ও ঝাঁপে, হাতে ঠেলা মাকুতে এই নক্‌শা কাপড় বোনা হত। তারপর তৈরি হল ঠক্‌ঠকি তাঁত (Fly Shuttle loom), বসল নক্‌শা তোলার কল (Jacquard Machine)। ঝাঁপে ৪০/৫০ ডাঙ্গি পর্যন্ত নক্‌শা হত, কলে হত ১৫০ থেকে ৪০০ ডাঙ্গি পর্যন্ত। বিভিন্ন রকমের শাড়ি বোনা হত। যেমন, সাদা, রঙীন, ডুরে, তাসখুপী, চৌখুপী, আয়নাখুপী ইত্যাদি। পাড়ের নক্‌শারও নানা নাম ছিল—চাঁদমালা, তাজ, কল্কা, ভোমরা, রাজমহল, দোরোখা, টেক্কা, চৌটেক্কা আঁকা ইত্যাদি।

এতদিন কাপড় তৈরি হত দেশীয় সুতায় ব্যাপারীরা এতদঞ্চলের উৎপন্ন তুলা এনে কাটুনিদের দিত। কাটুনিদের কাছ থেকে তাঁতিরা কিনে নিত সেই সুতা, তাই দিয়ে কাপড় বুনত। সূক্ষ্ম সুতা তৈরিতে শান্তিপুরের কাটুনিরাও খুব দক্ষ ছিল, তাদের রোজগারও মন্দ হত না।

কিন্তু যেদিন থেকে (১৮২৫ খ্রি) বিলিতি সুতার আমদানি আরম্ভ হল সেদিন থেকে কাটুনিদের ভাতে টান পড়ল। আমদানি যত বাড়ল দেশি সুতার ব্যবহার তত কমতে লাগল, শেষে বন্ধই হয়ে গেল একসময়। এই সময় সস্তাদরে ম্যানচেস্টারের কাপড় আমদানি হওয়ায় শান্তিপুরের বয়নশিল্পের চরম অবনতি ঘটে।

দেশ স্বাধীন হবার পর শান্তিপুরের তাঁত সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। প্রধানত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমন এই বৃদ্ধির কারণ। বাড়তে বাড়তে আজ শান্তিপুরের তাঁত সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫,৪৬১। গত দশ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে বলে অনুমান। গত বছর (১৯৯৫-৯৬) পুনরায় তাঁত গণনা হল সারা দেশে। তার চূড়ান্ত ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। উৎপাদনে সরকারি পরিসংখ্যান কিছু পাওয়া যায়নি। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী শান্তিপুরের বার্ষিক উৎপাদন একশ কোটি টাকার কাছাকাছি।

প্রধানত দাদনদার মহাজনেরাই এই বস্ত্র ব্যবসায়ের মূলে। তারাই সুতার জোগান দেন, কাপড় কিনে নেন। বেচেন কলকাতায়—বড়বাজারের গদিতে, দোকানে, হরিসার ও মঙ্গলার হাটে। শান্তিপুরেও কাপড়ের হাট বসে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে। সেখানে ভিনরাজ্যের ব্যাপারীরাও আসেন। এখন কলে তৈরি সুতাই শান্তিপুরি শাড়িতে ব্যবহৃত হয়, তবে তা বিদেশি নয়, দেশি—৮০ ও ১০০ নম্বরের। আসে অন্যরাজ্য থেকে। আমাদের রাজ্যে এই নম্বরের চিকন সুতা তৈরি হয় না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই সুতা সরাসরি মিল থেকে কিংবা কলকাতার এজেন্টদের কাছ থেকে সুতার জোগান দিয়ে থাকেন। মহাজনী শোষণ তখনও ছিল এখনও আছে। তবে তার পদ্ধতি পাল্টেছে। তাঁতিদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে সামান্যই।

মহাজনদের শোষণ থেকে তাঁতিদের বাঁচাতে শান্তিপুরে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল অনেক। কিন্তু তারা আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি। অধিকাংশ সমিতিই বন্ধ হয়ে গেছে, আর কিছু কোনওরকমে টিকে রয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র সচল।

উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুরি শাড়ির বাজার বাড়েনি বরং সঙ্কুচিত হয়েছে। ডিজাইন প্যাটার্নে আধুনিক রুচির অভাব, কাঁচা রং, নিম্নমানের সুতার ব্যবহার ইত্যাদি কারণে শান্তিপুরির

পূর্ব সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। ধুতি তো আর হয়ই না শান্তিপুরে। সুতার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে শাড়ির দাম চড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতার বাজারে তার টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়ে। এমনটা হওয়াই অনিবার্য। এই শিল্পের তাঁতিরা মহাজনদের আজ্ঞাবহ। দাদনদারের নির্দেশে কাপড় বোনে, তারই দেওয়া ডিজাইন প্যাটার্নে শিল্প ফলায়। আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে তাঁতির ধারণা না-থাকারই কথা। মহাজন ব্যবসা করেছে, মুনাফা লুটেছে, কিন্তু শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেনি। নতুনতর ভাবনা, শিল্পের প্রচার প্রসার কিছুই করেনি। বরং অধিক মুনাফার লোভে সনাতন ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে অনুকরণে প্ররোচিত করেছে তাঁতিকে। তাতে তার ধনাগম হয়েছে, কিন্তু শিল্প মার খেয়েছে, ঐতিহ্যের হয়েছে চূড়ান্ত অবমাননা।

ভাবনা শেষে ভাবতে হল সরকারকে। নিজস্ব ঘরানার সঙ্গে হাল-ফ্যাশনের সংযোজন, ভিন্নতর উৎপাদনে উৎসাহ, বাজার তৈরির জন্য প্রচার, প্রসার ইত্যাদির সূচনা করে বাংলার তাঁতশিল্পকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করল। শান্তিপুরের তন্তুবায়রাও এই সুযোগ অল্পবিস্তর গ্রহণ করে এখন একটি চলনসই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শান্তিপুরি শাড়ি বয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র, অসহায় মহিলারা এই তাঁতকে অবলম্বন করে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করছেন। বেকারত্বের সহজ সমাধান এই তাঁত। শ্রমে নিতান্ত অনীহা না থাকলে অতি অল্প আয়াসেই অনেক বেকার মানুষ কাজ খুঁজে পান তাঁতে ও তাঁতের নানাবিধ সহায়ক কাজে।

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া

শান্তিপুরের পাশেই ফুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামে আর একটি তন্তুবায় জনপদ গড়ে উঠেছে এবং অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। কবি কৃত্তিবাস বর্ণিত 'গ্রামরত্ন' ফুলিয়ার খ্যাতি আজ আবার নতুন করে সারা দেশে ছড়িয়েছে। যার দরুন ছড়িয়েছে তার নাম 'টাঙ্গাইল শাড়ি'। রামায়ণের পয়ারানুকরণে এখন গাওয়া হয়—

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন।
টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন।।

বয়সের দিক থেকে শান্তিপুরি শাড়ির তুলনায় টাঙ্গাইল শাড়ি নিতান্তই শিশু। শ'খানেক বছর আগে বাংলা তেরশ' সালের গোড়ায় তার উদ্ভব পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল নামক স্থানে। টাঙ্গাইল একটি মফস্বল শহর (বর্তমানে বাংলাদেশের জেলা শহর)। তাকে কেন্দ্র করে আশপাশের বাইশখানা গাঁয়ে ছিল তন্তুবায়দের বাস, টাঙ্গাইল বয়ন ছিল তাদের একমাত্র পেশা। সাতচল্লিশের দেশভাগ তাদের ভিটেমাটি গ্রাম ও দেশ ছাড়া করে,—দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে এসে তারা অধিক সংখ্যায় ঠাঁই নেয় নদিয়ার ফুলিয়ায়, বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে এবং অল্প সংখ্যায় নবদ্বীপ ও ধাত্রী গ্রামে (বর্ধমান) ও আরও কোথাও কোথাও। এসে তারা বয়ন শুরু করে। নিজেদের তাঁতবোনা বিদ্যায় এবং মহাজনদের আর্থিক সহযোগিতায় তারা পুনর্বসতি পায়। এ ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য ছিল নাম মাত্রই। উদ্বাস্তু

বুনন ছবি : শঙ্কর চক্রবর্তী

এই তাঁতিরা অন্যত্র ভিন্ন রীতির বয়নে নিয়োজিত হলেও ফুলিয়ায় তাঁতিরা কিন্তু পৈতৃক টাঙ্গাইল বয়ন রীতিকে আঁকড়ে থেকে তাকেই পুনর্জাগরিত করে তোলে এবং অপরিসীম দারিদ্র্য বঞ্চনা শোষণ সহ্য করেও তারা এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় দ্রুত। নিখুঁত বুনন, সুচারু ফিনিশিং, বৈচিত্র্যময় ডিজাইন, মনোহারি রঙে যে নক্শী পাড় শাড়ি তারা বোনে তাই আজ সারা ভারতের বাজার মাত করা 'টাঙ্গাইল শাড়ি'।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করি। 'টাঙ্গাইল'—এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্তি আছে বাজারে। জামদানি ও ঢাকাই-বুটি শাড়িকেও ব্যবসায়ীরা টাঙ্গাইল বলে চালাচ্ছেন, টাঙ্গাইল শাড়ির সুনামে ভাগ বসিয়ে অধিক মুনাফা লুটতেই তাদের এই কারসাজি। কোনও কোনও তাঁত-গবেষকও লোক মুখে শুনে শুনে তাঁদের গ্রন্থে সেইভাবেই স্থান করে দিচ্ছেন, ভেতরকার খোঁজ খবর নেবার দায় থাকলেও তা পালন করছেন না। তাই তাঁদের গবেষণায় ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হয়ে স্থায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছে, যা থেকে পরবর্তীকালে তৈরি হবে তাঁতের মিথ্যে ইতিহাস। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ঢাকাই জামদানি ও টাঙ্গাইল শাড়ির বয়ন রীতিতে, চেহারায়, আদলে বিস্তর ফারাক। টাঙ্গাইল শাড়ি মূলত নানা রংয়ের মসৃণ জমির দুপাড়ে নক্শার কারুকাজ—যা জ্যাকার্ড নামক যন্ত্রের দ্বারা তোলা হয়। আর ঢাকাই জামদানিতে সম্পূর্ণই বুটির কাজ—জমিতে, পাড়ে, আঁচলে—যা পুরোপুরি হাতের, জ্যাকার্ডের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হয় না, যাঁরা শাড়ি অল্প বিস্তর কেনেন এবং চেনেন তাঁরা এক নজরেই বলে দিতে পারেন কোনটা টাঙ্গাইল, কোনটা জামদানি।

জামদানি নয়, ফুলিয়ার তাঁতিরা যে শাড়ি বোনে তাই আদি ও অকৃত্রিম টাঙ্গাইল শাড়ি।

টাঙ্গাইলেও প্রথম তাঁতিরা এসেছিলেন ঢাকার ধামরাই ও তৎপার্শ্ববর্তী চৌহট্ট গ্রাম থেকে। এসেছিলেন দেশদুয়ার, সন্তোষ ও খারিন্দার জমিদারদের আমন্ত্রণে।

নদীয়া জেলা
(তাঁতশিল্প)
[স্কেল - ১ সেঃ মিঃ = ৮ কিঃ মিঃ]
উঃ
করিমপুর - ১
করিমপুর - ২
তেহট্ট - ২
তেহট্ট - ১
কালিগঞ্জ
চাপড়া
নাকাশীপাড়া
কৃষ্ণগঞ্জ
কৃষ্ণনগর - ২
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর - ১
হাঁসখালী
শান্তিপুর
রাণাঘাট - ২
রাণাঘাট - ১
চাকদহ
হরিণঘাটা
বাংলাদেশ
উত্তর ২৪ পরগনা
হুগলী
বর্ধমান
মুর্শিদাবাদ
ভাগীরথী নদী
আন্তর্জাঃ সীমানা -
জেলা সীমানা -
ব্লক - সীমানা -
রেলপথ -
সড়ক -
নদী -
ব্লক অফিস -
বুটিদার শাড়ি -
জামদানী -
টাঙ্গাইল -
শান্তিপুরি -
আটপৌরে, লুঙ্গি -
মানচিত্র - লেখক
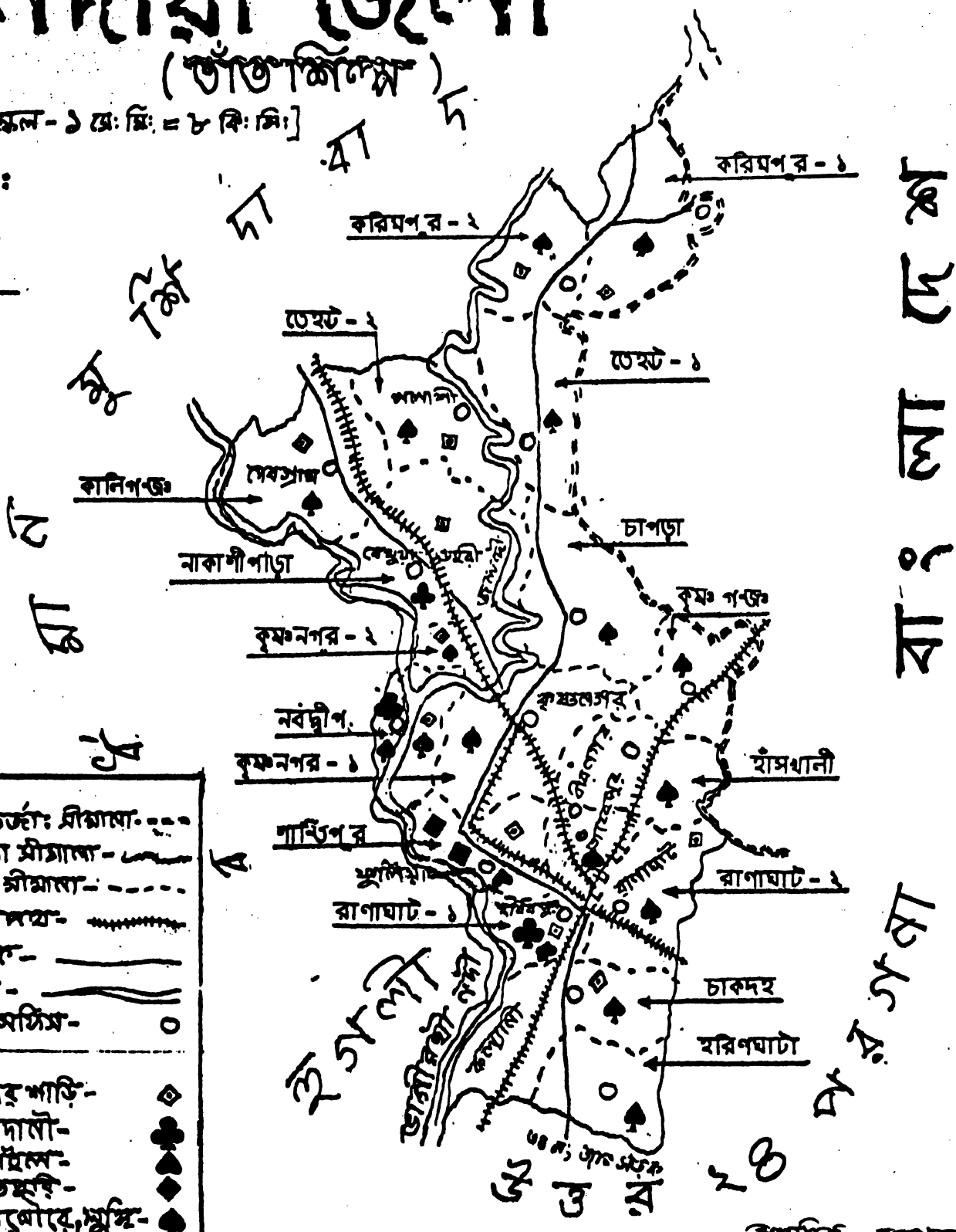
টাঙ্গাইলের তাঁতিদের পদবি 'বসাক'। এই বসাকদের মধ্যে আজও 'ধামরাইয়া' ও 'চৌহাইট্টা' বলে দুটি সম্প্রদায় বিদ্যমান।

১৯৪৮ সাল থেকেই ফুলিয়ায় আসতে শুরু করেন উদ্বাস্তু তাঁতিরা। এসেই মহাজনের কবলে। রাজ্য সরকার তাদের একটি পুনর্বাসন কলোনি করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে ১২৫টি পরিবারকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাঁত ও সুতার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যও। কিন্তু তখন তো স্রোতের জলের মতো উদ্বাস্তুরা আসছেন। পুনর্বাসন কলোনিতে আর স্থান না-পেয়ে তারা মহাজনদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। তাঁতিদের চাপ বাড়ে, বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখে মহাজনেরা আশেপাশের সম্ভাদরের জমি কিনে তাঁতি বসাতে থাকেন। এই ভাবেই গড়ে ওঠে ফুলিয়া উপনগরীকে কেন্দ্র করে বুঁইটা, মাঠপাড়া, চট্‌কাতলা, বাহান্নবিঘা, তালতলা ইত্যাদি তাঁতিপাড়া। দাদনি প্রথায় তাঁতিরা মহাজনের কাছে কাজে বাঁধা পড়েন। মহাজনের বাড়ি গাড়ি হয়, তাঁতিদের আয় উন্নতি কিছু হয় না—মজুরি কমে, দেনা বাড়ে। ১৯৭৩ সাল নাগাদ এমন অবস্থা দাঁড়াল, তাঁতে আর ভাত হয় না তাঁতিদের। তখন ফুলিয়ার তাঁত সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। নিরন্ন অসহায় তাঁতিরা আন্দোলনের পথ বেছে নিলেন, শুরু হল মিটিং, মিছিল, ঘেরাও, ধর্না। সরকারি দপ্তরের টনক নড়ল। এগিয়ে এল ঋণদাতা ব্যাঙ্ক। অর্থ সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে তাঁতিরা গঠন করলেন সমিতি। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। মহাজনী শোষণের জাল ছিন্ন হল। সমিতির তরুণ পরিচালকরা বুঝলেন এবং সারা ফুলিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁতেই তাঁতিদের ভাত কাপড় এবং নিবাস সম্ভব।

তাঁতিরা সমিতির দিকে ঝুঁকলেন—এক বছরেই সদস্য সংখ্যা এত বাড়ল যে আর একটা সমিতি গড়তে হল। পরের বছর আরও একটা। সমিতি তিনটি তখন সামান্য সংঘ মাত্র। ১৯৭৭ সালে তাদের সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করা হল। কিন্তু সে তো সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র। ১২/১৪ হাজার তাঁতির মাত্র শ'তিনেক সদস্য হতে পারলেন। এর বেশি নেবার সামর্থ ছিল না সমিতির। তা হোক, উপকার যা হবার তাতেই হল। মহাজনেরা শত চক্রান্ত করেও যখন সমবায় আন্দোলনকে দমাতে পারলেন না তখন বাধ্য হলেন নিজেদের মুনাফা কমিয়ে তাঁতিদের বাড়তি মজুরি দিতে, সমিতির সমান সুবিধাদি দিতে।

সেই শুরু ফুলিয়ার তাঁতের জয়যাত্রা, আজও তা অব্যাহত। বিপদ এসেছে বারে বারে, ধাক্কা খেয়েছে অনেক, কিন্তু সমবায় আন্দোলন থামেনি। ক্রমাগত বলিষ্ঠ হতে হতে এখন সমিতি তিনটের সাফল্য দেখবার মতো, তারিফ করবার মতো। কাজ হয়েছে, তাই সাহায্য সহযোগিতাও পেয়েছে—শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারি সাহায্যেরও অভাব হয়নি। নানা প্রকল্পে প্রচুর পরিমাণে টাকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উদার হস্তে দিয়েছেন। এতদিন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জোগাত, এখন জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক জোগাচ্ছে প্রয়োজনীয় মূলধন। ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি হল সকল সমবায় সমিতি তিনটির নিজস্ব বাড়ি। বাগান ঘেরা সুরম্য দালানের সেই বাড়ির নাম দেওয়া হল 'সমবায় সদন'। সারা দেশের তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে সমবায় সদন এখন একটি পরিচিত নাম। তন্তুবায় সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সদনই পেয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালের জাতীয় পুরস্কার, তিনটি—স্বর্ণ পদক, রৌপ্য পদক ও বিশেষ পুরস্কার।

ছোট আকারে আরও গুটিকয় সমিতি ফুলিয়ায় ভাল কাজ করছে। সমবায় সদন ও অন্যান্য সমিতি মিলে সমবায়ভুক্ত তাঁতির সংখ্যা বড় জোর হাজার দুয়েক। এখনও সেই সিন্ধুতে বিন্দুই,—ফুলিয়ায় টাঙ্গাইল তাঁতের বর্তমান সংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার। তবুও এই বিন্দুই সারা সমুদ্রের উপর এমন প্রভাব ফেলেছে যে, সমবায় বহির্ভূত সকল তাঁতিই সমান সুযোগ পাচ্ছেন। মহাজনদেরও চলতে হচ্ছে সমিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ির বার্ষিক উৎপাদন ১০০ কোটি টাকার উপর। উৎপন্ন হয় সুতি, সিল্ক, তসর, পলিয়েস্টার শাড়ি ও বিভিন্ন রপ্তানি বস্ত্রের। সারা দেশে এর বাজার। প্রধান ক্রেতা কলকাতা বড় বাজারের গদিওয়ালারা। বাংলার বাইরে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ির চাহিদা বাড়ছে। রপ্তানি বস্ত্র যাচ্ছে জাপান, জার্মান, ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যে।

ফুলিয়ার বাইরে থেকে প্রচুর তাঁতশ্রমিক এখানে এসে তাঁতের কাজ করছেন। তাঁতের সহায়ক কাজেও অনেক মানুষের রুজিরোজগার হচ্ছে। সুখের কথা, বেকার পূর্ণ এই দেশে ফুলিয়া সম্পূর্ণ বেকার শূন্য। বরং তাঁত শ্রমিকের অভাব রয়েছে এখানে—চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। আরও বহু মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে ফুলিয়ার তাঁতে।

ফুলিয়ার তাঁতির ঘরের মেয়েরা তাঁত বোনেন না। কিন্তু তাদের সহযোগিতা ছাড়া তাঁত অচল। বয়ন শুরুর আগে প্রস্তুতি পর্বের যাবতীয় কাজই মেয়েদের করতে হয়—লাটাই চরকা তাদের সর্বক্ষণের কাজ, তার ফাঁকে ফাঁকে রান্না-বাড়া, ঘরকন্না। ছোট ছেলেমেয়েদেরও সময় সময় চরকা মাকুর কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করতে হয়।

নবদ্বীপ ধাম

'নদীর জন্য নদীয়া নাম।
শ্রীচৈতন্যের পুণ্য সে-ধাম॥'

শ্রীধাম এই নবদ্বীপে কতকাল আগে তাঁত শুরু হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে চৈতন্যদেবের সময়ে যে নবদ্বীপে তাঁত ছিল না সেটা অনুমান করা যায়। কেননা, শান্তিপুরের 'বোকা' বংশের প্রথম পুরুষ শিবরাম ধামরাই থেকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে উপস্থিত হলে চৈতন্যদেব তাঁকে শান্তিপুরে চলে যেতে বলেন। নবদ্বীপে তাঁতের সুযোগ থাকলে তিনি তাঁকে অন্যত্র যেতে বলতেন না। তবে কোম্পানির আমলে অল্প সংখ্যায় থাকলেও থাকতে পারে। সাহেবেরা কুঠি ও কাপড় সংগ্রহের আরম্ভ স্থাপন করলে শান্তিপুর বস্ত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তখন এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই তাঁতিরা শান্তিপুরে আসতেন। এখান থেকেই তাঁরা দাদন নিতেন, কাপড় জমা দিতেন।

স্বাধীনতার পর থেকে তাঁতের প্রসার নবদ্বীপে। প্রধানত পাবনা, ঢাকা, টাঙ্গাইল থেকে নাথ দেবনাথরা এসে নবদ্বীপে তাঁতের কাজ আরম্ভ করেন। মোটা কাপড়ের পাশাপাশি তাঁরা জামদানি শাড়িরও উৎপাদন শুরু করেন। নবদ্বীপে এখন সরু সুতার (১০০ নম্বরের) বাহারী বুটিদার জামদানি শাড়ি তৈরি হয় যার সুনাম ও চাহিদা ভারতব্যাপী। সুতা এবং রেশম উভয় প্রকার জমিরই জামদানি হয়। দাম তিনশ থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত।

নবদ্বীপ পৌর এলাকায় ১৯৮৭-৮৮ সালের গণনা অনুযায়ী তাঁত সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। বর্তমানে সে সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দ্বিগুণ না হলেও কাছাকাছি। আনুমানিক হিসাবে, সে সংখ্যা ২৮ হাজারের কম নয়। অধিকাংশই মোটা কাপড়ের তাঁত। ৪০/৬০ নম্বরের সুতায় তৈরি হয় আটপৌরে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর ইত্যাদি। জামদানি বয়ন হয় বড় জোর ১৫ শতাংশ তাঁতে।

নবদ্বীপের জামদানি শাড়ির টান অপরিবর্তিত থাকলেও মোটা কাপড়ের বাজার কিন্তু বেজায় মন্দা। নবদ্বীপের তাঁত-কাপড়ের হাটে আগে সপ্তাহে এক-দেড় কোটি টাকার লেনদেন হত। এখন সে লেনদেন কমে দাঁড়িয়েছে ৫০/৬০ লাখে। মন্দার প্রধান কারণ পাওয়ারলুম। মোটা কাপড়ের বাজারে পাওয়ারলুম ঢুকে পড়েছে, বিশেষ করে লুঙ্গির ক্ষেত্রে। আমাদের রাজ্যে পাওয়ারলুমের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ খানিক শিথিল হলেও এখনও বজায় আছে। কিন্তু ভিন রাজ্যে তা নেই। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কটক ইত্যাদি স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়ারলুমের কাপড় এসে পশ্চিমবঙ্গের বাজার দখল করে ফেলছে। ফলে অসম প্রতিযোগিতায় তাঁতে তৈরি মোটা কাপড়ের বাজারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁতিদের আয় বাড়ছে না, অন্নবস্ত্রের সংস্থান কোনওক্রমে হলেও ভবিষ্যৎ ভাবনায় তাঁরা শঙ্কিত। কেন্দ্রীয় সরকার জনতা বস্ত্র প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ায় নবদ্বীপের বহু তাঁতির রোজগার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সরকারি তৎপরতা সত্ত্বেও নবদ্বীপে তন্তুবায় সমবায় আন্দোলন কোনও সুফল আনতে পারেনি। বহু সমিতি গঠিত হয়েছিল তার অধিকাংশই এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। যে কয়টি চলছে তাদেরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কিছু হয়নি।

এই জেলার তাঁত শিল্পাঞ্চলকে দুইটি জোনে ভাগ করা হয়েছে—নবদ্বীপ ও শান্তিপুর। নবদ্বীপ জোনে রয়েছে ১২টি ব্লক, কম-বেশি তাঁত সর্বত্রই আছে। মোটা কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেথুয়াডহরী, পলাশীপাড়া, দেবগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু বুটিদার শাড়িও তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব স্থানে জামদানি বয়নের প্রসার হবার সম্ভাবনা।

চুর্ণী নদী তীরে

চুর্ণীর তীরে মহকুমা শহর, রানাঘাট শান্তিপুর হ্যান্ডলুম জোনের অন্তর্গত। শহর রানাঘাট পাওয়ারলুমের কাপড়ের জন্য খ্যাত। তবে শহর ছাড়িয়ে বাইরে—চুর্ণী নদীর ধারে ধারে গ্রামগুলিতে অনবরতই শোনা যায় হাতের তাঁতের ঠকাঠক্ শব্দ। রামনগর আইশতলা, কালীনারায়ণপুর, হবিবপুর প্রভৃতি স্থানে মোটা কাপড়, লুঙ্গি, গামছা তৈরি হয়। রামনগরের তাঁত-কাপড়ের হাটে কেনাবেচা ক্রমশ বাড়ছে।

হবিবপুর স্টেশনের উত্তর-পার্শ্বে দুর্গাপুর এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে জামদানির অসংখ্য তাঁত। দুর্গাপুরে প্রথম সূচনা। ফুলিয়ার জনৈক মহাজনের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন অ-তন্তুবায় মানুষ এখানে শুরু করেছিল জামদানি বয়ন। তাঁদের দেখাদেখি প্রচুর মানুষ এই পেশায় চলে এসেছেন—এক সময় যাঁরা চাষ করতেন, ক্ষেত-মজুরী, দিন-মজুরী করতেন তাঁদের ঘরে ঘরে তাঁত এখন। অনেক চাষী পল্লী আজ তাঁতি পাড়ার রূপ নিয়েছে। পুরুষের সঙ্গে মেয়েরা, বউয়েরাও তাঁতে বসে যাচ্ছেন, মাকু টানছেন, বুটি তুলছেন। তাদের আয় বেড়েছে,—ক্ষেতের চেয়ে তাঁতে তাদের রোজগার কিছু বেশি হয়।

রানাঘাটের দক্ষিণে চাকদহ ব্লক তাঁত সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৭-৮৮-র গণনায় এই ব্লকের তাঁত সংখ্যা ছিল ২৬৫২ খানা। এতদিনে সে সংখ্যা বেড়ে কততে দাঁড়িয়েছে তার হিসাব এখনও বের হয়নি। বৃদ্ধির হার দেখে অনুমান করা যায়, পাঁচ হাজারে পৌঁছে গেছে তাঁতের সংখ্যা। প্রধানত চিত্তরঞ্জন তাঁতের আটপৌরে কাপড়, লুঙ্গি চাদর ইত্যাদি তৈরি হয়। ঠক্‌ঠকি তাঁতও বসেছে গ্রাম-গঞ্জ জুড়ে তাতে চিকন সুতার বুটিদার কাপড়ও বোনা হয়।

চাকদহের কাপড়ের হাটে শুধু মোটা কাপড় নয়, টাঙ্গাইল জামদানি, পলিয়েস্টার, ছাপা শাড়িরও বেচাকেনা চলে।

জনতা প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এ সব অঞ্চলের চিত্তরঞ্জন তাঁত অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন করে এই তাঁত আর বাড়ছে না। বাড়ছে ঠক্‌ঠকি তাঁতের সংখ্যা। খুব অল্প খরচে এবং ছোট জায়গাতেই এই তাঁত বসিয়ে কাজ শুরু করা যায়। কাজটা মোটামুটি শিখলেই দাদনদার মহাজনেরা সুতার জোগান দিতে সম্মত হন। ৮০/১০০ নম্বর সুতার জমিতে অল্প বুটির কাজ, মাঠা পাড়ের শাড়ি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে এবং বিক্রিও হচ্ছে হাটে বাজারে, দোকানে গদিতে সর্বত্র।

তাঁত কোথায় নেই এই জেলায়! উত্তরে করিমপুর থেকে দক্ষিণে হরিণঘাটা পর্যন্ত তন্তুবায় অতন্তুবায় বহু মানুষ মাকু টেনে জীবন যাপনের পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ তারা এখনও দেখতে পাননি, তবে অনিয়মিত ক্ষেতমজুরী, দিনমজুরীর চাইতে ঘরে বসে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা তারা করতে পারছেন।

রপ্তানি-বস্ত্র বয়ন

এক সময় মাদ্রাজ হ্যান্ডলুমের শাড়ি পশ্চিমবাংলার বাজারে দাপটে রাজত্ব করেছে। তাদের হটাতে বাংলার তাঁতিদের কম মেহনত করতে হয়নি। এতদিনে তারা পিছু হটেছে বলে মনে করা যায়। আসলে কিন্তু তারা পিছু হটেনি, স্বেচ্ছায় ফিরে গেছে। দক্ষিণ ভারতের অনেক তাঁতিই এখন শাড়ি বোনায় ক্ষান্তি দিয়ে রপ্তানিযোগ্য কাপড় বোনায় নিয়োজিত। তাতে তাদের আয় যেমন বেড়েছে, তেমনই সুনামও হয়েছে,—দেশেরও বিদেশি-মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। তাদের শাড়ির উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাংলার শাড়ির চাহিদা সেখানে বেড়েছে। ফুলিয়ার শাড়ির একটা অংশ এখন বিক্রি হয় মাদ্রাজ বাঙ্গালোর হায়দরাবাদে। জামদানি ও শান্তিপুরিও অল্প বিস্তর দক্ষিণমুখী হয়েছে।

চরকায় নলি পাকানো ছবি : শঙ্কর চক্রবর্তী

রপ্তানি বয়নে দক্ষিণ ভারতের তাঁতিরা এগিয়ে থাকলেও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশাও একেবারে পিছিয়ে নেই। বেনারস, ভাগলপুর, সম্বলপুরও রপ্তানিতে ঝুঁকে পড়েছে। ঝোঁকেনি কেবল বাংলা। রাজ্য সরকারের নজরে এটা পড়েছিল আগেই, তবে তৎপর হতে একটু সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার শান্তিপুরকে এক্সপোর্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করায় সুযোগও তৈরি হয়েছে। আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাসও পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে নদিয়ার ৯টি সমবায় সমিতিকে এক্সপোর্ট প্রোজেক্ট স্কিমের আওতায় এনে কাজ শুরু করা হয়েছে। এ বাবদে টাকাও মঞ্জুর হয়েছে ২০ লক্ষাধিক।

কাজ অবশ্য অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ফুলিয়ায় সমবায় সদনের সমিতি তিনটি ১৯৮৫ সাল থেকেই এই কাজে লেগে পড়েছে। সরাসরি বিদেশের বাজারে না-গেলেও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এজেন্ট মারফত তারা রপ্তানি করছে। খুব বিরাট অংকের না-হলেও এ বছরে তাদের রপ্তানি হয়েছে পৌনে এক কোটি টাকার বস্ত্র। বয়নে মানে ডিজাইনে বিদেশের বাজারে তাদের কাপড় যথেষ্ট সুনামও কুড়িয়েছে। বিদেশি ক্রেতারাও আসছেন সরাসরি—জাপান থেকে, ইতালি থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে। এই তো মাত্র ক'দিন আগেই এসেছিলেন জাপানের প্রখ্যাত রপ্তানি সংস্থার প্রধান মি. তাকেশি সুজুকি। এদের তৈরি কাপড় তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, বিস্তর নমুনাও নিয়ে গেছেন।

রপ্তানির ব্যাপারে রাজ্য সরকার নদিয়ার উপরে জোর দিচ্ছেন বেশি। রপ্তানি-বয়নে সুদক্ষ করে তুলতে তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেমিনার, প্রদর্শনী, ফ্যাশন শো ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাঁতশিল্পীদের উৎসাহিত করে তুলছেন।

সমস্যা সংকট

বলা হয়, আমাদের এই দেশে এমন একটা গ্রামও নাকি নেই যেখানে মাকুর শব্দ শোনা যায় না। সারা দেশের পক্ষে কতটা সঠিক জানি না, তবে নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে এ কথাটা সর্বাংশেই সত্যি। তাঁত কোথায় নেই এ জেলায় ! এ বঙ্গে তাঁত সংখ্যার দিক দিয়ে নদিয়া দ্বিতীয় স্থানে (প্রথম স্থানে মেদিনীপুর)। গত বছর (১৯৯৫-৯৬) তাঁত গণনা হয়েছে। সে গণনার চূড়ান্ত হিসাব এখনও বের হয়নি। একটা খসড়া হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে নদিয়া জেলার তাঁত সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৬০টি। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাষের পরেই তো বয়ন, এ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। তাঁত তো এখন আর শুধুমাত্র বংশগত তন্তুবায়দের দখলে নেই। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল—কে নেই তাঁতে ! কাজের খোঁজে সবাই আসছে—শিক্ষিত বেকাররা, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকরা, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিতরা। অন্য পেশার প্রসার যেখানে রুদ্ধ হয়েছে, সেখানেই তাঁত তার ক্ষেত্র বিস্তারিত করে দিচ্ছে। সীমাবদ্ধ চাষের জমির উপর যে প্রবল চাপ, তার ভার অনেকটাই লাঘব করছে তাঁত।

তাঁত এ জেলায় সর্বক্ষণের। সকাল সন্ধ্যা মাকু টানা—বছর ভর, বিরামহীন। অন্য জেলার মতো আংশিক সময়ের জন্য নয়, আংশিক জীবিকাও নয়। এ জেলার অধিকাংশ তাঁতির তাঁতই একমাত্র অবলম্বন।

তাঁতশিল্পের বরাবরের যে সমস্যা এ জেলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার জো নেই। এ শিল্পের কাঁচামালের সমস্যা আদ্দিকালের। মোটা সুতা যা হোক কিছু এ রাজ্যের মিলেই তৈরি হয়। কিন্তু সরু সুতার জন্য এ জেলার তাঁতিদের দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকিয়ে হা-পিত্যেশ করার দিন আর শেষ হল না। কোয়েম্বাটুরের সুতা, সুরাটের জরি, বাঙ্গালোরের সিল্ক, বোম্বের আর্ট সিল্ক,—এ ছাড়া টাঙ্গাইল, ঢাকাই, জামদানি, শান্তিপুরি তাঁতিদের তো গত্যন্তর নেই। মাঝে মাঝে সুতা অমিল হয়, বাড়তি দাম দিয়েও মিলে না। তাঁতশিল্পের যাবতীয় সুতার জোগানদারির কাজটা গুটিকয় টাকাওয়ালা মহাজনের একচেটিয়া। কাজেই তারা মনের সুখে ফাটকা খেলেন। যখন তখন দাম বাড়ে, ফলে খরচ বাড়ে উৎপাদনের। সুতার দাম যেমন খুশি লাফালেও, সেই সুতায় বোনা কাপড়ের দামের কিন্তু তেমন লাফালাফির শক্তি নেই। বাড়তি দাম পেতে তাঁতিকে অনেক কান্নাকাটি করতে হয়। কথায় বলে,—'সুতা দামে সোনা, বুনলে হয় ত্যানা।' অর্থাৎ সোনার দামে কেনা সুতায় কাপড় বুনে বাজারে নিলে তার মূল্য ত্যানার সামিল। তাঁতের পাইকার দাদনদারদের চিরকেলে বোল—'চলছে না চলবে না'। নাক মুখ কুঁচকে তারা বলবে—'মন্দারে ভাই, ভীষণ মন্দা'। নিতান্তই ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা, পাছে তাঁতি বুঝে ফেলে নিজের মূল্য দাম বাড়ানোর আব্দার জোরে মুনাফায় টান পড়বে তাহলে।

তা বলে মন্দা যে আসে না তা নয়। দেশটা তো কম বড় নয়,—প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও দৈব দুর্বিপাক ঘটছেই—বন্যা খরা ভূমিকম্প মহামারী, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা। কোথাও কিছু ঘটলেই তার ধাক্কা তাঁতের বাজারে এসে লাগবেই। থমকে যায় বাজার। অন্য রাজ্যের ব্যাপারীরা আসতে পারেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল হলে মাল যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হয় তাদের, যাদের বাজারের বিস্তৃতি দেশময়।

শান্তিপুর ফুলিয়ার তাঁতি মহাজনদের এ ভোগান্তি প্রায়শই পোহাতে হয়।

বাজারে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব নেই। নবদ্বীপ রানাঘাটের আটপৌরে কাপড়, লুঙ্গির বাজারে হানা দেয় অন্য রাজ্যের অপেক্ষাকৃত সস্তার কাপড়, আসে বিকল্প বস্ত্রও। তার উপর রয়েছে পাওয়ারলুম। বেশির ভাগ সময়ই এদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভবপর হয় না। কাপড় অচল হয়, জমতে থাকে দাদনদারের ঘরে, কমতে থাকে কাপড়ের দাম, কমে যায় তাঁতির মজুরি, রোজগার।

ভারত সরকার জনতা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ায় প্রচুর সংখ্যক তাঁতি আতান্তরে পড়েন। তাদেরকে পুনরায় মোটা কাপড়ে চলে আসতে হয়েছে। এদেরকে ভিন্ন ধরনের বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করতে বলা হয়েছিল। বাঁধা গতের শাড়ি লুঙ্গি ছেড়ে সার্টিং স্যুটিং তোয়ালে পর্দা বিছানার চাদর ইত্যাদি বোনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। আসলে বংশানুক্রমিক বয়ন রীতির বাইরে তাঁতিদের আগ্রহী করে তোলা কষ্টকর। ফলে বাজারে চাহিদা নেই এমন কাপড় বেশি তৈরি হচ্ছে, অথচ যে কাপড়ের চাহিদা আছে সেদিকে তাঁতিদের টেনে আনা যাচ্ছে না। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া নদিয়ার সর্বত্রই এই অবস্থা। অবস্থা এরকমটি থাকলে রপ্তানির কাপড় বোনার প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে বলা মুস্কিল। কেননা, এ ক্ষেত্রে একটা মাত্র বয়ন রীতি আঁকড়ে থাকলে চলবে না। একই তাঁতিকে একেক সময় একেক রীতিতে কাপড় বুনতে হবে, বিভিন্ন কাঁচামালের ব্যবহার তাকে জানতে হবে। অভিজ্ঞ হতে হবে বিভিন্ন বয়ন কৌশলে। শিখতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে, সর্বোপরি ধৈর্য ধরে নির্ধারিত মানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বয়ন সম্পূর্ণ করতে হবে। এতটা বাধ্যবাধকতায় তাঁতিরা প্রায়শই বিরক্ত হন এবং হাল ছেড়ে দেন। খুব যে দুঃসাধ্য কাজ তা নয়, তেমন শ্রমসাধ্যও নয়—কেবল অভ্যাসের পরিবর্তন, ধৈর্য আর নিষ্ঠার প্রয়োজন। উপার্জন তাতে অনেক বেশি। সঠিক মানের রপ্তানি বস্ত্র বেশ উচ্চ মূল্যেই বিকোয়। তাঁতশিল্পীদের রক্ষণশীল মানসিকতার পরিবর্তন না-হলে রপ্তানি বাণিজ্যে নদিয়া তথা বাংলার তাঁতকে পিছিয়েই থাকতে হবে।

কাপড়ের মান বজায় রাখা একটা বড় সমস্যা। অল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় দাদনদার মহাজনরা কোয়ালিটির চেয়ে কোয়ান্টিটির দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। ফলে কাপড়ের মান কমছে। এক সময় নদিয়ার কাপড়ের, বিশেষ করে টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরির গুণগত মানের যে সুনাম ছিল তা আর নেই। এখন তেমন যত্ন করে তাঁতিরা কাপড় বোনে না। বিশেষ করে যাঁরা অন্য পেশা থেকে এসে তাঁত ধরেছেন এবং ভাল করে না-শিখেই তুর্মুল বেগে মাকু টেনে যাচ্ছেন তাঁদের কাপড়ের মান বলে কিছু থাকছে না। যে হারে তাঁত বাড়ছে, উন্নতমানের কাপড় সে হারে বাড়ছে না। এতে শিল্পের সর্বনাশ হচ্ছে। দু-একবার কিনে ঠকছেন এবং তাঁতের কাপড় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সমঝদার গ্রাহকরা।

সমবায় সমবায়

আগেই বলেছি, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নদিয়ায় তাঁতের ক্ষেত্রে সমবায় সফল হতে পারেনি। সরকারি পরিসংখ্যান মতো এই জেলায় রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় সমিতি সংখ্যা ৪৩২টি। কিন্তু কাজ করেছে বা করছে খুব কম সমিতিই। এমনটা কেন হল, তার কারণ নানাবিধ।

এক সময় খুব অল্প সংখ্যক (১৫ জন) সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করা যেত। তার ফলে গড়ে উঠেছিল অনেক পারিবারিক সমিতি। তারা সরকারি সাহায্য পেত এবং সমিতির নামের আড়ালে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাত। তাছাড়া এত ছোট আকারের সমিতি আর্থিক দিক দিয়েও সফল হতে পারে না। এ সব দেখে রাজ্য সরকারের বস্ত্রশিল্প দপ্তর এক সার্কুলার জারি করে দিলেন, তন্তুবায় সমবায় সমিতি গড়তে হলে সাধারণ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০ জন সদস্য লাগবে।

নির্দেশ মেনে সমিতি রেজিস্ট্রি হতে লাগল, উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য জোগাড় করতে তাঁতি অ-তাঁতি সবাইকে সমিতিভুক্ত করা হল। তার মধ্যে দু-চারজন করে নীতিহীন রাজনীতির লোকও যুক্ত হয়ে গেল। স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তী সময়ে রাজনীতির কূটচক্রে পড়তে হল অধিকাংশ সমিতিকেই, বহু টাকার নয়-ছয় হল, আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠল পরিচালকদের বিরুদ্ধে, বন্ধ হল অনেক সমিতি। সরকারি নীতিতে গলদ রইল, সমবায় ব্যাঙ্কও দেখাল তুঘলকি আচরণ।

১০০ জন সদস্য নিয়ে সমিতি শুরু হল বটে কিন্তু শুরুতেই ১০০ জনকে কাজ দেওয়া গেল না। কেননা শুরুতেই এতটা সামর্থ কোথায় ! পরিচালনার দক্ষতা নেই, মূলধন, বাজার সবই অপ্রতুল। প্রাথমিক সরকারি সাহায্য এবং ব্যাঙ্ক ঋণ যা পাওয়া গেল তা দিয়ে ৮/১০ জনের বেশি সদস্যকে কাজ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দেওয়া গেল না, ফলে বাকিরা হলেন অসন্তুষ্ট। তারা মহাজনকে ছাড়তে পারলেন না, উপরন্তু সমিতির সদস্য তালিকায় নাম লেখানোর অপরাধে তারা মহাজনের সকল আনুকূল্য হারালেন। অসন্তোষ দানা বাঁধতে লাগল এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তার বিস্ফোরণ ঘটতে থাকল। বোর্ড গঠন নিয়ে বাঁধল গণ্ডগোল, রেষারেষি, হাতাহাতি এবং অচলাবস্থা। সালিস দরবার, মিটমাট বারে বারে করেও পাঁচ সাত বছর পর্যন্ত সমিতিকে টিকিয়ে রাখা যায়নি কেননা হিসেবমত ওই ১০০ সদস্যকে কাজ দিতে গেলে ৫/৬ বছরই লাগার কথা।

নদিয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের একটা বড় অংশ মার গেল, তারা বেঁকে বসল। ফলে যে সমিতিগুলি কোনওক্রমে চলছিল তারাও পথে বসল। ঋণদাতা ব্যাঙ্কের বিনা নোটিশে সিদ্ধান্ত বদল, টাকা দেওয়া বন্ধ, নতুন মঞ্জুরিতে মাত্রাতিরিক্ত দেরি ইত্যাদি কারণে নদিয়ার তন্তুবায় সমবায় আন্দোলন প্রায় শেষ হয়ে যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক কষ্টে রাজ্য সরকারের তাঁত বিভাগের মধ্যস্থতায় এতদিনে পরিস্থিতি খানিকটা সুস্থ ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে। চালু সমিতির সংখ্যা যদিও খুবই কম, তাদের সঙ্গে নদিয়া সমবায় ব্যাঙ্কের সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক, এটা সুখের কথা।

প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার দায়িত্ব নেবার কথা শীর্ষ সমিতিগুলির। এ ক্ষেত্রে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষা উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রবল উদ্যমে, কাজও
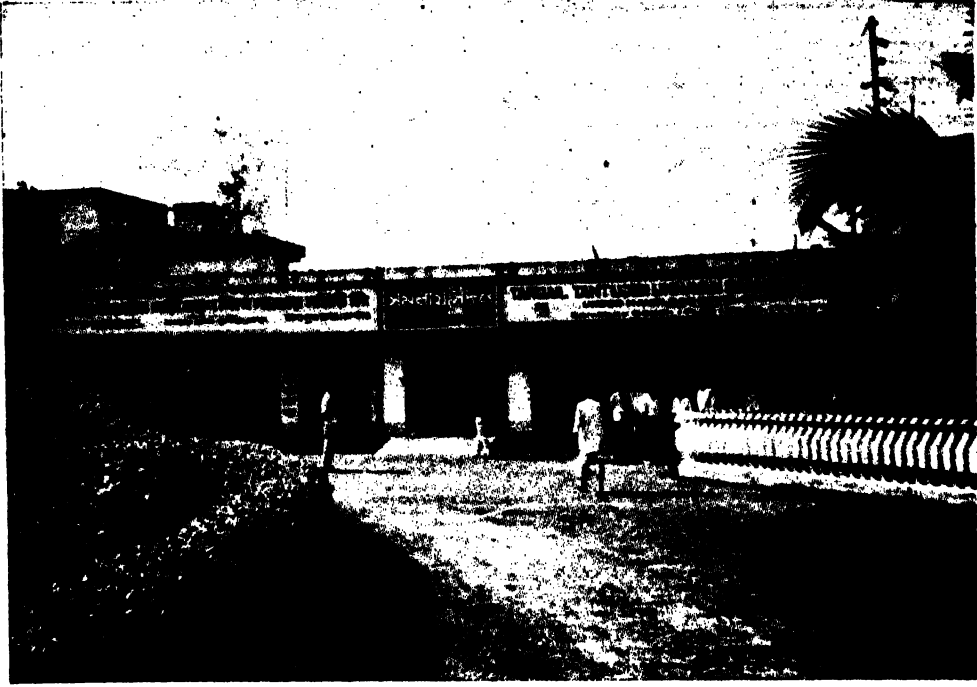
এগিয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন তাঁদের সে উদ্যম বজায় থাকেনি। তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। সময়মত সমিতিগুলিকে সুতা সরবরাহ ও টাকা পরিশোধে অক্ষম হন। প্রাথমিক সমিতির টাকা তাঁদের কাছে ছয় মাস এক বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে আটকে থাকে।

পরিচালনার ব্যর্থতা, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতির জন্য নষ্ট হয়েছে কত সমিতি। অতিরিক্ত সরকারি খবরদারিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরূপ ফলের কারণ হয়েছে। নিয়মমাফিক হিসাব কিতাব ছাড়াও নানাবিধ রিপোর্ট, রিটার্ন ইত্যাদি কাগজ-কলমের কাজ দিনকে-দিন এত বাড়ানো হচ্ছে যে, উৎপাদন ও ব্যবসায়ের কাজ শিকেয় তোলার জোগাড়।

তবুও নদিয়ার তাঁত-সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। সামগ্রিকভাবে না হলেও বিচ্ছিন্ন কিছু ভাল কাজের দৃষ্টান্ত রয়েছে এই জেলায়। ফুলিয়া এই আন্দোলনের সফলতার উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রত্যক্ষভাবে খুব কম সংখ্যক মানুষ এর উপকার পেলেও পরোক্ষে এলাকার সকল তন্তুজীবীই এর সুফল ভোগ করছে। শান্তিপুরেও কিছু ভাল কাজের নজির আছে। চেষ্টা হচ্ছে পুনরায় এই আন্দোলনকে জোরদার করার। কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নতুন নতুন প্রকল্প যাতে সমিতিগুলি রূপায়ণ করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার তৎপর হয়েছেন। জেলার তাঁত বিভাগের উপ-অধিকর্তা ও তাঁত-উন্নয়ন আধিকারিকরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সমিতিগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে নদিয়া তাঁত-সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে।

প্রকল্প

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রবর্তিত নতুন নতুন প্রকল্পের রূপায়ণ এ জেলাতেও চলছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম—'হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'। এই প্রকল্পের আর্থিক আয়তন ২৭ লক্ষ টাকা, যার ১০ লক্ষ অনুদান, বাকিটা ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়। এ জেলার ২০টি সমবায় সমিতিকে এই প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে এবং সাফল্যজনকভাবে কাজও এগিয়ে চলেছে। আরও ২০টি সমিতিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে।

উন্নত পদ্ধতিতে সুতা রংয়ের কারখানা স্থাপনের জন্য 'কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট' এই জেলার ৩টি সমিতিকে মঞ্জুর করা হয়েছে। আরও সমিতি যাতে এই প্রকল্প গ্রহণ করে তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রতিটির আর্থিক আয়তন ৭.৮৩ লক্ষ টাকা যার ৪.২৭ লক্ষ টাকা অনুদান।

সমিতিগুলিকে নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দেওয়া হচ্ছে ১ লক্ষ ঋণ ও ১ লক্ষ টাকার অনুদান। মোট ২ লক্ষ টাকার এই প্রকল্প জেলার ১১টা সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

'প্রোজেক্ট প্যাকেজ স্কিম' এ সাধারণত ভিন্ন ধরনের উৎপাদনের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। রপ্তানি বস্ত্র বয়ন, পোশাক তৈরি ইত্যাদির জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য এই প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া যায়। এর নির্দিষ্ট কোনও আর্থিক আয়তন নেই। যেখানে যেমন প্রয়োজন সেইমত রূপরেখা তৈরি করা যেতে পারে। যদি সে রূপরেখা অর্থকরী ও লাভজনক বলে মনে হয় তবে কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প মঞ্জুর করেন। প্রকল্পের নিয়মানুসারে উৎপাদন ও ব্যবসা সংক্রান্ত মূলধনের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর হবে তার অর্ধেক ঋণ ও বাকি অর্ধেক অনুদান। স্থায়ী সম্পদের জন্য যে অর্থ ;—তার সম্পূর্ণটাই অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। এই প্রোজেক্ট প্যাকেজ স্কিমে এই জেলার ৯টি সমিতিকে আনা

হয়েছে। পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরুও হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে এই সমিতিগুলিকে প্রাথমিক অর্থ সাহায্য বাবদ ১৯.৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই প্রকল্পাধীনে আরও সমিতিকে আনার প্রচেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া আই আর ডি পি প্রকল্পে এই জেলার ৭১৯ জন তাঁতিকে ঋণ ও অনুদান দেওয়া হয়েছে সর্বমোট ৫৯.১২ লক্ষ টাকার। TRYSEM প্রকল্পাধীনে ২০০ জনকে তাঁতশিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাব

বিজ্ঞানের এই চরম অগ্রগতির দিনেও হস্তচালিত তাঁতে আধুনিক প্রযুক্তি গৃহীত হল না। এখনও সেই আদ্দিকালের নড়বড়ে তাঁতে বসে তাঁতি খটাখট্ তাঁত বোনে শ্লথ গতিতে। যন্ত্র-তাঁত, মিল-বস্ত্রের সঙ্গে তার প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা। তবুও আজও তার গুটি-গুটি কচ্ছপ দৌড়ই চলছে। স্বভাবতই এই দুরন্ত গতির যুগে তার চলার পথ ক্রমাগত দীর্ঘতর হচ্ছে—পিছিয়ে পড়াই তার নিয়তি, এখনও সে সম্পূর্ণ ভাগ্যের দাস।

তা বলে তাঁত শিল্প নিয়ে মোটেই ভাবনা-চিন্তা হয়নি সে কথা বলা যাবে না। হয়েছে, অনেক উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা শেখানও হচ্ছে ঘটা করে। তাঁত-শিল্পের উচ্চশিক্ষালয়গুলিতে প্রতিবছর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, তারা খেটেখুটে শেখে অনেক কিছু, তারপর ডিগ্রি ডিপ্লোমা পেয়ে যে-যার চাকরি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে থিতু হয়। তাঁরা এমনই সব কর্মক্ষেত্র বেছে নেয় যেখানে তাদের অর্জিত শিক্ষার প্রয়োগের সুযোগ বা গরজ থাকে না।

তন্তুবায়দের সেবা করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে নানা বিভাগ রয়েছে। সেখানে যথোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা আছেন। তাঁদের কারও কারও সময় কাটে অফিসে বসে কলম পিষে, কারও বা সময় কাটে গবেষণাগারে। এই সেবাকেন্দ্র তথা গবেষণাগারগুলি সাধারণত শহরাঞ্চলে, গ্রামের তাঁতিদের নাগালের বাইরে অবস্থিত। সেখানে বয়নরীতি, পন্থাপদ্ধতি, উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। কিন্তু তার সুফল গবেষণাগারের চার দেওয়ালের বাইরে বড় আসে না। আসলে মাটির ঘরের তাঁত থেকে গবেষণাগারের আসমানের ফারাক এত যে, নাগাল পাওয়াই কঠিন।

এখন দরকার এই আসমান জমিনের মধ্যবর্তী এমন একটা শিক্ষাক্রম বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, যা হবে তাঁত-মুখী, চাকরি-মুখী নয়। তাঁত-শিল্প-খ্যাত শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের বৃত্তি শিক্ষার যে সূচনা হয়েছে তাতে তাঁতের জন্য এরূপ একটা শিক্ষাক্রম চালু করা যেতে পারে যেখানে তাঁতে অতি সহজে প্রয়োগ সম্ভব এমন সব উন্নত কলাকৌশল হাতে কলমে শেখানো হবে। গবেষণা হবে সেখানে বাস্তবমুখী, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে হবে তাঁতের সংস্কার, সরলীকরণ, ডিজাইন-প্যাটার্নের রূপান্তর এবং তা হবে তাঁতির সাধ্য দেখে, তার রোজগারের কথা ভেবে, ব্যবসায়িক দিকটা মাথায় রেখে।

এই শান্তিপুরে কাঁচা রং একটা বড় সমস্যা। এ জন্য শান্তিপুরি শাড়ির সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অথচ পাকা রং যে করা যায় না তাতো নয়। কিন্তু তাতে খরচ বাড়ে, বাজারে, প্রতিযোগিতায় টেঁকা দায় হয়ে পড়ে। দুর্মূল্যের পাকা রংয়ের মশলার ব্যবহার না করেও কাঁচা রংকে চিরস্থায়ী না-হোক দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, সে পদ্ধতি জানতে হবে। এখন তা জানতে হলে শান্তিপুরের রংকরকে মাদ্রাজ বাঙ্গালোরে ছুটতে হবে। শান্তিপুর কলেজে শিক্ষাক্রম চালু করে অতি সহজেই তা শেখানো সম্ভবপর।

নানা রংয়ের মিশেল দিয়ে নিত্যনতুন রংয়ের উদ্ভাবন হয়েছে গবেষণাগারে এবং তার ফর্মুলা মুদ্রিত হয়ে বাজারেও এসেছে। কিন্তু সে ফর্মুলার পাঠোদ্ধার এবং ব্যাখ্যা কে করে দেবে ? স্থানীয় স্কুল কলেজের বৃত্তি শিক্ষার ক্লাশে হতে পারে তার যথাযথ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা। হতে পারে, হাতে কলমে শেখানোর বন্দোবস্ত।

বাজারে তাঁতের কাপড়ের কদর বজায় রাখতে নিত্যনতুন ডিজাইন প্যাটার্ন তৈরি করতে হয়। এ কাজ কোনও প্রখ্যাত শিল্পী বা টেক্সটাইল ডিজাইনাররা করে দেন না। তাঁতিপাড়ারই অল্প কিংবা অর্ধশিক্ষিত ডিজাইনারেরা এ যাবৎকাল এই কাজগুলি করে আসছেন। তাঁদের এই কাজ বড়ই শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। আধুনিক প্রযুক্তি এদের সহায় হতে পারে।

রং তুলিতে আঁকা কাগজের ডিজাইনের সঙ্গে—কাপড়ের বুকে নানা রংয়ের ম্যাচিংয়ের বিবাদ বরাবরের। এই বিবাদ ভঞ্জন শুনেছি কম্পিউটারের বোতাম টিপেই সম্ভব। শান্তিপুর কলেজে বৃত্তিশিক্ষার জন্য কম্পিউটার এসেছে। সেখানে এ বিষয়ে কার্যকরী শিক্ষাক্রম চালু করা যেতে পারে এবং শান্তিপুরি ও টাঙ্গাইল শাড়ির ডিজাইনে যুগান্তর আনা যেতে পারে।

জ্যাকার্ড নক্‌শার জন্য কার্ড পাঞ্চিং জরুরি। টুকরো টুকরো পিচবোর্ডের গায়ে হাতুড়ি পিটিয়ে ছ্যাদা করতে করতে বুকে ব্যথা হয়, পিঠে টান ধরে, কোমর ধরে যায়। কিন্তু উপায় নেই, ওইভাবেই কার্ড কাটতে হবে। এই কার্ড কাটার উন্নত মেশিন আছে, তার নাম পিয়ানো পাঞ্চিং মেশিন। বোতাম টেপার মতোই সহজ কাজ। কিন্তু সে মেশিন শান্তিপুর ফুলিয়ার তাঁতিরা অদ্যাবধি চোখে দেখেনি। বৃত্তিশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে একে রাখলে এ অঞ্চলে তা যে যথেষ্ট কার্যকরী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

বর্তমানে তাঁতশিল্পে বংশানুক্রমিক উৎপাদনের সঙ্গে ভিন্নতর বস্ত্রের উৎপাদন জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁতির আয় বাড়াতে এবং বাজারে তাঁতের কাপড়ের কাটতি বাড়াতে এবং বিদেশে রপ্তানিযোগ্য কাপড় বুনতে হলে মিশ্র সুতোর ব্যবহার দরকার। এ ক্ষেত্রে সমস্যা, যে-তাঁতি যে-সুতোয় অভ্যস্ত, তা ছেড়ে অন্য সুতোয় তার আতঙ্ক। কেননা সে জানে না সেই সুতার প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি—হালিভাঙ্গা, ভিজানো, ধোয়া, মাড়িকরা, লাটাই করা, নলি পাকানো। প্রস্তুতিকরণ সঠিক না-হলে কাপড়ের মান থাকবে না, জাত থাকবে না, এমন কি মাকু টানাও কঠিন হয়ে পড়বে। শান্তিপুরের তাঁতি মিলের সুতা চেনে, তার নম্বর জানে, দৈর্ঘ্য জানে, জানে কী করে তাকে জাতে আনতে হয়, বোনার উপযোগী করে নিতে হয়। কিন্তু হাতে তৈরি খাদি সুতার চরিত্র তার পক্ষে বোঝা মুশকিল। সে সুতা বশে আনতে হলে তাকে ভিন্ন পদ্ধতিতে এগোতে হবে, যা সে জানে না। এ পদ্ধতি জানে মালদা মুর্শিদাবাদের তাঁতিরা, তারা এ কাজে দক্ষ। তেমনই সিল্কে দক্ষ

বিষ্ণুপুরি তাঁতিরা। তারা কী করে ঘরে ঘরে এই স্পর্শকাতর, সিল্কসুতোকে অবলীলায় নাড়াচাড়া করছে, রং করছে, অন্যস্থানের তাঁতিরা তা ভেবে পায় না। তাঁতে ব্যবহারোপযোগী আরও যে কতরকমের সুতো আছে, ভিন্ন ভিন্ন তাদের চরিত্র। যেমন, মুগা, তসর, মটকা, ঘিচা, নয়েল, ফেসুয়া, ঝুট ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি আলাদা। যারা করে কেবল তারাই জানে। সব ধরনের সুতোর প্রস্তুতি-পদ্ধতি সবাইকে জানানোর এবং শেখানোর একটা সুন্দর ব্যবস্থা শান্তিপুর কলেজের বৃত্তিশিক্ষার ক্লাশে করা যেতে পারে। তাতে এ অঞ্চলের তাঁত শিল্পের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে।

বয়ন-পদ্ধতিরই যে কত রকমফের আছে। একই তাঁতে একই যন্ত্রপাতি দিয়ে শুধু বাঁধাছাদার ভিন্নতা, জালা বয়ের কৌশলে বয়ন-রীতিতে নানা ধরন আনা সম্ভব। শিক্ষার্থীকে সে সব শিখিয়ে দিলে তাদের মাথা খুলে যাবে। তখন নিজেরাই নতুন নতুন রংয়ের বুনন উদ্ভাবন করতে পারবে।

আশা করা যায়, তাঁত শিল্পাঞ্চলের এই বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ যাঁরা নেবেন পরবর্তী সময়ে তাঁরা তাঁতকে কিংবা তার সহায়ক কাজকে পেশা হিসাবে নেবেন। শিক্ষা এমনই হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁতকে মর্যাদাকর পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁতেই অর্থ ও প্রতিষ্ঠা পাবেন। তাঁতের সহায়ক নানা কাজ করে তাঁত-শিল্পাঞ্চলের মানুষ রুজিরোজগার করে থাকেন। তাঁতি ও তাঁত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সহায়ক কাজে আরও অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এতদ্‌সংক্রান্ত আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষিত মানুষ যখন এ পেশায় এগিয়ে আসবেন তখন এ কাজের মান বাড়বে, মর্যাদা বাড়বে। বৃত্তিও অর্থকরী ও সম্মানজনক হবে।

তাঁত বোনা তো শুধুই খটাখট মাকু টানা নয়। বয়ন অনুষঙ্গের ব্যাপ্তি বিশাল। তাঁত-খ্যাত শান্তিপুরে তাঁত বিষয়ক আধুনিক পঠন-পাঠনের সুবন্দোবস্ত হলে সেই বিশাল ব্যাপ্তি থেকে জ্ঞান আহরণ করে এতদ্‌ঞ্চলের বয়নশিল্পকে যে আরও সমৃদ্ধতর করা যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

পরিসংখ্যান

সরকারিভাবে নদিয়া জেলাকে ২টি তাঁতশিল্পাঞ্চলে (Handloom Zone) ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল দুটি হল—নবদ্বীপ ও শান্তিপুর। এই দুই অঞ্চলের দায়িত্বে আছেন দুজন তাঁত উন্নয়ন আধিকারিক (Handloom Development Officer)। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর শহরে এঁদের অফিস। আবার এই দুই অফিসের সমন্বয়কারী তথা নিয়ন্ত্রক হিসাবে রয়েছেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের উপ-অধিকর্তা (Deputy Director, Handloom and Textiles)। তাঁর মূল কার্যালয় কৃষ্ণনগরে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যাবতীয় অর্থসাহায্য এই অফিসগুলির মারফত নদিয়ার তাঁতশিল্পাঞ্চলে আসে। এঁরাই জেলার হস্তচালিত শিল্পের সরকারি নিয়ন্তা ও তত্ত্বাবধায়ক।

নদিয়ার ২টি হ্যান্ডলুম জোনে রয়েছে ২টি পৌরসভা, ১৮টি ব্লক ও ১টি প্রজ্ঞাপিত এলাকা। এলাকাওয়ারী তাঁত সংখ্যার যে হিসাব রয়েছে তা পুরোনো (১৯৮৭-৮৮ সালের)। নতুন হিসাবটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

নদিয়া জেলার তাঁত পরিসংখ্যান ১৯৯৫-৯৬

১।	তাঁত সংখ্যা—১৯৮৭-৮৮ অনুযায়ী	—	৭০,৩৩৬ টি
	১৯৯৫-৯৬ "	—	১,২৭,২৬০* টি
২।	উৎপাদন (আনুমানিক)	—	৪৫০* কোটি টাকা
৩।	সমবায় সমিতির সংখ্যা	—	৪৩২ টি
৪।	সমবায় সমিতির তাঁত সংখ্যা	—	৪৩,০৩৫ টি
৫।	চালু সমবায় সমিতির সংখ্যা	—	১৭৫ টি
৬।	চালু সমবায় সমিতির তাঁত সংখ্যা	—	২৩,৬৪৯ টি
৭।	সমবায় ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন	—	১৬.৩৪ কোটি টাকা
৮।	সমবায় ক্ষেত্রে বার্ষিক বিক্রয়	—	১৬.৬৫ কোটি টাকা

* ১৯৯৫-৯৬ সালে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তাঁত-গণনা হয়েছে। সেই গণনার চূড়ান্ত ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। চূড়ান্ত ফলের আগে একটা খসড়া হিসাব বের করা হয়েছে যা অনেকটাই অনুমান নির্ভর। সেটাই এখানে উল্লেখিত হল।

নদিয়া জেলার তাঁতশিল্প ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ সাহায্যের চিত্র

(১৯৯৫-৯৬ হিসাব বর্ষের/লক্ষ টাকায়)

খাতের বিবরণ	রাজ্য	কেন্দ্র	সমিতির সংখ্যা
১। H.D.C. সমিতির জন্য—			
(ক) মূলধনী অনুদান	—	৪৩.৪৭	১৬
(খ) বিপণন অনুদান (MDA)	—	২৬.৩৫	২০
(গ) সুতা ক্রয়ের অনুদান	—	২.৬৩	৩
(ঘ) বিপণন কেন্দ্র স্থাপন	—	১৪.৫০	১১
২। উন্নত রংয়ের কারখানা স্থাপন	—	১৩.১৩	৩
৩। প্রোজেক্ট প্যাকেজ প্রকল্প	—	১৯.৮০	৪
৪। সাধারণ সমিতির জন্য—			
(ক) মূলধনী অনুদান	—	১.০০	২
(খ) বিপণন অনুদান (MDA)	১০৫.৬০	১২৬.৯৬	২০৩
৫। সুদ ভর্তুকী	১৩.৯৮	—	—
৬। মূলধনী ঋণ (জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক)	৫৬৫.৮৮	—	৮০
৭। আই আর ডি পি—ঋণ	২২.৪৩	—	৭১৯ জন তাঁতি
অনুদান	৩৬.৬৯	—	৭১৯ জন তাঁতি
৮। ভবিষ্যনিধি তহবিল (P.F.)	১.২৭	৩.৪৩	২১৫৩ জন তাঁতি
৯। বার্ধক্য ভাতা	২.২৪	—	২৮১ জন

ঈশ্বর গুপ্ত সেতু // কল্যাণী
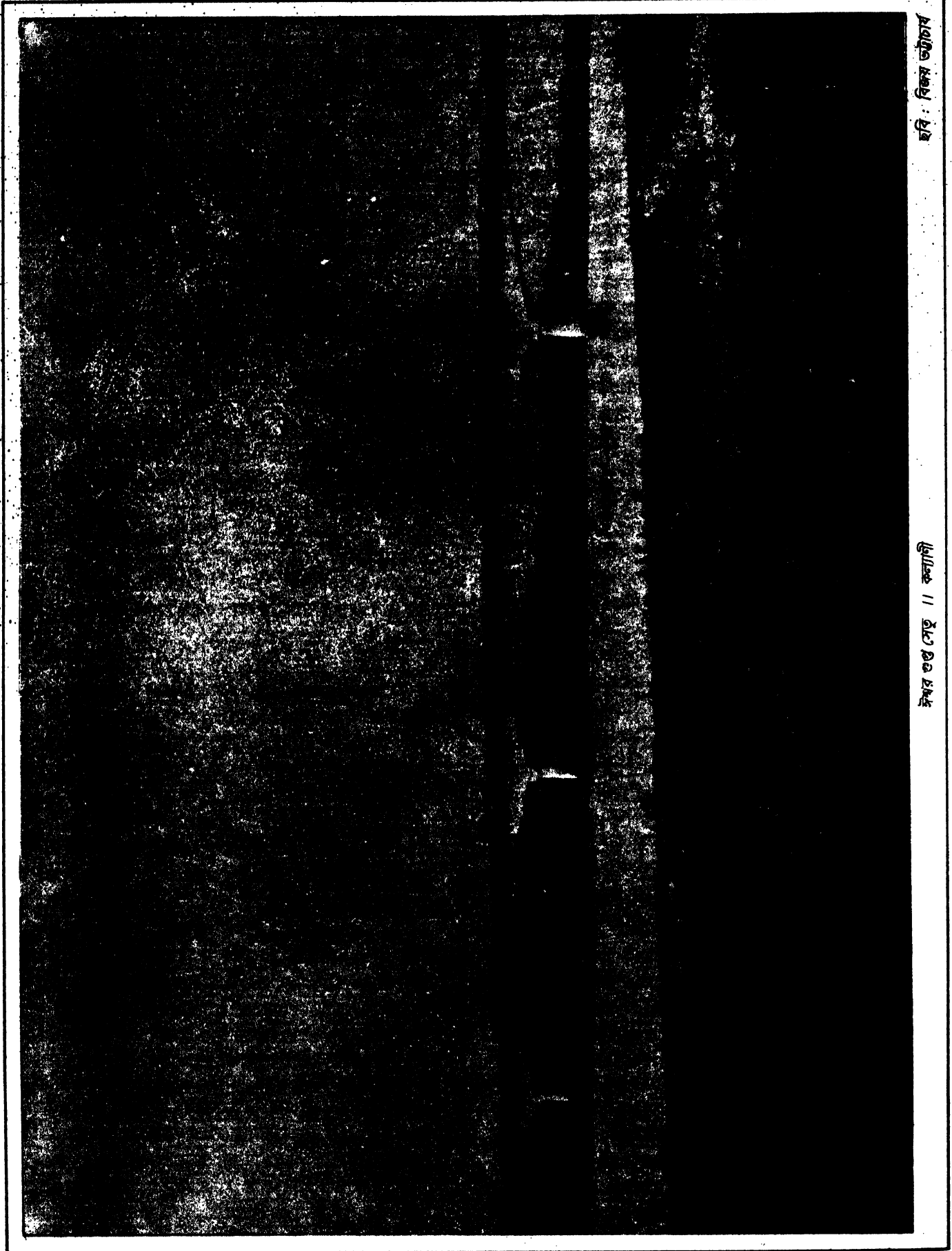
ছবি : বিজয় ভট্টাচার্য

গ্রন্থে গ্রন্থিত নদিয়া

বিশ্বনাথ সাহা

অবিভক্ত বাংলার মানচিত্রে যেমন, তেমনি আজও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নদিয়া এক অনাহত বর্ণময় ভূখণ্ড। সাবেক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ষোড়শ শতকের স্বর্ণিল সংগ্রাম নদিয়াকে প্লাবিত করেছিল। তারপর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অষ্টাদশ শতকে নদিয়া হয়ে ওঠে বঙ্গ-সংস্কৃতির শিরোনাম। বস্তুত এই সময় থেকেই রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নদিয়া সন্ধিৎসার শুরু। ফোর্ট উইলিয়াম গদ্যমালায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র আলোকিত হতেই আমরা বুঝতে পারি, নদিয়া সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের আগ্রহ কী মাত্রা পেয়েছিল।

সেই তো শুরু। তারপর উনিশ শতকে লক্ষ করা গেল নদিয়া সম্পর্কে রীতিমত গবেষণায় বৃত হয়েছেন রাজপুরুষের প্রসাদধন্য কৌতূহলী শিষ্টজনেরা। ওঁদের দেখাদেখি স্বদেশি পণ্ডিতেরা দুই মলাটের মধ্যে নদিয়াকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষ যখন 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' লেখেন, তখন বুঝতে পারি শুধু অনুরোধ বা উপরোধে তিনি একটা সময়কে ফ্রেমবন্দির চেষ্টা করেননি, সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন, নদিয়ার সংস্কৃতিকে সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপ্রাণনায় নদিয়া সম্পর্কে

বিদ্বজ্জনের আগ্রহ নব মাত্রা পায়। শিক্ষিতশ্রেষ্ঠরা স্বীকার করেন নদিয়ার একটা নিজস্ব 'কৃষ্টি' আছে। উত্তরকালে পদ্মাপারের বাঙাল প্রমথ চৌধুরিমশাই এ কথা কবুল করেছেন। আর বীরবল যাঁর বংশধর সেই ভারতচন্দ্র অন্য জেলার মানুষ হলেও নদিয়ার কাছে আনত। কলকাতায় বসে সাহিত্যচর্চা করলেও নদিয়ার সংস্কৃতির কেতনটি বরাবর হৃদয়ের মধ্যে লালন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কৃষ্ণনগরের রায় বংশের পুরনো ইতিহাস, শান্তিপুরের গোস্বামী পরিবারের পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলেই দেখা যাবে এক মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজও ফল্গুর মতো বয়ে চলেছে। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে পুরনো নবদ্বীপ, উলা, ঘোষপাড়া, অগ্রদ্বীপ, বিল্বগ্রাম। মদনমোহনের 'পাখি সব করে রব' এই উচ্চারণের মধ্যেই বঙ্গসংস্কৃতির প্রথম গায়ত্রীমন্ত্র রচিত।

সুতরাং নদিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে আজও পড়ে আছে এক অন্তবিহীন পথ। আমাদের পূর্বসূরিরা সেই পথটার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন বলেই গ্রন্থে গ্রন্থে নদিয়াকে গ্রন্থনা করার চেষ্টা করেছেন। সমসাময়িকেরা আজও সেই পথের অম্লান ও অক্লান্ত পথিক।

☐ গ্রন্থপঞ্জি : বাংলা

১ **অক্ষয়কুমার দত্ত**
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। প্রথম ভাগ।
সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ।
করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৩৯৪।

২. **অলোককুমার চক্রবর্তী**
প্রসঙ্গ : কৃষ্ণচন্দ্র।
কলকাতা। ১৯৮৫।

৩. **অলোককুমার চক্রবর্তী**
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা। ১৯৮৯।

৪. **অজিত দাস**
মাধবেন্দু মোহান্ত।
সুপ্রকাশ, কৃষ্ণনগর।

৫. **অজিত দাস**
জাতবৈষ্ণব কথা।
চারুবাক, কলকাতা। ১৯৯৩।

৬. **অজিত দাস**
কাজী নজরুল ইসলাম এক অজ্ঞাত পর্ব।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৯৫।

৭. **অজয় নন্দী**
চক্রতীর্থ চাকদহের ইতিকথা।
চাকদহ। ১৯৯৪।

৮. **অরুণ ভট্টাচার্য** সম্পাদিত
নদিয়ার থিয়েটার।
হিনাস, চাকদহ। ১৯৮৯।

৯. **অশোক মিত্র** সম্পাদিত
পশ্চিমবঙ্গে পূজা-পার্বণ ও মেলা। ২য় খণ্ড।
দিল্লি। ১৯৬৮।

১০. **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম।
কলকাতা। ১৩৮৭।

১১. **অসীম চট্টোপাধ্যায়**
গ্রামবাংলার ইতিকথা।
(ডবলিউ. ডবলিউ.হান্টার প্রণীত)
সুবর্ণরেখা, কলকাতা। ১৯৮৪।

১২. **আবদুল্লাহ রসুল**
কৃষকসভার ইতিহাস।
নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৮০।

১৩. **আবুল আহসান চৌধুরী**
লালন শাহ।
বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ। ১৯৯০।

১৪. **আবুল আহসান চৌধুরী**
কুষ্টিয়ার বাউলসাধক।
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ১৩৮০।

১৫. **আবুল আহসান চৌধুরী** সম্পাদিত
কুষ্টিয়া ইতিহাস ঐতিহ্য।
কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ১৯৭৮।

১৬. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**
কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত।
কলকাতা। ১৮৫৫।

১৭. **উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**
বাংলার বাউল ও বাউল গান
কলকাতা। ১৩৬৪।

১৮. **কুমুদনাথ মল্লিক**
নদিয়া কাহিনী।
সম্পাদনা : মোহিত রায়
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৬।

১৯. **কুমুদনাথ মল্লিক**
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।
রানাঘাট। ১৯৩০।

২০. **কুমুদনাথ মল্লিক**
সতীদাহ।
সম্পাদনা : মোহিত রায়
জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা। ১৯৯১।

২১. **কার্তিকেয়চন্দ্র রায়**
ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত।
সম্পাদনা : মোহিত রায়
মঞ্জুষা, কলকাতা। ১৯৮৬।

২২. **কার্তিকেয়চন্দ্র রায়**
দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত।
সম্পাদনা : মোহিত রায়
প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৯০।

২৩. **কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**
শান্তিপুর পরিচয়। ১ম খণ্ড।
সম্পাদনা : শান্তিপুর লোকসংস্কৃতি পরিষদ
শান্তিপুর পৌরসভা, নদিয়া। ১৩৯৩।

২৪. **কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**
শান্তিপুর পরিচয়। ২ খণ্ড।
কলকাতা। ১৩৪৯।

২৫. **কল্যাণী নাগ**
শান্তিপুর প্রসঙ্গ। ১ম খণ্ড।
ডি মুখার্জি, শান্তিপুর। ১৯৯৪।

২৬. **কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী**
নবদ্বীপ মহিমা।
নবদ্বীপ। ১৩৪৪।

২৭. **কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী**
নবদ্বীপ-তত্ত্ব।
নবদ্বীপ।

২৮. **কাঞ্চন মৈত্র**, জয়দেব মোদক
ইতিহাস ও লোককথার আলোকে নিত্যানন্দতলা।
কৃষ্ণনগর। ১৯৯৭।

২৯. **কালীপ্রসাদ বসু**
ক্ষুব্ধ নদিয়ার রুদ্র কৃষ্ণনগর।
কৃষ্ণনগর। ১৯৬৬।

৩০. **গিরিশচন্দ্র বসু**
সেকালের দারোগার কাহিনী
সম্পাদনা : অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়
কলকাতা। ১৯৮৩।

৩১. **গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ**
নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস। ১ম খণ্ড।
নবদ্বীপ। ১৩৭১।

৩২. **গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু**
বাংলার লৌকিক দেবতা।
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৯৬৬।

৩৩. **জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য**
নগর উখড়া গ্রামের কথা।
নগর উখড়া, নদীয়া। ১৩৮২।

৩৪. **দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়**
বাঙালির রাগ-সংগীতচর্চা।
কলকাতা। ১৯৭৬।

৩৫. **দীনেশচন্দ্র সেন**
বৃহৎ বঙ্গ। ১ম খণ্ড
কলকাতা। ১৩৪১।

৩৬. **দীনেশচন্দ্র সেন**
বৃহৎ বঙ্গ। ২য় খণ্ড
কলকাতা। ১৩৪২।

৩৭. **দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য**
বাঙালির স্বারস্বত অবদান। ১ম ভাগ
কলকাতা। ১৩৫৮।

৩৮. **দীনেশচন্দ্র সরকার**
পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত।
কলকাতা। ১৯৮২।

৩৯. **দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**
রাজসভার কবি ও কাব্য।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৬।

৪০. **দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ**
সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৭৩।

৪১. **দীনেন্দ্রকুমার রায়**
পল্লীকথা।
আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা। ১৯৯২।

৪২. **দীনেন্দ্রকুমার রায়**
পল্লীচিত্র।
আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা। ১৯৯০।

৪৩. **দীনেন্দ্রকুমার রায়**
পল্লীবৈচিত্র্য।
আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা। ১৯৯০।

৪৪. **দীনেন্দ্রকুমার রায়**
সেকালের স্মৃতি।
আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা। ১৯৯১।

৪৫. **দুর্গাচন্দ্র সান্যাল**
বাংলার সামাজিক ইতিহাস।
কলকাতা। ১৩১৫।

৪৬. **নদিয়া/স্বাধীনতা রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ।**
নদিয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, কৃষ্ণনগর। ১৯৭৩।

৪৭. **নরেশচন্দ্র চাকী**
নদিয়া পরিচিতি।
রানাঘাট।

৪৮. **নীহাররঞ্জন রায়**
বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব। ১ম খণ্ড
সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৮০।

৪৯. **নীহাররঞ্জন রায়**
বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব। ২য় খণ্ড
সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৮০।

জর্জ কোর্ট // কৃষ্ণনগর

ছবি : সত্যেন মণ্ডল

৫০. **নগেন্দ্রনাথ দাস**
নবদ্বীপ কাহিনী বা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়।
কলকাতা। ১৩১৩।

৫১. **নবীনচন্দ্র সেন**
নবীন রচনাবলী। ৩য় খণ্ড
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।

৫২. **নবীনচন্দ্র সেন**
পলাশীর যুদ্ধ।
কলকাতা। ১৯৬৪।

৫৩. **নিতাই ঘোষ**
কল্যাণী সেকাল ও একাল।
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী। ১৯৯০।

৫৪. **প্রমথ চৌধুরী**
প্রবন্ধ সংগ্রহ।
বিশ্বভারতী, কলকাতা। ১৯৬৮।

৫৫. **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়**
ফিরে ফিরে চাই।
মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। ১৩৯৪।

৫৬. **প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত**
নীলবিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ।
কলকাতা। ১৯৭৮।

৫৭. **পবিত্র চক্রবর্তী**
চাকদহ : ইতিহাস ও সংস্কৃতি।
চাকদহ। ১৯৯৪।

৫৮. **বিনয় ঘোষ**
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ৩য় খণ্ড।
প্রকাশ ভবন, কলকাতা। ১৯৮০।

৫৯. **বিনয় ঘোষ**
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ৪র্থ খণ্ড।
প্রকাশ ভবন, কলকাতা। ১৯৮৬।

৬০. **বরুণকুমার চক্রবর্তী**
লোক-উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৪।

৬১. **বরুণকুমার চক্রবর্তী** সম্পাদিত
বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ।
অপর্ণা। বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা। ১৯৯৫।

৬২. **ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য**
বাংলার তীর্থ।
কলকাতা।

৬৩. **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**
সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ১ম খণ্ড
কলকাতা। ১৩৫৬।

৬৪. **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**
সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড
কলকাতা। ১৩৫৬।

৬৫. **বিনয় ঘোষ**
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। ২য় খণ্ড
কলকাতা। ১৯৬৩।

৬৬. **বিনয় ঘোষ**
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। ৩য় খণ্ড
কলকাতা।

৬৭. **বিহারীলাল সরকার**
তিতুমীর। ২য় সং
সম্পাদনা : স্বপন বসু
কলকাতা। ১৯৮১।

৬৮. **বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা** সম্পাদিত
গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর।
গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি,
কলকাতা। ১৯৯৩।

৬৯. **ভবেশ দত্ত**
মেলায় মেলায় আমার দেশ।
ভোলানাথ প্রকাশনী, কলকাতা। ১৯৮৪।

৭০. **ভূপতিরঞ্জন দাস**
পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন।
কলকাতা। ১৩৮৫।

৭১. **ভোলানাথ দত্ত** সম্পাদিত
কৃষ্ণনগর পৌরসভা শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ :
১৮৬৪—১৯৬৪।
কৃষ্ণনগর পৌরসভা, নদিয়া। ১৯৬৫।

৭২. **ভারতকোষ**
১ম—৫ম খণ্ড
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।
১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭৩।

৭৩. **মোহিত রায়**
নদিয়া জেলার পুরাকীর্তি।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা। ১৯৭৫।

৭৪. **মোহিত রায়**
নদিয়া স্থাননাম।
অমর ভারতী, কলকাতা। ১৯৮৫।

৭৫. **মোহিত রায়**
রূপে রূপে দুর্গা।
অমর ভারতী, কলকাতা। ১৯৮৫।

৭৬. **মোহিত রায়**
নদিয়া উনিশ শতক।
অমর ভারতী, কলকাতা। ১৩৯৫।

৭৭. মোহিত রায়
নদিয়ার সমাজচিত্র।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৯০।

৭৮. মোহিত রায়
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে নদিয়া লোকসংস্কৃতি।
গণমন প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৯৩।

৭৯. মোহিত রায়
নদিয়ার সেকালের বিদ্যাসমাজের কথা ও কাহিনী।
জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৯৯৪।

৮০. মোহিত রায়
নদিয়ার পুতুলনাচ।
করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৯৯৫।

৮১. মোহিত রায়
এক ভাঁড় গোপাল।
অমর ভারতী, কলকাতা। ১৯৯৫।

৮২. মোহিত রায়
মদনমোহন তর্কালঙ্কার জীবন ও সাহিত্য।
নবকল্প, কলকাতা। ১৯৯৬।

৮৩. মোহিত রায়
আজীবন জ্ঞানতাপস শ্যামাচরণ সরকার।
প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৯৬।

৮৪. মোহিত রায়
শিবনিবাস।
মাজদিয়া। ১৯৮৪।

৮৫. মোহিত রায়
বারোদোলের মেলা।
কৃষ্ণনগর। ১৯৭৯।

৮৬. মুজফ্ফর আহ্মদ
কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা।
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা। ১৯৬৫।

৮৭. মদনমোহন গোস্বামী
রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র।
কলকাতা। ১৯৫৫।

৮৮. মনোজ ঘোষ সম্পাদিত
রানাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ।
রানাঘাট। ১৯৮৪

৮৯. মালা মৈত্র
বিষ্ণুপ্রিয়া : জীবন ও সাধনা
জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৯৯৪।

৯০. মালা মৈত্র
গৌরাঙ্গপ্রিয়া লক্ষ্মী।
জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৯৯৪।

৯১. মালা মৈত্র
স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তিমন্দির।
শক্তিনগর। ১৯৯৬।

৯২. মোহনকালী বিশ্বাস
দিল্লি লাহোর অশান্ত অমর শহিদ বসন্ত।
কলকাতা। ১৩৮৪।

৯৩. মোহনকালী বিশ্বাস
নাবালকের ফাঁসি।
কে সি সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৯৯০।

৯৪. যতীন্দ্রমোহন (বাগচী) রচনাবলী। ১ম ও ২য় খণ্ড
সম্পাদনা: জ্যোতির্ময় ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৯৫. রথীন্দ্রনাথ রায়
দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার।
বাক্ সাহিত্য প্রা: লি:, কলকাতা। ১৩৭৮।

৯৬. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।
শ্রীরামপুর। ১৮০৫।

৯৭. রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল
শান্তিপুর স্মৃতি : অদ্বৈত খণ্ড।
কলকাতা। ১৩৩৬।

৯৮. রতনকুমার নন্দী
কর্তাভজা : ধর্ম ও সাহিত্য।
কলকাতা। ১৯৮৪।

৯৯. রবীন্দ্রনাথ রায়
আপনজন।
কৃষ্ণনগর। ১৩৯৩।

১০০. রমারঞ্জন দাস
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি।
কলকাতা। ১৯৮০।

১০১. শতঞ্জীব রাহা
কথাচিত্রকর দীনেন্দ্রকুমার রায়।
সুপ্রকাশ, কলকাতা। ১৯৯০।

১০২. শতঞ্জীব রাহা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলার কৃষক মঞ্চ-সম্পর্ক।
সুপ্রকাশ, কৃষ্ণনগর। ১৯৯৩।

১০৩. শিবনাথ শাস্ত্রী
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।
কলকাতা। ১৯০৯।

১০৪. শ্রীকেতুলাল
মদনপুরের ইতিকথা।
তরুলতা প্রকাশনী, মদনপুর, নদিয়া। ১৩৯৮।

১০৫. **শরদিন্দুনারায়ণ রায়**
চিত্রে নবদ্বীপ।
নবদ্বীপ। ৪৬৮ গৌরাব্দ।

১০৬. **শ্যামাপদ মণ্ডল**
প্রবাদের আলোকে নদিয়া।
দীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা।

১০৭. **শ্যামাপদ মণ্ডল**
হরিণঘাটার ইতিকথা।
দীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা।

১০৮. **শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ**
শ্রীধাম নবদ্বীপ চিত্র প্রদর্শনী-প্রদর্শক।
মায়াপুর। ১৯৯০।

১০৯. **শ. ম. শওকত আলী**
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ১৯৭৮।

১১০. **সুপ্রকাশ রায়**
ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা। ১৯৬৬।

১১১. **সুধাংশু দাশগুপ্ত**
কারাগারে কমিউনিস্ট হওয়ার কাহিনী।
গণশক্তি, কলকাতা। ১৯৮৪।

১১২. **সজল রায়চৌধুরী**
গণনাট্য কথা।
গণমন প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৯০।

১১৩. **সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়**
আমাদের গ্রাম।
কৃষ্ণনগর। ১৩৭০।

১১৪. **সুনীলচন্দ্র দাস**
কাঁদে মরালী কাঁদে যমুনা।
লঘুছন্দা প্রকাশনী, চাকদহ। ১৯৯৫।

১১৫. **সুধীর চক্রবর্তী**
সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৫।

১১৬. **সুধীর চক্রবর্তী**
কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ।
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৯৮৫।

১১৭. **সুধীর চক্রবর্তী**
বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৬।

১১৮. **সুধীর চক্রবর্তী**
গভীর নির্জন পথে।
আনন্দ পাবলিশার্স লি:, কলকাতা।

১১৯. **সুধীর চক্রবর্তী**
চালচিত্রের চিত্রলেখা।
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৯৯৩।

১২০. **সুধীর চক্রবর্তী**
ব্রাত্য লোকায়ত লালন।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১২১. **সুধীর চক্রবর্তী**
পশ্চিমবঙ্গে মেলা ও মহোৎসব।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১২২. **সুধীর চক্রবর্তী**
দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণ ও বিস্মরণ।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১২৩. **সুধীর চক্রবর্তী** সম্পাদিত
দেহতত্ত্বের গান।
প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা।

১২৪. **সুকুমার সেন**
বাংলার স্থাননাম।
আনন্দ পাবলিশার্স লি:, কলকাতা। ১৩৮৮।

১২৫. **সত্যশিব পাল দেব মহান্ত**
ঘোষপাড়ার সতীমা ও কর্তাভজা ধর্ম।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৯০।

১২৬. **সৃজননাথ মুস্তৌফী**
উলা বা বীরনগর।
কলকাতা। ১৩৩৩।

১২৭. **সৃজননাথ মুস্তৌফী**
উলার মুস্তৌফী বংশ।
উলা (বীরনগর)। ১৩৩৭।

১২৮. **সনৎকুমার মিত্র** সম্পাদিত
কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস। ১ম খণ্ড
কলকাতা। ১৩৮২।

১২৯. **সনৎকুমার মিত্র** সম্পাদিত
কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস। ২য় খণ্ড
কলকাতা। ১৩৮৩।

১৩০. **সনৎকুমার মিত্র**
পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা।
কলকাতা। ১৩৮২।

১৩১. **স্বপন বসু**
গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ।
পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৯৮৪।

১৩২. **সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত** সম্পাদিত
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। ১৯৭৬।

১৩৩. **স্বাধীনতা সংগ্রামে নদিয়া।**
নদিয়া জেলা নাগরিক পরিষদ,
কৃষ্ণনগর। ১৯৭৩।

১৩৪. **হারাধন দত্ত**
জমাদার সাহেব মামুদ জাফর।
শিবনিবাস, নদিয়া। ১৩৮৩।

১৩৫. **হরিদাস দাস**
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। ১ম—৪র্থ খণ্ড
নবদ্বীপ। ৪৭০-৪৭১ চৈতন্যাব্দ।

১৩৬. **হরিদাস নন্দী** সঙ্কলিত
আদিম নদিয়ার কথা।
কলকাতা।

১৩৭. **ক্ষুদিরাম দাস**
বৈষ্ণব রস প্রকাশ।
এ কে সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা। ১৩৭৯।

১৩৮. **অমরেন্দ্র রায়**
বাঙ্গালির পূজা পার্বণ।
কলকাতা। ১৩৫৬।

১৩৯. **তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়**
উনিশ শতকের রানাঘাট।
সাহিত্য শ্রী, কলকাতা। ১৯৯৫।

১৪০. **তপোবিজয় ঘোষ**
নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র।
কলকাতা। ১৯৮৩।

১৪১. **দেবেন্দ্রনাথ দে**
কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত।
সম্পাদনা : সত্যব্রত দে
জিজ্ঞাসা, কলকাতা। ১৯৯০।

১৪২. **ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী।**
সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস
কলকাতা। ১৩৬৯।

১৪৩. **মেসবাহুল হক**
পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীলবিদ্রোহ।
ঢাকা, বাংলাদেশ। ১৯৮২।

১৪৪. **নিখিল সুর**
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ।
কলকাতা। ১৯৮২।

□ *উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও প্রায় শতাধিক বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও জীবনী গ্রন্থগুলিতে নদিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

ENGLISH BOOKS :

1. **Banerjee, B. and Bowers, N. M.**
Changing Landscape of Nadia.
Calcutta, 1965.

2. **Bhattacharya, Jogendra Nath**
Hindu Castes and Sects.
Calcutta, 1896.

3. **Chakrabarty, Chintaharan and Ghosh Paresh Nath ed.**
Krishnagar College Centenary Commemoration Volume.
Krishnagar, 1948.

4. **Calendar of Persian Correspondence,**
Vol. 1 (1759—67).
National Archives of India, 1970.

5. **Garrett, J. H. E.**
Bengal District Gazetteers : Nadia.
Calcutta, 1910.

6. **Habib, Irfan**
An Atlas of Mughal Empire—Political and Economic Maps.

7. **Hunter, W. W.**
A Statistical Account of Bengal, Vol. II.
London, 1875.

8. **Imperial Gazetteer of India,**
Provincial Series Vol. I.
Calcutta, 1909.

9. **Indigo Commission's Report.**
Calcutta, 1860.

10. **Majumdar, Durgadas**
West Bengal District Gazetteers : Nadia
Calcutta, 1978.

11. **Rennell, James**
Memoir of a Map of Hindoostan.
London, 1788.

12. **Sarkar, J. N.** , ed.
The History of Bengal.
Dacca, 1948.

13. **Siddiqui, Ashraf** ed.
Bangladesh District Gazetteers : Kushtia.
Dhaka, 1976.

14. **Tofayell, Z. A.**
History of Kushtia.
Kushtia, 1970.

15. **West Bengal District Census Handbook :**
Nadia–1951, 1961, 1971, 1981.
Govt. of India, New Delhi.

সীমা ও আয়তন : উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা আর পদ্মা নদী, পূর্বে বাংলাদেশ, দক্ষিণে চব্বিশ-পরগনা জেলা, পশ্চিমে বর্ধমান আর হুগলি জেলা। এই জেলা আয়তনে ৮৯২৭ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা ৩,৮৪,৮২৭ (১৯৯১)।

নদ-নদী : ভাগীরথী (গঙ্গা), জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙা, চূর্ণী আর ইছামতী এই জেলার প্রধান নদ-নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য : ধান, পাট, ডাল, গম, আখ ইত্যাদি।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান : কৃষ্ণনগর এই জেলার সদর শহর। এখানকার মৃৎশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এখানে জন্মেছিলেন। নবদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন কেন্দ্র। এখানে প্রায় ৮০০ বছর আগে বাংলার শেষ স্বাধীন সেন বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান আর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। মায়াপুর মহাপ্রভু মন্দির একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। পলাশী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের নিকট বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। এখানে একটি চিনির কল আছে। শান্তিপুর, রানাঘাট মহকুমায় অবস্থিত বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। ফুলিয়া, বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। রানাঘাট বিরাট রেলওয়ে জংশন স্টেশন ও মহকুমা শহর। কল্যাণীতে বিধান রায় পরিকল্পিত এক আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। এখানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় নামে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। হরিণঘাটাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ সরবরাহের বিরাট কেন্দ্র আছে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

শিল্পী : প্রয়াত শম্ভু পাল (ঘূর্ণী)